পরিচয়

বিশেষ সংখ্যা

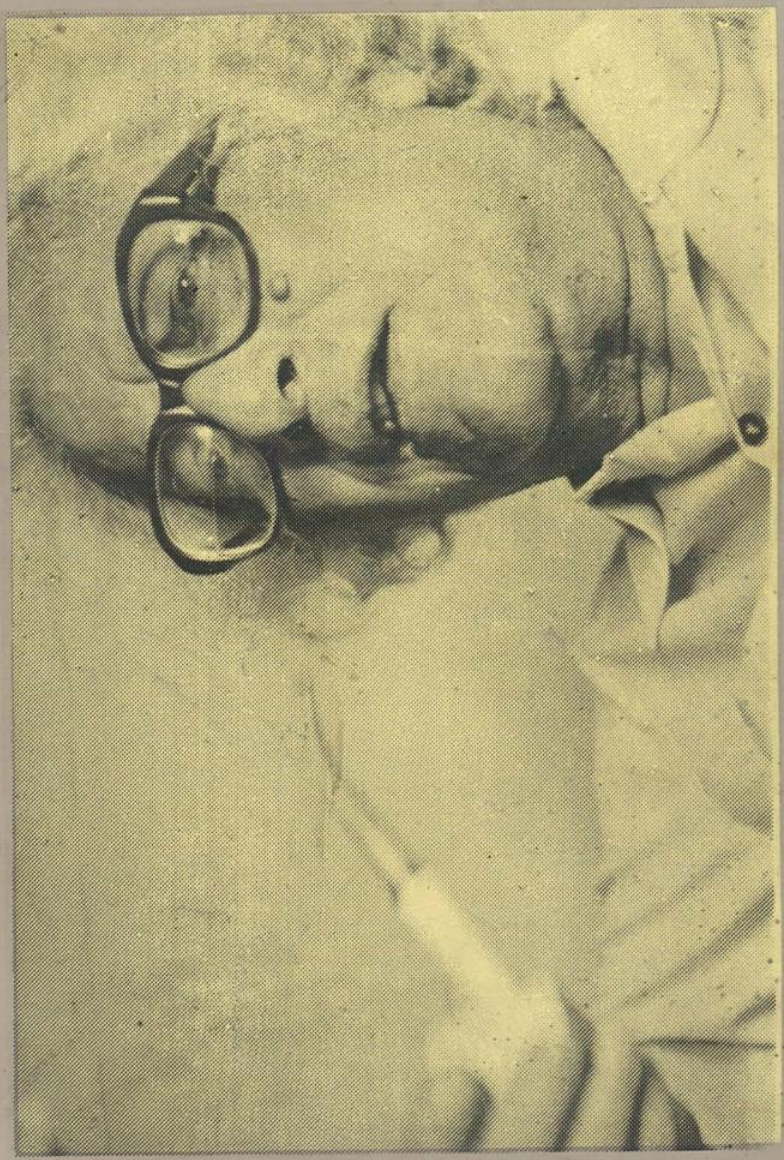

পরিচয় • ১০০ টাকা

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

অনিলকুমার সিংহ

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিমাইসাধন বসু

হুমায়ূন আজাদ

নিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)

চিরন্তন সাহিত্যের সেরা প্রকাশনায়—সংসদ

রচনাবলী

বঙ্কিম রচনাবলী-১ (সমগ্র উপন্যাস)	১৪০.০০
বঙ্কিম রচনাবলী-২ (সমগ্র প্রবন্ধ ও রচনা)	১৪০.০০
বঙ্কিম রচনাবলী-১ (সমগ্র ইংরেজি রচনা)	১০০.০০
মধুসূদন রচনাবলী	১২০.০০
রমেশ রচনাবলী	১২৫.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী-১	১৩৫.০০
দ্বিজেন্দ্র রচনাবলী-২	১৫০.০০
গিরিশ রচনাবলী-১	৭৫.০০
গিরিশ রচনাবলী-২	১৫০.০০
গিরিশ রচনাবলী-৩	৮০.০০
গিরিশ রচনাবলী-৪	১৩০.০০
গিরিশ রচনাবলী-৫	১০০.০০
দীনবন্ধু রচনাবলী	১০০.০০
সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ	২০০.০০
তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ-১, ২, ৩ (প্রতিটি)	১৬০.০০
ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক সমগ্র-১, ২ (প্রতিটি)	১৫০.০০
রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ	১০০.০০
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটকসমগ্র-১	১৫০.০০

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ● কলকাতা ৭০০ ০০৯

দূরভাষ : ২৩৫০-৭৬৬৯/৩১৯৫

FAX : 00-91-33-2360-3508, E-MAIL : samsad@cal3.vsnl.net.in

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ * পশ্চিমবঙ্গ সরকার
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০

বাংলা নাট্য সংকলন ১ম খণ্ড

সম্পাদনা : ড. অজিতকুমার ঘোষ, ড. বিষ্ণু বসু, নৃপেন্দ্র সাহা ২০০

সফদর হাসমি নাট্য সংগ্রহ (শোভন সংস্করণ)

সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৭৫

শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী উপেন্দ্রনাথ দাস

সম্পাদনা : ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা ৪০

নীল দর্পণ (ইং) সম্পাদনা : সুধী প্রধান ৭০

গেরাসিম লিয়েবেদেফ ড. হায়াৎ মামুদ ১৮
নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী গণেশ মুখোপাধ্যায় ৯
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার শংকর ভট্টাচার্য ৪০
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫
বাংলা নটনটী (৪র্থ খণ্ড) দেবনারায়ণ গুপ্ত ৩৫
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৩ ২০
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৫ ৫০
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৬ ৬০
নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ৩, ৪ (প্রতিটি) ১০
বঙ্গীয় নাট্যশালা ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়
সম্পাদনা : ড. বিষ্ণু বসু ৫০

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান
(১৯০১-১৯০৯) শংকর ভট্টাচার্য ৬০
বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান
(১৯১০-১৯১৯) শংকর ভট্টাচার্য
সম্পাদনা : অভিজিৎ ভট্টাচার্য ৮০
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস
কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০
আশার ছলনে ভুলি (২য় সং)
উৎপল দত্ত ৪৫
প্রসঙ্গ : নাট্যকার মন্মথ রায় ৫০
সম্পাদনা : শিব শর্মা

নট-নাট্যকার-নির্দেশক গিরিশচন্দ্র ঘোষ : একটি আলেখ্য

লেখা : বিষ্ণু বসু সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০

নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য : একটি আলেখ্য

লেখা : সজল রায়চৌধুরী সম্পাদনা : নৃপেন্দ্র সাহা ৮০

বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান

ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর ৩৫

প্রাপ্তিস্থান : বইঘর কফি হাউস (কলেজ স্ট্রিট), রবীন্দ্রসদন, দীনবন্ধু মঞ্চ (শিলিগুড়ি)
বাংলা আকাদেমি ভাণ্ডার ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-১০

আই. সি. এ. ২১৪৪/২০০৪

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সারস্বত কেন্দ্র **পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি**

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৭০০০২০

শুদ্ধ বাংলা

শিখতে গেলে পাশে রাখুন

আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান ১৬০/

আরও অভিধান

আকাদেমি বানান অভিধান ৭০/
পরিভাষা প্রশাসন (৩য় সং) ২৫/
বাংলা বানানবিধি (৩য় সং) ৫/

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

১০ম খণ্ড প্রকাশিত

সাঁওতালি-বাংলা
সমশব্দ অভিধান ১০০/ ক্ষুদিরাম দাস
সাহিত্যের শব্দার্থকোষ ৪০/
সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাষাতত্ত্বের পরিভাষা ১৮/
সুভাষ ভট্টাচার্য

কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে
৫ খণ্ডে গ্রাহকমূল্য ৬০০/

২০০৩ কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত গ্রন্থ

শ্রদ্ধালেখমালা : সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন ১৫০/ পবিত্র সরকার সম্পাদিত
সুকুমার সেন ৩০/ অলোক রায়
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫০/ বুদ্ধদেব দাস
বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন ১৩০/ অমলেন্দু দে
অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৩০/ অরুণ মুখোপাধ্যায়
বসন্তরঞ্জন রায় ৪০/ শান্তি সিংহ
পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ১৮০/ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
সম্পর্ক : সম্প্রীতি বিষয়ক গল্প সংকলন ১৫০/ বিষ্ণু বসু অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট ৯০/ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত
গান্ধর্ব কবিতাগুচ্ছ (বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়) ৫০/ শঙ্খ ঘোষ

যোগাযোগ ঃ দূরভাষ : ২২২৩-৯৯৭৮, ২৩৫৩-০৪৩৭ ফ্যাক্স (০৩৩) ২২২৩-০৯৪৬ ই-মেল bakademi@vsnl.com.

আই. সি. এ. ২১৪৪/২০০৪

পরিচয়-এর কথা

প্রথমে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্মান-সংখ্যা করার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা দাঁড়িয়ে গেল স্মরণ-সংখ্যায়। বয়স হলেও বা অসুস্থ থাকলেও পদাতিক-কবির পথচলা অব্যাহত থাকবে এটাই ছিল আমাদের বিশ্বাস।

পরিচয়-এর সৌভাগ্য এই যে, উপদেশক বা সম্পাদক হিসেবে সে সর্বদাই সাহিত্য-সংস্কৃতি জগতের সেরা মানুষদের পেয়ে এসেছে। পরিচয়-এর দুর্ভাগ্য এই যে, এখন 'একে একে নিভিছে দেউটি।' অল্পদিন আগেই আমাদের প্রধান উপদেশক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ঘটেছে। তাঁর সম্মান-সংখ্যাটি হীরেন্দ্রনাথের হাতে পৌঁছে দেবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটেছিল। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে সেটি সম্ভব হল না। তবে হীরেন্দ্রনাথ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ওপর তাঁর স্বহস্ত-লিখিত রচনাটি আমাদের দিয়ে যান। শেষমুহূর্ত পর্যন্ত যে তিনি পরিচয়-এর সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন এই রচনাটি তার নিদর্শন।

পরিচয়-কে বাদ দিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত যে-কোনো আলোচনাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। পরিচয়-এ তাঁর প্রথম কবিতা 'এখানে' প্রকাশিত হয় ১৩৪৫-এর অগ্রহায়ণে। সম্পাদক তখন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তারপর থেকে দীর্ঘকাল 'পরিচয়' তাঁর গদ্যে-পদ্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সংখ্যায় তার বেশ কিছু পুনর্মুদ্রণ আছে। পরিচয়-এর সম্পাদনা তিনি করেছেন দু'দফায়। প্রথমবার ১৯৫১ থেকে ১৯৫২, দ্বিতীয়বার ১৯৬৬ থেকে ১৯৬৭। তাঁর সম্পাদনার মান এবং উৎকর্ষ ছিল প্রশ্নাতীত। 'পরিচয়' কোনোদিনই পেশাদার বা বাণিজ্যিক কাগজ নয়। তাই এই পত্রিকা পরিচালনার অর্থ কেবল লেখা সংগ্রহ বা প্রকাশই নয়, একই সঙ্গে নানা ভূমিকায় সম্পাদকদের অবতীর্ণ হতে হয়। এই সংখ্যায় শ্রীলা বসুর সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে তাতেই সুভাষের পরিচয়-সম্পাদনার অভিজ্ঞতা বর্ণিত আছে। সেই দায়বদ্ধতার এখনও আমরা উত্তরাধিকারী।

তাই এই স্মরণ-সংখ্যা কেবল পরিচয়-এর এককালের সম্পাদক এবং তার চিরকালের লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনই নয়, বিলম্বে হলেও আমাদের মহান পূর্বসূরীদের অবদানের কথাও একবার নতমস্তকে স্মরণ করা। কোনো সংকলনই হয়তো পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে না, এটিও সেই অর্থে হয়নি। তবে আমাদের আন্তরিকতার অভাব ছিল না। লেখকদের কাছে 'পরিচয়' কৃতজ্ঞ। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধাতেই তাঁরা আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। প্রণব বিশ্বাস সবসময়ই এসব ক্ষেত্রে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। এবারেও দিয়েছেন। তাপস ভৌমিকের সহায়তাও ভুলবার নয়।

বিনীত

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

অরুণ ঘোষ ❑ ভবানী সেন স্মৃতি পাঠাগার ❑ ন্যাশনাল লাইব্রেরি ❑ অন্তরা বক্সি

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একমাত্র নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিমিটেড

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড, (৪র্থ তল) কলিকাতা-৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

ক) এইচ. এম. টি./মহিন্দর/এসকর্টস/মিৎসুবিশি ট্রাকটরস/সোনালিকা। এল এন্ড টি-জন-ডিয়ার/স্বরাজ

খ) ক্যামকো/মিৎসুবিশি/ভি. এস. টি. ডি. আই-১৩০ পাওয়ার টিলারস্।

গ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।

ঘ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামতি করার বিষয়ে কোনো অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং—২২২০-২৩১৪/১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস

২৪ পরগণা (দক্ষিণ)	ঃ ১৪, নিউ তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮।
” (উত্তর)	ঃ ২৭নং যশোর রোড, বারাসাত।
হুগলী	ঃ সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর/আরামবাগ/চুঁচুড়া, খরুয়া বাজার, লোহাপট্টি চিনসুরা/পুরশুড়া, বিডিও অফিস প্রেমিসেস্, পুরশুড়া।
বর্ধমান	ঃ ৫নং রামলাল বোস লেন, রাধানগর পাড়া, ষ্টেশন রোড, বর্ধমান।
বাঁকুড়া	ঃ জল সম্পদ ভবন (এগ্রি ইরিগেশন ক্যান্টিন হল), কেন্দুয়াডিহি।
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট)	ঃ ডাকবাংলো রোড, শরৎপল্লী।
মেদিনীপুর (ইষ্ট)	ঃ চৌধুরী কুটির, বহরগ্রাম, পোঃ পাঁশকুড়া।
বীরভূম	ঃ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং (এগ্রি ইরিগেশন), বড়বাগান, সিউড়ি।
মালদা	ঃ গৌর রোড, কৃষ্ণকালিতলা, মালদা।
মুর্শিদাবাদ	ঃ ৪৬/১, কৃষ্ণনাথ রোড, বহরমপুর।
জলপাইগুড়ি	ঃ প্রশাসনিক ভবন, রুম নং-২, ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট, রাজবাড়ি গ্যারেজ, জলপাইগুড়ি।
দার্জিলিং	ঃ বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি।
কুচবিহার	ঃ এন. এন. রোড, কোচবিহার।
পুরুলিয়া	ঃ বেলগুমা, এগ্রি ইরিগেশন কলোনি।
নদীয়া	ঃ ৫/২, অনন্ত হরি মিত্র রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া।
উত্তর দিনাজপুর	ঃ রায়গঞ্জ, সুপার মার্কেট কমপ্লেক্স।
দক্ষিণ দিনাজপুর	ঃ বালুরঘাট (ঘটকালি রোড)।

এ. আই. সি/৮৮৫৯/এবি ২০০৪

পরিচয়

ফেব্রুয়ারি-জুলাই ২০০৪
মাঘ ১৪১০-আষাঢ় ১৪১১
৭-১২ সংখ্যা. ৭৩ বর্ষ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মরণে ❑ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩
নিজের মতো করে দেখি ❑ রাম বসু ৯
সুভাষদা মানে চলা... ❑ কার্তিক লাহিড়ী ১২
সুভাষ ও সুকান্ত ❑ অশোক ভট্টাচার্য ২০

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সমকালীন মূল্যায়ন

সুভাষদার সঙ্গে পথ চলা ❑ শঙ্খ ঘোষ ৩৯
আমার এ গল্পের নায়ক ❑ অলোক রায় ৪৯
সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অনুঘটক ও অনুস্রষ্টা ❑ তরুণ সান্যাল ৫৮
আমাদের সময়ের স্বপ্ন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ❑ পরমেশ আচার্য ৬৭
ছন্দ-প্রকরণ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় ❑ সুমিতা চক্রবর্তী ৭৭
সুভাষ ছেড়ে যাননি, পাশেই ছিলেন ❑ অমিয় ধর ৮৭
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাসের জগৎ ❑ তপোধীর ভট্টাচার্য ১১৮
বানানো তো বটেই, কিন্তু মনেই হয় না বানানো : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া ❑ মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১
পদাতিক হয়ে বাংলার পথে ঘাটে : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ❑ গৌতম নিয়োগী ১৪০
পদাতিক-অগ্নিকোণ-চিরকুট : 'বহ্বারম্ভে বজ্র যেদিন হাসাত' ❑ হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫১
সুভাষিত গদ্যলিপি : হাংরাস ❑ হীরেন চট্টোপাধ্যায় ১৬৫
মিথ-পুরাণ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ❑ শুভঙ্কর ঘোষ ১৭৮
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষাচিন্তা ❑ সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০
ভাষা নিয়ে ভাবনা ❑ অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৯৭
জাদুগদ্যে ভাবনার আলপনা ❑ অভীক মজুমদার ২০৩
এবার আমরা রাত জাগি ❑ জয়দেব বসু ২১২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছোটোদের জন্য লেখা তিনটি বই ❑ অর্জুনদেব সেনশর্মা ২১৫
কে শাঁখে ফুঁ দেয়—পদাতিক? ❑ অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৪

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ পরিচয়

'পরিচয়' ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত : সুভাষের সম্পাদনা ❑ শ্রীলা বসু ২৩৭
সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত পরিচয় : কালানুক্রমিক সূচি ❑ প্রভাতকুমার দাস ২৪৫

পুরোনো পরিচয় থেকে : সৃষ্টি

রিপোর্তাজ

বাবর আলির চোখের মত ২৬৯
একুশের সুরে বাঁধা ২৭৪
লাল-মাটি ২৭৯
এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা ২৯০
ফুলের লোক্যালে ফেরা ৩০৩
গ্রামের নাম নিমতিতা ৩১০
ভুবননগর এড়িয়ে ৩২৩
মিছিলে মিছিলে ৩৩০

কবিতা

এখানে ❑ রাস্তার লোক ❑ ধীন তা ❑ সন্ধ্যামণি ❑ পাথরের ফুল ❑ জননী
জন্মভূমি ❑ জলছবি ❑ লাল গোলাপের জন্য ❑ ভাল লাগছে না ❑ জল
আসুক ❑ চীরবাসে বীর ৩২২-৩৪৯

সম্পাদকীয়

পূর্বপাকিস্তানে 'পরিচয়' নিষিদ্ধ ৩৫০
পাক ভারত সংস্কৃতি বিনিময় ও মৈত্রী ৩৫১

পুরোনো পরিচয় থেকে : প্রসঙ্গ

বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা ❑ প্রবোধচন্দ্র সেন ৩৫৩
'চিরকূট' ❑ সিদ্ধেশ্বর সেন ৩৬২
'নাজিম হিকমতের কবিতা' ❑ মৃগাঙ্ক রায় ৩৭৫
পরিবর্জনে নয়, পরিগ্রহণে ❑ অরুণ সেন ৩৮০
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ❑ সতীন্দ্রনাথ মৈত্র ৩৮৩
কবিতার দশ বছর ❑ অরুণ সেন ৩৯০

এখনকার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ❑ অমিতাভ দাশগুপ্ত ৩৯৩
যখন যেখানে ❑ কুশল লাহিড়ী ৩৯৮
জীবন অবাধ, জীবন অগাধ ❑ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ৪০০

বিবিধ

সাক্ষাৎকার ৪০৭
চিঠিপত্র ৪১২
রচনাপঞ্জি ৪১৮

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন
দীপ্ত দাশগুপ্ত

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

যুগ্ম সম্পাদক
বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
কার্তিক লাহিড়ী
শুভ বসু অমিয় ধর

সম্পাদনা সহায়তা
অজয় চট্টোপাধ্যায়

দপ্তর সচিব
দুলাল ঘোষ

উপদেশকমণ্ডলী
রাম বসু
সিদ্ধেশ্বর সেন শঙ্খ ঘোষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু কর্তৃক ঘোষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯/এইচ/এইচ, গোয়াবাগান স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

শারদীয় পরিচয় ঃ ১৪১১

মহালয়ার আগে

প্রকাশিত হবে

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মরণে

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

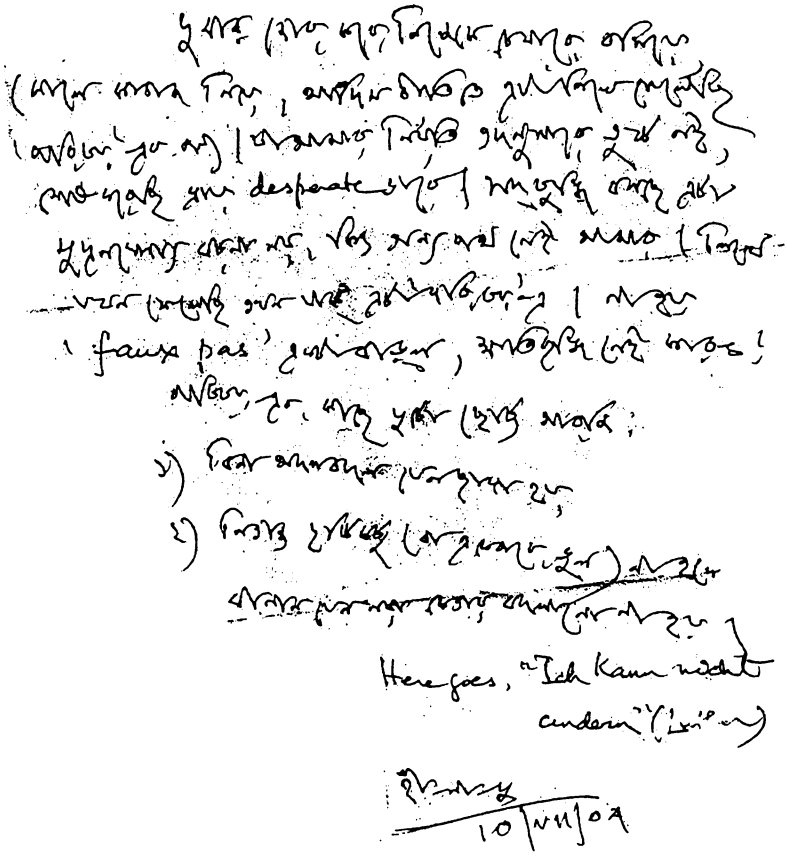

জেনে খুব খুশি হয়েছি যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে 'পরিচয়' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের আয়োজন হয়েছে। একটু মজা করার জন্যই গৌরচন্দ্রিকা করছি এই বলে যে বহু বৎসর ধরে 'পরিচয়'-এর উপদেষ্টা হিসাবে থেকে এই সিদ্ধান্তে আমার আনন্দ, বিশেষত এজন্য যে কখনও কোনো উপলক্ষে 'পরিচয়' আমার উপদেশ বা পরামর্শ চেয়েছে বলে আমার স্মরণ হয় না। এই অতি বৃদ্ধ বয়সে কোনো কোনো পদে 'নামকা ওয়াস্তে' অধিষ্ঠিত থাকার অভিজ্ঞতা আমার রয়েছে। তাই 'পরিচয়' যাঁরা চালান তাঁদের এই সিদ্ধান্তে আমার

শুধু সায় নয় বেশ একটু উৎসাহও রয়েছে। তাই আশা করব যে এই প্রযত্ন সাফল্য ও সৌষ্ঠবের সঙ্গে চালিত হবে।

আরও একটু বাড়িয়ে বলে নেবার অনুমতি চাইছি। গত বছর আমার ৯৬-তম জন্মদিনে (২৩ নভেম্বর ২০০৪) 'পরিচয়' সম্পাদক আমার হাতে তুলে দেন আমারই নামাঙ্কিত একটি সম্বর্ধনা সংখ্যা। 'উপদেশক' রূপে আমি পূর্বাহ্নে জানতামই না। আর আমার অভিজ্ঞতা হল যে একই সঙ্গে এই সংখ্যা পেয়ে এবং পড়ে আমি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত বোধ করলাম আর যুগপৎ (বিশেষত এই সংখ্যার বিস্তৃত ইংরেজি অধ্যায়গুলি দেখে) বিব্রত ও কিঞ্চিৎ ক্লিষ্ট অনুভব করলাম। রহস্য ছলে যা বলছি তার কদর্থ হবে না এ ভরসা আমার হচ্ছে। এজন্যই বেশি খুশি যে সুভাষকে নিয়ে সংখ্যাটি সম্পর্কে আমাকে যথাকালে জানানো হয়েছে; এ-কাজটি ইতিপূর্বে আমাদের করা উচিত ছিল।

* * *

বাংলায় কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যত যিনি প্রতিষ্ঠাতা, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ যে মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব তা সর্বজনবিদিত। শিক্ষিত বাঙালির যত দোষ ত্রুটিই থাকুক, একটা গুণ হল যে সাহিত্য বিষয়ে অন্তত কিঞ্চিৎ আগ্রহ ও অনুরাগ প্রায় যেন মজ্জাগত। তাই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের জীবনারম্ভ সাহিত্যচর্চা নিয়ে আর পরম সৌভাগ্য আমাদের সকলের যে তখনই তিনি গভীর সাহচর্য পেলেন বাঙালির পরম প্রিয় সাহিত্যসঙ্গীত স্রষ্টা কাজী নজরুল ইসলাম-এর। তালতলা লেনে বাসকালে নজরুল একদিন সকালে শোনালেন সারারাত জেগে লেখা "বিদ্রোহী" কবিতা। যা হল এদেশের সাহিত্যের বিবরণে এক পথ-চিহ্ন. "আমি বিদ্রোহী/আমি বিদ্রোহী সূত/বিশ্ব বিধাতৃর।" স্বয়ং বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত-খ্যাত ভৃগু ঋষিকে স্মরণ করলেন বাংলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল—কেউ মানুক বা না মানুক কম্যুনিষ্ট বাংলার বিবরণে নজরুলের অবদান আর মুজফ্‌ফর-নজরুল সম্পর্ক ও সৌহার্দ্য এক পরম গৌরব। আশ্চর্য কি যে লেখক শিল্পীদের সঙ্গে কম্যুনিস্ট আন্দোলনের হৃদ্যতা এক বিশ্বব্যাপী ঘটনা। এই বাংলায় তার নিদর্শন কম নয়। এ নিয়ে মস্ত লেখা ফাঁদা যায়। কিন্তু তা আমার অসাধ্য। তবু কত কথাই যে মনে আসে। কত নামই যে ভিড় করে আসে স্মৃতিতে। 'পরিচয়' এই বিষয় নিয়ে একটি স্মরণীয় গবেষণার উদ্যোগ নিতে পারবে? আমার মেয়াদ না ফুরিয়ে এলে একটা খসড়ায় হাত দিতে পারতাম। কিন্তু তা আর সম্ভব নয়।

এসব কথা অপ্রাসঙ্গিক নয় কারণ সুভাষকে নিয়ে ভাবতে বসে ভিড় করছে মনে সেই সব অভিজ্ঞতা যখন বিদেশ থেকে ফিরে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদানকালে (১৯৩৬, পার্টি তখন বে-আইনি) আমার প্রথম কর্তব্য হল প্রগতি লেখকসংঘ গঠনের চেষ্টা যাতে আমার প্রধান সহযোগী ছিলেন অবিস্মরণীয় বিদ্বান, বাগ্মী ও সুলেখক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। সহজে ও স্বাভাবিকভাবে 'পরিচয়' গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ঘটল। প্রিয় বন্ধু হুমায়ুন কবির ও আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ল, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো প্রতিভার সৌহার্দ্য পেলাম। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মহাভাগের বন্ধু হতে পারলাম, জানা শুরু হল কবি-কোবিদ বিষ্ণু দের সঙ্গে, যিনি ক্রমশ আমার জীবনে এক পরম মিত্র ও চিত্ত-সহোদর হলেন মার্ক্‌স্‌তত্ত্বে

অনায়াস অথচ গভীর 'weltanschaung'-এর (বিশ্ববীক্ষা, জগৎচেতনা) সন্ধানে। 'পরিচয়'-এর সঙ্গে বিষ্ণুবাবুর সাযুজ্য ছিল অকাট্য; প্রবল মতান্তরে আলাদা হয়ে কিছুদিন 'সাহিত্যপত্র' প্রকাশ করেছেন (যাতে আমিও লিখেছি। তিরস্কৃত হইনি!) কিন্তু আমৃত্যু (আমার মতো) ছিলেন 'উপদেশক'। যাই হোক্ বাংলা সাহিত্য শিল্পজগতের অবস্থিতি তখন এমন যে আমার কাজ হল সহজ। গান্ধীজীর অসহযোগ সংগ্রামের 'ব্যর্থতা'র পর বিপ্লবব্যাকুল দেশব্রতীদের 'বিজলী' 'আত্মশক্তি' প্রভৃতি পত্রিকা মারফৎ সমাজবাদ-সাম্যবাদের মূল নীতি সঞ্চারিত হতে আরম্ভ হয়েছিল। 'কল্লোল' 'কালিকলম' যে ধারা আনল তাতে ছিল সমাজবাদের মর্মবস্তু, সর্ববিধ বঞ্চনার বিপক্ষে সৃষ্টিশীল মানুষের আকুল প্রতিবাদ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুবাদে Maxim Gorky-র 'মা' উপন্যাস বাংলায় তখন এক 'best seller'; লঘু হাস্য রচনায় পারঙ্গম শিবরাম চক্রবর্তী লঘু-গুরু মিশ্রণে লিখলেন বৃহৎ গ্রন্থ 'মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি'। ঠাকুরবাড়ির মতো প্রায় সাধারণের নাগালের বাইরে অবস্থিত অঞ্চলে বহুগুণান্বিত অথচ বিপথগমনে উন্মুখ সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন। বাংলার স্বীকৃত সাহিত্যরথীদের মধ্য থেকে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (প্রগতি লেখক সংঘের প্রথম সভাপতি) ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত-এর মতো মানুষ তখন সক্রিয়। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের ছত্রচ্ছায়ায় থেকেও ব্যাকুল চঞ্চল চিন্তাকুল বাঙালি সাহিত্যজগৎ তখন নতুন পথের সন্ধানী। স্পেনের গৃহযুদ্ধ হল ফ্যাশিষ্টদের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মহড়া; তা বাঙালি লেখকের মনকে উন্মুখ করে দিয়েছিল। পূর্বজগতে ফ্যাশিস্ট জাপান মহাচীনকে আক্রমণ করে দেখাচ্ছিল রাজনীতির নতুন চেহারা। জওয়াহরলাল নেহরুর কল্যাণে আমাদের মুক্তিপ্রয়াস মিলিত হতে শুরু করল জগৎজোড়া ফ্যাশিষ্ট বিরোধী স্রোতে। এখানে প্রগতি লেখক সংঘ ১৯৪১ সালে সোভিয়েট সুহৃৎ সমিতির সঙ্গে মিলে ৪৬নং ধর্মতলা স্ট্রীটের বিখ্যাত দফ্তর খুলে বস্‌ল। সেখানেই এল ১৯৪৩-এ আই-পি-টি-এ (গণনাট্য সংঘ)। যেখানে এলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অতুলন সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (পরে শিষ্য ও অনুজ বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়). 'মহর্ষি' বলে খ্যাত অভিনেতা ও চিন্তক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মতো অবিস্মরণীয় মানুষ। শুধু মানুষের অর্থনৈতিক জীবন নয়, সম্পূর্ণভাবে তার মনুষ্যত্বকে শোষণব্যবস্থার কলুষ থেকে মুক্ত করার সামগ্রিক সংগ্রাম যে কম্যুনিজ্‌মের। এই 'সত্য' তখন আমাদের চোখে বাস্তব হয়ে ফুটে উঠছিল। ফ্যাশিস্ট দলপতি হিটলার-এর প্রচারমন্ত্রী ও দক্ষিণহস্ত Goebbels-এর সর্বত্র বিস্তৃত বিকার : "মিথ্যাকে বারবার ছড়িয়ে তাকে সত্য বানিয়ে দাও", কিম্বা "যখন আমি শুনি কেউ বলছে সংস্কৃতির ('Culture') কথা তখন আমি আমার বন্দুক উঁচিয়ে ধরি ("I cock my revolver") ইত্যাদি ইত্যাদি। ফ্যাশিজম্ যে কী নিদারুণ বিভীষিকাভরা পৈশাচিকতা, তা দুনিয়া জুড়ে মানুষের চেতনায় ছড়িয়ে পড়ছিল। সেদিনের উন্মাদনা আজ কোথায়? ভাবতে গেলে হৃৎকম্প হয়। স্বখাত সলিলে আমাদের সমাজবাদ-সাম্যবাদী প্রয়াস কোন্ এক মরুপথে হারিয়ে যেতে চলেছে, কে জানে? যাক্, ক্ষান্ত হই এমন চিন্তা থেকে। শুধু এত কথা না বলে পারলাম না (আরও কত কিছু অকথিত রইল) আমাদের সকলের প্রিয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা ভাবতে গিয়ে। ক্ষমা চাইছি এভাবে হয়তো মনের দুর্বলতাই প্রকাশ করছি।

সেই যুগে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে (১৯৩৯-৪৫) সুভাষ এল আমাদের মধ্যে। ঢাকায় ফ্যাসিস্টদের হাতে প্রাণ গেল তরুণ কম্যুনিস্ট প্রতিভা সোমেন চন্দ-এর; সারা বাংলা চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল। এ ক্ষতি পূরণের সম্ভাবনা রাখে না। তবু জীবন চলতে থাকে আর তাই যেন সুভাষ এল তার সহজাত সরল গভীর সতেজ নবীন চেতনা নিয়ে—আরও অনেকে। বিশেষ করে ভাবছি দুজনের কথা। সমর সেন আর সুকান্ত ভট্টাচার্য। যে ত্রয়ী বাংলা ভাষার ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অদ্বিতীয় কথাশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য হবার পূর্বে একবার আমায় বলেন তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন পার্টিতে তত্ত্বগত চিন্তার প্রতি প্রবল অনুরাগ দেখে। আমায় বললেন পার্টির নেতা পূরণচন্দ্ জোশী ১৯৪১-৪২ সালে জাগতিক পরিস্থিতি নিয়ে কয়েকদিনব্যাপী বিবরণ দিলেন তার শ্রোতাদের মধ্যে খাতা পেন্‌সিল নিয়ে 'নোট' করতে দেখলেন রাধারমণ মিত্র, সুশোভনচন্দ্র সরকার, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির মতো বিদগ্ধ জনকে! হ্যাঁ, বাস্তবিকই এমন ঘট্‌ত তখন। আজ যা অকল্পনীয়। চিন্তারহিত, ক্ষমতার লড়াইয়ে কামড়া কাম্‌ড়ির রাজনীতি কম্যুনিজ্‌ম কোনোকালে বরদাস্ত করেনি। কিন্তু সে ঘটনাই ঘটতে দেখেছি আর অতি সুকৌশলে সংঘটিত (Fidel Castro-র ভাষায় 'Contrived') প্রতিবিপ্লবে, কম্যুনিস্টদেরই সহায়তায়। ইতিহাসের সর্বনাশ ঘটে গেছে প্রায় যেন আমাদের আত্মহননে, বিপ্লবের মূল মন্ত্র ভুলে গিয়ে। খেদ করব না, মানুষ যদি পিশাচ হতে রাজি না থাকে তো আবার সবাই জাগব। মাথা তুলব—যে স্বপ্ন নিয়ে সুভাষের মতো প্রতিভা ব্রত গ্রহণে এসেছিল আর যেন বাইরের চাপে এবং নিজের কাছে পরাজিত হয়ে, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে চলে গেল, তা যেন শেষ কথা না হয়।

* * *

সুভাষের সাহিত্যিক শিল্পগত মূল্যায়ন আমার সাধ্য নয়, উদ্দেশ্যও নয়; সে কাজ অন্যজনেরা করবেন। আমি তুষ্ট যে জগদীশ ভট্টাচার্য-এর মতো প্রাজ্ঞ সুধী কবিরাই সে কাজ আরম্ভ করে গেছেন। আমি শুধু বলব যে একেবারে তরুণ হয়েও সে যেন বেশ এক ঝলক নতুন বাতাস এনেছিল। আর অত কম বয়সে অত সুপরিণত! আমার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি নেই কবিতা বিষয়ে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে যাই যখন একেবারে নতুন কেতার রাজনীতি নিয়ে সে লিখল : "বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ/রুখ্‌ব দস্যু দলকে আজ/দেবো না জাপানী উড়োজাহাজ/ভারতে ছুড়ে স্বরাজ।" লিখ্‌ল "আমরা নইকো ভীরুর জাত/দেব নাকো হতে দেশ বেহাত/আজকে যদি না করি আঘাত/দূষবে ভাবী সমাজ।" কী আশ্চর্য কাণ্ডজ্ঞান আর সঙ্গে সঙ্গে দেশাভিমান। একে আমি স্থান দিই "স্বদেশী গান" নাম দিয়ে এক সংকলনে। যা অনেক কর্মসহচরকে তেমন পছন্দ করতে দেখিনি। কিন্তু আমি খুশি। মনে পড়ছে সেই চল্লিশের দশকে সজনীকান্ত দাস-এর 'শনিবারের চিঠি' আমার সংকলনের সমালোচনায় কড়া চাবুক চালান আর—আমার সৌভাগ্য যে 'স্বদেশী গান'-এর পোষাকে সুভাষ, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় রায়, ক্ষেত্র গুপ্ত-এর লেখা উদ্ধৃত করে অন্তত গোচর করে দেয় 'শনিবারের চিঠির' পাঠকদের। সে বই এখন কোথাও পাওয়া যায় না। আমার কাছেও নেই।

কিন্তু মনে পড়ছে সে কথা। তবে নজরুলের পর যাকে 'স্বদেশী গান' বলে গর্ব করি তা যে কম্যুনিস্ট কবিরা স্বচ্ছন্দে ও সগৌরবে লেখে তা সবাইকে দেখাতে পেরে আমি আহ্লাদ পেয়েছি।

লেখা বেড়ে যাচ্ছে। অবান্তর হয়ে পড়ছি নিশ্চয়। কেমন করে শেষ করব, তাই এখন ভাবি। সুভদ্র সাহিত্যিক ভাষায় লিখতে পারছি না, শুধু বলব সুভাষ যে বাংলা ভাষায় দীপ্তিমান এক প্রধান কবি তা শুধু নয়। কবিতার ক্ষেত্রে বহু বিচিত্র ধারা সে প্রবর্তন করেছে। কিন্তু গদ্য পদ্য উভয় কৃতিত্বে সে সব্যসাচী। ফ্রান্সে যাকে বলে 'reportage'। সোমনাথ লাহিড়ীর প্ররোচনায় সুভাষ সেই 'গুরুমারা' বিদ্যা অর্জন করেছিল, এমন বাংলা গদ্য তার কলম থেকে বেরিয়েছে যা অনবদ্য। এত সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ, অর্থবহ অথচ সঙ্গে বাংলার মাটির সুগন্ধ তার সর্বাঙ্গে। আমি জানি না গদ্য লেখক হিসাবে কজন তার সমকক্ষ। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ মাথায় থাকুন। এক্ষেত্রে মনে পড়ে বুদ্ধদেব বসুর দ্বৈত কীর্তি গদ্যপদ্য উভয় বিভাগে। তবে যা বলছিলাম। এদিক দিয়ে সুভাষ প্রায় অনন্য। সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে হবে তার লেখায় বাঙালির স্বভাবগত শৈথিল্য নেই—কত বিস্তৃত তার লেখাপড়া, প্রেমেন্দ্র মিত্রের মতো তার জ্ঞানার্জন স্পৃহা। হঠাৎ মনে পড়ছে, "কাজের বাংলা" নিয়ে তার একটি বই—যখন শারীরিক ব্যাধি আর বিবিধ কারণে অসম্ভব মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে তার কালাতিপাত। তখনই লেখা এ বইটি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল—কত জেনে ভেবে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করছে এই স্বভাবকবি। জ্ঞানার্জনের এর কী আকুলতা। আর সেই জ্ঞান বহুজনের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেবার প্রবৃত্তি।

আমাকে তার 'শিক্ষক' বলে সে বর্ণনা করত। ভালোবেসেই করত তা জানি। 'শিক্ষা' দেবার পাত্র আমি ঠিক নই তবে সুভাষ M.A. ক্লাসে দর্শনশাস্ত্র যখন পড়ত তখন কিছুকাল মার্কস্‌তত্ত্ব বিষয়ক একটি পেপার আমি সুভাষ-সহ কয়েকজনকে পড়িয়েছি (প্রচণ্ড ফাঁকি দিতাম মনে রয়েছে!) তবে পার্টির কাজ নিয়েই তার সঙ্গে আমার বহু বৎসরের যোগাযোগ। তাই তাকে আমি শ্রদ্ধা নয় ভালোও বেসেছি—যা ক্ষুণ্ণ হয়নি বিপুল মতভেদ (ও কিছু পরিমাণে ছাড়াছাড়ি) সত্ত্বেও। কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে সে আমার চেয়ে ঢের বেশি একাত্ম হয়েছিল, অনেক বেশি কৃচ্ছ্রসাধন করেছে। বক্‌শা পাহাড় দুর্গে বন্দী হবার অভিজ্ঞতা তার কবিসত্তা তার কম্যুনিস্ট সংকল্পকে বিকৃত করেনি। দূষিত করতে পারেনি। আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকরণে সে অভ্যস্ত হয়েছে। লড়াই করতে পেরে বলতে কুণ্ঠা পায়নি যে পথে নেমে পড়তেই হবে কারণ "রাস্তাই একমাত্র রাস্তা"। সেই সুভাষ যখন পার্টি ছেড়ে যায় বা পার্টিই তাকে ছাড়িয়ে দেয় তখন তার মতো দুর্ঘটনা কি হতে পারে? এটাই ঘটেছে। বাস্তবকে অস্বীকারে লাভ নেই। সে কংগ্রেসের সভায় গেছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন্তারহিত কার্যক্রমে সমর্থন জানাতে পেরেছে, পার্টি এবং যে কম্যুনিস্ট প্রত্যয়ে তার মূলগত নিষ্ঠা ছাড়তে না পারলেও কিঞ্চিৎ চরিত্রভ্রংশ থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারেনি। তবু বলব এ সব সত্ত্বেও তাকে দূরে ঠেলতে আমি আজও প্রস্তুত নই, হব না, হতে পারি না। এই বাংলার দুজন কম্যুনিস্ট সম্বন্ধে বলব : ত্রিপুরার অদ্বিতীয় নেতা নৃপেন চক্রবর্তীকে প্রায় সত্তর বছর ধরে জেনেছি। একসঙ্গে

কাজ করেছি। শ্রদ্ধা করেছি। তিনি সি পি আই (এম) থেকে বহিষ্কৃত; সুভাষ সি-পি-আই থেকে বহিষ্কৃত (যার কুৎসিৎ ফলাফল দেখা গেল নোংরা চেহারায় তার অন্ত্যেষ্টি কালেও!)। কিন্তু বিচ্যুতি সত্ত্বেও এদের মহিমাকে আমি অভিবাদন করতে থাকব। সোভিয়েট দেশে দেখেছি সুভাষের কবিতার সংস্করণ ছাপা হয়েছে এক লক্ষ; মস্কোর Lumumba University for Peoples of the East-এর ক্রিয়াকলাপ দেখেছি, Foreign Literature Publishing House-এ জগৎ জুড়ে সাহিত্যকর্ম কি ভাবে সেখানে উৎসাহিত হত (দুর্বলতা সত্ত্বেও) তার সাক্ষাৎ পরিচয়ে তৃপ্ত হয়েছি। বিশ্বব্যাপী যে ভ্রাতৃত্ব ও কর্মসাহচর্য হল কম্যুনিজ্‌মের "ঐতিহাসিক মহাযজ্ঞ" (রবীন্দ্রনাথের কথা) তার সঙ্গে স্বল্প পরিচয় ও আস্বাদের গৌরব বোধ করেছি। এই কর্মযজ্ঞে আমাদের দেশে সুভাষের মতো 'ঋত্বিক', ক'জন পেয়েছি? তাকে আমি বাহবা দেব চিরকাল।

এবার দাঁড়ি টানি লেখায়। দুবার বসে নিজের ওপর জোর করে লিখে চলেছি। আর যেন পারছি না—তাছাড়া আমার সর্বতোব্যর্থ জীবনে যেন আর একটা বাড়তি ব্যর্থতায় ভুগছি এভাবে লেখার মধ্য দিয়ে। তবু বলব সুভাষ জানত আর মর্মে মর্মে বুঝত কম্যুনিস্ট শৃংখলার গৌরবকে। ফরাসী দার্শনিক Merleau Ponty পার্টি ত্যাগ করার প্রসঙ্গে বলেছিলেন কম্যুনিজ্‌মে "বিশ্বাস বস্তুটি দাবি করে অসম্ভব নিষ্ঠা"—বলতে হয় একটি হাঁ ("U a un Oui trop massif et charnel") যা হল মাত্রাতিরিক্ত বিপুল আর মর্মভেদী"। কথাটির মধ্যেই যেন স্বীকৃতি যে বিশ্বের সামূহিক পরিবর্তনের প্রযত্ন এই রকমই প্রায় 'অসম্ভব' দাবি করতেই পারে এবং এটাই এর এক গৌরব (সুভাষেরা বিপথে গেছে ভেবে যারা বসে থাকি তাদের বলি যে সুভাষ বা নৃপেনবাবু কিন্তু কখনও হাল ছেড়ে দেন নি, সত্তাকে অস্বীকার করতে পারে নি, "The God that Failed" ঘোষণা করে স্বাভাবিক সংসারী জীবনে ফেরেনি।) পার্টি তাদের অস্বীকার করলেও তারা কম্যুনিস্ট। মার্কস্‌-এর ভাষায় 'The Party in the Grand historical sense of the term"—সেখানে সুভাষের স্থান অটুট; অকাট্য। সুভাষ নেই, তবু জানাই তাকে শ্রদ্ধা ভালোবাসা কৃতজ্ঞতা।

নিজের মতো করে দেখি

রাম বসু

সুভাষদা চলে গেলেন।

সব মৃত্যুই বিষাদের। কিন্তু কবির মৃত্যু আমাদের চেতনার ওপর বজ্রাঘাত। আর সেই মৃত্যু নিয়ে যখন ক্ষমতার কাঙালদের নোংরা কামড়াকামড়ি হয়, তখন নির্বাক অনুশোচনা মর্মমূল বিদ্ধ করেই। তখন মনে না এসে পারে না—কী গভীর পাপের পাঁকে আমরা যে যার গোষ্ঠীর মধ্যে অমায়িক কেষ্টবিষ্টু দিব্যি হয়ে আছি।

ভেবেছিলাম এত বড় পতন নিপাট আত্মপক্ষ সমর্থনে নয়, আত্মবিশ্লেষণে টেনে নিয়ে যাবে আমাদের। অচলায়তন-পাপটা একটু নড়ে চড়ে বসবে।

না, তা হয়নি। হবেও না।

হয়েছিল কি সোভিয়েট ইউনিয়নে—যাকে আমরা, দেশবাসীর উপেক্ষার মুখে তুড়ি মেরে বলতাম, আওয়ার সোভিয়েট ফাদারল্যান্ড! কেমন ভাবে যেতে হয়েছিল ব্লক-কে? মায়াকোভস্কির মৃত্যু শুধুমাত্র ছিল না প্রেমের দুর্ঘটনা। কর্তাদের কাছে কানমলা খেতে হয়েছিল স্বয়ং গোর্কিকেও।

তাই কবি হওয়া মানে দুই হাতে নীল বিষের অঞ্জলি জিভ দিয়ে চাটা। কবি হওয়া মানে—নীলকণ্ঠ হওয়া।

কবি অনন্তকালের অশান্ত নিশি পাওয়া।

আবার, কবি হওয়া মানে, নিজেকে নিজের হাতে ছুরি মারা। কবি হওয়া মানে কারও-না-কারও বশংবদ হওয়া। বশংবদ হতে হত সেকালে রাজা বাদশার। আর আজকে, ডটকম ই-মেলের কালে—বেনিয়া প্রতিষ্ঠান, মিডিয়া কিংবা মোহন্তর। দুনিয়া কাঁপানো 'আগাজে' বিদ্রোহের মূলে ঘাপটি মেরে থাকে ওরাই।

একই ক্লান্ত ইতিহাস; অন্তর্গত সত্তাটা একই, কেবল ভোলটা আলাদা।

এমনকি অতি-খ্যাত লিটিল ম্যাগাজিন, সে-ও কি বিশ-হাজারি বা ষাট-হাজারি মুনসেফদারের জায়গির নয়? নান্দনিক ভূমিকায় বিপণনে সিদ্ধহস্ত প্রাতিষ্ঠানিক পত্রিকার সঙ্গে তার প্রভেদ নেহাত-ই পরিমাণগত। টিকে থাকতে হলে কবিকে কারও-না-কারও ছাতার তলায় আসতেই হবে। প্রকৃত কবি তাই বৈশাখের মরুভূমিতে নিঃসঙ্গতায় নিবেদিত উট। প্রকৃত কবি তাই কখনও চলন্ত বিদ্যুৎ, কখনও নিঃশব্দ আর্তনাদ।

সুভাষদা বুঝতে পারেননি। অথবা বুঝতে চাইলেও, বোঝেননি এই সহজ সত্যটা। শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতায় মুগ্ধ সুভাষদা নবযুগ আনতে বেরিয়ে পড়লেন। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে প্রকৃত সত্যটা বুঝতে পেরেছিলেন? বোধহয় পারেননি। ট্রাকটরের পাশে এক ছিলিম তামাক টানার নেশা তাকে কখনও ছাড়েনি। সুরু থেকেই সুভাষদা নিপুণ ও

প্রকরণসিদ্ধ। মফঃস্বল থেকে এলেও কলকাতার ইয়োরোপীয় ও শান্তিনিকেতনী কেতাদুরস্ত নতুন জাতের বুদ্ধিজীবীদের ড্রয়িংরুম থেকে চারমিনার সহযোগে ভাঁড়ের চায়ের দোকানের ঠেক্-এ জায়গা করে নিয়েছিলেন অনায়াসে। ফলে ফ্যাসিস্ট বিরোধী নতুন কালচার, যা আলোড়িত করেছিল ইয়োরোপের নতুন বুদ্ধিজীবীদের এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর আমাদের কালচারের গতিপ্রকৃতি ও উত্তরাধিকারের জেরে, এই নতুন ঢেউ আমাদেরও মাতিয়ে দিল অতি সহজে। আমরা কডওয়েল র‍্যালফ ফক্স্ হতে না পারলেও নতুন তরঙ্গে নিজেকে চিনতে চেয়েছিলাম। ৪৬নং ধর্মতলা আর অধুনালুপ্ত কমলালয়-এর চা ও বই-এর দোকান ধরে রেখেছিল জীবনের নতুন অর্থ সন্ধানের নেশায় মাতোয়ারা কিছু যুবক-যুবতীকে। সন্ধান তার নতুন মানবিকতার।

এই আর্ত ভালোবাসার টানে সুভাষদা অসুস্থ সুকান্তকে নিয়ে এলেন তখনকার দিনের জঙ্গলের মধ্যে চেরাগের বাতির মতো জ্বলছিল যে যক্ষ্মা হাসপাতাল, সেখানে। যাদবপুরে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তখন অসুস্থ। থাকতেন তাঁর নতুন বাড়ি বরানগরে। সুভাষদার সঙ্গে আমিও ছিলাম। বাড়িটার কথা মনে পড়ছে। তখনও সিমেন্টের প্ল্যাসটার পড়েনি। বেআব্রু ইঁটগুলো বড় বেয়াদপ। বাড়ির সামনে তখনও খালি জায়গা ছিল। গোটা তিনেক সিঁড়ির ধাপ। তার ধারে মানকচুর গাছ। বারান্দা। তখনও খোয়ার। কিছু ডাকাডাকির পর দরজা খুলে গেল। মানিকবাবু তখনও অসুস্থ। কিন্তু তিনি হাসপাতালে যাবেন না। ব্যর্থ হয়ে ফিরলেন সুভাষদা। বড় ম্লান। পরাজিত। "জানো রাম", তারপর প্রায় আধ মিনিট কি এক মিনিট নীরবতা। কোনো গভীর আবেগময় কথা বলতে হলে তিনি আত্মগত হয়ে যেতেন। কথাগুলো যেন স্বগতোক্তি। "বুঝলে রাম, বড় লেখকদের মনের ধারাই আলাদা। বড্ড বেহিসেবী।"

আজ মনে হচ্ছে, কথাটা সুভাষদার ক্ষেত্রে খুব খাটে। লেখা, বিশেষ করে কবিতা লিখে সংসার চালানো কম কথা নয়। কলকাতার দলমত নির্বিশেষে নামজাদা সব মানুষ স্নেহ ভালোবাসায় ডুবিয়ে দিলেও, সংসার চালানোর হিংস্র বাস্তবতা থেকেই যায়। নীহাররঞ্জন স্নেহ করে তাঁর ইতিহাস কিশোরদের উপযোগী করার বরাত দিলেও, সংসারের খিদে মেটে না। অথবা বন্ধু সন্তোষ ঘোষের আগ্রহে আনন্দবাজারে ফিচার খিদের জবাব নয়। তখন বোধহয় গীতাদির স্কুলও হয়নি। যাইহোক, বড় কবি, সুভাষদাও, বেহিসেবী। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারটা পাবার পরই তিনি গাড়ি কিনে বসলেন। এই রকম বেপরোয়া হওয়া সুভাষদাকেই মানায়।

এই বেপরোয়া ভাবটা তাঁর কবি স্বভাবের দান। সত্য তাঁর কাছে আবেগ—যদিও কবিতায় তিনি আবেগ থেকে দূরে থাকতে চান। গ্রহণ তাঁর শর্তহীন। একবার মেনে নিলে আর ফিরে দেখা নয়।

এ রকম স্বভাবের সঙ্গে সংগঠনের বজ্র আঁটুনি সহজেই ফস্কা গেরো হয়ে যায়। বিরোধ একটা থেকেই যায়। শুধু আমাদের নয়, পৃথিবীর সব জায়গায় বোধহয় বিরোধটা থেকেই যায়। বদ্ধ আমি যে মুহূর্তে মুক্ত আমি হতে চাই তখনই শোনা যায় গেল গেল রব।

আর, মানুষের জন্যে ক্ষমতার নামাবলী গায়ে দেওয়া নায়কদের কাছে তখন ক্ষমতার

জন্য হয় মানুষ যদিও মুখে ধরতাই বুলি থেকেই যায়—মানুষের জন্যেই ক্ষমতা।

মানুষ ব্যবহৃত। সে মুক্তি পায়নি। মুক্তি পায়নি শিল্প। ব্যবহৃত হওয়া শিল্পের ভাগ্য। শিল্পীর ভাগ্য। সামন্ততন্ত্র থেকে যে পাপ এসেছে জানি না তার প্রায়শ্চিত্ত হবে কোন তন্ত্রে।

শিল্পের স্বাধীনতা বা শিল্পীর স্বাধীনতা, তা কি কোনো দিন ছিল? কখনও কি থাকতে পারে? এই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল সুভাষদাকেও, যিনি ৪৬ নম্বরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা।

জীবন আমাদের কাছে অনেক অপ্রিয় বা অস্তিত্বের পক্ষে সংকটজনক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়। সেই প্রশ্ন তুলে নিয়ে নিজের মতো উত্তর খোঁজার সাহস সকলের থাকে না।

গর্ব করে বলতে হয় সে সাহস সুভাষদার কিছুটা ছিল। আর ছিল বলেই মানিয়ে চলতে পারেন নি।

মানিয়ে চলতে না পারার একটা কারণ বোধহয়—তাঁর গ্রহণ ছিল একরৈখিক। শর্তহীন। প্রশ্নাতীত। গ্রহণ তাই তাঁর কাছে ছিল সার্বিক সত্তা। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংশয়, প্রশ্ন—এইসবই আধুনিক মননের বিশেষত্ব। কিন্তু সুভাষদার কাছে তা আদৌ বিচার্য বিষয় নয়। কারণ তাঁর "নীড", তাঁর অন্তর্গত তাগিদ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। তাই যে মানুষটা লাহিড়ীর পাশে বসে রাত জেগে স্বাধীনতার কপি লেখে, জেলে যায়, অনশন করে, গুলির মুখে দাঁড়ায়, তামাম বাংলা চষে বেড়ায়, বা বজবজের পাটকলে পাটের ফেঁসো চেনে, সেই মানুষটাই আবার তার নিজের গড়া সংগঠনের বিরুদ্ধে চলে যায়। দার্শনিক অবস্থানের চেয়েও তাৎক্ষণিক ভালো লাগা মন্দ লাগা, ব্যক্তিগত সম্পর্ক ও আবেগই বড়। তাই মনে হয় আধুনিক মননের তত্ত্বগত দিক তাঁকে প্রভাবিত না করলেও, প্রয়োগগত ক্ষেত্রে তিনি এই সমস্যাকে চিনেছেন একান্তভাবে তাঁর নিজের মতো করে। নিজের চোখের আলোয় দেখেছিলেন চোখের বাইরে।

চোখের বাইরে চলে গেলেও তাঁর চোখের আলোয় আমি আপ্লুত। নিজের মতো করেই তাঁকে দেখি, ভালোবাসি। আর ভাবি প্রচলিত অর্থে রাজনীতি, সংগঠন নয়, আবেগের ফেনশীর্ষ ঢেউ টেনেছে জীবনের প্রেমে অন্ধ ঈগলকে।

সুভাষদা মানে চলা...

কার্তিক লাহিড়ী

মনে হয় সেদিনের কথা। অথচ মেঘে মেঘে বেলা হয়, টেরও পাই না এর মধ্যে কেটে গেছে প্রায় পঞ্চাশটি বছর। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, যা ছাপা হয় 'চতুষ্কোণ' পত্রিকার সমাবর্তন সংখ্যায় অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৩৬১ সালে। প্রবন্ধটি অবশ্য তারও বেশ কিছু আগে লেখা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তখনও আমার চাক্ষুষ পরিচয় হয়নি। কিন্তু ওই প্রবন্ধের সূত্র ধরে তাঁকে চিঠি লিখি। সেই চিঠিতে জীবনানন্দ সম্পর্কে তাঁর মতামত নিয়ে কিছু প্রশ্ন রাখি। কী প্রশ্ন করেছিলাম তা আর মনে নেই আজ, তবে চিঠির জবাব পেয়েছিলাম। তিনি লেখেন :

"আপনার চিঠির জবাব দিতে হলে একটু প'ড়ে শুনে নিয়ে লেখা দরকার। যে প্রশ্ন আপনি তুলেছেন, সত্যিই জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে তার পরখ করা দরকার। কিন্তু আমি যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম তা শুধুমাত্র 'বনলতা সেন' প্রসঙ্গে। জীবনানন্দের সামগ্রিক বিচার তাতে নেই।

"দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়িষ্ণুতায় যে দিকটা জীবনানন্দের কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে—সে সম্বন্ধে খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ দরকার। কোন্ পথে তা পাঠককে চালিত করে? মোহভঙ্গের দিকে, না আশাভঙ্গের দিকে? আমি নিজে সত্যিই তাঁর এ যুগের লেখা খুব খুঁটিয়ে পড়িনি। আপনি এ বিষয়ে খেটেখুটে একটা প্রবন্ধ লিখুন না। হয়ত জীবনানন্দের কাব্য বিচারের একটা নতুন দিক তাতে খুলে যাবে।..." (১৪.১.৫৫ তারিখে লেখা চিঠির অংশ)

জীবনানন্দের গল্প, উপন্যাস ও 'কবিতার কথা' নিয়ে পরবর্তী সময়ে প্রবন্ধ লিখেছি বটে, কিন্তু তাঁর কবিতা নিয়ে আজও লিখতে পারিনি কিছুই। কাব্যবিচারের নতুন দিক খুলতে গেলে নতুন কথা বলা চাই, জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে তেমন কথা বলা বেশ কঠিন, কারণ তাঁর কবিতা নিয়ে অজস্র প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। এদিক ওদিক সেদিক কোনো দিকই প্রায় বাদ নেই, তাই সুভাষদার ইচ্ছা বা আদেশ, যাই বলা যাক, পূরণ করা সম্ভব হয়নি, আমার পক্ষে লেখা সম্ভব হবে কিনা তেমন প্রবন্ধ বলা মুশকিল হচ্ছে।

কিন্তু এরপর পেয়ে যাচ্ছি আরেকটি চিঠি আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে :

"আপনার লেখা প্রবন্ধটি পড়েছি। বলা বাহুল্য, ভালো লেগেছে। সঙ্কোচ না রেখেই আমার মতামত জানাচ্ছি। আপনার লেখায় আমার একাধিক অভিপ্রায় ঠিকমত ধরা পড়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার অপূর্ণতাগুলো আলোচনার মধ্যে ভালোভাবে আসেনি।

যেমন : সহজ করে বলার ব্যাপারে।

সোজা সোজা শব্দ আছে ঠিকই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সোজাসুজি বলা হয়নি। তার মানে এ নয় যে, সব সময় চ্যাটাং চ্যাটাং করে বলতে হবে। অনেক সময় বেঁকিয়ে বললে অনেক বেশি বেঁধে। 'পদাতিকে' এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যেতে পারে, যেখানে ব্যঞ্জনা দিতে

গিয়ে সমসাময়িক এমন বহু ঘটনা টানতে হয়েছে—যার তাৎপর্য আজকের দিনে খুব স্পষ্ট নয়।

"এ সত্ত্বেও আপনার সহৃদয় বিশ্লেষণ আমার ভালো লেগেছে। লেখায় প্রশংসা আছে, শুধু এজন্য নয়—আমরা যে মনোভাব নিয়ে লিখেছি, সেই মনোভাবটা আন্দাজ করতে পেরেছেন বলে। ** সত্যিই একটা সময়কে আমরা কবিতায় ধরতে চেষ্টা করেছিলাম।..." (তারিখ নেই চিঠিতে)

বলতে দ্বিধা নেই এখন প্রবন্ধটা পড়তে বেশ সংকোচ লাগে। লেখার ভাষা দুর্বল তো বটেই, উপরন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মর্মে প্রবেশ করা, তার তির্যক ব্যঞ্জনা ও অভিব্যক্তি ধরা সম্ভব হয়নি বুদ্ধি ও বোধের অপরিপক্কতার ফলে। লেখাটার একটা শুধু প্লাস পয়েন্ট যে সাহস করে লিখেছিলাম—এইমাত্র।

তখন জলপাইগুড়ি ফার্মেসি ট্রেনিং সেন্টারে (পূর্বতন জ্যাকসন মেডিক্যেল স্কুল) পড়াই, আর বাংলায় এম. এ. দেবার জন্য তৈরি হচ্ছি। একদিকে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ছাত্রদের বোঝানো সাহায্য করা, অন্যদিকে পরীক্ষার প্রস্তুতি ও গল্প-উপন্যাস লেখা আর জোর আড্ডা। তবে ফার্মেসি সেন্টারে কাজ করার এক মস্ত সুবিধে ছিল—তিন তিনটে বড় ছুটি—গরম পুজো ও বড়দিনের। ছুটি হলেই কথা নেই, দে ছুট কলকাতায় মণিহারী সকরিগলি পেরিয়ে।

তো সেই বছরেই (১৯৫৫) গরমের ছুটিতে একদিন হাজির হই ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোডে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। মনেই হল না এ বাড়িতে প্রথম ঢুকছি, যেন কত চেনা, যেন আমি এ বাড়িরই এক আপনজন। মুহূর্তে সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ে গেলেন সুভাষদা, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় গীতাদি। কোনো ভূমিকা না করেই আপনি নেমে এল তুমি-তে।

সুভাষদা যে অনেক কথা বললেন এমন নয়। প্রচুর কথা বলার লোক ছিলেন না তিনি। তাঁর থেমে থেমে কথা বলা, দৃষ্টি কোথাও দূরে পাঠিয়ে দেওয়া, বসার শিথিল ভঙ্গি—এসব অনেক কথা বলে বোঝার অনুভবের। খানিকটা বুঝি, অনেকখানি বুঝি না, কিন্তু সেটা-ই আকর্ষণের বিন্দু হয়ে ওঠে। এরপর ফিরে তাকাতে হয় না আর, কারণ

সুভাষদা মানে চলা, থামা নয়
চওড়া রাজপথে শুধু নয়, অলিগলি বেয়ে বেয়ে নতুন
নতুন পাড়া মাঠ দেখতে দেখতে চলা চোখ খোলা
রেখে তবু

৫বি-তে গিয়ে দাঁড়ালেই কয়েক মুহূর্ত পরে উঠে আসে বাজারের থলে সুভাষদার হাতে, গীতাদি কী বললেন সুভাষদা কী শুনলেন, বেরিয়ে পড়লাম, বাজারে যাওয়া তো একটা ছুতো বেরিয়ে পড়া রাস্তার

চলো চলো, কখনও সখনও রাস্তার ঠেকে চা খাওয়া, দেখা যত কথা নেই তত, সেই নিশ্চুপতা শেখায়

চললেই চিন্তাভাবনা চলতে থাকে, থামলে...

ট্রামরাস্তা ছেড়ে অলিগলি পেরিয়ে কখনও পৌঁছে যাওয়া আলিপুর কোর্টের গঞ্জামে, চিড়িয়াখানার জিরাফ কিংবা বাঘের খাঁচার সামনে কিংবা নিরালা এক কোণ বেছে নিয়ে ঘাসের উপর বসে চিনেবাদাম চিবনো

কিংবা গড়িয়াহাট বা লেক মার্কেটে পাক দেওয়া কিংবা ঘুরেটুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরির কোনো গাছের তলায় এসে বসা

চলতে চলতে এসে পড়ি লেক টেম্পল রোডে সত্যজিৎ রায়ের বাড়ি, অন্য একদিন হঠাৎই ভবানীপুরে ঋত্বিক ঘটকের কাছে, তখন তাঁর ঠিকানা বোধহয় গঙ্গাপ্রসাদ মুখার্জি রোডে, কিংবা

সুভাষদার সঙ্গে কখনও এসে পৌঁছে যাই কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের ডেরায় বা ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে, একদিন এসে পড়ি ঔপন্যাসিক অমরেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের আবাসে, এবং আরও কত কত জায়গায়

ট্যাং ট্যাং করে তাঁর সঙ্গী হই। আর চলতে চলতে বুঝতে পারি, কেন এই লোকটিকে সকলে ভালোবাসে। তিনি কখনোই অন্যের চেয়ে নিজেকে বড় ভাবেন না, আমিত্ব-ও ফলান না, ওই মাপের কবি লো-প্রোফাইলে থাকতে পছন্দ করেন—সকলের মতো সাধারণ হয়ে

কত কত জায়গায় গেছি—তার ঠিক ঠিকানা নেই, বিস্মৃতির অতলে লীন হয়ে গেছে, একদিন উঠে আসবে হয়তো অভিজ্ঞতার গাঢ় নীলিমায় নির্মেঘ পটে

কলকাতায় এলে সময় হাতে পেলে সুভাষদার কাছে যাওয়া, এবং তারপর বেরিয়ে পড়া—রুটিন প্রায় এরকমই ছিল, তবে মধ্যে মধ্যে কেউ এসে পড়লে ঘরেই আড্ডা জমে যেত। কিন্তু যখন থাকতাম জলপাইগুড়ি কিংবা আগরতলা, তখন চিঠিই হত সম্বল খবরাখবরের, তাঁকে জানার, কত কী ভাবার

তিনি লিখছেন :

"যারা সঙ্গে সঙ্গে চিঠির উত্তর দেয় তাদের সঙ্গে আমার তফাৎটা হল এই যে, চিঠি দিয়েই তারা লোককে দিব্যি ভুলে যেতে পারে কিম্বা তারা শুধু একবারই চিঠি লেখার কাজটা করে। কিন্তু চিঠির উত্তর না দিলে মনের মধ্যে সব সময় যে দংশন অনুভব করা যায় তাতে মানুষকে কিছুতেই ভুলে থাকা যায় না। তাছাড়া যে চিঠিটা লেখা হল না, মনের মধ্যে তা যে কতবার লেখা আর মোছা হল সে খবরটা কেউ পায় না।...

"...খুব লিখতে ইচ্ছে করছে। কী লিখব তা জানি না। যদি লেখা নাও হয়, ইচ্ছেটা আমার সঙ্গে কবর অবধি যাবে। তারপর হয়ত হেঁট হয়ে বলবে, 'মশাই পায়ের ধুলো দিন।'..." (১৩.৩.৫৬)

লেখার ইচ্ছে খুব, অথচ লিখতে পারছেন না—এ কথা জানাচ্ছেন প্রায় চিঠিতে। লিখতে না পারার যন্ত্রণা ও কষ্ট, তবু কষ্টের মধ্যে জানাতে ভোলেন না :

"'পরিচয়ে' তোমার গল্পটা পড়লাম। আরম্ভটা দারুণ হয়েছিল, কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। মনে হচ্ছে গল্পে তোমার রীতি-মত হাত আছে।..." (১.৪.৫৯)

ওই একই চিঠিতে লেখেন, "আমি জানি, আমার অনেক লেখা উচিত। কিন্তু ঠিক এখনও

নিজেকে গোছাতে পারছি না। তবে হাল ছাড়িনি। হাল ছাড়বও না। আমার পক্ষে বেশী লেখা সম্ভব হবে না। তবে কিছু লিখব। লিখব বলেই আপাতত কষ্ট করতে হচ্ছে। প্রীতি জেনো।..."

এরপর একটা দারুণ চিঠির কথা না বললেই নয়। সুভাষদা সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পাচ্ছেন, ব্যাস্...পুরো চিঠিটা তুলে দিচ্ছি, চিঠির তারিখ ৩০/১, সালের উল্লেখ নেই, পোস্টাফিসের ছাপ থেকে আন্দাজ করছি ১৯৬৫। চিঠিটা এই :

"কার্তিক ৩০/১

সুরজিৎ (বাচ্চু) এসেছিল ফিল্ম দেখতে। এ সময়ে তোমার অভাব আমরা প্রত্যেকে খুব অনুভব করছি। তাছাড়া পুরস্কার! নানা রকম জল্পনা কল্পনায় বাজার গরম।

আমার খুব মজা লাগছে। বিস্তর লোককে অবাক, হতভম্ব এবং খুশী করতে পেরে। সেই সঙ্গে দুঃখ হচ্ছে এই ভেবে যে, আমার যেসব বন্ধুরা আমার কী দুঃখ ভেবে বেজায় দুঃখ পেত—হায়, তারা আর দুঃখের কারণ খুঁজে পাবে না।

১৭ই তারিখে ফিল্ম সোসাইটির একটা মিটিং শুনে রাত্তিরে সাড়ে ৯টা নাগাদ বাড়ি ফেরবার সময় গলির মধ্যে 'বসুমতী' লেখা সাইকেল দেখে ভাবলাম এতদিনে বোধহয় গীতার 'বসুমতী' কাগজ আসতে আরম্ভ করল। দরজা ঠেলে ঘরে পা দিতেই গীতা, পুপে, যমুনা একসঙ্গে হৈহৈ করে উঠল। আমার এক বন্ধুর দিদি রেডিওতে খবর শুনে আমাকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। তাঁর কাছ থেকেই গীতারা খবরটা পায়। আর ঠিক তখনই 'বসুমতী' থেকে লোক আসে ফটো নিতে। প্রথমে খুবই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। যদিও মাস কয়েক আগে এক কপি 'যত দূরেই যাই' সংগ্রহ করতে এসে এক বন্ধু খুব উত্তেজিত হয়ে খবর দিয়েছিল লিস্টে নাকি আমার নাম গেছে। আমি বলেছিলাম, 'কেউ যদি না পাবার হয়, তাহলে আমি পাব।' বলেছিলাম ঠাট্টা করে। লিস্টে প্রতি বছরই গুচ্ছের নাম ওঠে। এ ক'মাস ও নিয়ে ভেবেছি বলে মনে পড়ে না। কাজেই খবরটা আমার কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। পরদিন কাগজে না দেখা পর্যন্ত পুরোপুরি বিশ্বাস হয়নি।

কিন্তু নিঃসংশয় হবার পরই চৈতন্যোদয় হল। বেজায় লজ্জা করতে লাগল। তারপরই মনে হতে লাগল আমাকে ডোবাবার ব্যবস্থা হয়েছে। একটা কোনো ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়ে গিয়েছি। আমি যেন victim। যাঁরা আমার অগ্রজ এবং সহস্রগুণে বড় হয়েও পুরস্কৃত হননি, তাঁদের সামনে মুখ দেখাব কী করে?

যাইহোক, দিন তিনেক আমাকে নিয়ে হৈচৈ হওয়ার পর আমি বুঝতে পারলাম—আমি যা ভাবছি, তা নয়। লোকে অত সাহিত্য কাব্য দান অবদান নিয়ে ভাবছে না—তারা বেজায় খুশী হয়েছে একজন চেনা, কাছের লোক এবং কমিউনিস্ট পুরস্কার পাওয়ায়। পুরস্কারের বাঁধা খাতে একটা বৈচিত্র্য এসেছে। একটা বেহিসেবী ব্যাপার ঘটে গেছে। কমিউনিস্টরা যেহেতু সরকারী বিষনজরে, সেইজন্যে কমিউনিস্টের পুরস্কার পাওয়াটাকে নিজেদেরই একটা জিৎ বলে লোকে মনে করছে। তবে আমার রিপোর্টিংটা হয়ত কিছুটা আত্মগত। বাচ্চু আর গীতার কাছ থেকে আরও বাস্তব চেহারা পাবে।

১২ই দিল্লী যাচ্ছি। সেখান থেকে বোম্বাই। গীতা আর পুপেও যাচ্ছে। মার্চের মাঝামাঝি ফিরব। পাঁচ হাজার ফুরোবার আগেই একবার এসো। দুজনে ভালবাসা জেনো। তৃতীয় জন কতদূরে? গীতার চা করতে করতে হাতে কড়া পড়ে গেছে। পরে লিখবে।

সুভাষদা " (নিম্নরেখ পত্রলেখকের)

চিঠিটা পড়তে পড়তে অভিভূত হই। খুব কাছের মানুষ না ভাবলে কি সুভাষদা এমন চিঠি লিখতে পারতেন আমাকে?

ফকিরের আলখাল্লা পরলে কী হবে, সুভাষদা বিবাগী ছিলেন না মোটে, ছিলেন কাজ পাগল। কোনো কাজ হাতে নিলে পুরো ঝাঁপিয়ে পড়তেন সঙ্গে সঙ্গে, যেন কাজটা না সারলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। কাজের শুরুতে যত উৎসাহ, কাজ এগোতে থাকলে তত পালাই পালাই ভাব। কিন্তু পালানো কি এতই সহজ? একের পর এক কাজ ঘাড়ে চেপে বসে। 'পরিচয়', 'সন্দেশের' সম্পাদনার কাজেও তেমন উৎসাহ ছিল, নতুন কিছু করার আবেগে টগবগ করছেন সর্বদা।

"পরিচয় দেখেছ কি? তোমার এবং অন্যান্যদের মতামত জানিও। আমি যে কি রকম বিব্রত হয়ে আছি ধারণা করতে পারবে না। একে মা রাঁধে না—তার উপর দুটো সংসার। যে ভয় করছিলাম তাই। এখন অফিস পাহারা, টাকা জোগাড় এই করতেই দিন রাত কাবার হচ্ছে।..." (৪.৯.৬৭)

এর মধ্যে অবশ্য লিখেও চলেছেন। সুভাষদা তাঁর কয়েকটা বই আমাকে উপহার দেন, তার প্রথমটিতে শুধু লেখেন—কার্তিক-কে সস্নেহে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২৭/৬/৬২, কিন্তু অন্যগুলি সচিত্র। পকেট থেকে স্কেচ্ পেন বের করে ছবি এঁকে দিতেন। কিন্তু আমি সবচেয়ে উত্তেজিত উল্লসিত হই যখন 'ক্ষমা নেই'—এর পুস্তানিতে ছবি এঁকে লেখেন—কার্তিক আরতি ফুলকি-কে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৬/৬/৭২. তখন আমার মেয়ের বয়স মাত্র সাত। কী অভাবনীয় উপহার পাচ্ছে ফুলকি ওই বয়সে!

এখন কনিষ্ঠ কাউকে বই উপহার দিলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তার নামের পাশে সস্নেহে কথাটি লিখি, তখন সুভাষদার কথা বেশ মনে পড়ে।

আরেকটা বিষয়ে সুভাষদা আমাকে যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেন। তখন তিনি 'পরিচয়'-এর সম্পাদক। 'পরিচয়'-কে অন্যান্য পত্রিকা থেকে বিশিষ্ট করতে হবে, এমনকি এতদিন অব্দি 'পরিচয়' যেভাবে চলে এসেছে লেখায় এবং অন্যান্য বিভাগে—তা থেকে আলাদা চেহারা দিতে ভাবছিলেন খুব। নতুন জিনিস উপস্থাপনার আবেগে ফুটছিলেন তিনি, এমন একসময় আমাকে বললেন, সাক্ষাৎকার ছাপলে কেমন হয়? আমিও নেচে উঠলাম যেন, 'পরিচয়ে' সাক্ষাৎকার আগে ছাপা হয়েছে কিনা বলতে পারি না, কিন্তু সেই ভারটি দিলেন আমার উপর। নানা বিশিষ্ট ব্যক্তির সাক্ষাৎকার ছাপা হবে ঠিক হয়, তার প্রথমটা কার সাক্ষাৎকার প্রকাশ করা হবে, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলে। শেষে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, ডক্টর সুকুমার সেনের নাম। সঙ্গে সঙ্গে সুভাষদা অনুমোদন করলেন তা।

তখন টেপ-রেকর্ডার ইত্যাদির তেমন ব্যাপক চল হয়নি, তাই আমাকে খাটতে হল বেশ।

প্রথমে মাস্টারমশাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ করে দিন স্থির করা, তারপর গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা ও তার উত্তর লেখা। সেই খসড়া থেকে পুরো সাক্ষাৎকার লিখে ফেলা, ফের আচার্য সেনের কাছে যাওয়া অনুমোদনের জন্য। তিনি পুরোটা পড়লেন, জায়গায় জায়গায় সংশোধন করে ফেরত পাঠালেন। আবার সেটা লেখা হল এবং তারপর ছাপা। এর প্রতিটি ধাপে সুভাষদার সজাগ দৃষ্টি ছিল।

পরে আরও কয়েকটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি, তার একটি যতদূর মনে হয় দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনাকালে 'পরিচয়ে' বের হয়। এখন সব সাক্ষাৎকার দৃশ্য ও শ্রাব্য দুই মাধ্যমের যন্ত্রের সাহায্যে নেওয়া হয়, ফলে তখনকার অসুবিধার কথা আজকের সাক্ষাৎ গ্রহণকারীরা বুঝতে পারবেন না। সে যাইহোক, একটা নতুন কপাট খুলে যায় আমার, সুভাষদা তার উন্মোচক ছিলেন বলতে দ্বিধা নেই।

জলপাইগুড়ি থেকে আগরতলা যাওয়ার পরও সুভাষদার সঙ্গে যোগাযোগ অটুট ছিল। সুভাষদা কয়েকবার আগরতলা গেছেন, কিন্তু আমার কলকাতা আসার সংখ্যা কমে যেতে থাকে, ফলে আগের মতো ঘন ঘন সাক্ষাৎ হত না আর। শেষের দিকে কলকাতায় এসেও ৫বি-তে যেতাম না তাঁর কাছে। এর পিছনে আমার মনে কোথাও কি সংকোচ জাগার একটা ভূমিকা ছিল? সংকোচ, কারণ সুভাষদা একটু দূরে সরে যাচ্ছিলেন মনে হচ্ছিল আমার। মানবিক কোনো কিছু আমার অনাত্মীয় নয়—কথাটি ভুলে কেবলই সংকীর্ণতার পাকে পাকে জড়িয়ে ফেলি নিজেদের। কোথায় মুক্তমতি হওয়ার দরকার ছিল আমাদের, তা নয় গণ্ডিবদ্ধ রাজনীতি এনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক সব নষ্ট করতে থাকি। নাকি আমাদের রাজনীতির মধ্যে বরাবরই সংকীর্ণতার একটা চোরা স্রোত লুকিয়ে ছিল, যাতে মানুষের চেয়ে দল, দলের চেয়ে উপদল এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের ছদ্মবেশে একজনের কর্তৃত্ব-ই সর্বৈব হয়ে পড়ে?

সুভাষদা কিন্তু নিজের মত প্রকাশে কোনো লুকোছাপা করেননি কখনও। কমিউনিস্ট পার্টি ভাগের সময় তাঁকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়নি, মুখ বুজে সহ্য করে গেছেন, গীতাদির মুখে মধ্যে মধ্যে শুনেছি তা। আসলে মুখে এক কাজে আর এক—এমন মানুষ ছিলেন না তিনি। মনের কথা খুলে বলার পক্ষপাতী ছিলেন। মানুষের উপর বিশ্বাস ছিল, তাই তিনি জানতেন—ভুল করলে মানুষই ধরিয়ে দেবে সেই ভুল।

আস্তে আস্তে এসব কথা মনে পড়তে থাকে, এবং নিজের সঙ্গে যুঝতে থাকি। তারই ফলে দ্বিধা সংকোচ কাটতে থাকে। যাঁর কাছে এত স্নেহ, ভালোবাসা পেয়েছি একদিন, তাঁর কাছ থেকে কেন দূরে সরে থাকব? তাঁর কবিতা, গদ্য এখনও চমকে দেয়, মনের রসদ জোগায়। কিন্তু তাঁকে কী দিয়েছি? এতদিন লিখছি, বই-ও বেরিয়েছে অনেকগুলো, অথচ একটি বই-ও তাঁর নামে উৎসর্গ করিনি। গ্লানিতে মন ভরে ওঠে। সেই গ্লানি মোচন করতে সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে গীতাদি ও সুভাষদার নামে উৎসর্গ করি 'আজ রবিবার' উপন্যাসটি।

অনেকদিন পর ৫বি-এ যাই, বাইরের ঘরে নয়, ভিতরের বারান্দা দিয়ে ঘর পেরিয়ে আরেক বারান্দায়। সুভাষদা একটা উঁচু পিঠের চেয়ারে বসেছিলেন। টেবিলে ছিল ক্লিপবোর্ডে

আঁটা কাগজ, সামনে কলম ও বিড়ির চ্যাপটা কৌটো বোধহয়।

সুভাষদা একের পর এক অনেকগুলো কবিতা পড়ে শোনালেন। দারুণ ব্যাপার! তাঁর হাব-ভাব আচার-আচরণে মনেই হল না যে আমি ঢের দিন আসিনি এখানে। মনে হচ্ছে গতকালও তো এসেছি, শুনেছি তাঁর কথা ও কবিতা। মনেই হল না তিনি ঘন ঘন অসুস্থ হয়ে পড়ছেন, চলার শক্তি তেমন নেই, কানেও শুনতে পাচ্ছেন না মোটে আজকাল, শ্লেটে লিখে জানাতে হচ্ছে।

স্নেহভাজন বন্ধু প্রণব বিশ্বাস একদিন জানায়—আমার গল্পসমগ্র আছে সুভাষদার বিছানায়, বললেন তারিয়ে তারিয়ে পড়ছেন গল্প। প্রণবের কথা শুনে মনে হল আমি আর আমিতে নেই যেন—সুভাষদা পড়ছেন আমার গল্পসমগ্র! খুশির তোড়ে হঠাৎ সংশয় জাগে, ঠিক দেখেছো তো প্রণব? আমার গল্পসমগ্র পাবেন কী করে সুভাষদা? আমি তো পৌঁছে দিইনি বইটা তাঁকে, তাহলে?

তবু ভাবতে ভালো লাগে। আর কপাল এমনই যে তার আরেকটা প্রমাণ পেয়ে যাচ্ছি অচিরেই। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ' পত্রিকায় সুভাষদার একটা ধারাবাহিক লেখা বের হচ্ছিল তখন। তারই একটি সংখ্যায় ওই লেখার সঙ্গে "এতদ্বারা জানানো যাইতেছে..." শিরোনামে তুষার প্রধান লেখেন—

"কার্তিক লাহিড়ীর সঙ্গে কতদিনের পরিচয়?

"সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখলেন, 'কার্তিক যখন জলপাইগুড়িতে থাকত, তখন থেকে চিনি। ও ছিল তখন ছাত্র। ভালো গল্প লিখত। পড়াশোনাতেও খুব ভালো ছিল। কার্তিক লাহিড়ীর গল্পসমগ্র পেয়ে খুব ভালো লাগল। অনেকদিন পর একসঙ্গে ওর এতগুলো গল্প পড়তে পাব—ভেবে খুব আনন্দ হচ্ছে।' এক ফাঁকে লিখে ফেললেন, রবীন্দ্রনাথের লেখা যখন যেটি পড়ি, সেটাই এখন সবচেয়ে ভাল লাগে।"

(উত্তরবঙ্গ সংবাদ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৩)

আমার গল্প পড়বেন ভেবে তাঁর খুব আনন্দ হচ্ছে, জানতে পেরে আমার মতো সামান্য একজন লেখকের যে কী আনন্দ হতে পারে তা বুঝতে অসুবিধে হবে না কারও। প্রণব জানায়, সুভাষদা নাকি দাগ দিয়ে পড়েছেন আমার গল্প। আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর মতামত জানার জন্য ইন্‌ল্যান্ডে একটা চিঠি লিখি। কিন্তু সে চিঠি পোস্ট করার দরকার হয়নি আর, তার আগেই সব প্রাপ্তি অপ্রাপ্তির বাইরে চলে গেছেন তিনি চিরদিনের মতো। এই খেদ আমৃত্যু বহন করে যেতে হবে আমাকে।

সুভাষদা খুব শান্ত, স্থিতধী প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তাঁকে রাগতে বিচলিত হতে বা কাউকে কটু কথা বলতে দেখেনি শোনেনি বোধহয় কেউ। অথচ তাঁকে ঘিরে কত অশান্তি হয়েছে, বিতর্কের কেন্দ্র হয়েছেন তিনি, ভুল বোঝা হয়েছে যথেষ্ট, এমনকি মৃত্যুও অস্বস্তির ঘূর্ণি তৈরি এক। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় কি এইসব চেয়েছিলেন কখনও?

কী চেয়েছেন তিনি তবে?

"আমি চাই কথাগুলোকে

পায়ের ওপর দাঁড় করাতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।..." (আমার কাজ)

খুব বড় চাওয়া নয়, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে হাঁটা। এটুকু চাওয়াও তাঁর পূরণ হল না বাস্তবে শরীরের কখনও স্বাভাবিক কখনও ব্যতিক্রমী নিয়মে। তবু যতদিন পেরেছেন চলেছেন ইতিহাসের গতির সমান তালে। মধ্যে মধ্যে একটু থমকে দাঁড়িয়েছেন বটে, তখনও ইচ্ছেগুলো চলেছে, থেমে থাকেনি। পা চলেনি তো কী হয়েছে, কলম চলেছে নয়তো মন নতুন নতুন লেখার আবেগে। চলা থামেনি তাই কখনও

সুভাষদা মানে চলা, থামা নয় মোটে...

সুভাষ ও সুকান্ত

অশোক ভট্টাচার্য

'পদাতিক'-এর কবিকে 'ছাড়পত্র'-এর কবি বরণ করেছিলেন গুরুর আসনে। আর তা করেছিলেন স্বনির্বাচনেই। কবিতার বিষয়ে গুরুর উপদেশ কান পেতে শুনেছেন সুকান্ত—কখনও মেনেছেন, কখনও তার বাইরে নিজেকে প্রসারিত করেছেন—কবিতার আবেদনে এবং পরিবেশনের স্বাতন্ত্র্যে। কিন্তু গুরু যে-পথের পথিক ছিলেন সেই পথেই হেঁটেছেন, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুকান্ত ভট্টাচার্যের পরিচয় কৈশোরেই। সুভাষ তখন আধুনিক বাংলা কবিতার জগতে সাড়া জাগানো এক নতুন ভাবনার নতুন পথযাত্রী। সুকান্ত তখন পরিবার আর বন্ধুমহলে এক বিস্ময়কর বালক কবি-প্রতিভা। দু-জনের পরিচয় কীভাবে সুভাষ তা 'সুকান্ত সমগ্র'-এর ভূমিকায় নিজেই লিখেছেন :

"সুকান্ত যখন বালক বয়স, তখন থেকেই তার কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয়।

"আমি তখন স্কটিশ চার্চ কলেজে বি. এ. পড়ছি। পদাতিক বেরিয়ে তখন পুরনো হয়ে গেছে। রাজনীতিতে আপাদমস্তক ডুবে আছি। ক্লাস পালিয়ে বিডন স্ট্রিটের চায়ের দোকানে আড্ডা। কলেজের বন্ধু মনোজ একদিন জোর করে আমার হাতে একটা কবিতার খাতা গছিয়ে দিল। পড়ে আমি বিশ্বাসই করতে পারিনি কবিতাগুলি সত্যিই তার চোদ্দ বছর বয়সের খুড়তুতো ভাইয়ের লেখা। শুধু আমি কেন, আমার অন্যান্য বন্ধুরা, এমন-কি বুদ্ধদেব বসুও সেই কবিতা পড়ে অবাক না হয়ে পারেন নি।

"আমার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্যেই বোধহয় মনোজ একদিন সুকান্তকে সেই চায়ের দোকানে এনে হাজির করেছিল। সুকান্তর চোখের দিকে তাকিয়ে তার কবিত্বশক্তি সম্বন্ধে সেদিন কেন নিঃসংশয় হয়েছিলাম, সে বিষয়ে যদি আমাকে কেউ জেরা করে আমি সদুত্তর দিতে পারবো না।"

এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছোয় বছরখানেক-বছর দেড়েক পরে, সুকান্ত যখন সুভাষেরই রাজনৈতিক মতাদর্শের কাজে জড়িয়ে পড়েছেন। বন্ধু অরুণাচল বসুকে লেখা সুকান্তের ২০শে অক্টোবর ১৯৪২-এর একটি চিঠি থেকে জানা যায় এই সময়টাকে। ২৮শে ডিসেম্বর অরুণাচলকে লেখা চিঠিতে সুকান্ত এই প্রসঙ্গে লিখছেন : "তোর চিঠিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'আলাপ করা' ব্যাপারটা নিয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছিলি, কিন্তু তার আগেই বোধহয় একদিন ইউনিভারসিটি ইন্‌স্টিটিউটে P. C. Joshi-র এক বক্তৃতা সভায় সুভাষ নিজেই আমার সঙ্গে আলাপ করেছিল এবং আমার 'কোনো বন্ধুর প্রতি' কবিতাটির প্রশংসা করে দুঃখের সঙ্গে জানায় কবিতাটি তার পকেট থেকে হারিয়ে গেছে নচেৎ ছাপা হত। তারপর অনেকদিন পরে সুভাষের কথামতো একটা সংকলন গ্রন্থের জন্য রচিত কবিতা নিয়ে কাছে হাজির হয়েছিলাম। সেদিন প্রায় দু'ঘণ্টা সেখানে থেকে সুভাষের অন্তরঙ্গ হয়েছিলাম, ...।"

(সুকান্ত-সমগ্র পত্র ৮) এই সংকলনটি "জনযুদ্ধের গান" নামে ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী প্রকাশ করেছিল। এতে সুভাষ ও সুকান্তের লেখা দুটির নামও ছিল 'জনযুদ্ধের গান'। সুকান্তর লেখাটি 'সুকান্ত সমগ্রে'র 'অপ্রচলিত রচনা' অংশে ছাপা হয়েছে। আর সুভাষের লেখা গানটি তো তখন কমিউনিস্টদের মুখে মুখে—"বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ/রুখবো দস্যু দলবো আজ,/দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ/ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।" পরে এই গানটি তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'চিরকুট'-এ স্থান পেয়েছে।

।।২।।

অনুজপ্রতিম কবি সুকান্তর সঙ্গে সুভাষের সম্পর্ক যে রাজনৈতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছিল তা পুরোনো হলেও স্মরণ করা দরকার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের আগ্রাসী জার্মানি সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করলে ভারতীয় কমিউনিস্টরা তাকে জনযুদ্ধ আখ্যা দিয়ে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া ও তার মিত্রশক্তির পক্ষে দাঁড়ায়, যে মিত্রশক্তির অন্যতম ব্রিটিশ সরকারও। তখন সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তুঙ্গে। তাই স্বাভাবিক কারণেই ভারতের জাতীয়তাবাদী দলগুলি কংগ্রেস, ফরওয়ার্ড ব্লক, সোসালিস্ট পার্টি প্রভৃতিরা কমিউনিস্টদের জাতির শত্রু ও ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল বলে চিহ্নিত করে। এই প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে সোভিয়েত রাশিয়ার স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়ার আন্দোলন ছিল খুবই দুরূহ। কাজ অনেক। অথচ তুলনায় কর্মী নগণ্য। কিন্তু সেই স্বল্পসংখ্যক কমিউনিস্ট কর্মীদের ছিল সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি অবিচল বিশ্বাস, এবং সাংগঠনিক শক্তি, যার ভিত্তি ছিল দেশের শ্রমিক ও কৃষক এবং কিছু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী।

সুভাষ ও সুকান্ত ছিলেন সেই স্বল্পসংখ্যক কমিউনিস্ট কর্মীদের মধ্যেও যাঁরা অগ্রণী, তাঁদের প্রতিনিধি। তাই কোনো বাঁধাধরা কাজ কারও ছিল না। সুভাষের মতো কবিকেও সর্বক্ষণ 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার কাজের পাশাপাশি নানা অঞ্চলে প্রচারের কাজে, সংগঠনের কাজে লিপ্ত থাকতে হত। সুকান্তকেও দেখা যায় আঞ্চলিক পার্টির কর্মী হিসাবে দিনেরাতে প্রচারের কাজে, আবার ছাত্র আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে শহরের কেন্দ্রেও এ ছাড়াও বড় ছোটো জনসভা এবং মিছিল তো ছিলই। এই দিনগুলোর সংক্ষেপিত বর্ণনা পাওয়া যায় সুভাষের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্রের সুকান্তের স্মৃতিচারণামূলক একটি ছোটো নিবন্ধে। তিনিও সুকান্তের এক বড় গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সুকান্তকে উপহার দিয়েছিলেন ফরাসি কমিউনিস্ট কবি জগৎখ্যাত আরাগঁ-র কবিতার একটি ইংরেজি ভাষান্তরিত সংকলন। একজন কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে সুকান্তর কালটি তিনি অনবদ্য ভাষায় ও সংযমে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর একটি স্মৃতিচারণমূলক [illegible] 'কিশোর বাহিনী ও সুকান্ত' নিবন্ধে (দ্র. অশোক ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'সুকান্ত প্রসঙ্গ')। রমাকৃষ্ণ [illegible]ছেন :

"বস্তুত, চল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ এই কটি বছর, ক্রমাগত এক বিভীষিকায়, এক দুঃস্বপ্ন থেকে আরেক দুঃস্বপ্নে হেঁটে চলা।

"কিন্তু ছবিটা শুধু যদি এই হত, তাহলে আজ আমাদের এই জীবনের কোনো মানে

খোঁজা যেত না, তাহলে সুকান্তর লিখে যাওয়া কবিতাগুলো তো প্রায় অলীক হয়ে উঠত। না, ছবিটা শুধু এই নয়। পাশাপাশি আরো একটা ছবি আছে।

যুদ্ধের কলকাতা। আলো-নেভানো অন্ধকারে, মই কাঁধে বগলে পোস্টার হাতে আঠার টিন নিয়ে সংকল্পিত হেঁটে চলা। বস্তির কোনো ঘুপচি ঘরে, দরজা জানলা বন্ধ করে টিমটিমে আলোয় রাত জেগে উত্তপ্ত বিতর্ক—সাম্রাজ্যবাদ, স্বাধীনতা, সাম্য।

মন্বন্তরের কলকাতা। জ্বলন্ত সূর্য পিঠে রেখে গনগনে আঁচের সামনে লঙ্গরখানা। না, তোমাকে আর এক হাতাও বেশি দেওয়া হবে না। অনভিজ্ঞতার সহানুভূতিতে এক হাতা বেশি দেবার ফলে গরাস-মুখে ঠক্ করে মরে যেতে দেখা।

মারী-মড়কে শ্মশান হয়ে যাওয়া গ্রাম। নিস্তব্ধ মিছিল। ভরদুপুর। সঙ্গে কুইনিন, ইন্‌জেকশন, ওষুধ। ভারতের অন্য প্রান্ত থেকে আসা ডাক্তারী ছাত্র। যদি কাউকে বাঁচানো যায়!

দাঙ্গার কলকাতা। ঘৃণা আর হত্যার বিষ-জর্জরিত সেই দিনগুলো। এ-পাড়ায় রহিমের পরিবারকে লুকিয়ে রাখা। ও-পাড়ায় রামের পরিবার। বাড়ি বাড়ি নতুন কচি মুখ। তোমার নাম কি খুকী? শীলা। তোমার নাম কি খোকা? রহমান।

দুটো ছবি। পাশাপাশি। দুটোই সমান সত্যি। একটা বিভীষিকা, দুঃস্বপ্ন, ভেঙে পড়া, মুছে যাওয়া। আর একটা—উঠে দাঁড়ানো, হাত বাড়ানো, কাঁধ মেলানো, মুঠো ধরা। দুটোতে মিলে নিরন্তর কাটাকুটি। তারই মধ্যে নতুন কিছু। নতুন এক দিগ্বলয়ের যন্ত্রণা। নতুন জন্ম। যা পরে ইতিহাস।

সেই ইতিহাসই সুকান্ত।"

কিন্তু সে-ইতিহাস রচিত হয়েছে অনেকেরই মিলিত মিছিলে—যাতে সে-দিন সামিল হয়েছিলেন সুভাষ, সুকান্ত, রমাকৃষ্ণ, আরও কতজন।

।।৩।।

সুভাষের সঙ্গে সুকান্তর সম্পর্ক বহুমাত্রিক। আর তার সম্ভবত সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল এক অগ্রজপ্রতিম কবির সঙ্গে আর এক কনিষ্ঠ কবির। এই প্রসঙ্গে যাবার আগে সুকান্তর সহজাত কবিসত্তা কীভাবে আধুনিক কবিসত্তায় উন্নীত হল তার পরিচয় দেওয়া যাক কয়েকটি কথায়।

সুকান্তর কবিপ্রতিভা পরিবারের পরিবেশেই পরিপুষ্ট হবার সুযোগ পেয়েছিল। সুকান্ত এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত পরিবারের সন্তান। তাঁর জ্যাঠামশাই কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ লেখক ও বাগ্মী হিসাবে দেশখ্যাত ছিলেন। পিতা নিবারণচন্দ্র তাঁরই সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা করেন সারস্বত লাইব্রেরী গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ায়। সারস্বত লাইব্রেরী সংস্কৃত ও বাংলা প্রকাশনায় প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল। এই দুই সূত্রে বাড়িতে বইয়ের অভাব ছিল না। তাই কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাশ, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ পড়ার সুযোগ ঘটেছিল বালক বয়স থেকেই। সুকান্তও ছিল গভীর মনোযোগী পড়ায়। সুকান্তর জাঠতুতো দাদারা স্কুল-কলেজে ইংরেজি শিক্ষা নিয়ে আধুনিক মানসিকতায় বড় হয়েছিলেন। তাঁদেরও ছিল সাহিত্য-প্রীতি এবং বিশেষ করে

সমকালীন সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহ। সুকান্তর নামকরণও হয় কল্লোল-এর অন্যতম জনপ্রিয় লেখক মণীন্দ্রলাল বসুর একটি গল্পের নামে।

কিন্তু সুকান্তকে আধুনিক রবীন্দ্রত্তোর বাংলা কবিতার সঙ্গে পরিচয় ঘটান সুভাষেরই বন্ধু, সুকান্তর জ্যাঠতুতো দাদা মনোজই। তিনি ছিলেন আধুনিক কবিদের ভক্ত গুণগ্রাহী। পড়তেন বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা—কবিতা ভবনের অন্যান্য প্রকাশনও। মনোজ 'সুকান্ত কি করে কবি হল' শিরোনামের এক স্মৃতিকথায় লিখছেন :

"১৯৪০ সালে আমার এক সহোদর দাদার বিবাহ হয়। আমার এক বন্ধু ঐ বিয়েতে নতুন বৌদিকে উপহার দেয় হীরেন মুখোপাধ্যায় ও আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত 'আধুনিক বাংলা কবিতা'। সেই বইয়ের কবিতাগুলি আমার পৃথিবীকে এক অনির্বচনীয় মাধুর্যে ভরে দিল। আধুনিক কবিতার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় এই বইয়ের মাধ্যমে।

বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সমর সেন—এঁদের কবিতা যেন এক নতুন আলোর ঝলকানি। সুকান্ত তখন বেলেঘাটার বাড়িতে। একদিন সকালে চলে গেলাম এবং ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম আমাদের বাড়িতে আর হাতে তুলে দিলাম একটি নতুন আবিষ্কার—'আধুনিক বাংলা কবিতা'। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সুকান্ত সেই বই নিয়ে রইল তিন-চারদিন।"

এতদিন শুধু রবীন্দ্রনাথে আবিষ্ট সুকান্ত আধুনিক কবিতার স্বাদ পেয়ে নতুন ভাবে ভাবিত হলেন। মনোজদের সহায়তায় আর স্কুলের সহপাঠী কবিবন্ধু অরুণাচল বসুর সাহচর্যে আরও বিস্তৃতভাবে জানলেন এই নতুন ধারাকে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত কবিতা পত্রিকা পড়লেন নিয়মিত। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, সমর সেন থেকে পাঠ নিলেন গভীর অভিনিবেশে। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা, বিশেষ করে বলাকা, প্রান্তিক, পত্রপুট, পরিশেষ আর পুনশ্চ তো ছিলই তাঁর নিজের সংগ্রহে। রবীন্দ্রনাথের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা তাঁর কাব্যবোধ ও ভাষা নতুন অনুশীলনে অগ্রসর হল।

১৯৪০ থেকে ১৯৪২ সাল দু-বছর ছিল তাঁর অনুশীলন পর্ব। এই সময়ের দু-একটি কবিতার উদাহরণ দিয়ে অরুণ মিত্র 'সুকান্ত-কাব্যের ভাষা ছন্দ ছবি' নিবন্ধে (দ্র. সুকান্ত প্রসঙ্গ) লিখেছেন : "মনে হয় এ জাতীয় কবিতায় সুকান্ত তখনকার কোনো কাব্যিক ঢাক-বাজনায় বিভ্রান্ত হয়ে লিখেছিল। কোনো বিমূর্ত মনোভাবকে ক্রিয়াশীলতায় নিয়ে আসা সুকান্তর এক বৈশিষ্ট্য, কিন্তু কোথাও কোথাও তা ঘুরপথে কৃত্রিম হয়ে পড়ে।" সুকান্তর 'ঘুম নেই'-এ প্রকাশিত 'পরিখা', 'সব্যসাচী', 'পরিশিষ্ট' ও '১৯৪১' এবং 'পূর্বাভাস'-এ প্রকাশিত বেশ কয়েকটি কবিতা পড়লে অরুণ মিত্রের বক্তব্য অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না। এ লেখাগুলি সবই সুকান্তর প্রস্তুতিপর্বের। এই প্রস্তুতি নিয়েই কিন্তু সুকান্তর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল ১৯৪৩ সাল থেকে নিজের ভাষা ও বাক্‌ভঙ্গিকে রূপ দেওয়ায়। এই পর্বের কয়েকটি কবিতায় যেমন সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঝোঁক স্পষ্টত চোখে পড়ে, তেমনি অন্য কয়েকটিতে বিষ্ণু দে ও সমর সেনের তির্যকতাও।

এই আধুনিক কবিদের মধ্য থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে গুরু হিসাবে গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে ছিল স্বাভাবিক। সুভাষের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, বক্তব্যকে সুস্পষ্ট ভাষা ও

ছন্দে ব্যক্ত করার নৈপুণ্য এবং সর্বোপরি প্রাণস্পর্শিতা আধুনিক কবিদের মননশীলতার মধ্যেও এনেছিল গণমুখিনতা। এইসব গুণাবলিতেই সুকান্ত আকৃষ্ট হন।

'পদাতিক'-এ প্রকাশিত হয়েছে সুভাষের লেখা ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের কবিতা। এই বইয়ের অধিকাংশই সমর সেনের ধারাতেই সমকালের বিপর্যয় সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন মধ্যবিত্ত জীবনকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-শ্লেষে জর্জরিত ও সচকিত করে তোলার কবিতা। কিন্তু পাশাপাশি এমন কয়েকটি কবিতাও আছে যেখানে কবি কেবলমাত্র দর্শক নন, সমাজ পরিবর্তনের দৃঢ়কল্প মানুষদের একজন। তিনি ডাক দেন : "কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?/কুশকঠিন বাসর যে সম্মুখে।/লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—। জলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে,/কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?" (সকলের গান)। কিংবা "প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য/ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,/চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য/কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া" (মে দিবসের কবিতা)

এই ডাকই প্রবলভাবে সুভাষের দিকে টেনেছিল সুকান্তকে।

।। ৪ ।।

সুভাষ 'সুকান্ত সমগ্র'-এর ভূমিকায় লিখেছেন : "সুকান্তর আগের যুগের লোক আমি পার্টিতে এসেছিলাম কবিতা ছেড়ে দিয়ে; আর সুকান্ত এসেছিল কবিতা নিয়ে। ফলে, কবিতাকে সে সহজেই রাজনীতির সঙ্গে মেলাতে পেরেছিল। তার ব্যক্তিত্বে কোনো দ্বিধা ছিল না।"

বাস্তবিকই, 'পদাতিক' প্রকাশের পর পরই সুভাষ রাজনীতিতে 'আপাদমস্তক' ডুবে গিয়েছিলেন। সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন ভয়ংকর সংকটের দিনগুলিতে তখনকার কমিউনিস্ট কর্মীদের প্রাত্যহিক কাজের ধারা ওপরে উদ্ধৃত রমাকৃষ্ণ মৈত্রের স্মৃতিচারণে কিছুটা হলেও ধারণা করা যায়। সুভাষের পার্টি দায়িত্ব ছিল ততোধিক—তিনি 'জনযুদ্ধ'-এর সঙ্গে যুক্ত হন সাংবাদিকতার কাজে। পরে, ১৯৪৫ সালে, পার্টির দৈনিক 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হলে সে-দায়িত্ব আরও বাড়ে—তিনি হন তার রবিবাসরীয় ক্রোড়পত্রের সম্পাদক। এর ওপর ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে তার অন্যতম প্রধান সংগঠক হিসাবে তাঁর পরিশ্রমের অন্ত ছিল না। এই পরিস্থিতিতে তাঁর কবিতার ধারা একেবারে শুকিয়ে না গেলেও ক্ষীণস্রোত হয়ে পড়ে।

কবিতাভবন প্রকাশিত 'পদাতিক'-এ সংকলিত হয়েছিল ১৯৩৮ থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে লেখা মোট তেইশটি কবিতা ; আমাদের উদ্যোগে সারস্বতী লাইব্রেরী থেকে প্রকাশিত তাঁর পরবর্তী কবিতার বই 'চিরকুট'-এ সংগৃহীত হয় ১৯৪১ থেকে ১৯৪৬-এ লেখা পঁচিশটি কবিতা। আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৫-এ প্রায় কোনো কবিতাই লেখেননি তিনি। কিন্তু, তাৎপর্যপূর্ণ ভাবেই তাঁর এ সময়ের স্বল্পসংখ্যক কবিতাই উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল সুকান্ত ও তাঁর সমবয়সী কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাসী কবিদের। সকলের কাছেই তিনি তখন ছিলেন পথপ্রদর্শক। এই সময়ে সুভাষের কবিতার প্রকাশভঙ্গিও 'পদাতিক'-এর কালের কবিতা থেকে নতুন দিকে মোড় নিয়েছিল—তাঁর বক্তব্য অনেক প্রত্যক্ষ ও দ্বিধাহীন হয়ে উঠেছিল।

তখন কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে সুকান্তর দায়ভারও কম ছিল না, বিশেষ করে তাঁর বয়স ও অভিজ্ঞতার বিচারে। বেলেঘাটার আঞ্চলিক পার্টির কর্মী হিসেবে পার্টি সাহিত্য ও 'জনযুদ্ধ' বিক্রি এবং পোস্টার লেখা ও মারার কাজ তো ছিলই। সেই সঙ্গে ছিল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের লঙ্গরখানার কাজ, শ্রমিক মহল্লায় প্রচারের কাজ। আর শহরে ছিল ছাত্র ফেডারেশনের প্রাদেশিক অফিসের কাজও। ১৯৪৪-এ ছাত্র ফেডারেশনের নেতারাই তাঁকে দেন 'সারা বাংলায় কিশোর বাহিনী'র সাধারণ সম্পাদকের গুরুভার। 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হলে তার সাপ্তাহিক 'কিশোর সভা' পাতাটির সম্পাদক হন তিনি। এইসব কাজের ফাঁকে ফাঁকেই, তার অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়েই, সুকান্ত কবিতা লিখেছেন গভীর রাত্রে কিংবা নির্জন দুপুরে—যখন বাড়ির লোকজন ঘুমে বা কাজে। এই কয়েকটা বছর—১৯৪৩ থেকে ১৯৪৬—সুকান্ত কবিতা লিখেছেন সুভাষের পাশাপাশি, সহযোগী কমরেডের মতোই, একই আদর্শে একই ভাবধারায়। দুজনের কবিতার নৈকট্যও চোখে পড়বে, উদাহরণ তুলে ধরলে।

জাপানি বোমারুর আক্রমণ যখন চট্টগ্রাম শহরকে বিধ্বস্ত করছিল, বার্মা পেরিয়ে সীমান্ত ভারতে তাদের প্রবেশ যখন আসন্ন, তখন সুভাষ লিখছেন :

তোমাকে ভুলিনি আমি
তুমি যেন ভুলো না আমায়;
তোমার সহস্র চোখ
চেয়ে আছে তারায় তারায়।
.....
শৃঙ্খল ভাঙার ডাক দিকে দিকে—
এখানে আমার মনে
জ্বলে অনুকম্পাহীন ঘৃণা।
শত্রুর জ্বলন্ত চোখে দেখি
জীবন দক্ষিণা। (সীমান্তের চিঠি : চিরকুট)

কিংবা—

চট্টগ্রাম জানে তার ভাষা;
.....
জাগ্রত চল্লিশ কোটি এখানে তৈয়ার।
ধারালো সঙীন দেবে বিজয়ী স্বাক্ষর
গণশক্তি দিকে দিকে কেটে দেবে মৃত ধনতন্ত্রের কবর।
যে ক্লীব পালাবে তার মুক্তি নেই আর।
দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, তবু এই দধীচির হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার—
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার।
(প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার : চিরকুট)

একই প্রেক্ষিতে সুকান্ত লিখছেন :

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম
চট্টগ্রাম ঃ বীর চট্টগ্রাম।
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেহে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষ্ণুতা
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে
বিদ্যুৎ প্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন।
চট্টগ্রাম ঃ বীর চট্টাগ্রাম।
.....
হে অভুক্ত ক্ষুধিত শ্বাপদ—
তোমার উদ্ধত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর
এখনো হয়নি নিরাপদ।
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ—
যে স্বাদ জেনেছে স্তালিনগ্রাদ
তোমার সংকল্প স্রোতে ভেসে যাবে লোহার গরাদ
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস।
তোমার প্রতিজ্ঞা তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম।
আমার হৃৎপিণ্ডে আজ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম।

(চট্টগ্রাম : ১৯৪৩, ছাড়পত্র)

১৩৫০-এ মহামন্বন্তরে সুভাষ লিখছেন :

গ্রামে উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা,
ধান-বোনা জমি আছে পড়ে।
শুকনো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।
সূর্য পাটে বসেছে কখন।
....
প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে
একে একে তারা
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে—
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।.....

(স্বাগত : চিরকুট)

সুকান্ত লিখছেন :

আমার সোনার-দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে,
জমে ভিড় ভ্রষ্টনীড় নগরে ও গ্রামে,
দুর্ভিক্ষের জীবন্ত মিছিল,
প্রত্যেক নিরন্ন প্রাণে বয়ে আনে অনিবার্য মিল;

আহার্যের অন্বেষণে প্রতি মনে আদিম আগ্রহ
রাস্তায় রাস্তায় আনে প্রতিদিন নগ্ন সমারোহ ;
বুভুক্ষা বেঁধেছে বাসা পথের দুপাশে,
প্রত্যহ বিষাক্ত বায়ু ইতস্তত ব্যর্থ দীর্ঘশ্বাসে।.....

(বিবৃতি : ছাড়পত্র)

এবং

এই হেমন্তে কাটা হবে ধান,
আবার শূন্য গোলায় ডাকবে ফসলের বান—
পৌষপার্বণে প্রাণ-কোলাহলে ভরবে গ্রামের নীরব শ্মশান।
তবুও এ হাতে কাস্তে তুলতে কান্না ঘনায় :
হালকা হাওয়ায় বিগত স্মৃতিকে ভুলে থাকা দায় ;
গত হেমন্তে মরে গেছে ভাই ছেড়ে গেছে বোন,
পথে-প্রান্তরে খামারে মরেছে যত পরিজন ;
নিজের হাতের জমি ধান-বোনা
বৃথাই ধুলোতে ছড়িয়েছে সোনা,
কারোরই ঘরেতে ধান তোলবার আসে নি শুভক্ষণ—
তোমার আমার ক্ষেত ফসলের অতি ঘনিষ্ঠ জন।

(এই নবান্নে : ছাড়পত্র)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রসঙ্গে সুভাষ লিখছেন :

এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনো,
বসন্ত গলিতপত্র ;
বাতাস বারুদ গন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত ;
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ।.....

ফেরে লুব্ধ পশু
মিটেছে রাজ্যের ক্ষুধা;
প্রাণ তার বিশ্বময় মৃত্যু আতঙ্কিত,
স্তালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর;

তাই তো নদীর স্রোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে
মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ স্বাক্ষর।

(স্তালিনগ্রাড : চিরকুট)

সুকান্ত লিখছেন :

লেনিন ভেঙেছে রুশে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।
আজকেও রুশিয়ার গ্রামে ও নগরে
হাজার লেনিন যুদ্ধ করে,
মুক্তির সীমান্ত ঘিরে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।
বিদ্যুৎ-ইশারা চোখে, আজকেও অযুত লেনিন—
ক্রমশ সংক্ষিপ্ত করে বিশ্বব্যাপী প্রতীক্ষিত দিন,
বিপর্যস্ত ধনতন্ত্র, কণ্ঠরুদ্ধ, বুকে আর্তনাদ;
—আসে শত্রু জয়ের সংবাদ।

(লেনিন : ছাড়পত্র)

এই মহাযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা সুভাষের 'ঘোষণা' (চিরকুট) আর সুকান্তের 'মণিপুর' (ঘুম নেই) কবিতা দুটি পাশাপাশি পড়লে দুজনের কণ্ঠস্বরের যে সম্মোহক মিল তা লক্ষ করা যাবে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপরই আন্দামানে ও অন্যান্য জেলে বন্দি রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তির যে আন্দোলনের জোয়ার বয়েছিল কলকাতায় তার প্রতিধ্বনি শোনা যাক দুই কমিউনিস্ট কবির কণ্ঠে :

জেনো, পনেরোই আগস্ট আবার আসব।
দেখে নেবো কার বিচার কে করে
কে দেখে দলিলপত্র কার?
ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল যখন
ভাঙুক, তাহলে
ভাঙুক বন্দীশালার দেয়াল।

....

যতদিন বীর বন্দীরা জেলে থাকবে—
আমরা শান্তি মানব না।
মিছিলে সভায় অশান্ত হাতে ওড়াবে নিশান
দুর্দমনীয় দাবী।

(ফের আসব : চিরকুট)

ওরা বীর, ওরা আকাশে জাগাত ঝড়!
নিদ্রায় কাজকর্মের ফাঁকে

ওরা দিনরাত আমাদের ডাকে
ওদের দিবা কবে?
কবে আমাদের বাহুর প্রতাপে
কোটি মানুষের দুর্বার চাপে
শৃঙ্খল গত হবে?
কবে আমাদের প্রাণ কোলাহলে
কোটি জনতার জোয়ারের জলে
ভেসে যাবে কারাগার!
কবে হবে ওরা দুঃখসাগর পার?

(জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুৎবাণী : ঘুম নেই)

এবার আসা যাক স্বাধীনতার শেষ সংগ্রামে—২৯শে জুলাই ১৯৪৬-এর সেই ডাক-তার ও সার্বিক ধর্মঘটের দিনগুলিতে :

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!
যেখানে থাকি, ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!
একবার লাখো হাত এক হোক, দেখে নেব পশুরাজকে।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!
দোকানে কপাট, দপ্তরে চাবি, ট্রামবাসে চাকা বন্ধ।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!
বিজলির চোখ গেলে দাও, করো চৌরঙ্গীকে অন্ধ।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!
ডাক-তার ভাই। টেলিফোন-বোন ভয় নেই, পাশে আমরা।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক!
দুঃশাসনের পাঁজর খসাবো, গা থেকে খুলবো চামড়া।

(উনত্রিশে জুলাই : চিরকুট)

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারি দিকে
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে,
এত বিদ্রোহ কখনো দেখে নি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ;
স্বপ্ন-চূড়ার থেকে নেমে এসো সব—
শুনেছ? শুনছ উদ্দম কলরব?
নয়া ইতিহাস লিখছে ধর্মঘট,
রক্তে রক্তে আঁকা প্রচ্ছদপট।.....

(অনুভব ॥ ১৯৪৬॥ : ছাড়পত্র)

এই কয়েকটি উদ্ধৃতিই পুরোনো কমিউনিস্টদের সামনে মেলে ধরে সেই স্মৃতি, ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে শহর কলকাতা জুড়ে ধর্মঘট আর মিছিল। সেই মিছিলে বহু জনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলছে কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী—সুভাষ আর সুকান্ত। ইতিহাসের সেই দুঃখ-দুর্দশা সংগ্রাম আর আশার প্রতিধ্বনি ধরে রেখেছেন একই বোধ আর বিশ্বাসে, একই জীবনাদর্শে সুভাষ ও সুকান্ত।

।। ৫ ।।

১৯৪৬-এর দুর্দান্ত ঔপনিবেশিক বিরোধী শ্রমিক-ছাত্র-যুব সমাজের অভ্যুত্থানের পর আগস্ট মাসেই শুরু হয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কী কারণে কাদের স্বার্থে সেই দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল সে প্রসঙ্গে যাব না। কারণ ইতিহাস সচেতন মানুষ আজ তা সহজেই বুঝতে পারেন। সুকান্ত তখন বেশ কিছু দিন ভুগে ভুগে কমিউনিস্ট পার্টির রেড-এইড কিয়োর হোম-এ শয্যাশায়ী। সেই অবস্থাতেই এই দাঙ্গার বেদনায় সে চিঠি লিখছে বন্ধুকে, সঙ্গে 'দেওয়ালী'-র মতো কবিতা :

তোর সেই ইংরাজীতে দেওয়ালীর শুভেচ্ছা কামনা আমি পেয়েছি, তবুও নিরুৎসাহে আজ অন্যমনা,

আমার নেইকো সুখ, দীপান্বিতা লাগে নিরুৎসব,
রক্তের কুয়াশা চোখে, স্বপ্নে দেখি শব আর শব।
এখানে শুয়েই আমি কানে শুনি আর্তনাদ খালি,
মুমূর্ষু কলকাতা কাঁদে, কাঁদে ঢাকা, কাঁদে নোয়াখালী,
সভ্যতাকে পিষে ফেলে সাম্রাজ্য ছড়ায় বর্বরতা
এমন দুঃসহ দিনে ব্যর্থ লাগে শুভেচ্ছার কথা ;
তবু তোর রঙচঙে সুমধুর চিঠির জবাবে
কিছু আজ বলা চাই, নইলে যে প্রাণের অভাবে
পৃথিবী শুকিয়ে যাবে, ভেসে যাবে রক্তের প্লাবনে।.....

(দেওয়ালী : ঘুম নেই)

এই অসুখ নানা দিক থেকে ঘুরে ঘুরে সুকান্তকে কাবু করে ফেলল। এমন সময় এল যখন তাকে নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে বিশ্রামের জন্যে গৃহবন্দী হয়ে থাকতে হল। তখন দাঙ্গায় জ্বলছে কলকাতা। বিশেষ করে নারকেলডাঙ্গা-বেলেঘাটায় চলছে দিনের পর দিন কারফিউ। তার মধ্যে সকালের দিকে যে দু-একঘণ্টা ছাড় থাকত, তাতে কলকাতা শহর থেকে পার্টির ডাক্তার নিয়মিত এসে উঠতে পারতেন না। তখন পর্যন্ত চিকিৎসার দায়িত্ব পার্টিই পালন করেছে। এ সময় সুকান্ত লিখছেন তাঁর শেষ দিকের কবিতাগুলি—যাতে সহজেই চোখে পড়বে রচনাশৈলী ও আবেদনের নতুন স্রোত। তখন তাঁর ঘনিষ্ঠ কবি-লেখক বন্ধুরা নিয়মিত আসতেন প্রায় প্রতিদিন কারফিউয়ের ফাঁকে ফাঁকে বিকেলে, তাঁকে সঙ্গ দিতে, পার্টি ও সাহিত্য জগতের খবর দিতে। এমনই একদিন বিকেলে নারকেলডাঙ্গার বাড়িতে সুকান্তর শরীরের খোঁজ নিতে এসেছিলেন সুভাষ—তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও সুকান্তকে নিয়ে তখন তিনি উদ্বিগ্ন। সে সময় আমি বাড়ি ছিলাম না। সন্ধ্যার পর ফিরলে সুকান্ত আমায় বলেছিলেন,

"কে এসেছিল জানিস? আমার গুরু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়।"

সুকান্তর এই অসুখের সময় থেকেই সুভাষ ও সুকান্তর অন্য এক গভীর সম্পর্কের পরিচয় মেলে। কিছু দিনের মধ্যেই নারকেলডাঙ্গায় ঠিকমতো ব্যবস্থা করে ওঠা যাচ্ছে না বলে জ্যাঠতুতো দাদাদের উদ্যোগে, সুচিকিৎসার জন্যে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল শ্যামবাজারের বাড়িতে। সেখানেই বড় ডাক্তার প্রথম রোগ নির্ণয় করল সুকান্তর টি. বি. হয়েছে এবং তা পেটের, ফলে তা ধরা পড়েনি সহজে। এসব কথা বিস্তারে 'কবি সুকান্ত'-তে আমি লিখেছি। কিন্তু এখানে উল্লেখ করব সুকান্তকে সারিয়ে তোলার জন্যে সুভাষের প্রয়াসের কথা—যা পরে তাঁর মুখ থেকে আমি শুনেছি। টি. বি.-র চিকিৎসার জন্যে টাকার দরকার, তাই সুভাষ উদ্যোগ নেন কালীধন ইন্‌স্টিটিউটে একটি গানের আসর করে টাকা তোলার—এই আসরে গান গেয়েছিলেন দেবব্রত বিশ্বাস, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, সম্ভবত আরও তাঁর ঘনিষ্ঠ কোনো কোনো শিল্পী। এখানে একটা নিদারুণ সত্য প্রকাশ না করে পারছি না। সুভাষদা (এখানে তাঁকে দাদা বলেই উল্লেখ করব) আমাকে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন, টাকা বেশ কিছু উঠেছিল। কিন্তু কয়েকজন ছাত্রনেতা তাদের তোলা টাকা জমা দেননি!

শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি সুকান্তকে। কারণ চিকিৎসার সময় পাওয়া গেল না আর তখনও পর্যন্ত টি. বি.-র অব্যর্থ ওষুধ স্ট্রেপটোমাইসিন পরাধীন ভারতে এসে পৌঁছয় নি। সুকান্তকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন অনেকেই—পরিবারের মানুষ আর পার্টির নেতারা কিন্তু সুকান্তর জীবনাবসানের পর তাঁর স্মৃতিকে তাঁর কবিতাকে বাঁচিয়ে রাখতে যাঁরা প্রয়াসী হন তাঁদের মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন সুভাষদাই। সুকান্তর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই "রবিবারের স্বাধীনতা"-র 'সুকান্ত স্মৃতি-সংখ্যাটি যাঁরা দেখেছেন ও স্মরণে রেখেছেন এই প্রয়াসের প্রথম স্বাক্ষর সুভাষ কী গভীর মমতা ও নিষ্ঠায় দিয়েছেন, তা মনে করতে পারবেন। ১৮ই মে ১৯৪৭, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪ সালের প্রায় ষাট বছর পুরোনো স্বাধীনতা পত্রিকাটির ভাঁজে ভাঁজে জীর্ণ একটি কপি আজও আমার সংগ্রহে আছে। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই ছোটো ছোটো হলেও যে অমূল্য লেখাগুলি তিনি জোগাড় করেছিলেন, তার লেখক তালিকায় রয়েছেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, অজিত দত্ত, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ধীরেন্দ্রলাল ধর, আর এতে কবিতা লিখেছিলেন অরুণ মিত্র, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও জগন্নাথ চক্রবর্তী। পরিবারের পক্ষ থেকে সুকান্তর জীবন আলোচনা করেছেন জ্যাঠতুতো দাদা রাখাল ভট্টাচার্য। সুকান্তর 'দেওয়ালিকা' কবিতাগুলি এবং একটি চিঠিও এতে স্থান পায়। সুকান্তর খ্যাতি তাঁর উনিশ বছর বয়সেই দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই লেখাগুলি পড়লে জানা যায় সুকান্তর প্রতি অগ্রজ কবি ও লেখকদের মমতা ও প্রত্যাশা কত গভীর ছিল। লেখাগুলি পরবর্তীকালে প্রকাশিত কয়েকটি সংকলনে মুদ্রিত হয়েছে। কিন্তু সব ছাড়িয়ে আজও যা আমার মনে সাড়া তোলে, তা হল অরুণ মিত্রের সেই পদ্য কবিতাটি—'কি ভেবেছিল সুকান্ত?'..... "..... "মৃত্যুর আগের দিন পড়ন্ত রোদের দিকে তাকিয়ে কি ভেবেছিল আমাদের সুকান্ত? রোদের একটা ঝলক যদি সুকান্তর অন্ধকার অন্ত্র আর ফুসফুসের মধ্যে ঢুকতে পারত!"

সুকান্তর প্রতি সুভাষদার দায়বোধ তখন থেকে যেন শতগুণ বেড়ে গেল। কীভাবে মৃত্যুর পর 'ছাড়পত্র' প্রকাশিত হয় তার ইতিহাস জানা যাবে "সুকান্ত-প্রসঙ্গে" সংকলিত চিন্মোহন সেহনবীশ, আমাদের প্রিয় চিনুদার স্মৃতিকথনে। এখানে আমি একটা ছোটো ভ্রম সংশোধন করে রাখতে চাই—আমার ইতিহাসবোধে। 'ছাড়পত্র'-এর ভূমিকায় সুভাষদা লিখেছেন বই প্রকাশের একটা বড় কারণ হল নামকরণে বিলম্ব। লিখেছেন সুকান্তর মৃত্যুর পর "বইয়ের নাম বদলে প্রথম কবিতার নাম রাখা হল 'ছাড়পত্র'।" যাদবপুর হাসপাতাল থেকে 'সুকান্তর শেষ শয্যায় পাওয়া তাঁর লেখার যে কয়েকটি পাণ্ডুলিপির পাতা পরিবারে আসে সেগুলি আমার কাছেই রক্ষিত আছে। তার মধ্যে একটা আলগা পাতা রয়েছে যাতে বড় বড় অক্ষরে সুকান্ত অবসরকালে কয়েকটা কথা লিখেছেন। এই লেখাগুলির মধ্যেই তিনি তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষরে বার চারেক লিখেছেন ছাড়পত্র, ছাড়পত্র তবে তাই হোক। সেই সঙ্গে এক জায়গায় রয়েছে তার লেখা তিনটি নাম পরপর : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুনীল রায়। সুনীল রায় ছিলেন সুকান্তর অতিপ্রিয় রবীন্দ্র সংগীত গায়ক। কিন্তু 'ছাড়পত্র / তবে তাই হোক' এবং সেই সঙ্গে সুভাষদার নাম লেখা থেকে বোঝা যায়, 'ছাড়পত্র' নামটি সুকান্তর মৃত্যুর আগেই সুভাষদা চূড়ান্ত করেছিলেন, এবং সুকান্ত তা স্বীকার করেও নিয়েছিলেন। এ তথ্য কেবল আমারই জানা তাই প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে রাখলাম।

সুভাষদার লেখা 'ছাড়পত্র'-এর ভূমিকা পড়লে বোঝা যায় কবিতা সম্পর্কে তাঁর বোধ ও দূরদৃষ্টি কত গভীর ও দূরপ্রসারী ছিল। আজ প্রায় ষাট বছর পরও তাঁর লেখা থেকে দু-এক কথা উদ্ধৃত না করে পারা যায় না :

"১৯৪৩ থেকে ১৯৪৭ সাল—যুগসন্ধির এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে'র রচনাকাল। একদিকে মৃত্যুকীর্ণ যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষ, বন্যা আর মহামারী, অন্যদিকে জীবন প্রতিষ্ঠার মৃত্যুপণ সংগ্রাম—জয় পরাজয় আর উত্থান পতনে, সুখদুঃখ আর আশা নিরাশায় ঘেরা এই পাঁচটা বছর 'ছাড়পত্রে' উৎকীর্ণ হয়ে আছে। কোটি কোটি মানুষের বলিষ্ঠ আশা কবির কণ্ঠে নির্ভীক ঘোষণায় ফুটে উঠেছে।

সুকান্ত নুতন যুগের সার্থক কবি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন একাত্মতা, সহজ কথা সোজাসুজি বলতে পারার এমন দুঃসাহসী ক্ষমতা সুকান্তর সমসাময়িক কোন কবি দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। বয়সে সর্বকনিষ্ঠ হয়েও কবিত্বশক্তিতে সুকান্ত ছিল অগ্রগণ্যদের একজন। ইস্কুলের ছাত্র অবস্থায় দেশজোড়া এত বিরাট খ্যাতি বাংলার আর কোনো কবির ভাগ্যেই বোধহয় জোটেনি। এই বয়সেই বিদেশে সুকান্তের একাধিক কবিতার অনুবাদ হয়েছে, তার কবিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

সুকান্তর কবিতা যাঁরা পড়বেন, তাঁরা এ কথা স্বীকার করবেন যে, সুকান্তর কবিতা শুধু বিরাট সম্ভাবনার ইঙ্গিত নয়, তাতে আছে মহৎ পরিণতির সুস্পষ্ট পদধ্বনি। 'ছাড়পত্র' তাই বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন পাবে।"

সুভাষদার এই সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নেরই বিস্তৃত স্বীকৃতি পাওয়া যায় পরবর্তী কয়েক বছরে লেখা বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের বক্তব্যে। এঁদের মধ্যে যেমন স্মরণীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনই কাব্য সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্য ও শীতাংশু মৈত্র। কবিরাও কবিতা লিখেছেন তার স্মরণে—যা সংকলিত হয় 'সুকান্তনামা'য়।

'ছাড়পত্র'-র ভূমিকাতেই সুভাষদা লিখেছেন, এর বাইরেও সুকান্তর অনেক কবিতা ছড়িয়ে আছে তা নিয়ে অনতিবিলম্বেই তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করা হবে। আসলে 'ছাড়পত্র'-এর কবিতা সুকান্তই বেছেছিলেন, এবং তাতে গুরুত্ব পেয়েছে তাঁর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লোকপ্রিয় ওঠা কবিতাগুলি, বিশেষ করে ১৩৫০-র দুর্ভিক্ষ বিষয়ে মর্মস্পর্শী কবিতাগুলি। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাঁর রোগশয্যায় লেখা নতুন ধারার প্রায় সব কবিতাই। কিন্তু এতে তিনি তাঁর চৌদ্দ-পনেরো বয়সের লেখাও যোগ করেছিলেন—যেমন 'দুরাশার মৃত্যু' ও 'প্রস্তুত'। 'ছাড়পত্রে'র সমকালেরই অনেক কবিতাকে তাই সংগ্রহ করে বই করার প্রয়োজন বোধ করেছে সবাই।

এ ব্যাপারে পরিবারের পক্ষ থেকেই প্রথম উদ্যোগ নিয়ে 'ঘুম নেই' প্রকাশ করা হয় সারস্বত লাইব্রেরীর কাউন্টার থেকে। 'ঘুম নেই'-এর ব্যাপারে সব থেকে উদ্‌গ্রীব ছিলেন সুকান্তর ঘনিষ্ঠ কবিবন্ধু অরুণাচল। তিনি দৌড়োদৌড়ি করেছেন—নানা জায়গা থেকে কবিতা উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছেন, আর সুকান্তর অনুজ প্রশান্ত পত্র-পত্রিকার অফিস থেকে সে-সব কবিতা কপি করে এনেছেন। এই কবিতাগুলি নিয়ে সুভাষদার বাড়িতে গিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে আনার ভার ছিল আমার ওপরই। সে কাজ পরবর্তী বইগুলির জন্যও করতে হত। সুভাষদা তখন খুবই ব্যস্ত মানুষ। বেলেঘাটা থেকে বালীগঞ্জ গিয়ে সকাল-সকাল ধরতে না পারলে দিনটা নষ্ট হত। সেখানে গিয়ে পড়লে, সুভাষদা মন দিয়ে কবিতাগুলি পড়তেন, সাজিয়ে দিতেন। তারপর সমকরণ করে দিতেন। 'ঘুম নেই', 'হরতাল', 'অভিযান' এই বইগুলির ভূমিকাও লিখে দিয়েছেন তাঁর অনবদ্য ভাষায় ও ভঙ্গিতে। কেবলমাত্র 'পূর্বাভাস'-এর ভূমিকা লিখেছিলেন কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ—কারণ সুভাষদা তখন রাজনৈতিক কারাবাস করছেন। এই প্রসঙ্গে এখানে জানাই আমার ঘনিষ্ঠবন্ধু, যার সঙ্গে কিশোর বাহিনী করেছি দু-তিন বছর, এবং যে পরবর্তীকালে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাখ্যাত দীপক মজুমদারের সংগ্রহ থেকে সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত এবং ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ প্রকাশিত 'আকাল' নামক দুর্ভিক্ষ বিষয়ক ঐতিহাসিক বাংলা কবিতা সংকলনটি পেয়ে পুনর্মুদ্রণের ইচ্ছা হলে আমি সুভাষদাকে জানাই। তিনি সম্মতি দিয়ে নতুন সংস্করণের জন্য একটা ভূমিকাও লিখে দেন :

"আবার নতুন করে ছাপা হল 'আকাল'।

মধ্যে দু-দুটো যুগ। অথচ পড়ে দেখুন, আজও মনে হবে এর কাব্যবস্তু একেবারে টাটকা তরতাজা। অমরত্বলোভী কবিদের আত্মা এই কালাতিক্রমণতায় খুশী হবে কিনা জানি না, দেশকালের মানুষ হিসাবে এতে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার কথা।

আমাদের মাথার ওপর আজ আবার উদ্যত আকালের খাঁড়া। বিদেশী শাসকদের বদলে আমাদের অবাঞ্ছিত স্বাধীনতা পতাকার নীচে আজ দেশী লুটেরাদের রাজত্ব। দেশ জুড়ে নিরন্নের হাহাকারে শোনা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি।".....

আকাল প্রথম প্রকাশিত হয় সন ১৩৫১ সালে, দুর্ভিক্ষের সমসময়ে। দ্বিতীয় প্রকাশ বৈশাখ ১৩৭৩ সালে—যখন পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য-আন্দোলন শুরু হয়েছে। হয়তো এই পরিস্থিতিই আমাদের 'আকাল' পুনর্প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সুভাষদা সুকান্তের প্রতিটি সংকলনের ব্যাপারেই বিশেষ যত্ন নিতেন। প্রতিটি কবিতা পড়ে দিতেন ফাইনাল প্রুফ দেখালে যতিচিহ্ন প্রায়ই ঠিক করে দিতেন। তখন আমরা দু-ভাই, আমি আর সারস্বতের কর্ণধার বিভাস তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতাম। আমি লেখাপড়ার জীবনে রাজনীতির ঘোর কাটিয়ে ফিরে আসি, এই ইচ্ছা তাঁর প্রবলই শুধু ছিল না, আমার ভবিষ্যতের প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠাও দেখেছি। এসব ব্যক্তিগত ঋণের কথা তুলতাম না, যদি না আমার সঙ্গে তাঁর যে শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক গভীরভাবে গড়ে উঠেছিল, তাঁর মূলে থাকত সুকান্তের প্রতি তাঁর দায়বোধ। তিনি তাঁর ব্যস্ত জীবনে যখনই সারস্বতের দিকে গেছেন তখনই মুকুল অর্থাৎ বিভাসের চেয়ারে বসে অগ্রজতুল্য প্রত্যয়ে চা খেয়ে বিশ্রাম নিয়েছেন।

সুকান্তর প্রকাশনার বিষয়ে তাঁর শেষ বড় কাজ 'সুকান্ত সমগ্র' প্রকাশের ব্যাপারে সম্পাদনার কাজে উপদেষ্টার গুরুদায়িত্ব নেওয়া। 'সুকান্ত-সমগ্র'—এই নামকরণও তাঁরই। মনে রাখা প্রয়োজন বাংলা রচনাবলীর প্রকাশে 'সমগ্র' কথাটির প্রয়োগ এর আগে কখনও হয়নি। এটা কেবল সুকান্তর রচনাবলীর জন্যে নয়, বাংলা ভাষার জন্যেও তাঁর স্মরণীয় দান। 'সুকান্ত-সমগ্র' প্রকাশিত হয় সন ১৩৭৪ সালে—অর্থাৎ ১৯৬৭ নাগাদ। সেই সাতচল্লিশ সাল থেকে পরবর্তী কুড়ি বছর সুকান্তর লেখার চূড়ান্ত উপস্থাপনায় এক ঐতিহাসিক ভূমিকা তিনি পালন করেছিলেন। আজও মনে পড়ছে, সুভাষদা তখন 'পরিচয়'-এর সম্পাদক। আর এই সম্পাদকের দপ্তরে প্রতিদিন কিছু আগে এসে নির্জন দুপুরে তিনি নিউজপ্রিন্ট কাগজের ছাঁট দিয়ে তৈরি সরু লম্বাটে প্যাডে প্রতিদিন সুকান্ত সমগ্রের ভূমিকা কয়েকটি করে পাতায় লিখে লিখে দিচ্ছেন, আর বিভাস তা বসে থেকে সারস্বতে নিয়ে এলে কলেজের পড়ানো শেষ করে সেখানে এসে আমি পড়ছি। এই ভাবেই সমগ্রের দীর্ঘ ভূমিকাটি তিনি লিখেছিলেন। এই ভূমিকা থেকে দুটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরছি আজকের পাঠকদের জ্ঞাতার্থে :

....."এখন সুকান্তর লেখা আর সুকান্তর নয়—দেশের এবং দশের। আমার কিংবা আর কারো একার বিচার সেখানে খাটবে না। কাজেই যে লেখা যেমন তাকে ঠিক সেইভাবেই কালের দরবারে হাজির করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। 'সুকান্ত-সমগ্র'-র সার্থকতা সেইখানেই।"

এই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে সুকান্তর যেখানে যত লেখা পাওয়া গেছে তাই-ই প্রকাশ করা হয়েছে এই 'সমগ্র'-এ। এইভাবেই গ্রন্থিত হয়েছে তাঁর মূল্যবান চিঠিপত্র আর দুর্লভ অপ্রচলিত রচনাগুলি। অপর অনুচ্ছেদটিতে তিনি লিখেছেন অকুণ্ঠচিত্তে :

"সমসাময়িকদের মধ্যে যে কাজ আর কেউ পারেনি, সুকান্ত একা তা করেছে—আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বার বহুজনের জন্যে সে খুলে দিয়ে গেছে। কবিতা বিমুখ পাঠকদের কবিতার রাজ্যে জয় ক'রে আনার কৃতিত্ব সুকান্তর। তারই সুফল আজ আমরা ভোগ করছি।"

।। ৬।।

সুকান্তর প্রতি সুভাষদার দায়িত্ব শুধু পাঠকদের সামনে তাঁর লেখাগুলি গুছিয়ে তুলে ধরার মধ্যেই শেষ হয়নি। এখন ভাবাও দুষ্কর, সেদিনের সেই 'যুগসন্ধিকালে' তাঁদের জীবনাদর্শ ও কবিতার লক্ষ্য কীভাবে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। তাই সুকান্তর কবিতাকে কেবল কবিতা পাঠকদের মধ্যে না রেখে সুকান্তর কবিতায় অনুপ্রাণিত রাজনৈতিক মানুষজনের কাছে সরাসরি পৌঁছোনোর কর্তব্যেও তাঁকে যথেষ্ট ভূমিকা নিতে হয়েছিল। সুকান্তর জীবনাবসানের পরে নানা স্তরের ও জনসংগঠনের পার্টি কর্মী তাঁর জন্মদিন পালন শুরু করেন—ক্রমে ক্রমে তা সারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। এই 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' আন্দোলনের সময় সুকান্তর বৈপ্লবিক ডাকের বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধ হয়েছিল। এইসব অনুবীক্ষণের বক্তা হিসাবে অন্যান্য বামপন্থী সাহিত্যিকদের মতো তাঁকেও নানা জায়গায় ছুটতে হয়েছিল। তাঁর মতো ব্যস্ত মানুষের পক্ষে এ দায়িত্ব পালন সহজ ছিল না। মনে পড়ছে, মাঝে মাঝে তাঁর চিরকুট আমার কাছে এসে পৌঁছত—অশোক, এঁরা মানুষ খুব ভাল, গত বছর আমি এঁদের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম, এবার তুমি যাও। সুভাষদা। এ জাতীয় নির্দেশে আমাকেও যেতে হয়েছে এখনকার উত্তর চব্বিশ পরগনার গ্রামে, মেদিনীপুরে, যেতে হয়েছে বাংলা-বিহারের সীমান্তের পাঞ্চেত জলাশয়ের অস্থায়ী শহরেও।

সুকান্তর আকস্মিক জীবনাবসানের শোক আর তার কবিতার সম্মোহনী শক্তি তাঁর বহু অনুরাগীর কাছেই তাঁকে একটা 'মিথ' করে তুলেছিল। সেই 'মিথ'-এর মুখোমুখি হতে হয়েছে এই জন্মতিথি উদ্‌যাপনের সভায় প্রায় সব বক্তাকেই—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ মিত্র থেকে সুভাষদা ও অরুণাচলকেও। আমার জ্যাঠতুতো দাদাকে তো প্রায় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে প্রশ্নকর্তাদের সামনে। এই পরিস্থিতিতেই সুভাষদা আমাকে বললেন দ্রুত সুকান্তর একটা জীবনী লিখতে। এ ব্যাপারে আমার ও সুকান্তর অগ্রজ সুশীল, জ্যাঠতুতোদের এবং অরুণাচলেরও বিশেষ উৎসাহ ছিল। আমি অল্প বয়সে, সবে কলেজে ঢুকেছি, 'কবি সুকান্ত' লিখি—প্রথমে কয়েক কিস্তিতে অনিলকুমার সিংহ সম্পাদিত 'নতুন সাহিত্য'-এ এবং পরে গ্রন্থাকারে সারস্বত থেকে। সে বই আজও সুকান্ত প্রেমিকরা পড়ছেন।

প্রথমত সহপাঠী মনোজ এবং মূলত সহমর্মী অনুজপ্রতিম সুকান্তর সূত্রে আমাদের পরিবারের সঙ্গে সুভাষদার ঘনিষ্ঠতা এমনই ছিল যে আজ তা স্মরণ করলে অভিভূত না হয়ে পারি না। সুভাষদার অনেক আক্ষেপও আমাকে ও বিভাসকে তিনি কখনও কখনও জানিয়েছেন। তার একটার উল্লেখ করছি। বলেছিলেন, দেখ সকলেই আমাকে এই বলে সম্পাদনার দায়িত্ব ঘাড়ে চাপায় যে, সম্পাদকের কাজটাই হবে শুধু আমার কাজ। শেষ পর্যন্ত আমাকে কিন্তু কাঁধে ঝুলি নিয়ে বন্ধুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হয় বিজ্ঞাপনের জন্যে। এ কথা, জেনেছিলাম, 'পরিচয়' আর 'সন্দেশ' উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান সত্য ছিল। সুকান্ত পরিবারের প্রতি তাঁর আকর্ষণের উদাহরণ হিসাবে জানাই—

যেদিন তাঁর সাহিত্য একাদেমির পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল, তার পরদিনই সকাল এগারোটা-সাড়ে এগারোটা নাগাদ সুভাষদা ও গীতাদি আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছিলেন অতর্কিতে। আমাদের কারোরই বুঝতে অসুবিধা হয়নি—আসলে তিনি এসেছিলেন সুকান্তর বাড়িতেই।

এ কথা যখনই ভেবেছি তখনই মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে যে জীবনের শেষ দুই-দশক তিনি সুকান্তর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ক্ষীণ করে ফেলেছিলেন। একেবারে যে ছিন্ন হয়নি তার কারণ সর্বজনপ্রিয় বিভাস—দেখা হলে তাঁর সঙ্গে সুভাষদা কিছু কথাবার্তা বলতেন। বন্ধুদের কাছ থেকে মাঝে মাঝে জানতে পারতাম আমার খোঁজখবরও তিনি কিছু রাখতেন—বিশেষ করে লেখাপড়ার দিকটার। তবে বছর পাঁচেক আগে 'আজকাল' পত্রিকার একটা সচিত্র সংবাদ পড়ে জেনেছিলাম, সুকান্তর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আগের মতোই গভীর ছিল। 'নবজাগরণ' দপ্তরে ১৭ই আগস্ট ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত সুকান্ত স্মরণসভায় সুকান্তর বিষয়ে অনেক কিছু বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আজকের দিনের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে বলেন, "কারও সন্দেহ থাকলে কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকানে ঘুরলেই সব সন্দেহ দূর হবে।" এরপর, তাঁর জীবনাবসানের বছর দুই আগে কলকাতা বইমেলায় সারস্বত লাইব্রেরীর স্টলে তিনি একদিন বিকেলে এসেছিলেন। উপলক্ষ, কবি সতীন্দ্রনাথ মৈত্রের নতুন কবিতার বই প্রকাশ করা। সেদিন বিভাস 'সুকান্ত-সমগ্র'-এর সুমুদ্রিত নতুন সংস্করণের কপি দিয়েছিলেন। বিভাস আমাকে বলেছিলেন, সুভাষদাকে দেখলে মন ভেঙে যায়—দেহে শুধু বয়সের জড়ত্বই আসেনি, কানে একটা কথাও শোনেন না। লিখে দিলে মুখে উত্তর দেন।

সুভাষ-সুকান্তর সম্পর্কের যতটুকু আমার জানা তা আজকের পাঠকদের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরলাম। কারণ একটুই। গত পঞ্চাশ বছরে, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি ভাঙাভাঙির পর, এবং তারপরের রাজনৈতিক নানা বিভ্রান্তির কারণে সুভাষদা সম্পর্কে হয়তো কমিউনিস্টদের কারও কারও কিছুটা বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। সেটা যথার্থ বা অযথার্থ তা আমার বিচার্য নয়। আমি শুধু একজন ঐতিহাসিক হিসাবে বলব কারোর জীবনের মূল্যায়ন হয় তাঁর মৃত্যুর পর—যখন তাঁর সারা জীবনের কর্মকাণ্ডটা একটু দূর থেকে সম্পূর্ণ দেখা যায়। এইভাবে দেখলে দেখা যাবে তাঁর আশি বছরের জীবনের প্রথম পঞ্চাশ বছর তিনি কমিউনিস্ট আদর্শের জন্যে, সেই আদর্শজাত কবিতা ও সাহিত্যের জন্যে যা করে গেছেন, তা তাঁকে নিঃসন্দেহেই সে দিনের মতো আজকেও বাংলার আধুনিক কবিতার ও প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের ইতিহাসের পাতায় এক পুরোধা পুরুষের স্থান চিহ্নিত করবে।

সুভাষ ও সুকান্তর প্রসঙ্গ শেষ করব 'উজ্জীবন' নামক তাঁর 'চিরকুট'-এ প্রকাশিত কবিতাটির কথা উল্লেখ করে। দুর্ভিক্ষ-পরবর্তী দু-এক বছর তাঁর কবিতা লেখায় ছেদ পড়েছিল—সুকান্ত তখন প্রায়ই সে জন্যে আক্ষেপ করতেন। পরে সুভাষদাও তার উল্লেখ করেছেন একাধিকবার। সুকান্তর স্মরণে লেখা এই কবিতাটি সত্যিই তাঁর কবি জীবনকে

রুজ্জীবিত করার প্রথম সার্থক অভিব্যক্তি। একেবারে অন্য ভাব ও রীতিতে লেখা জ্জীবনে' তিনি বলেছেন :

আমার প্রশংসায় কাজ নেই।
ধর্ম অধর্মের অতীত
কার্যকারণ থেকে পৃথক
অতীত অনাগত বর্তমান থেকেও ভিন্ন
যা তুমি জানো
আমাকে বলো।

—যমের প্রতি নচিকেতা : কঠোপনিষদ

যে
যৌবনের পদপ্রান্তে কৈশোরের ছিন্নশির উপহার দেয়,
বসন্তকে পুড়িয়ে মারে
দাউ দাউ দাবাগ্নি শিখায়,

যে
তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় স্বপ্নের দড়ি নাকে দিয়ে
বঞ্চনার অভিশপ্ত পথে,
পিচগলা প্রচণ্ড রৌদ্রে
গলদ্‌ঘর্ম করে,
দুপায়ে শহুরে বর্ষার বন্যা ঠেলে ঠেলে
মহল্লা থেকে মহল্লায় ছুটিয়ে নিয়ে যায়,

যে
তার শত্রুকে ফাঁসিতে না লট্‌কে
অদৃশ্য উদ্বন্ধনের পাকে পাকে জড়ায়,
পথে পথে কঙ্কাল স্তূপীকৃত করে,
বন্দুকের নলে জনসমুদ্রে আগুন ছড়ায়,

যে
ফুটন্ত একটা স্পর্শাতুর হৃদয়
উত্তেজনায় আর অসহ্য বেদনায় ছিন্নভিন্ন ক'রে
একটি কিশোরের আশ্চর্য কণ্ঠের কাকলি স্তব্ধ ক'রে দিয়ে
মাটির বুকে টেনে আনে এক ঝলক রক্ত,

তারপর সমস্ত শরীর জুড়ে শাদা কাপড় বিছিয়ে
মৃত্যুর গুণকীর্তন করে—

সুকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে
তোমাকে বাঁচাব।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : সমকালীন মূল্যায়ণ

সুভাষদার সঙ্গে পথচলা

শঙ্খ ঘোষ

১৯৫২ সালের জানুয়ারিতে, পড়ন্ত এক দুপুরবেলায়, প্রথম দেখেছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। সেই প্রথম দেখাতেই তাঁর সঙ্গে অনেকটা পথ হাঁটবার যে সুযোগ মিলেছিল সেদিন, পায়ের ক্ষতিতে অশক্ত হয়ে পড়বার আগে পর্যন্ত অব্যাহত ছিল সেটা। এত দীর্ঘকাল জুড়ে কত-যে পথ হেঁটেছি তাঁর সঙ্গে, কত-যে কথা বলবার কথা শুনবার অবাধ অবকাশ! সাহিত্যজগতে আমার মেলামেশা খুব অল্পই, বড়োদের সঙ্গে তো একেবারেই কম। সেই অর্থে আমার পক্ষে সুভাষদার সান্নিধ্য ছিল সুপ্রসর এক ব্যতিক্রম, আনন্দময় ছিল সে-অভিজ্ঞতা, সহজের নিশ্বাস ছিল তাতে। এই লেখাটিতে আমি তেমন কয়েকটি ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের কথাই শুধু বলব, নির্বাচিত কয়েকটি অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা।

দল

সেটা ছিল বোধহয় ১৯৫৪ সালের এক ডিসেম্বর-সন্ধ্যা। ইডেন গার্ডেনস্-এ মস্ত আকার নিয়ে চলছে কয়েকদিনের যুব-উৎসব। নাচ গান নাটক কবিতা, চারদিক জুড়ে নানারকমের আয়োজন, নানারকমের ছাউনি। অত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের সবটাই যে আলো ঝলমল তা নয়, দু-চার জায়গায় আছে কিছু আলোআঁধারি প্রান্ত। অনেকের সঙ্গে দেখা অনেকের সঙ্গে কথা, বেশ একটা ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সঙ্গে আছেন সুভাষদা।

ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সুভাষদা বললেন : 'শোনো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। চলো একটু ওইদিকে যাই।'

মন্থর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে আলোবিরল জনবিরল একটা অংশে পৌঁছে গেছি, কিন্তু কথাটা আর বলছেন না উনি। অনেকটা ইতস্তত করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেললেন : 'তোমার বিষয়ে একটা গুজব শুনছি, সেটা কি সত্যি?'

'গুজব? আমার বিষয়ে? কিসের গুজব?'

আবার কিছুক্ষণ চুপ থেকে : 'শুনলাম তুমি পার্টি মেম্বারশিপ নেবার কথা ভাবছ?'

চমকে উঠলাম শুনে। এবার নীরব থাকবার পালা আমার। কেননা, নিশ্চিত জানি যে উত্তরটা শুনে উনি আশাহত হবেন, আর সে-আঘাতটা আমার দিতে ইচ্ছে করছে না এই সুন্দর সন্ধ্যায়। ইস্কুলজীবন থেকে শুরু করে কখনোই কোনো দলীয় রাজনীতির অন্তর্গত হবার অভ্যাস আমার নেই, ইচ্ছেও নেই। দলীয়তার কথা ভাবলেই একটা দমচাপা অনুভব টের পাই ভিতরে। কিন্তু অন্যদিকে এও ঠিক যে ব্যক্তিগতভাবে একটা রাজনৈতিক বিশ্বাসের অনুবর্তী হয়ে আছি বেশ কিছুদিন ধরে, আর সেই সূত্রেই সুভাষদার এতটা কাছাকাছি আছি এই দু-বছর। একজন কমিউনিস্ট লেখক কেমন হতে পারেন, তার মডেল ভেবে চলেছি তাঁরই জীবনযাপনকে, তিনিও অনেকটা স্নেহ করছেন আমাকে। সেই স্নেহপথে হয়তো এখন

তিনি আমাকে টেনে নিতে চান নিবেদিতপ্রাণ একজন পার্টিকর্মী হিসেবেও, গুজবটা তাই যাচাই করে নিচ্ছেন এই নিরালায়।

অনেকটা দ্বিধার পর, ব্যথা দেওয়া হবে জেনেও, বলতেই হলো তাঁকে : 'না, কথাটা ঠিক সত্যি নয়। ও-রকম কোনো ভাবনা আমার নেই। ওটা আমি পেরে উঠব না।'

শুনে, আমাকে অবাক করে দিয়ে, সুভাষদার প্রতিক্রিয়াটা হলো একেবারে উলটো। একটা স্বস্তির শ্বাস নিয়ে বললেন তিনি : 'সত্যি নয় তবে? খুব ভালো। শোনো, এখন তো নয়ই, লিখতে যদি চাও, পার্টি মেম্বারশিপ নেবার কথা ভেবো না। পার্টির কাজ যদি করতে চাও, তাহলে বাইরে থেকে করো। বাইরে থেকেই অনেক ভালোভাবে কাজ করতে পারবে। দুপক্ষেই সেটা ভালো।'

'আপনি? আপনি বলছেন এই কথা?'

'হ্যাঁ, আমিই বলছি। এ নিয়ে অন্যদের সঙ্গে আলোচনার আর দরকার নেই। তবে পার্টির কাজে সাহায্য করার কথা ভুলো না কখনো। মানুষের সঙ্গ ছেড়ো না। চলো এখন, ওইদিকে যাই।'

আবার আলোর দিকে চলতে থাকি আমরা। ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়াই। নানাজনের সঙ্গে কথা বলবার ভিতরে ভিতরে আমাকে বিঁধতে থাকে সুভাষদার ওই স্বস্তিবোধ, অবিশ্বাস্য ওই পরামর্শ। কেমন করে এটা হলো? কেন হলো এটা?

আমরাও অবশ্য একটা গুজব শুনছিলাম কিছুদিন ধরে। শুনছিলাম যে পার্টির ভিতরে সুভাষদার একখানা বই নিয়ে বিতণ্ডা চলছে খুব। বইটির নাম 'ভূতের বেগার'। মার্ক্সবাদে দীক্ষা দেবার জন্য সরল যেসব বইপত্রের কথা হচ্ছিল তখন, সম্ভবত তারই একটা নমুনা হিসেবে লেখা হয়েছিল ওই বই। কিন্তু সরল করতে গিয়ে সুভাষদা না কি এমন সব তাত্ত্বিক সমস্যা তৈরি করে তুলেছেন যে জবাবদিহির দায়ে পড়তে হচ্ছে তাঁকে। এপক্ষে-ওপক্ষে যুযুধান তখন অনেকে। তার সবটাই যে সে-মুহূর্তে টের পাচ্ছি আমরা তা নয়, কিন্তু আঁচ পাচ্ছি কিছুটা। আজ এখন, অনেকদিন পর, সেসব ভিতরকার খবর অনেকটাই আমাদের জানা। এখন 'চিঠির দর্পণে'র সুবাদে আমরা জানি যে 'ভূতের বেগার' নিয়ে 'পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে জোর কাজিয়া চলছে। "বুদ্ধিজীবী" বলে পার্টিতে যাদের হেলাফেলা করা হয়, "ভূতের বেগার"-এর পেছনে তারা সবাই এককাট্টা। ফলে নেতারা পড়েছেন ফ্যাসাদে। এখন আর না পারছেন গিলতে, না পারছেন ওগরাতে।...পার্টির নিষেধাজ্ঞা থাকায় পার্টির দোকানে বইটি রাখেনি। ভয়ে পার্টির কেউ সে বই কেনেনি। অপছন্দের বই ব'লে পার্টি আঁতুড়ঘরে নুন দিয়ে মারল। ক্ষমতায় না থেকেই এই।'

সেই আলোড়ন থেকেই কি কোনো অশনিসংকেত টের পাচ্ছিলেন তিনি? সেইজন্যই কি আমাকে ওই সতর্কীকরণ? না, কেবল 'ভূতের বেগার'ই নয়, মনে পড়ে 'চিঠির দর্পণে'র একেবারে শেষ কথাগুলিও, যেখানে একজন কমরেডের কথা শুনবার পর 'খানিকক্ষণ আমরা নীরবে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। দুজনে যেন দুই মেরুর লোক। দুজনের কেউ কাউকে বুঝতে পারছি না।' দুই মেরুর, কেননা একজন কমরেড তাঁকে বলেছিলেন

আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনের প্রতিবাদ করতে, অথচ সুভাষদা সেখানে প্রতিবাদযোগ্য-দেখেননি কিছু। তখনকার দিনের চলতি 'প্রগতিশীল' কবিতার বিষয়ে সংগত একটা প্রশ্ন তুলেছিলেন সুভাষদা, পত্রিকায় ছিল তার প্রতিবেদন, আর সে-প্রশ্নকে অনেক কমরেডের মনে হচ্ছিল একেবারেই 'পার্টিবিরোধী সব কথা'!

অশনিসংকেত ছিল হয়তো সেখানেও। অশনিসংকেত ছিল এই মনোভাবে যে 'পার্টিতে দলাদলি আছে, প্রথম যেদিন ধরতে পারলাম, সেদিন খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল' ('হাংরাস')।

দেশ

এ-দেশ আমার গর্ব, এ-মাটি আমার কাছে সোনা—লিখেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এ-রকম একটা পঙ্‌ক্তি লিখে ফেলাটা তত শক্ত নয় হয়তো, কিন্তু বেশ শক্তই জীবনের মধ্যে ওই কথাটাকে সত্য করে তোলা। বছর চারেক তাঁর সঙ্গে পথেবিপথে অনেক ঘুরবার পর ১৯৫৬ সালে আমাদের বহরমপুরের ক্ষণিক আস্তানায় যখন তাঁকে কদিনের অতিথি হিসেবে পেলাম, কেবলই তখন মনে হতো কথাটা। মনে হতো, ঠিক, এই মানুষটিরই মুখে তো মানায় 'আমার বাংলা'। দেশকে কত আনাচেকানাচে থেকে জানেন ইনি। সারা দিন জুড়ে আমাদের সঙ্গে যেসব ভাবনার কথা তিনি বলেন, বেশির ভাগই হালকা চালে, তার মধ্যে কেবলই মিশে থাকে ভাষা-মানুষ-জীবন-জীবিকা নিয়ে এই বাংলাকে জানবার আর জানাবার এক নিরভিমান আবেগ। আজ দেখছি ওই সময়ের কিছু আগে গীতাদিকে তিনি লিখছিলেন : '...সব মিলিয়ে যে আবেগ প্রকাশ করা যেত তার ছিটেফোঁটাও আমি প্রকাশ করতে পারিনি। আমার মুশকিল হয়েছে টুকরো টুকরো ছবিগুলোকে একটি আবেগের স্রোতে কিছুতেই ভাসাতে পারছি না।' কবিজীবনের নতুন একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে, 'ফুল ফুটুক' পর্যায়ের কবিতাগুলি লিখবার সূচনাপথে দাঁড়িয়ে, ওই অনিশ্চয়ের আর অতৃপ্তির বোধ স্বাভাবিকই ছিল তাঁর পক্ষে। অথচ আমাদের মনে হতো, সেই আবেগেরই কোনো স্পর্শ আমরা পাচ্ছি, পাচ্ছি কবিতা নিয়ে ভাষা নিয়ে শব্দ নিয়ে থম্‌কে-থম্‌কে-বলা তাঁর দৈনন্দিন কথাগুলির মধ্যে।

সেইসময়েই সুভাষদা আমাদের জানিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্য-ইতিহাস লিখবার কল্পনা, নতুন এক সাহিত্যের ইতিহাস। সে-কল্পনায় রসদ জুগিয়েছিলেন নিশ্চয় নীহাররঞ্জন রায়। নীহাররঞ্জন তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' লিখেছিলেন 'স্বদেশব্রতের দুর্দম দুরন্ত নেশায়', তাঁকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল দেশের সেই রূপের মধ্যে যা ধরা আছে 'বিস্তৃত বাঙলার কৃষকের কুটিরে, নদীর ঘাটে, ধানের ক্ষেতে, বটের ছায়ায়, শহরের বুকে, নির্জন প্রান্তরে, পদ্মার চরে, মেঘনার ঢেউয়ের চূড়ায়'। এরই মধ্যে দেশের মানুষের একটা রূপ তিনি দেখেছিলেন আর ভালোবেসেছিলেন। এই ভালোবাসায় সুভাষদা তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, এই ভালোবাসায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' পড়ে এর ছোটো এক সংস্করণ তৈরি করে ফেলেন সুভাষদা। তাঁর মনে হতে থাকে : সাধারণ মানুষের জীবনের যে ছবি সে-ইতিহাসে দেখা দিয়েছিল, তারই পথ ধরে তো নতুনভাবে ঢেলে সাজানো যায় আমাদের গোটা সাহিত্যের ইতিহাস। যায় না?

শুধু উঁচুতলার চোখ দিয়েই তো ইতিহাসকে দেখা হয়েছে, আমরা দেখব জনজীবনের স্তর থেকে। দেখব—শুধু পুরুষদের নয়—মেয়েদেরও চোখ দিয়ে। এসো না কয়েকজন মিলে সেই কাজটা করি। প্রতিমা, এসো তুমি আর আমি দুজনে মিলে লিখব। পারব না? তুমি লিখবে মেয়েদের কথা, মেয়েদের দিক থেকে। আচ্ছা, কাল সকালে বসে একটা ছক তৈরি করা যাবে।

যেভাবে তিনি ভেবেছিলেন, কাজটা সেভাবে করা যায়নি অবশ্য। 'বাংলা সাহিত্যের সেকাল ও একাল' বা 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : আদি ও মধ্যযুগ' নামে দুখানা ভিন্ন বই লিখেছিলেন ভিন্ন দুই সময়ে, ইস্কুলের পাঠ্যরীতি মেনে নিয়ে সেই লেখা। তাঁর ইচ্ছের যথার্থ পূরণ নেই সেখানে, থাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যে-ইতিহাসকে তিনি খুঁজতে চেয়েছিলেন সাহিত্যের ইতিহাসে, তারই একটা আদল রয়ে গেছে তাঁর নিজের কবিতার মধ্যে। প্রগতিবাদ তার দলীয় তুচ্ছতা ছেড়ে আর স্লোগাননির্ভরতা ছেড়ে যেদিন সত্যি সত্যি জীবনের দিকে তাকাতে শিখবে, সেদিন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার মধ্যে জনজীবনের যে ছবি পাবে, সেখান থেকেই তো জেগে উঠবে আমাদের দেশের একটা রূপ, তার ইতিহাস। 'আসলে এখানকার জীবনের সঙ্গে আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েছি। বজবজ বলব না, আসলে এই গ্রাম, চটকলের মানুষজন—এদের ওপর অসম্ভব মায়া পড়ে গেছে।' এই মায়া দিয়ে, 'ফুল ফুটুক'-এর পর্যায় থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তৈরি হয়ে উঠছে একটা দেশ। বজবজ থেকে ফিরে আসবার পর যাঁরা ঠাট্টা করে বলেছিলেন 'শখের মজদুরি', তাঁরা বুঝতে পারেননি ওইসময়ের মধ্যে তাঁর বদলের পরিমাণ। 'ফিরে এলেও, এখন আমি আর ঠিক সেদিনের সে-আমি নেই'—একথা আমরা বুঝতে পারতাম বহরমপুরে তাঁর সেদিনকার সান্নিধ্য থেকে, সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে ব্যক্তিমানুষের সুখদুঃখকে খুঁজবার আর বুঝবার গরজ থেকে, 'ফুল ফুটুক' থেকে শুরু করে তাঁর কবিতার ভিন্নমুখ এক চলন থেকে, 'লড়াকু সংসার'গুলি যেখানে বিশেষের রূপ নিয়ে অবয়বময় হয়ে দেখা দিতে থাকে কেবলই।

কবিতা

ঘনিষ্ঠতার প্রশ্রয় পেলে যা হয়, অনেকসময়ে তাঁর কবিতার বিষয়ে দু-একটা দ্বিধার কথাও কখনো-বা বলে ফেলেছি সুভাষদাকে। কিছুটা হয়তো অবোধেরই মতো, প্রশ্ন করে বসেছি।

'যত দূরেই যাই' বেরিয়ে গেছে ততদিনে। বেশ খানিকটা হাঁটার পরে দুকাপ চা নিয়ে বসেছি কলেজ স্ট্রিট বাজারের বসন্ত কেবিনে। নানা কথার মধ্যে হঠাৎ সুভাষদা বললেন : 'জানো, একটা কবিতার কথা ভাবছি।'

এ-রকম অভিজ্ঞতা আগেও ঘটেছে আমার। এই অভিজ্ঞতা যে, যে-কবিতাটা লেখাই হয়নি তখনও, তার একটা আভাস বলছেন মুখে, আর আমি শিউরে উঠছি। শিউরে উঠছি ভিন্ন দুই কারণে। অগ্রিম জানতে পারব একটা কবিতার কথা, এই এক রোমাঞ্চ। কিন্তু কী করে লিখবার আগেই বলা যায় লেখাটার বিষয়ে? লেখাটা যদি তাতে রুদ্ধ হয়ে যায়? এই এক ভয়।

কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছি মুখের দিকে, আর সুভাষদা বলে চলেছেন : 'একটা ট্রাম চলে গেলে তারের যে শব্দটা হতে থাকে, সেই শব্দটাকে মনে হয় যেন কেউ "ছি ছি" বলছে। পাশেই ল্যাম্পপোস্টে একটা ছেঁড়া চাটাই ঝুলছে, মনে হয় যেন কেউ ওকে ফাঁসিতে লটকেছে। এইসব নিয়ে কবিতা।'

'আপনি কি এভাবে এগুলো ভেবে নেন আগে থেকে?'

'টুকরো টুকরো ছবি গেঁথেই তো কবিতা। আর সেগুলো তো এভাবেই জমতে থাকে।'

'কিন্তু আগে থেকে বলে ফেললে ভিতরে কোনো অসুবিধে হয় না?'

'কী অসুবিধে? না, অসুবিধে হয় না।'

'একটা কথা বলব? আপনার কবিতায় একটা জিনিস কিন্তু খুব বেশি করে আসে, মানে একটা ধাঁচ। এই যেমন বললেন চাটাইটা ফাঁসিতে ঝুলছে। অলংকারের ভাষায় যাকে সমসোক্তি বলা যায়, তার একটু বেশি ব্যবহার। এর কোনো অসুবিধে নেই? একই ধাঁচে এই বেশি ব্যবহারের?'

'আমি ওসব ভাবি না। ওসব তোমাদের ভাবনা।'

এদিন তবু এই উত্তরটুকু দিয়েছিলেন। অন্য আরেকদিন, হয়তো-বা ভিতরে ভিতরে একটু আহত হয়েই, একেবারে চুপ করে গিয়েছিলেন।

'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ' নামে তাঁর অন্যতম সেরা কবিতাটি ছাপা হয়ে গেছে তখন, তা নিয়ে কথাবার্তাও চলছে অনেক। আমারও যে কত ভালো লাগছে সেই লেখা, সেকথা জানাবার পর কোন্ দুর্মতিতে হঠাৎ বলে বসি : 'কিন্তু কবিতাটার মধ্যে এটা থাকাও কি ঠিক হলো যে ক্রুশ্চেভের গলায় কথা বলছে ভবিষ্যৎ? একেবারে ক্রুশ্চেভ? এ যদি পরে পালটে যায় আবার?'

সুভাষদা শুধু জিজ্ঞাসুভাবে একবার তাকালেন আমার দিকে।

আমি বলতে থাকি : 'দশ বছর আগে তো লিখেছিলেন, কমরেড স্তালিন তুমি সুখে নিদ্রা যাও। এখন তো আর সেভাবে বলতে পারবেন না? সেইরকম, ক্রুশ্চেভকেও যদি কখনো বাতিল করতে হয়? তখন এ-লাইনটাকে কীভাবে পড়ব আমরা? বাতিল হয়ে যাবে তো লাইনটাও?'

উত্তর দিলেন না তিনি। একটু পরে চলে গেলেন অন্য কথায়। নিজেকে একটু অপ্রস্তুত লাগল।

কিছুদিনের মধ্যে নিজের মতো একটা উত্তর অবশ্য তৈরি করে নিয়েছিলাম। ভেবে নিয়েছিলাম ওই ব্যবহারের সমর্থন। আর, অনেকদিন পর, 'চিঠির দর্পণে'র মধ্যে লিখিত বয়ানে পেয়ে গেলাম সুভাষদারও উত্তর, যেখানে স্তালিনের মৃত্যুকালের বর্ণনার পরে কবিতাটির উল্লেখ করে উনি লিখছেন : 'মূর্তিটা মন-গড়া ছিল ব'লে আমাদের সেদিনের সেই আবেগ আর জীবনের জয়গান তো মিথ্যে হয়ে যায় না।'

আবেগের সেই সত্যটাই কবিতার সত্য। বস্তুসত্য পালটালেও সে-সত্যের চিরকালীনতার কোনো ক্ষয় নেই।

কথা

১৯৬৫ সালের গোড়ার দিকে, ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের বিশাল প্রেক্ষাঘরে উপচে পড়ছে লোক, মঞ্চে অনেক গণ্যমান্য, উইংসের পাশে আড়াল করে দাঁড়ানো সুভাষদা। আজ তাঁর সংবর্ধনা।

'যত দূরেই যাই' বইটির জন্য অকাদেমি পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে কিছুদিন আগে। আহ্লাদ অনেকের, হতবুদ্ধিও অনেকে। হতবুদ্ধি, কেননা একজন কমিউনিস্টকে কি না দেওয়া হচ্ছে এমন প্রাতিষ্ঠানিক সম্মান! এ কি ঠিক হলো? আবার, পুরস্কার নেওয়াটাও কি ঠিক হচ্ছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের? কিন্তু সেসব তর্ক সরিয়ে রেখে আজ আয়োজন হয়েছে এক অভিনন্দনের।

অভিনন্দন একটা প্রথা মাত্র। একটা-দুটো ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে বলা যায়, পুরস্কার ঘোষণার পর পুরস্কৃতকে নিয়ে তাঁর অনুরাগীজনেরা যে সমবেত আনন্দ প্রকাশ করবেন, সেই সূত্রে তাঁদের হৃদয়ের সমর্থন জানাবেন, এ যেন প্রত্যাশিত আর অবধারিত এক সাংস্কৃতিক কর্মসূচি। প্রথাগত সেসব সভা বিশেষ যে স্মরণীয় হয়ে থাকে, এমনও নয়। কিন্তু, সভার ওই পুঞ্জীভূত ভিড় ছাড়াও, ভিন্ন একটা কারণে একে আমি ভুলতে পারিনি কখনোই।

সভায় যাঁরা এসেছেন, বসবার জায়গা না পেয়ে অনুযোগহীনভাবে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন দূরের গাঁও-গঞ্জের মানুষ। যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকে আছেন কারখানার শ্রমিক, কিংবা অন্য কোনো গায়ে-গতরে খেটেখাওয়া গরিব-গুর্বো লোক। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা ভাবছেন এ যেন তাঁদের সম্মিলিত শক্তির কোনো জয়চিহ্ন।

আর মঞ্চে? মঞ্চে গান গাইবেন সুচিত্রা মিত্র বা দেবব্রত বিশ্বাসের মতো মানুষেরা, কথা বলবেন গোপাল হালদার চিন্মোহন সেহানবিশ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়েরা, কবিতা পড়বেন শম্ভু মিত্র।

উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে সবটাই শুনছেন সুভাষদা, বেশ মন দিয়ে। আসাযাওয়ার পথে অনেকে ওঁকে ব্যক্তিগত সম্ভাষণ জানিয়ে যাচ্ছেন, হাসিমুখে শুনছেন সেসব, মানছেন সেসব। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেন এসে শম্ভু মিত্র। সুভাষদার সঙ্গে স্মিত দৃষ্টিবিনিময় করে ঢুকে গেলেন তিনি মঞ্চে। কবিতা পড়বেন এই ঘোষণায় বিপুল করতালিতে ভরে গেল প্রেক্ষাঘর।

শম্ভু মিত্র তখন খ্যাতির পরমতায়। 'রাজা' বা 'রাজা অয়দিপাউস'-এ অভিনয় সম্পন্ন ততদিনে। আর, কবিতা-আবৃত্তির জনপ্রিয়তাতেও তখন চূড়ান্ত তাঁর অবস্থান। 'মধুবংশীর গলি'র ভরাট আর খেলানো গলায় তিনি আবেগভরে শোনালেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তিন-তিনটি কবিতা। আরো একবার করতালির মধ্য দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন মঞ্চ থেকে। আর তার ঠিক পরেই, সুভাষদার একেবারে মুখোমুখি।

সভাটি যে আমার বিশেষভাবে মনে থেকে গিয়েছে, তা কেবল ওঁদের এই মুখোমুখি দাঁড়াবার অভিজ্ঞতাটার জন্য। এক লহমা চুপ করে আছেন শম্ভু মিত্র, হয়তো সুভাষদার

পক্ষ থেকে কোনো মন্তব্যের প্রতীক্ষা করছেন। কিন্তু কিছুই উনি বলছেন না দেখে আত্মপ্রত্যয়ে গরীয়ান ভাবে জিজ্ঞেস করলেন : 'কী সুভাষ, ঠিক পড়েছি তো?' আর তার উত্তরে, শিশুর সরলতা মুখে নিয়ে বিমল হাসিতে সুভাষদা বললেন : 'ঠিকই আছে, তবে ওগুলো আমি নিজে পড়লে বোধহয় আরেকটু ভালো হতো।' স্তম্ভিত বিস্ময়ে বড়ো বড়ো চোখে তাকিয়ে 'ও, তাই বুঝি' বলে শম্ভু মিত্র চলে গেলেন শমীককে নিয়ে, আর প্রস্থানপথের দিকে তাকিয়ে সুভাষদা আরেকবার হাসলেন।

'এইভাবে বললেন আপনি?' আমি জিজ্ঞেস করি।

'কেন? বলাটা ঠিক হলো না? না না, উনি তো খুবই ভালো আবৃত্তি করেন। কিন্তু কী জানো, আমি তো কবিতাগুলি ঠিক ওইভাবে লিখিনি—এমনি এমনি পড়ে গেলেই তো হয়। কথাবার্তাই তো এগুলি।'

সভাটি আমার মনে থেকে গেছে সুভাষদার এই শান্ত অনায়াস প্রতিক্রিয়ার জন্য। তাঁর নিজের কবিতার একটা চরিত্রলক্ষণই সরাসরি এইভাবে জানাতে চেয়েছিলেন বোধহয়। তাঁর প্রিয় কবি নাজিম হিকমত লিখেছিলেন : 'কবিতার, গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন—যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর, একান্ত জটিল—অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা।' আর সুভাষদা লিখেছেন : 'মুখের ভাষায় যে জাদু থাকে, সেটা কবিতায় উঠিয়ে আনতে হবে। শব্দে ফোটে সুরেলা ছবি। বেশি কথাকে কম কথায় আঁটানো, কথায় রং ফলানো, নিরাকারকে আকার দেওয়া, কথায় কথা জুড়ে মানুষকে নিশানা দেখানো—লোকমুখের ভাষার ধর্মই তো এই।'

এই ধর্মের জন্যই, কবিতাপড়াটাও ভিন্নরকম হবে, জাঁকালো আবৃত্তির থেকে বহুদূরবর্তী সেটা—তা বেশ বোঝা যায়। প্রথম পরিচয়ের অল্পদিন পরে ময়দানের এক জনসভায় সুভাষদার মুখে 'অগ্নিকোণ' শুনে উদাত্ততার অভাবে বেশ হতাশ হয়েছিলাম মনে পড়ে। বুঝতে পারছি, কবিতাপড়া বিষয়ে সেদিন আমার প্রত্যাশাতেই ছিল ভুল, কেননা সুভাষদার কবিতা তো শুধু কথাই।

কাহিনী

পথ চলতে চলতে প্রায়ই বলতেন : 'জানো, অনেকদিন ধরে ভাবছি একটা উপন্যাস লিখলে কেমন হয়।'

'উপন্যাস? আপনি লিখবেন? সে তো দারুণ হয়।'

'কিন্তু আমি বোধহয় পারব না।'

'বাঃ, পারবেন না কেন? আপনার এই-যে এত ঘুরে-বেড়ানো, এই-যে পার্টির এত অভিজ্ঞতা, এ থেকে তো কত কিছুই হতে পারে।'

'সে তো রিপোর্টাজ হয়। উপন্যাস কি হয়?'

'উপন্যাসের কি ধরাবাঁধা কোনো হওয়া আছে না কি?'

'নেই? তোমরা আবার বলবে না তো—লেখাটা ভালোই, তবে ঠিক উপন্যাস হয়নি?'

'বললেই বা আপনি শুনবেন কেন?'

কয়েকদিন পর আবারও জিজ্ঞেস করি : 'উপন্যাসের কথা ভাবলেন আর কিছু? কবে শুরু করবেন?'

'নাঃ, ওটা আমার হবে না।'

'কেন, হবে না কেন?'

'দেখো, অনেক ভেবে দেখলাম, একটা ব্যাপার আমার ভালো জানা নেই।'

'সে আবার কী?'

'ওই-যে থাকে না? উপন্যাসে মেয়েপুরুষের একটা ব্যাপার থাকে না? ওটা মনে হয় আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'এর মধ্যে আবার বোঝার কী আছে? আর না-ই যদি বোঝেন তো লিখবেন না সেটা। তা বলে উপন্যাস কেন হবে না?'

'নাঃ, থাক।'

এসব কথাবার্তার প্রায় দু-বছর পর, ১৯৭২ সাল সেটা, একদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন : 'তোমার খানিকটা সময় হবে? একটা লেখা শোনাব।'

'লেখা? কবে? কখন?'

'কখন সময় হবে বলো। অনেকটা লম্বা সময় কিন্তু। দুপুর থেকে বসতে পারলে ভালো হয়।'

'বড়ো লেখা?'

একটু লাজুক হেসে বললেন : 'উপন্যাসটা লিখে ফেলেছি। তবে, কেউ পড়বে কি না বুঝতে পারছি না।'

'হয়ে গেছে লেখা? কী কাণ্ড! কবে শুনব? কবে শোনাবেন?'

দিনক্ষণ ঠিক হলো। আজ পঞ্চাশ বছর ধরে যে-বাড়িটির সঙ্গে আমাদের অনেকের ঘন পরিচয়, তার মধ্যবর্তী একটা ঘরের গোল টেবিলের পাশে দুখানা চেয়ার নিয়ে লেখক আর পাঠক, না, কথক আর শ্রোতা। মধ্যদুপুরে এসে পৌঁছেছি, সুভাষদা পড়ে চলেছেন, মাঝে মাঝে হেঁকে বলছেন 'গীতা, চা', মাঝে মাঝে থমকে গিয়ে বলছেন 'পড়ব আর? একটু একঘেয়ে লাগছে, না?' থামতে দিতে রাজি হই না আমি, সুভাষদার পড়ার সূত্র ধরে ফিরে গেছি বাইশচব্বিশ বছরের পুরোনো দিনগুলিতে, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভিতরকার ছবিতে, যা দিয়ে তৈরি উপন্যাসটির কাহিনী। মুখে যে দ্বিধার কথাটা বলতেন, উপন্যাসের মধ্যেই দেখতে পাই সেটা : 'আমার অনেকদিনের শখ একটা উপন্যাস লেখার। কিন্তু আমি মনে মনে জানি আমাকে দিয়ে হবে না। আসলে আমি হচ্ছি হাড়ে হাড়ে সাংবাদিক।' এমনকী সেই মেয়েপুরুষের সম্পর্ক নিয়েও তাঁর সেই সংকোচের কথাটা : 'মানুষ জাতের অর্ধেক যে স্ত্রীলোক এবং মনুষ্যজীবনের অর্ধেক যে দেহমনের মিলন, তার তুমি খবর রাখ না। মানুষের যেটা তুমি জান, সেটা অর্ধসত্য।' তবে কি আমার কাছে দ্বিধার কথাটা যখন বলছিলেন, সমান্তরালে তখনই লিখছিলেন এই কথাগুলি?

একদিনে শেষ হয় না পড়া। সন্ধের দিকে জরুরি একটা কাজের তাড়ায় উপন্যাসের অর্ধপথে উঠতেই হয় আমাকে পরের দিনের ভরসায়, সুভাষদা সন্দেহ করেন হয়তো-বা আমার ভালো লাগছে না বলেই পালাচ্ছি। পরের দিন শেষ হলো সেই উপন্যাসের পাঠ, সে-উপন্যাসের নাম হয়েছে 'হাংরাস', যে-উপন্যাস পরের বছরেই বই হয়ে বেরোল সকলের জন্য। পড়া শেষ করে আধা-অন্ধকার ঘরের মধ্যে যখন শুনলেন আমার কাছে এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা হয়ে এল এটা, নিছক আমার মতো এক পাঠকেরও সেই প্রতিক্রিয়া শুনে খুশি হয়ে উঠলেন সুভাষদা, বললেন 'এই-যে গীতা, শুনে যাও, শঙ্খর ভালো লেগেছে।' 'কী বলছে শঙ্খ?' জিজ্ঞেস করেন গীতাদি। 'বলছে এর মধ্যে আলাদা স্বাদ পাচ্ছে। এই প্রথম না কি একটা মুসলিম পরিসরও এভাবে ফুটছে আমাদের লেখায়।'

ঠিকই তাই। অনেক কিছুই নতুন। তবু বিশেষ করে মনে হয়, বাদশার ওই কাহিনীর মধ্য দিয়ে যেভাবে একটা অঞ্চল তৈরি হয়ে উঠল এ-উপন্যাসে, সেটা আমার কাছে বড়ো একটা আকর্ষণ। সেইসঙ্গে আরো একটা অভাবের পূরণ হলো এই লেখায়। কীভাবে একজন সাধারণ মানুষ নিজেরই গরজে নিজেদের বাঁচার তাড়নায় সত্যি সত্যি কমিউনিস্ট হয়ে ওঠে, কোথা থেকে কোথায় পৌঁছয়, তারও তো একটা দলিল এটা। মধ্যবিত্ত জীবনের ছকটার বাইরে সেই দলিলটারও তো খুব দরকার ছিল আমাদের।

'পড়বে লোকে?'

'পড়বে না? বলেন কী!'

কতদূর পড়েছে লোকে, তা অবশ্য জানি না ঠিক। এইটুকু শুধু জানি—পরে জেনেছি—যে, যতই দ্বিধার কথা বলুন না সুভাষদা, এই লেখাটির অন্তর্গত কাহিনীকে মনে মনে তিনি লালন করেছেন অতিদীর্ঘকাল। এমনকী 'হাংরাস' নামসুদ্ধই এ-পরিকল্পনার কথা আজ আমরা জানতে পাই 'চিঠির দর্পণে'র পাতাগুলি থেকে। ১৯৫২ সালে ২১ সেপ্টেম্বর তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র লিখছেন সামনের কয়েকদিনে কী কী তাঁর করে ফেলা দরকার : 'বাংলা কবিতা সংকলনের পরিকল্পনাটা এই কটা দিনে সত্যি সত্যি করে ফেলা উচিত। "হাংরাস" উপন্যাসের শেষ কাঠামোও ঠিকঠাক করা প্রয়োজন।' ১৯৫২? ১৯৫২ সালেই তবে একটা কাঠামোর কথা ভেবে চলেছিলেন সুভাষদা, যার শেষ রূপায়ণ হতে পারল ঠিক কুড়ি বছর পর ১৯৭২ সালে? পার্টির বিষয়ে যে-প্রশ্ন যে-সমালোচনা 'হাংরাস'-এর মধ্যে থেকে-থেকেই দেখতে পাওয়া যায়, কুড়ি বছর আগেই তার চিহ্নগুলি কি থেকে গিয়েছিল তবে? 'বরুণবাবুর মতের সঙ্গে (সাহিত্য হল সাহিত্য, তার আবার উদ্দেশ্য কী?) আমার মত মেলে না। আবার যারা তাঁর সামনে আঙুল নেড়ে বলে সাহিত্য মানেই উদ্দেশ্য প্রচার—তাদের সঙ্গেও ঠিক সায় দিতে পারি না' কিংবা 'আমাদের পার্টিতে যারা গল্প লেখে তাদেরও তাই ঘাড় গুঁজে লিখে যেতে হয় কেবল বীর বিপ্লবী আর সাধুসচ্চরিত্রদেরই কথা'—১৯৭২-এর উপন্যাসের এসব কথার সঙ্গে সহজেই মিলিয়ে নেওয়া যায় তাঁর ১৯৫৩ সালের কথা : 'আমরা এতদিন যে আবেগে লিখে এসেছি, তাতে থেকেছে শুধু সংগ্রামের ডাক আর চড়া গলার

দাবি। সব বড় বেশি টান-টান, বড় বেশি ধরা-বাঁধা।...সব সময় আমরা মুখ গোমড়া করে আছি, সবই কেমন এক-রঙা।[৪] কথাটা বুঝি অনেকদিন পর কবিতায় এল এইভাবে:

আমি তো আর ফটোয় তোলা ছবি নই
যে,
সারাক্ষণ হাসতেই থাকব!

আমার মুখে তো চোঙ লাগানো নেই
যে,
সারাক্ষণ গাঁক গাঁক করব!

আমার তো হাতে কুষ্ঠ হয়নি
যে,
সারাক্ষণ হাত মুঠো করে রাখব!

এই আবদ্ধতা থেকে মুক্তির কাহিনীই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা। মনে পড়ে, 'হাংরাস'-এর শেষে ছিল : 'আমাদের শরীরের আর মনের অনেক খিল এখনও খোলা হয়নি। কোনো খিল দিয়ে আটকে রেখেছি বেরিয়ে যাবার দরজা, কোনোটাতে আটকানো বাইরে চোখ মেলার জানলা। আমি বোধহয় নেহাত আকস্মিকভাবে তেমনি কোনো খিল খুলে জানতে পেরেছিলাম—কাল, হ্যাঁ, কাল—অনশন ভাঙবার দিনটাতেই আমার জন্মদিন ছিল।'

নানারকম ভাবে ওই খিল খোলাটাই তো কবিতার কাজ। ওই জন্মদিনে পৌঁছনোটা।

আমার এ গল্পের নায়ক

অলোক রায়

হাংরাস (১৯৭৩) প্রকাশের পর একটু চমক লেগেছিল। মনে হয়েছিল 'ম্যাজিক-দেখানেওয়ালা এক হেকিমের ঝুলি থেকে কত কী বেরোচ্ছে।' রিপোর্টাজ, ভ্রমণকাহিনী, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক রচনা আগেই পেয়েছি, অনূদিত উপন্যাসও। এবার পাওয়া গেল মৌলিক উপন্যাস, অবশ্য কবিতাতেই সে উপন্যাসের 'মূল' পেয়েছি আগে—

দাঁতে দাঁত দিয়ে সব বসে থাকা
কিছুতে না-খাওয়া,
সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বারান্দায় জল ঢেলে রাখা
টিয়ার গ্যাসের জন্যে, সারা রাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি—
তবু কী আনন্দে, ভাবো
কেটেছিল জীবনের সেই দিনগুলি।
বলতে বলতে জল আসে আমাদের দুজনেরই চোখে।
মুখগুলো ভেসে ওঠে; মনে পড়ে
প্রভাত-মুকুল-সুমথকে। (*জেলখানার গল্প*)

এই কবিতারই শেষ লাইন—'নিজেদের জালে বন্দী; নিজেদেরই তৈরি-করা জেলে।' সম্ভবত এর মধ্যে লুকিয়ে আছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরে লেখা চারটি উপন্যাসের বীজ। *হাংরাস* উপন্যাসের রুশ-অনুবাদের (১৯৭৭) ভূমিকায় সুভাষ লিখেছিলেন, "দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেকবার ভেবেছি একটি উপন্যাসে সেই সময়টাকে ধরে রাখব। সেটাই হবে আমার প্রথম উপন্যাস। আমার সামনে তখন নিজের অভিজ্ঞতা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ করে তোলার কঠিন পরীক্ষা। বহুবার উপন্যাসটি লেখা শুরু করতে গিয়েও অবধারিতভাবে পিছিয়ে এসেছি, মনে হয়েছে সার্থক উপন্যাস লেখার চাবিকাঠি আমার হাতে নেই।" তারপর বাইশ বছর প্রতীক্ষার পর উপন্যাস লেখা হল (১৯৭২), বিশেষ একটি উদ্দেশ্য মনে রেখে। শুধু *হাংরাস* নয়, সুভাষের সবগুলি উপন্যাসেই ঘুরে ফিরে এসেছে কমিউনিস্ট আন্দোলনের যুগচিত্র, পার্টি-ভাগের মর্মবেদনা এবং সেই তাগিদ "যাতে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অতীত থেকে শিক্ষা নিতে পারে।" কবিতায় যখন আমরা এরকম লাইন পাই—'গল্পটা অনেকক্ষণ থেকেই বলব বলব করছি', তখন হয়তো মনে থাকে না, সুভাষের কবিতা তাঁর উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি। আর কবিতা বা উপন্যাস, গল্প বা রিপোর্টাজ সব কিছুর মধ্যে আছেন সুভাষ, হয়তো কিছুটা প্রচ্ছন্নভাবে, কারণ সব গল্পেরই নায়ক একজন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কোনও সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, "নিজেকে ঔপন্যাসিক বলি না, কারণ বানিয়ে লিখতে পারি না। আমার উপন্যাস কতখানি উপন্যাস হয়ে উঠেছে, সে বিষয়েও আমার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। উপন্যাসের একটা সুবিধে হল, অনেক কথা বলা যায়, খুব

বেশি আঁটসাট না হলেও চলে। কিন্তু লেখার ব্যাপারটা একটু অন্যরকম।" (দ্র. গ্রন্থপরিচয়, *সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্যসংগ্রহ* ২)। অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে তিনি উপন্যাস লেখেন, এ কথা মানতে বাধা নেই। তবে কাহিনী রচনা করতে হলে কিছুটা বানাতে হবে, খড়ের কাঠামোর উপর মাটি দিয়ে গড়তে হয় প্রতিমা। কবিতায় সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়, যেমন 'মেজাজ' কবিতায় "থলির ভেতর হাত ঢেকে/শাশুড়ি বিড় বিড় করে মালা জপছেন;/বউ/গটগট গটগট করে হেঁটে গেল।" শাশুড়ি-বউয়ের চরিত্রের বাস্তব-ভিত্তি থাকা সম্ভব, তারপর বউয়ের সন্তান-সম্ভাবনাও কাহিনীসূত্র অনুসরণে স্বাভাবিক। কবিতার শেষে কিন্তু ছোটগল্পের চমক— "ওমা, বউমা বেশ ডগমগ হয়ে বলছে :/কী নাম দেবো, জানো?/আফ্রিকা—/কালো মানুষেরা কী কাণ্ডই না করছে সেখানে।" উপন্যাসে আর একটু বেশি সংযোজনের দরকার হয়, কারণ শুধু তার বিস্তার বা শিথিল-গঠন নয়, সেখানে অনেক কথা বলতে হয়, যার কিছুটা অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া, কিছুটা বানানো। যে-কোনও সাহিত্যকর্মের মধ্যে নির্মাণ ও সৃষ্টি লক্ষ করা যাবে। উপন্যাসের গঠন গত দুশো বছরের মধ্যে এতটাই পরিবর্তিত হয়েছে যে কাকে উপন্যাস বলব, আর কাকে উপন্যাস বলব না, তা আজ সুনিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পাঁচটি উপন্যাসের গঠন পাঁচরকম বললে ভুল হবে না। খুব সচেতনভাবে তিনি উপন্যাসের শিল্পরূপ নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করেছেন। *হাংরাসে* রোজনামচার আদল আছে, *অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ* (১৯৮৩) অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি-প্রেরিত ইংরেজি পাণ্ডুলিপির ভাষান্তর, *কাঁচাপাকাও* (১৯৮৯) যেন অন্যের লেখা পাণ্ডুলিপির সংশোধিত/পরিবর্তিত রূপ, *কে কোথায় যায়* (১৯৭৬) প্রচলিত উপন্যাস-রীতি অনুসরণে কাহিনী গ্রন্থন। কল্পিত লেখকের পাণ্ডুলিপি উদ্ধার এবং তার মুদ্রণের দায়িত্ব গ্রহণ—আঠারো-উনিশ শতকে বিলিতি উপন্যাসে দেখা গেছে। এখানে দ্বৈত-লেখকের কথা ভাবা যায়, কারণ মূল লেখকের তৈরি খড়ের কাঠামোতে মাটি আর রঙ জুড়ে দ্বিতীয় লেখক যে সুন্দর মূর্তি গড়েছেন (ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়) তার একটা নিজস্ব শিল্পরূপ আছে (যেমন, "পরের কথা বলতে গিয়ে অবরে-সবরে যদি নিজের কথা বলার একান্তই কোনো দরকার হয় সেটা আমি নিজের জবানিতেই আলাদাভাবে বলব।") অনুবাদের ক্ষেত্রে সুভাষ যে-সমস্যার কথা বলেছেন, তা আসলে উৎস থেকে মোহানায় পৌঁছনোর সমস্যা। যাকে আমরা বলি বাস্তব বা অভিজ্ঞতা, তা যখন উপন্যাসের অবয়ব লাভ করে, তখন তার মধ্যে একটা বড়ো রকমের পরিবর্তন ঘটে—"সত্যি বলতে কী, এ-বইয়ের অনুবাদক না হয়ে আমি যদি ভূতুড়ে লেখক হতে পারতাম, তাহলে আমি যে কী খুশি হতাম বলার নয়। কিন্তু সেটা সম্ভব হত লেখককে যদি আমি আমার নাগালের মধ্যে পেতাম। তার প্রত্যেকটা কথা আমি বাজিয়ে দেখতে পারতাম। যেখানে যে-ফাঁক-আছে, জেরা করে করে তা ভরে নিতে পারতাম। কিন্তু তাতেও কি আমার মুশকিলের সম্পূর্ণ আসান হত? একই রেখায় দাঁড়িয়েও আমরা প্রত্যেকেই আলাদা আলাদা একটা বিন্দু। হাজার চেষ্টা করলেও হুবহু এক হওয়া যায় না। বড়জোর খুব কাছাকাছি কোনো সমান্তরালে আসা যায়। এখানে আমাকে অনুসরণ করতে হচ্ছে এমন একজনকে, হাত বাড়িয়েও যাকে আমি ঠিক ধরতে ছুঁতে পারছি না। আমাকে এগোতে হচ্ছে অন্ধকারে

ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে। এমন এক অনিচ্ছাকৃত দায়ে আমি জড়িয়ে পড়েছি শেষ না করে যা থেকে আমার নিষ্কৃতি নেই।" *(অন্তরীপ)*। অন্যের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে তো কথাই নেই, এমনকি নিজের অভিজ্ঞতাকেও পুরোপুরি ধরা যায় না।

কে কোথায় যায় উপেনবাবুর কাহিনী। উপেনবাবুর কাহিনীর মধ্যে লেখকের অভিজ্ঞতার প্রক্ষেপ ঘটতেই পারে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সবগুলি উপন্যাসের নায়ক চরিত্রের মধ্যে কোথাও একটা মিল আছে, উপেনবাবুকে "বাইরে থেকে যতটা গোবেচারা বলে মনে হয়, আসলে তিনি তা নন। ভেতরে ভেতরে বেজায় ঢ্যাঁটা। মুখ হাসি হাসি করে আগাগোড়া তিনি শোনার ভান করে গেলেন।" উপেনবাবু এম. পি. নন, এম. এল. এ. নন—উচ্চপদস্থ নেতা-টেতা হলেও বা কথা ছিল। নিতান্তই ঝাণ্ডা-বওয়া লোক। তাও মফস্বলে। পার্টি-অন্ত প্রাণ, তাঁর কাছে পার্টির টান নাড়ির টানের চেয়েও বেশি। তবে শহরের পার্টি-অফিসে এসে তিনি স্বস্তি বোধ করেন না, শহরের কমরেডরা যেন কেমন,—নিজেকে নিয়ে সকলে ব্যস্ত। দীর্ঘ কারাবাসের পর উপেনবাবু তেত্রিশ বছর ডুয়ার্সে চা-বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে কাজ করেছে, নিজে কিছু পাওয়ার জন্য নয়। আজ অসুস্থ হয়ে পড়ায় পার্টি তাঁকে চিকিৎসার জন্য সোভিয়েট রাশিয়ায় পাঠাচ্ছে। উপেনবাবু নিজের শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত নন, তাঁর একমাত্র ভাবনা জীবন-শেষে তীর্থদর্শন। শরীর ভেঙেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার থেকে বেশি ভেঙেছে মন। একদা এক কমিউনে এক ডেনে নুন-ভাত খেয়ে দিনের পর দিন কেটেছে যার সঙ্গে, সেই যদুবাবু আজ দল ভাঙার পর এম. পি। ঘা এখনও শুকোয়নি, সেটা বোঝা গেল যদুবাবুর উক্তিতে, "আপনারা কি দল বেঁধে দীক্ষা নিতে শুরু করেছেন নাকি?" উপেনবাবুর প্রত্যুত্তরে শ্লেষের সঙ্গে যন্ত্রণাও প্রকাশ পেয়েছে, "দল বেঁধে দীক্ষা নেব কেন? দীক্ষা নিয়ে দল বেঁধেছিলাম। দীক্ষা নিয়েও সবাই কি আর ভক্তিনিষ্ঠা রাখতে পারল। না পেরে তখন ভেঙে বেরিয়ে গেল। তাতেও শেষ হল না। শেষে নিজেরাই ভেঙে চৌচির হল।" বোঝা যায় বিশ শতকের সাতের দশকের মধ্যভাগে নকশাল-আন্দোলনের পটভূমিতে কে কোথায় যায়, তার সন্ধান করছেন সুভাষ। উপেনবাবু এর মধ্যে নিশ্চয় ব্যতিক্রমী চরিত্র—"উপেনদা রাজনীতিতে বরাবরই কাঁচা। পাবলিক মিটিঙে বক্তৃতা দেওয়া দূরের কথা, পার্টি ক্লাস নেওয়ার ভারও ওঁকে ঠিক দেওয়া যেত না। ফলে, যেখানে ছিলেন সেখানেই থেকে গেলেন। পার্টিতে বাড়লেন না।" অবশ্য এ সব কথা যদুবাবুর মনের কথা, কিন্তু খুব ভুল এমন বলা যায় না—"তাছাড়া কোনোরকম প্যাঁচ পয়জারের মধ্যে থাকবেন না। ওতে কি হয়? রাজনীতি তো ধুনি জ্বালানোর জায়গা নয়, খেলার মাঠও নয়। তার আসল ব্যাপারই হল ক্ষমতা। শুধু পথ চলাই যথেষ্ট নয়। পথ কাটার ক্ষমতা চাই।" উপেনবাবু সারা জীবন 'রাজনীতি' করেছেন, যদিও তাকে এখন আর আমরা রাজনীতি বলি না। পরোপকার আর বিপ্লব এক নয়, এই কথাটা তাঁর মাথায় ঢোকে না। তাঁর আত্মসমালোচনা হল এই রকম—"বড় বড় কথা মুখে বলি, ছোট ছোট কাজগুলোও নিজেরা করতে ভুলে যাই। আসলে এর পেছনে রয়েছে আত্মপর-ভেদ। এটা আমার, ওটা আমার নয়। এক সময়ে সমাজে আমি-তুমির ভেদ ছিল না। সবাইকে নিয়ে ছিল একটা বড় যূথবদ্ধ আমরা। মানুষে মানুষে তফাৎ তার পরে এল। এর আছে ওর নেই—এইভাবে।"

কে কোথায় যায় উপন্যাসকে আগে বলেছি উপেনবাবুর কাহিনী। ট্রেনে উপেনবাবুর দিল্লি-যাত্রা, ট্রেনে সেই রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু এর মধ্যেই ঘটে গেছে এক অলৌকিক ঘটনা। একই ট্রেনে সহযাত্রী সদ্য-বিবাহিত একদা-নকশাল সহদেব সরকার আর আত্মপরিচয়সন্ধানী তাতিয়া সোম। সহদেবের সমস্যা, কোলন-বেতারে সংবাদ-ভাষ্যকার হিসেবে তার কাজ 'সোভিয়েত আর তার সাঙাত দেশগুলোর মুণ্ডপাত করা'। সোভিয়েতবিরোধী যে-তথ্যগুলো সহদেব সবান্ধবে লোফালুফি করত, এখন সে চাক্ষুষ দেখতে পাচ্ছে সেগুলো কোন্ কারখানায় তৈরি। অন্যদিকে পূর্বজার্মানির উপরও আস্থা রাখতে পারছে না (দুই জার্মানির মিলন তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে)। সহদেবের সমস্যা রাজনৈতিক দলের অভিজ্ঞতা তার যথেষ্ট আছে, কিন্তু সেখানে পথ খুঁজে পাচ্ছে না। এখন একটা স্কুল-মাস্টারি পেলেই খুশি। সহদেব রাজনীতি নিয়ে আলোচনা, পারলে তর্ক করতে চায় উপেনবাবুর সঙ্গে। কিন্তু "সহদেব উপেনদার মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। একেবারে অপাপবিদ্ধ এক শিশুর মুখ। মহাযোগীর মতো নিরাসক্ত।" ফলে তর্ক জমে না। উপেনবাবু 'ভয়' কাকে বলে জানেন, কিন্তু তিনি ভালোবাসেন বলেই তাঁর মনে ভয় নেই। তিনি সোজাসুজি সহদেব তাতিয়াকে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে আহ্বান জানান,—

> না সহদেব—আমি শুধু চা-বাগান বলে বলছি না। কোলিয়ারিতে যাও, গ্রামে যাও, চটকলে যাও। সব জায়গায় এক ছবি। নতুন ছেলেমেয়ে আসছে কই?
>
> বুড়োদের দোষ নেই আমি বলছি না। কিন্তু তোমরাও একটু নিজেদের দিকে তাকাও। আমরা দূরের চেয়ে কাছেরটা কম দেখব, পোড়-খাওয়াদের চেয়ে অর্বাচীনদের ওপর কম ভরসা করব, সাহস করে ছেড়ে দেওয়ার বদলে সতর্ক হয়ে টেনে ধরব—এ তো বয়সেরই ধর্ম। তোমাদের বাড়তিটা দিয়ে আমাদের ঘাটতিটা পূরণ করো। ব্যস, তাহলেই তো কাজ ফতে হয়।"

এ পর্যন্ত বোঝা যায়। এমনকি উপেনবাবুর 'স্বদেশি' করতে আসার প্রেক্ষাপট আমাদের কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়। কিন্তু শিকলিসুদ্ধ উড়ে যাওয়া টিয়াপাখির সন্ধানে বেরিয়ে, দেশ ও মানুষ, বন্ধন ও মুক্তিকে চেনা সহজ ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন—দেশটা নিখুঁত না হলেও মায়ের দোষের মতো সেই দেশের দোষকে বড় করে দেখতে পারেন না তিনি। তাঁর মুখে আরও শুনি—"ভুল, ভুল, এই বলে তোমরা এত চেঁচাও কেন? একেবারে নির্ভুল ব্যাপার আমরা যন্ত্রের কাছ থেকে চাই। ঠিক আর ভুল, দোষ আর গুণ মিশিয়ে হবে মানুষ। ভুল না থাকলে কোথায় থাকত উদ্ভাবন? কোথায় থাকত আবিষ্কারের বিস্ময়?" এই বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি নিয়ে উপেনবাবু জগৎ ও জীবনের দিকে তাকিয়েছেন।—"সব যদি আগেভাগে জেনে নেওয়া যায়, বাঁচার আনন্দটাই তাহলে মাটি হয়ে যাবে।" তিন খণ্ড 'ক্যাপিটাল' তেত্রিশ বছরে দ্বিতীয়বার উলটে দেখবার তাঁর সময় হয়নি। হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়ামে এবার তা পড়বার সময় পাবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু সে সময় আর জুটল না। উপেনবাবু ভবিষ্যৎ জানতে চান না, "পুরো জীবনটাই হল ঠ্যাক ফেলে বেড়ানোর মতো একটা ব্যাপার। কথাটা ঠিক বললাম কি না জানি না। মানে, আমি বলতে চাই—লাগিয়ে দেখা। লেগে গেল ভালো। না হলে আবার চেষ্টা করা।"

কথাগুলো সহদেব আর তাতিয়ার মনে লেগেছে। দুজনের সমস্যা দু'রকম। সহদেব সত্তরের ঝোড়ো দিনগুলিতে দাবানলে জ্বলেছে, কিন্তু পুড়ে মরেনি, মা আর দাদা তাকে জেল-হাজত থেকে খালাস করে বিদেশে পাঠিয়ে দেয়। দেশে থাকতে বাংলায় হামেশাই যে সব কথা সে মুখে উচ্চারণ করত, বিদেশে সেইসব কথাই ইংরেজি হ্যান্ডআউট থেকে বাংলায় তর্জমা করা আর রেডিওতে বলা, খুবই আপত্তিকর ঠেকল। "রেডিওর এই ভাড়াখাটা কাজটাই তার এতদিনকার সযত্নে লালিত অনেক ধারণার ভিত টলিয়ে দিচ্ছে।" পশ্চিম জার্মানিতে ফেরার পথে উপেনবাবুর সঙ্গে ট্রেনে দেখা, আর তার ফলে সহদেব কোথায় যেতে চায়, কোথায় যাবে, তা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে—"তত্ত্বের চেয়েও ঢের বড় জিনিস হল জীবন। উপেনকে দেখো, যতক্ষণ আমরা পাড়ে দাঁড়িয়ে হিসেব করব, উনি তার মধ্যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে হয় ডুবন্তকে তুলবেন নয় মরবেন। আমাদের হিসেব আর উপেনদার টান। হিসেবের মধ্যে নিজেরটা ধরা থাকে, টানের মধ্যে থাকে ছেড়ে দেওয়া।" তাতিয়াকে বিয়ে করার সময়ও সব ব্যাপারটা ছিল খেলা। তারপর তাতিয়ার পারিবারিক জীবনের ইতিহাস, জন্মের কলঙ্ক, অসহায়তাবোধ, সেই সঙ্গে উপেনদার আহ্বান, সব মিলিয়ে সহদেবের 'বদল' সম্ভব হয়েছে, "মানুষ যেমন প্রকৃতিকে বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বদলায়, সেইভাবে।" তাতিয়া জন্ম থেকে ভালোবাসা পায়নি, পেয়েছে ভয়। "কিন্তু আমার সব গোলমাল করে দিয়েছে ঐ বুড়ো। কেন জানি না, উপেনদাকে দেখে আমার মধ্যে কী যেন একটা ঘটে গেল। তুমি হাসবে। কিন্তু সত্যিই একটা পলকে প্রণয়ের মতো ব্যাপার। অমন করে এ-পর্যন্ত আমি কারো ভেতর দেখতে পাইনি। তুমি আমি আমরা সবাই নিজেদের ঢেকে রেখেছি। নইলে যে ফাঁস হয়ে যাব। এই একজন লোক দেখলাম যার ভয় নেই। ভয় নেই বলেই ভালোবাসা আছে। কাকুতিমিনতি নেই তার ভালোবাসায় আছে জোর। সেই জোরেই পৃথিবীকে সে বদলাতে চাইছে।" উপেনবাবুর অল্পক্ষণের সান্নিধ্যে তাতিয়ার নবজন্ম হয়েছে। সহদেব ও তাতিয়া দুজনেই নতুনভাবে ভাবতে শুরু করেছে, "রাগের মাথায় কিছু না করে, ঠাণ্ডা মাথায় সময় নিয়ে লেগে থেকে কিছু করা যায় না?" ইউরোপ যাওয়া আর তাদের হল না, তার দরকারও নেই। তারা আবার ফিরে যাবে, দেশের কাজে লাগবে।

এর মধ্যে ট্রেনের কন্‌ডাক্টর-গার্ড গিরিজা বা ঢ্যাঙা গির্জার তেমন কোনও প্রয়োজন ছিল না, গোড়াতে তাই মনে হয়। কাহিনীর বাস্তব পটভূমিকে প্রত্যক্ষবৎ করে তোলার জন্য বুঝি ঢ্যাঙা গির্জার অবতারণা। ফার্স্টক্লাস কম্পার্টমেন্টের প্রত্যেকটি কামরার মানুষজনকে তার দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে। বেশ কয়েকটি ছোটগল্পের আভাস মেলে তার মধ্যে। কিন্তু ঢ্যাঙা গির্জা নিজেই একটা ছোটগল্প, সেটা বোঝা যায় দশম পরিচ্ছেদে এসে। জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের তিনটি স্বতন্ত্র দৃশ্য পরপর সাজানো হয়েছে। আর তা থেকে যে সিদ্ধান্তবাক্যটি সবশেষে উপস্থিত করা হয়—"ঢ্যাঙা গির্জার কাছে মানুষের ভয় আর সাহসের ব্যাপারটা বরাবরই খুব অদ্ভুত ঠেকে", তা উপন্যাসের মূল বক্তব্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে। উপেনবাবুর সঙ্গে ঢ্যাঙা গির্জার সেভাবে কোনও পরিচয় হয়নি সত্য, কিন্তু মত্যুর উৎপত্তি নিয়ে যে-গল্পটি সে শুনিয়েছে, তা হয়তো উপেনবাবুরও জানা ছিল। অন্তত উপেনবাবুর

মৃত্যুর পটভূমি রচনায় গল্পটি সহায়তা করেছে।

উপেনবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে চ্যাংমুড়ির মৃত্যু নিশ্চয় তুলনীয় নয়। *কে কোথায় যায়* আর *অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ* একেবারে ভিন্ন ধরনের উপন্যাস। *অন্তরীপ* সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গলায় এক অজ্ঞাত-পরিচয় লেখকের কথা—"লেখকের নিজের গলা আপনারা শুনতে পাচ্ছেন না। আপনারা বাংলায় শুনবেন শুধু দোভাষীর কণ্ঠস্বর। তাকেই লেখকের কণ্ঠস্বর বলে ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।" অন্যদিকে "নামের ব্যাপারে লেখকের মনোভাবটা একটু অদ্ভুত। লেখক তাঁর নিজের নাম তো চেপে গেছেনই, এমনকি যাদের নিয়ে লিখেছেন তাদের কারো নাম তিনি প্রকাশ করেননি।" উপন্যাসের ঘটনাস্থল তালবেতালিয়া বা নবজীবনগড় ঠিক কোথায় অবস্থিত তা আমরা জানি না। আমরা শুধু জানি কুষ্ঠরোগমুক্ত কিন্তু বিকৃত-অঙ্গ কিছু নরনারী শহরের বাইরে পোড়ো ডাঙা জমিটাতে পাতার ছাউনি বানিয়ে আশ্রয় নিয়েছে—'সেরে যাওয়া কুষ্ঠরোগীদের গাঁ'। কিন্তু সেরে গেলেও সমাজ তাদের গ্রহণ করেনি, সমাজের বাইরে তারা নিজেদের সমাজ গড়ে নিয়েছে,—"বাইরের জগৎটার সঙ্গে আমাদের বনিবনা নেই। মাঝখানে রয়েছে একটা ঘৃণার বেড়া। ওরা আস্ত মানুষ আর আমরা ভাঙাচোরা।" এইভাবে ক্রমশ একটা রূপকের জগৎ গড়ে ওঠে। বিকলাঙ্গ মানুষেরা যেন মূল ভূভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক দ্বীপে বাস করে, অথবা দ্বীপ না বলে 'অন্তরীপ' বলাই ভালো—'মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে আমরা নিজেদের লাগিয়ে রেখেছি। নালাগুলো ওরা এমনভাবে কেটে রেখেছে, যাতে ওদের যত ময়লা জল সব আমাদের দিকেই গড়িয়ে আসে।" অন্তরীপ হয়ে ওঠে ভাঙাচোরা মানুষের কাহিনী। কাহিনীর একটা বাস্তবভিত্তি আছে, সুভাষ বিশ শতকের সাতের দশকের মধ্যভাগে পশ্চিমবাংলার গ্রামেগঞ্জে ভ্রমণের সময়ে বাঁকুড়ার গৌরীপুর কুষ্ঠ-হাসপাতাল ও খেজুরডাঙার আরোগ্যাবাসে যা দেখেছিলেন, যাদের দেখেছিলেন, তাই নিয়ে লেখেন *অন্তরীপ* (*আবার ডাকবাংলার ডাকে* বইতে 'মরাডালে ফুল' আর 'নাম রেখেছি নবজীবনপুর' রচনা দুটিতে উপন্যাসের বীজ মিলতে পারে)। রূপক, কিন্তু রূপকথা নয়। তাই *অন্তরীপ* উপন্যাসের চরিত্রের কোনো নাম না থাকলেও তারা দেহমনের অধিকারী, রক্তমাংসের মানব-মানবী। শহরের মানুষগুলোদের সঙ্গে তাদের তফাৎ আছে, শহরের মানুষের মতো তারা আত্মপর ভেদটাকে ছোটবড় কাছে-দূরে নানান মাপে বাঁধে না। তাদের মধ্যে আছে স্নেহমায়ামমতা, হয়তো কখনও প্রকাশ পায় ক্রোধকামমোহ।—"বাইরের জগৎটার সঙ্গে ভয়তরাসের যে-সম্পর্কটা আমরা পাতিয়ে রেখেছি, তার তলায় তলায় কখন কীভাবে যে ঘৃণার বারুদ জমছে আমরা নিজেরাই তা জানি না।" নিরাশ্রয় অন্ত্যজ অচ্ছুত মানুষজনকে নিয়েই যেন গড়ে উঠেছে অন্তরীপ। উগ্রপন্থী পালিয়ে আসা তিনটি ছেলেকে যখন তারা আশ্রয় দেয়, তখন "ওদের শরীরে যন্ত্রণার ঐ দাগগুলোর জন্যেই আমাদের সারা গাঁয়ের লোকের কাছে ওরা আমাদের একেবারে আপন হয়ে গেল।" সমাজ পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগীদের অথবা শহুরে আত্মকেন্দ্রিক জড়োপাসক মানুষেরা কেউই 'রাজনীতি' করে না। তবু এই তিনটি ছেলে চলে যাওয়ার আগে তালবেতালিয়া গ্রামে বাচ্চাদের শিখিয়ে গেছে 'বাঁচার জন্য মরতে হল মরব' কিংবা 'দেখো দেখো দিন বদলায়'-এর মতো গান!

রূপকের প্রচ্ছদ ভেদ করে নবজীবনগড়ে প্রাত্যহিকের সন্ধান মেলে।

বড়বাবু আসার সঙ্গে সঙ্গে শহর চলে আসে তালবেতালিয়া গ্রামে। আর অন্তরীপ নয়, এবার মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাহিনী যেন পায়ের তলায় মাটি পায়। উগ্রপন্থী ছেলেদের উপস্থিতি প্রথমে খানিকটা প্রক্ষেপের মতো মনে হয়, শুধু বাইরের জগতের কিছু খবর তারা বহন করে এনেছে—"ওরা আসায় এটাও আমাদের জানা হয়ে গেল, যে-জগৎটাকে ছেড়ে আসতে হয়েছে বলে আমরা হেদিয়ে মরচি, সেটাও তো খুব একটা থিতু হয়ে নেই। সেখানেও তো কানা পুতের নানা রোগ। নইলে এমন সব সুস্থ স্বাভাবিক সোনার টুকরো ছেলে জান দেবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠবে কেন?" বড়বাবুর পরিবর্তনের ধারণার সঙ্গে এই ছেলেদের পরিবর্তনের ধারণা মেলে না। বড়বাবুর চেষ্টায় তালবেতালিয়ার চতুর্গুণ জায়গা নিয়ে গড়ে উঠেছে এক নয়াবসত, যার নাম নবজীবনগড়। সেই ছেলেগুলো যে-স্বপ্ন দেখে তা হয়তো কোনোদিন বাস্তবে রূপ লাভ করবে না ("ওরা চায় দুনিয়াটাকে ঢেলে সাজাতে। ওপর ওপর ঝাড়পুঁছ করা মানে পুরনো জিনিসটাকে টিকিয়ে রেখে মানুষের যন্ত্রণা বাড়ানো। স্যাকরার ঠুকঠাক দিয়ে হবে না। ওরা দিতে চায় কামারের এক ঘা।"), অন্যদিকে "বড়বাবুর একটা বড় গুণ, ওঁর স্বপ্নগুলো মাটিতে পা দিয়ে চলে। কিন্তু উনি কতকটা ঠুলি-পরানো ঘোড়ার মতো, শুধু সামনেটা ছাড়া আশপাশগুলো ওঁর নজরেই পড়ে না।" ঝুপড়ি ভেঙে সেখানে তৈরি হল ব্যারাকবাড়ি, সরকারি আনুকূল্যে জমি টাকা সব এল। হাজী মাস্টারের পাঠশালায় ছোটদের সঙ্গে বড়রাও মাঝে মাঝে এসে ভিড় করেছে। "এ-কদিনের মধ্যে তালবেতালিয়া জবর বদলে গেছে। এখন আর চায়ের লিকারে দুধ পড়ার মতো করে নিঃশব্দে সকাল হয় না। এখন ভটর ভটর শব্দে রীতিমতো হাঁকডাকের মধ্যে সকাল হচ্ছে।" এতদিন তালবেতালিয়ায় বার-দিন-মাস-বছরের হিসেব ছিল না, ঘড়ির সময় মেপে কাজ করার কথা কেউ ভাবেনি। এখন এসেছে 'একটা সময়-ধরার কল', সকলেই যেন ছুটছে, ঘড়িতে ঢং করে আওয়াজ হলেই সবাই নড়েচড়ে বসে, "প্রাপ্তির একটা করে লক্ষ্য প্রত্যেকেই দাগিয়ে রেখেছে। মুখে লাগাম দিয়ে মন তাদের চাবুক মারতে থাকে যাতে হুস করে সেখানে পৌঁছুনো যায়।" একটা জিনিস বোঝা গেছে, হাজার চেষ্টাতেও আর নবজীবনগড়কে তালবেতালিয়ায় ঠেলে নিয়ে যাওয়া যাবে না। বড়বাবু সেবক সঙ্ঘের স্বামিজির উপস্থিতি বারোয়ারি বিয়েরও ব্যবস্থা করলেন। এতদিন যারা ছিল সমাজের বাইরে, এবার তারা সমাজবন্ধনে বাঁধা পড়ল।

এ পর্যন্ত সবই ভালো। কিন্তু নরনারীর পরস্পর টানকে বন্ধনের শিকল পরাতে গেলে জাতি-ধর্মের কথা উঠবে। এতদিন যাদের কোনো নাম ছিল না, পদবি ছিল না, এবার তাদের নাম-পদবির সঙ্গে জাতবর্ণের ভেদগুলো খাড়া হয়ে উঠল। চ্যাংমুড়ির নাম যে কুলসুম বিবি, এ কথা সে কি আগে জানত! এর পরিণাম, মরলে তাকে কবর দিতে হবে। এর সঙ্গে মিলেছে ভোটের হাওয়া—কুষ্ঠরোগীদের দুঃখে দুঃখী এত যে মানুষ আছে, তা আগে জানা ছিল না। অথচ কুষ্ঠরোগীর হাত থেকে চা-সন্দেশ নিতে বাধা কাটেনি। সরকার পক্ষের দাবি—তালবেতালিয়া আগে ছিল এক নরক, সরকার সেখানে নবজীবনগড়ের পত্তন করে স্বর্গ বানিয়ে দিয়েছে। অন্যপক্ষের বক্তব্য—এই পচাগলা সমাজটাকে না পালটালে কিছু হবার নয়, দুনিয়া

জুড়ে চলেছে তাই নিচের মানুষকে ওপরে তোলার লড়াই, পীড়িতের দল আর নিপীড়িতের দল যদি এক হয়ে দাঁড়ায় তাহলেই মানুষের কপাল ফেরানোর চাবিকাঠি ঠিকঠাক হাতে এসে যাবে। আর রূপক নয়, রূপকথা তো নয়ই। ভোটের আগেই চারদিকে পোস্টার পড়তে শুরু করেছে—হিন্দুদের পোড়াতে হবে। মুসলমানের চাই আলাদা কবরখানা। বড়বাবুর স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক। আর দ্বীপ নয়, অন্তরীপ নয়, আমাদের চেনা জগৎ, অভিজ্ঞতার জগৎ।

অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ কোনও অজ্ঞাতনামা লেখকের ইংরেজিতে লেখা পাণ্ডুলিপির ভাষান্তর, অন্তত এইরকম একটা ভূমিকা সংযোজিত হয়েছে উপন্যাসের সূচনায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের তৃতীয় উপন্যাসটির জন্য এইরকম একটা প্রকরণের দরকার ছিল। তিনি যে 'বানিয়ে লিখতে' পারেন না, সে কথা একাধিকবার জানিয়েছেন, "মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, তাদের জীবনের নানা সমস্যার কথাই আমার লেখায়, কবিতায় তুলে ধরেছি। ঠিক বানানো গল্প আমি কখনো লিখতে পারিনি।...চাক্ষুষ দেখাশুনো ও অভিজ্ঞতা থেকে আমার গল্প।" উপেনবাবু, কচি, ভাইসাহেবের মতো প্যানসাহেবও তাহলে সুভাষের চেনাজানা মানুষ। তবে উপেনবাবু আর ভাইসাহেব ঠিক পূর্ণায়ত চরিত্র নয়, অল্পক্ষণের জন্য তাদের দেখি (ভাইসাহেবকে তো দেখতেও পাই না), লেখকের রাজনীতি-ভাবনার প্রকাশে চরিত্র সহায়তা করেছে। কচি পূর্ণাবয়ব চরিত্র, তবে তার মধ্যে জটিলতা কম, কচি শেষপর্যন্ত কাঁচাই থেকে গেছে, উপন্যাসের শেষে তার মুখে শুনি "কেঁচে গণ্ডুষ করেই বোধহয় আমাকে আবার জীবন শুরু করতে হবে।" একমাত্র প্যানসাহেব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ধারায়, সবচেয়ে পরিস্ফুট ও পরিপক্ক চরিত্র।

প্যানসাহেব অবশ্য নায়কের নাম নয়। কুষ্ঠ হাসপাতালে অবসর সময়ে টুকটাক লেখালেখি আর সাহেব ডাক্তারের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলার জন্য, সবাই তাকে বলত পেনসাহেব, তাই থেকে প্যানসাহেব। সন্ন্যাসীর মতো পূর্বাশ্রমের কথা সে বলতে চায় না, তবু পটভূমি ও স্মৃতিচারণ থেকে যেটুকু বেরিয়ে এসেছে, তা হল—পূর্বজীবনে সে ছিল চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট, শহরে সাজানো ফ্ল্যাট, সুশ্রী গোয়ার মেয়ে ঘরণী, শিশুসন্তান। সাধারণভাবে মধ্যবিত্ত জীবনে চাওয়া-পাওয়ার মধ্যে আবদ্ধ। তবে প্যানসাহেব যতই বলুন না কেন, বড়বাবুর কাছে ঘুষ দিতে আসা ঠিকেদারের মতো "ঐ জাতেরই লোক ছিলাম। শুধু আরেকটু ভদ্রস্থ এবং আরেকটু পালিশ করা—তবে হরেদরে একই মাল"—কথাটা সত্য নয়। প্যানসাহেবের ভেতরে আগাগোড়া "ঐ বস্তাপচা সমাজের" বিরুদ্ধে একটা মনোভাব কাজ করে গেছে। সে আয়নায় মুখ না দেখলেও, আত্মপ্রতিকৃতি তার কাছে স্পষ্ট, "আমার কুষ্ঠরোগ ধরা পড়ল আর তখন আমি সমাজসংসার ছেড়ে চলে এলাম—এটা কি বিলকুল ঠিক? নাকি কোনো না কোনোভাবে আমি পালানোরই ছুঁতো খুঁজছিলাম। জো পেয়ে গেলাম কুষ্ঠ হওয়ায়।" তা না হলে কুষ্ঠ হয়েছে জানার পর একজন শিক্ষিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট একালে চিকিৎসা না করিয়ে পাঁচবছর অলৌকিক নিরাময়ের আশ্বাসে তীর্থে বা দুর্গম গুহাগুম্ফায় ঘুরে বেড়াবে, এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। "এ-রোগ এখন সহজেই নিরাময়যোগ্য এবং কুষ্ঠমাত্রই ছোঁয়াচে নয়—এসব কথা কস্মিনকালে সে কি কাগজে পড়েনি? দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি জানবে না এবং

চিকিৎসা করলে সেরে যাবে, তার যে অনেক উপায়—সেও তো তার করায়ত্ত ছিল। তাহলে?" প্যানসাহেব এর উত্তরে বলে, জীবন ঠিক যুক্তির পথ ধরে চলে না। অথচ জীবনের সবটাই আচমকা ঘটে-যাওয়া-ঘটনা নয়। আসলে দুটো বা একাধিক জীবনের কথা মেনে নিতে হয়—"প্রথম জীবনের চোখে যা নষ্ট হল বলে মনে করেছিলাম দ্বিতীয় জীবনের দৃষ্টিতে তার অন্য রূপ।" একই আমি দুই হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়, আর তখন নিজেকে আর কেউ বলে ভাবতে পারা সম্ভব হয়। এগারো বছর আত্মনির্বাসনের পর পুরনো সব মুখ এখন ঝাপসা। তালবেতালিয়ায় সেই ভাঙাচোরা আর তেরাবাঁকা মানুষের মধ্যে প্যানসাহেব নিজেকে আবিষ্কার করেছে—"সমাজ থেকে ছেঁটে-ফেলা দাগী মানুষের এই দঙ্গলটাতে এসে আমার মনে হল এই আমার নিজের জায়গা।" এর পর কানা বিকলাঙ্গ কুচকুচে কালো (মুখটা ঠিক রিলিফ ম্যাপের মতো দগদগে) আদিবাসীদের মেয়ে চ্যাংমুড়িকে সঙ্গিনী হিসেবে গ্রহণ করা আর অবাস্তব ঠেকে না। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কত সময়েই ভেবেছেন—"সৌন্দর্য আর ভালো লাগা—এ দুটো কি পরিপূর্ণভাবে এক? ভালো লাগে না এমন সৌন্দর্যও তো আছে। সুন্দর নয়, তবু ভালো লাগে—এমনও তো হয়?" প্যানসাহেবের সঙ্গে এখানে কবির একাত্মতা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। শুধু সৌন্দর্যভাবনায় নয়, সমাজভাবনাতেও ঐক্য লক্ষ করা যায়।—"একটা সময় গেছে যখন কিছুতেই নিজের মুখোমুখি হতে পারতাম না। একা পেয়ে পাছে পিছন থেকে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে স্মৃতি। নিজেকে আলাদা করে প্রতি মুহূর্তে চোখে চোখে রেখে আমি তখন স্মৃতির হাত এড়িয়েছিলাম। এখানে আসার পর অনেকের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।" এই যে আত্মবিস্ফার, শ্রেণীবিস্মৃতি, অন্যের সঙ্গে মিলে যাওয়া—এর জন্য হয়তো তালবেতালিয়ার প্রয়োজন ছিল।

কিন্তু নবজীবনগড় নিয়ে প্যানসাহেবের মনে প্রথম থেকেই সংশয় ছিল। সামনে এগোতে হবে। সেজন্য পরিবর্তন চাই। অথচ প্যানসাহেব কিছুতেই নতুন জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। তার কেবল মনে হয় "আমার কিছু পাওয়ার নেই, কোথাও পৌঁছুবার নেই।" তালবেতালিয়া ছিল দুনিয়ার বার। দুজনের এক হয়ে যাওয়াতেই ছিল জগৎজয়ের আনন্দ। তখন মনে হত, দুনিয়ায় যদি আস্ত মানুষ কেউ থাকে তো এই তালবেতালিয়ার ভাঙাচোরা লোকগুলো। কেননা বাইরের ভাগ-আড়ালগুলো রোগের এক ধাক্কায় এখানে ভেঙে গেছে। বড়বাবু অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন "মানুষকে কোনোদিনই একরঙা এবং আগাপাশতলা এক মাপের করা যাবে না।" বড়বাবুর আছে একটা তৈরি জগৎ, তারই ছাঁচে উনি নবজীবনগড়কে ঢালতে চান। প্যানসাহেবের মনে হয় সমাজ থেকে বেরিয়ে এসে আবার 'ঐ বস্তাপচা সমাজেরই পাহারাদার' হওয়ার বাসনা অন্যায়। অন্যদিকে কুষ্ঠ হওয়া যেমন তার সমাজসংসার ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা 'ছুতো', উপন্যাসের শেষে চ্যাংমুড়ির মৃত্যু তেমনি নবজীবনগড় ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার একটা উপলক্ষ। ভেতরে ভেতরে পালানোর ইচ্ছা কাজ করছিল—"একবার যা ছেড়ে আসি আমি আর কখনও সেখানে যাই না। আমার স্বভাবটা সত্যিই অদ্ভুত।" একে কি স্ববিরোধ বলব! প্যানসাহেব কি বাইবেলের পাতায় সান্ত্বনা খুঁজেছেন—"ঘরে আর সে ফিরবে না,/তার নিজের জায়গায় কেউ আর তাকে চিনবে না।" ঠিক জানি না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : অনুঘটক ও অনুস্রষ্টা

তরুণ সান্যাল

নোয়াম চমস্কি ভেবেছেন সব ভাষাই এক। প্রতিটি অভিজ্ঞতার প্রতিশব্দ এক এক ভাষাতে এক-এক রকম। গাছ-পেড়-বৃক্ষ-ট্রি-দেরেভো-বাউম কতই-না। নদীও এমনি, ফসল, ফসলের মাঠও এমনি। নরনারী জেলখানা শিশু প্রেম যুদ্ধবিগ্রহ নৌকা জাহাজ...সব সব এমনি। চেনা ভাষায় তফাৎ যাইহোক না কেন, ওই ভাষাসমূহের অন্তরাত্মায় রয়েছে একই মানুষ, মানবসমাজ। মানব ঐক্য। তবে বর্ষার নদী বলতে ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা-পদ্মার তীরের বাসিন্দা যে অভিজ্ঞতার ছবিটি শব্দে ধরবে তা কি বর্ধমানের বাঁকা—সাপজলা বাঁকে বাঁকে চলা 'নদী' শব্দচিত্রের সমার্থক হবে? এমনি বহু বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনাম-অব্যয়-ক্রিয়া নিয়ে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতার পার্থক্য রয়েছে। তা ছাড়া নানা ভাষা-পরিবারও রয়েছে। বাংলা-অসমিয়া-ওড়িয়া-মৈথিলি ভাষাগুলিতে কখনও রচনা যত সহজে এইসব ভাষার এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় 'অনুবাদ' করা যাবে, তেমনটি তামিল-তেলেগু-কর্ণাটক-মালয়ালামে করা যাবে না। উত্তর ভারতের অন্য ইন্দো-ইয়োরোপীয় ভাষা পরিবারের সন্ততির মধ্যে যেমন অনুবাদ অনেকখানি সম্ভবপর। হয়তো উত্তর ভারতে বহুবিধ সাংস্কৃতিক অনুষঙ্গ কাজও করবে। তেমনটিই ঘটে ইয়োরোপীয় ভাষাগুলি সমপরিবারের হলেও। সম্ভব হবে না। তুর্কে-মোঙ্গোল ভাষা থেকে অনুবাদ তো দূরস্থান।

বিদ্বানরা বলেন কবিতা অনুবাদ তো হয়ই না। কেন হয় না, তা বিচার-আলোচনা করতে মস্ত মস্ত সন্দর্ভ লিখতে হবে। কেউ বলেন, আসল রচনা পাঠককে চিনিয়ে দেওয়ার কাজে অনুবাদক আদতে পদে পদে বিশ্বাসভঙ্গ করছেন। তিনি বে-ইমান, বিশ্বাসঘাতক। কেউ বলছেন, অনুবাদটি গালিচার উল্টোপিঠ। আদত নক্সাটির একটি আদল আসছে বটে, কিন্তু কার্পেটটির সোজা দিকের সঙ্গে উল্টোদিকের আসমান জমিন ফারাক রয়েছে। এজন্য, বহু অনুবাদক বিনীত হয়ে কাজটিকে বলছেন অনুসৃজন। ট্রান্সক্রিয়েশন। কেউ বলেছেন অনুবাদ করলে, যা কিছুর উদ্ভব হল, তা এক ভিন্ন রচনা। আসল যা তা রয়েই গেল। কেউ বলছেন দু-ভাষা মিশিয়ে রাসায়নিক যৌগিক গড়েন অনুঘটক ক্যাটালিস্ট অনুস্রষ্টা। অনুসৃজন শব্দটি আমার কাছে মনঃপূত নয়। একসময় এই নিবন্ধের লেখক গ্যয়টের কয়েকটি লিরিক, ফাউস্ট প্রথম খণ্ডের কয়েকটি অংশের বঙ্গীকরণ পদ্যছন্দে করেছিল। গোটা চারেক ইংরাজি অনুবাদ, মূল জার্মান, কলকাতাস্থ তখনকার গণতান্ত্রিক জর্মান প্রজাতন্ত্রর কনসাল জেনারেল ও বিশিষ্ট সংস্কৃতিমনস্ক বন্ধু শ্রীযুক্ত হাইড্রিশের সহযোগিতায় অনুসৃজনটি ঘটানো হয়। ওই অনুসৃজন করার কাজে ওই রচনাগুলির মধ্যে আমার অনেকখানি প্রবেশ করা সম্ভব হয়েছিল। আমার তো ধারণা, বিদেশি কবিদের বিশেষভাবে অনুধাবনের জন্য কোনো সৃষ্টিশীল পাঠকের পক্ষে অনুসৃজন কর্মটি খুবই কাজের। উপরন্তু কোনো কবির পক্ষে তো কোনো নিশ্চেষ্টতার অসহায়তা পূরণ করার কাজে অনুসৃজন বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। সে যাইহোক, গ্যয়টের

কবিতাগুচ্ছর ভূমিকায় 'অনুবাদ' শব্দটির বদলে 'অনুসৃজন' শব্দটি লেখায় পশ্চিমবঙ্গের এক বিশিষ্ট বামপন্থী বিদ্বান ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, গ্যয়টের মতো মহামহিম কবির রচনার বঙ্গীকরণে 'অনুসৃজন' শব্দটির ব্যবহার বাঙালি কবির পক্ষে ধৃষ্টতা হয়েছে, অবশ্য শ্রীআজাহারউদ্দীন খান একটি বইতে ডক্টর শহীদুল্লাহ্, কাজী আবদুল ওদুদ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আহমদ ছফা প্রমুখের অনুসৃজনের সঙ্গে ওই লেখাগুলির তুলনা করে মর্যাদা দিয়েছিলেন। অবশ্য সেই সমালোচক মহোদয় নিশ্চিতই জানতেন, সোভিয়েত ইউনিয়নে ম্যাকসিম গোর্কির তত্ত্বাবধানে বিশাল আন্তর্জাতিক সাহিত্য রুশ ভাষান্তরণে প্রকাশিত হতে শুরু করে। তার সুফলও ফলেছিল। বিপ্লবের ফলে সমাজের যে বিপুল অংশ পিলসুজের তলার অন্ধকার থেকে আলোয় উঠে এসেছিল তাদের বিশ্বের কল্পনা-শিল্প বা ফিকশন এবং কবিতা, নাটক সহ নানা সৃষ্টিশীল রচনার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোটা আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল। ছিল চুভাস চুকচিদের মাত্র কয়েক হাজার জনগোষ্ঠীর জন্যও বিশ্বসাহিত্য অনুবাদ। ছিল চুকচিদের মৌখিক-সাহিত্যকেও নানা ভাষায় লিখন সাহিত্যে রূপান্তরণ। এসব কাজ কলখোজ গঠন—শিল্পায়ন, খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য কর্মসংস্থান প্রভৃতির মতোই জরুরি ছিল। সমাজতন্ত্রী লোকসমাজ বা সোশালিস্ট সিভিল সোসাইটির মানস গঠনে ওই আন্তর্জাতিক ও অন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল ও ইনট্রান্যাশনাল—সাহিত্য সম্ভার দেশের কোণে কোণে ছড়িয়ে দেবার প্রয়োজন পড়েছিল।

মানসগঠনের প্রক্রিয়া ছিল দুটি। এক, গোর্কি-লেনিনীয় পন্থায় দেশবাসীকে বিশ্বের সৃষ্টিশীল রচনার সঙ্গে নির্বাধভাবে সম্পর্কিত করা। দ্বিতীয়টি ছিল রাজনৈতিক দলের তাৎক্ষণিক রণনীতি ও রণকৌশল দেশবাসীকে গেলাবার জন্য ওই সিভিল সোসাইটির উৎপাদন-বণ্টন-বিনিময়-নন্দন সংস্থা-উৎসব পালন-শিক্ষা-স্বাস্থ্য-আবাসন ইত্যাদি ইত্যাদি সবখানেই পার্টির নির্দেশনা। তবে পুরোপুরি ফ্যাসিস্ত দেশে একনম্বর ও দু-নম্বর দুটি লক্ষ্যই পার্টি নির্দেশনায় নিরঙ্কুশভাবে চালু হতো। যেখানে লোকসমাজ দুরমুশ করে দিয়ে পার্টিই ছিল সব। আর সোভিয়েতে প্রথমটিতে ছড়িয়েছে সমাজতন্ত্রী মানবতার শিকড়বাকড়। দ্বিতীয়টিতে গড়ে উঠেছে শেষ পর্যন্ত আপারাৎচিক ও নোমেনক্লাতুরা। রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ব্যবস্থা। পার্টির তকমাধারীরা সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থাটির গঙ্গাযাত্রা যখন প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিল, তখন মিখাইল গরবাচভের শক-থেরাপির বিশল্যকরণীও অকেজো হয়ে গেল। তবু, এখনও রুশদেশে যে গ্রাম-শহরের জীবনে সমাজতন্ত্রী অভিজ্ঞানবহ লোকসমাজ রয়ে গেছে, শত ইয়েলেৎসিন আগামী সত্তর বছরেও তা ভাঙতে পারবেন না।

ইংরেজ শাসন শেষ হয়েছে এদেশে। তাদের আমলের যাপনধারা এই প্রায় ষাট বছর স্বাধীনতা পাবার পর শত পরীক্ষা-নিরীক্ষাতেও আগাপাশতলা বদলানো যায়নি। উৎপাদন সম্বন্ধগুলির জবরদস্তি করে কিছু বদল ঘটালেও সত্তর বছরের সমাজবাদী রুশি মানসভুবন কি আমূল বদলে যেতে পারে? দুনিয়াভর পশ্চিমী রাষ্ট্র-ভৃত্যরা প্রচার করছে, গেছে, সবই গেছে ওই রুশি গ্রাম জনপদে বিপ্লবের অর্জন। আসলে শূদ্র, প্লেবিয়ান, দলিত, প্রলেতারিয়েত, সাকুল্যে যে নামেই বলো, ওদের উত্থান হয়েছিল বলে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-প্যাট্রিসিয়ান-উচ্চকোটি-ক্যাপিটালিস্ট, প্রথম এস্টেট অভিধার শোষকবিশ্ব ক্রুদ্ধ হয়ে বিদ্বিষ্ট হয়ে পৃথিবীময়

প্রচার প্রোপাগান্ডায় যে বিষ ঢেলেছে, সেই প্রক্রিয়া এখন নতুন কায়দা নিয়েছে কীভাবে ওই টিকে থাকা সমাজতন্ত্রী সিভিল সোসাইটি উৎসন্নে পাঠানো যায়। ওই প্রচারে যোগ দিয়েছিল যে বিপ্লবের নামে অতি উৎসাহীবৃন্দ সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী অভিধা দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে নস্যাৎ করতে, তাদেরও থোঁতা মুখ এখন ভোঁতা।

কমিউনিস্টরা নানাদেশে হয়ে পড়েছিল অনুসৃজনবাদী। লেনিন বলতেন, জনগণের অতীত-বর্তমানের গণতান্ত্রিক যাপন ও ধ্যানধারণা শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতার সঙ্গে যুক্ত হলেই গড়ে উঠবে প্রলেতারীয় সংস্কৃতি। ওইটাই গড়ার অন্যতম উপায় ছিল বিশ্ব সাহিত্যের ভাষান্তরণ। একটু অভিনিবেশ দিয়ে নজর করলেই দেখব, গত শতকের চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্যেও অনুসৃজনের বা ভাষান্তরণের বিস্ফোরণ ঘটেছিল। অবশ্য তা ছিল গদ্যেই বেশি। অনুবাদকদের বড়ো অংশটাই ছিল কমিউনিস্ট বা ওই দলের দূরের-কাছের সহানুভূতিশীলরা। মনে পড়ছে, সম্ভবত পাঁচখণ্ডে প্রকাশিত কিশোর-কিশোরীদের কথা মনে রেখে গিরীন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'দেশ বিদেশের লেখা'র কথা। বিষ্ণু দে থেকে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সরোজ দত্ত থেকে গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ঋষি দাস থেকে পুষ্পময়ী বসু— অনুসৃজকদের সংখ্যার যেন শেষ নেই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ 'পদাতিক' 'চিরকুট' (অগ্নিকোণ সহ) কাব্যগ্রন্থে পাওয়া যায় না। আছে 'চিরকুটে' 'উজ্জীবন' নামে সুকান্ত ভট্টাচার্যকে মনে করে লেখা কবিতায় উদ্ধৃতি 'যমের প্রতি নচিকেতা : কঠোপনিষদ'। আর 'উজ্জীবন' কবিতাটিও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গদ্যছন্দে লেখা। অবশ্য 'পদাতিক' কবিতার ৫ অংশেও গদ্যের সুর আছে। কবিতাটিকে দেখছি অনুবাদকর্ম ঠিকঠাক সংস্কৃতভাষ্য অনুসরণ নয়।

"অন্যত্র ধর্মাদন্যত্রাধর্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ তৎ পশ্যতি তদ্বদ্॥ ১/২/১৪

(নচিকেতা বলিলেন) 'ধর্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম হইতে ভিন্ন, এই কার্য ও কারণ হইতেও পৃথক এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান হইতেও ভিন্ন বলিয়া যে বস্তুকে আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই আমাকে বলুন।' (স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত উপনিষদ গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড)। সাতাশ-আঠাশ (১৯৪৭) বয়সে লেখা, মিহির আচার্য সম্পাদিত 'সুকান্তনামা'য় প্রকাশিত এই কবিতাটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী কবিতার পদপাত রয়ে গেছে। ওই 'উজ্জীবন' কবিতাটিতে রয়েছে লোক-লজ 'স্বপ্নের দড়ি নাকে দিয়ে' 'ফাঁসিতে লটকে'। একেবারে তৎসম অভিব্যক্তি 'বঞ্চনার অভিশপ্ত পথে', 'অদৃশ্য উদ্বন্ধনের পাকে পাকে'র পাশাপাশি। কবিতাটি আগেই বলেছি গদ্যছন্দে লেখা। গদ্যছন্দে কি? নাকি শব্দগুলির ওজনমাফিক অক্ষরবৃত্তে ভার চাপিয়ে না দিয়ে গদ্যের ফাঁকফোকরে শ্বাস নেওয়া ও ফেলা চলেছে। গদ্য ও অক্ষরবৃত্তের মধ্যে চলাফেরা চলছিল কবিতাটিতে। আগেই বলেছি অবশ্য 'পদাতিক' কবিতাটির পঞ্চম অংশে গদ্যের চলন আছে, সে চলন অতি সাধু রীতিতে। একটু ব্যক্তিগত কথা বলি। আমার মনে পড়ে, পদাতিক চিরকুট প্রকাশের ঢের বছর পর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহু ধরনের সভাসমিতিতে আমিও কিছু বলতে গিয়েছি। উনি বহুবার তখন উপদেশ দিয়েছেন, যেমনটি

বক্তৃতার কথা সাজাই, ঠিক তেমন ভাবে যেন কথোপকথন ঢঙে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখি। স্বভাবে যা নেই তা আর হবে কী করে! সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আপন মাতৃভাষা বিষয়ে এমন আস্থা ছিল, যেন সবাই সে ভাষা সব দেশে বুঝে যাবে। মনে পড়ছে, ১৯৭৭-এর ডিসেম্বরে নাকি ১৯৭৮-এর জানুয়ারিতে মস্কোয় হাসপাতালে চোখে তখন অস্ত্রোপচার করিয়েছি। বিছানায় এক চোখ ঢাকা অবস্থায় পড়ে আছি। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এলেন মস্কোয় প্রগতি প্রকাশনের অনুবাদক কথাশিল্পী ননী ভৌমিক ও কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গী করে। আমাকে নিয়ে 'পরিচয়ে'র অতীত-বর্তমানের চার সম্পাদকই উপস্থিত। মঙ্গলাবাবুর স্ত্রী উর্মিলা চট্টোপাধ্যায় কেরিয়ার ভর্তি নানা ধরনের পিঠে বানিয়ে দিয়েছিলেন, 'সারি সারি লক্ষ্মীর পা' লিখিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আগ্রহে পৌষ-পার্বণে। আমার ওয়ার্ডবাসী ভিয়েতনামী এক প্রাক্তন সেনানায়ক, ১৯৪৫-এ পোলান্ড মুক্তির কালে চোখে স্পিনটার লাগা রুশি, সদ্য সদ্য তরুণ বিদ্রোহের আবর্তে আহত ফরাসি যুবক, তাছাড়া একদা ভারতীয় জেলখানায় অনশন ধর্মঘট চলাকালে মাথায় আঘাত পাওয়া আমি এবং ওই তিন বর্ষীয়ান কমিউনিস্ট লেখক-কবি যখন পিঠেগুলি ভাগ করে খাচ্ছিলাম, আলাপচারীরা কথা বলছিলেন ভিয়েতনামী, রুশি, ফরাসি, ইংরাজি ও বাংলায়। কেন যেন মনে হচ্ছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা ভিয়েতনামীও বুঝতে পারছিলেন। রুশির ভাষা ফরাসিও। 'অগ্নিঈ' পুস্তক প্রতিষ্ঠান প্রকাশিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রুশভাষার কবিতার বইটি থেকে পড়ে শোনানো হল বেশ কয়েকটি কবিতা ভিশ্চুলা পার হওয়া রুশি ট্যাঙ্ক-ক্যাপ্টেন ইউলির পাঠে। আমি কিন্তু সব কবিতাই বুঝতে পারছিলাম। নোয়াম চমস্কির কথা বলছি না। বলছি বন্ধু সাহচর্যই ভাষার বিভেদ দূর করে দেয়। এখন ভাবি, সত্যি সত্যি কি এমন ঘটনাটা ঘটেছিল! আমি ছাড়া ওই ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে কেউ তো এখন বেঁচে নেই!

থাক ওসব কথা।

১৯৭০ সালে শান্তনু দাস ও রদ্রেন্দু সরকার সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' বইটিতে বহু কবির রচনা এবং জীবন ও শিল্পবিষয়ে মন্তব্য ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবিকা লিখেছিলেন 'লেখা ও তর্জমা'। তাঁর প্রিয় কবিতাটি 'নির্বাচনিক (?)' বলে মন্তব্য করেছিলেন। কবিতাটি '১৯৩৯-এর গোড়ার দিকে নদিয়ায় জয়রামপুর গ্রামে আই. এ. পরীক্ষার ছুটিতে লেখা।' আই. এ. পরীক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন হত ফেব্রুয়ারির শেষে এপ্রিলের আগে। যখনই হোক, ১৯৩৯-এর ৩ সেপ্টেম্বরের তো আগে। অর্থাৎ স্পেনে ফ্যাসিস্তদের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 'মঞ্চ মহড়া'র শেষ পর্যায় তখন। অবশ্য মলোতফ-রিবেনট্রফ চুক্তিতে কালির আঁচড় পড়েছে।

'নির্বাচনিক' কবিতাটি নিয়ে আলোচনা না বাড়িয়েও বলা যায়, কবিতাটিতে যে বাঁকাভাবে বলার ধরনটি দেখছি তা কিন্তু ক্রিটিক্যাল রিয়ালিস্ট। রয়েছে বুদ্ধির ছটার তীব্রতা। লোগোপিয়ার চূড়ান্ত। দেশের সরকার বদল, ফ্লাউড কমিশন, রুশ-জার্মান চুক্তির পশ্চাদ্‌পটে বার্সিলোনা-গুয়ের্নিকা ফ্যাসিস্ত বোমায় ধ্বংস হওয়া, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে 'ইয়োরোপীয় সাধারণ গৃহ' বিষয়ে আলাপচারিতা এবং দীন ভারতীয়র উচ্চকণ্ঠ 'নক্ষত্রপল্লী' বা পশ্চিমী রাজনীতি কুশীলবদের নিয়ে বাতচিত, গান্ধীজীই ভারতের হিটলার ধরনের বাক্য বিন্যাস, 'জীবন বিস্বাদ লাগে' ধরনের মধ্যবিত্ত তরুণের ইনটেলেকচুয়াল বিজৃম্ভন—সব কিছুই

কেড়ে নেয় আত্মা—রয়েছে প্রকাশ্য ও অন্তরীক্ষে কবিতাটিতে। বলা বাহুল্য কবিতাটিতে আছে কৃষ্ণনগরীয় উইট। শব্দসজ্জা টান টান, লোক ভুইটে এসে যায় 'ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি' 'খাশা চিজ' ইত্যাদি বাগভঙ্গিতে।

এই 'নির্বাচনিক' কবিতাটি কি সুভাষ-রচনারীতির জলবিভাজিকা? যা অগ্নিকোণে 'রাম রাম' কবিতাটিতে আবার দেখব? 'পদাতিক'-এর প্রথম দিকের কবিতাগুলি মাত্রাবৃত্তের নানা ঝোঁকে লেখা। পুরো পদাতিক ও 'চিরকুটে' বাংলার লোকশ্রুতি ও স্মৃতিধন্য 'স্বরবৃত্ত' বা ছড়ার ছন্দে লেখা তেমন একটি কবিতাও চোখে পড়ে না। অথচ কৃষ্ণনগর-নদিয়ায় তো ছড়ার ছড়াছড়ি। কাদের খোপা চোপা নিয়ে কোন দিগনগরের মেয়েগুলি নাইতে নামলে রুনুরুনু চুল ঝাড়তে লাগে—চিরকুট-তক সেই মিঠে শব্দের বাংলা, সেই লোককথনের চিত্রকল্প, চিত্রকল্পবাহন ছড়ার ছন্দ দেখছিই না। আমার তো ধারণা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু বঙ্গেশ্বর পালের আর্জিতে লেখা সুভাষের যে ছন্দজ্ঞানে মুগ্ধ হয়েছিলেন, সে সুভাষ সদ্য মার্কসচিন্তার ভক্ত তখন, উৎসাহী বাঙালি তরুণদের জন্যই লিখছেন। তাদের ভাবনা ছিল অবশ্য শ্রমিক-কৃষকদের প্রতি অনুগত। হয়তো ক্লাব বানিয়ে গাইছেনও 'মজদুর হ্যায় হাম'। কিন্তু চল্লিশের দশক থেকে তাঁদেরও নতুন ঘরানার এক হাঁটু কাদা মাখা কমিউনিস্ট 'স্বদেশী' হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। সুভাষ যখন অক্ষরবৃত্ত চিনেছেন, ওই ছন্দস্পন্দনের মধ্যে উচ্চাবচ শব্দভঙ্গিমা অর্জন ছাড়াও সিধা আবেগ ও বক্তব্য শ্রোতার মধ্যে সঞ্চার করার সুযোগ পেয়ে যান। ও ছন্দর গদ্য থেকে উদ্ভব, আবার গদ্যেই ওর অন্তর্ধান। সেই অক্ষরবৃত্ত ভাঙা কবিতা অগ্নিকোণে 'মিছিলের মুখ'। প্রথম স্বরবৃত্ত ব্যবহার 'ঝড় আসছে'তে। আর লোক-লক্ষও 'রাম রাম' কবিতাটিতে। কোনো কনসীট নেই, কবির মুখচ্ছদ নেই। মুখচ্ছদ ও মুখ কবির একটিই, বিপ্লবী ক্রিটিক্যাল রিয়ালিস্ট কবি।

কুকুরের মাংস কুকুরে খায় না
ল্যাজ নীচু করে
এ ওর দিকে তাকায়—
হুবহু এক
যেন একজন আরেকজনের আয়না।

তুলনায় 'নির্বাচনিকে' 'কথোপকথনে মুগ্ধ হবে দুটি পার্শ্ববর্তী সিঁড়ি', ইঙ্গিত ছিল সেই দুই শোষকের শেষ আশ্রয় হবে 'মড়া কাটা ঘর'। পড়তে থাকি

'রাম রাম-
একটু তেল চাই কামানের চাকায়'

সে একপক্ষ নিজামই হোক আরেকপক্ষ স্বাধীন দেশের জল্লাদ মন্ত্রীর বন্দুক সরকারই হোক, দুইয়েরই লক্ষ্য 'অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানা'কে 'জমির আস্বাদ' ভোলানো। যেমনটি মন্দ ভাগ্য বার্সিলোনার জন্য ছিল ফ্যাসিস্ত ও পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা নাকি, 'নির্বাচনিকে' ছিল রুশ-জার্মান চুক্তি: 'নির্বাচনিকে' পেয়ে যাচ্ছি 'মন্দভাগ্য বার্সিলোনা', 'রাম রাম' কবিতাটিতে পেয়ে যাচ্ছি 'অবাধ্য ছোটলোক'। 'মন্দভাগ্য'র তুলনায় 'অবাধ্য ছোটলোক' কবিখ্যাত ডিকসনই নয়। কিন্তু সে ডিকসনই 'সত্য'।

সাতান্ন সাল থেকে চিনের শ্রেষ্ঠ কবি আই চিং দক্ষিণপন্থী ঘোষিত হয়ে আঠারো বছর এ প্রদেশে ও প্রদেশে প্রায় ক্রীতদাসের কাজ করেছেন 'শ্রম দিয়ে দক্ষিণপন্থী ঝোঁক থেকে পরিশ্রুতি পেতে।' মুক্ত হয়ে ঢাকঢোল প্রশংসাবাণীর প্লাবনে যখন তিনি ভাসছিলেন চারচক্রীদের সাংস্কৃতিক বিপ্লবী রাজ-পরিবর্তনে, লিখেছিলেন "কবিকে সত্য কথা বলতেই হবে। লোকে তো বলে 'অমুক-অমুক কবিতা' সবার ভালো লাগে, কেননা শব্দ দিয়ে মানুষের মনের কথাটি ধরে ফেলেছে। আমি বরং বলব, সেই সেই কবিতাই মানুষজনের ভালো লাগে, কেননা কবি তাঁর আপন হৃদয় থেকে সত্য কথাটি বলছেন'...কবিকে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। ভাগ নিতে হবে তাদের ভালোবাসা আর ঘৃণার, তাদের সুখ-দুঃখের। যখন সেই কবির প্রজ্ঞা আর সাহস জনগণ থেকে আসে, তখনই তো কবি জনগণের আস্থা জয় করে নেবেন। কেউ কেউ আছেন, তাঁরা নিজেদের 'রাজনৈতিক জ্ঞান' বিষয়ে খুব সজাগ। যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় বসেছেন তাঁদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁরা। যাঁরা ক্ষমতার যুদ্ধে পদচ্যুত তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা খড়্গহস্ত। এঁরাও কবিতা লেখেন, চোখ রয়েছে কিন্তু সর্বক্ষণ ব্যারোমিটারে।...অবশ্য সত্যকথন বিপদ ডেকে আনতে পারে। তবে যদি কবিতা লিখতে চাও, বিবেককে বাঁধা দিয়ে অনৃতভাষী হয়ো না।" (আই চিং : অন পোয়েট্রি : চাইনিজ লিটারেচার ৬, ১৯৭৯)

এতদিন পার্টি নেতৃত্বের রদবদল নিয়ে ভেবেছেন সুভাষ, ওই 'অগ্নিকোণ' থেকেই। 'only when the poet's wisdom and courage come from the people will he win the people's trust.' সুভাষের পার্টি-কবি হওয়ার পথ পরিক্রমণ কিন্তু বিশ্ব আবিষ্কার সত্যি সত্যি ঘটালো একদিক ব্যঞ্জনহেড়িয়া অন্যদিকে নাজিম হিকমত। ওই পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। এবার পার্টি ও বিবেক, ক্ষমতা ও বোবা কান্না। ব্যঞ্জনহেড়িয়ায় সুভাষ যাপন (১৯৫২) করতে গিয়ে দেখলেন শ্রমিকদের বাস্তব জীবন। তাদের মতো করে বাঁচা বড়ো কঠিন। তবু বলব, 'সালেমনের মা' বাংলা কবিতার জলবিভাজিকা। 'ফুল ফুটুক' (১৯৫১-৫৭) বইটির কবিতাগুলি ওই জলবিভাজিকার এ ডাঙা ও ডাঙা ঘেঁষা। 'জয়মণি, স্থির হও' কবিতাটিতে পড়ি :

সীমাহীন শূন্যতায় ঘূর্ণ্যমান
এক জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড
কলকাতার ভীড়াক্রান্ত পথ ঠেলে
সামনে এগিয়ে চলেছে।

এই সভ্যভব্য শিষ্ট ডিকসন একেবারে কাব্যিক। অবশ্য টেনশন অংশটিও পড়ি

কাল সারাটা দিন আমাকে আলোড়িত করেছে এক স্বপ্ন...
কে যেন ডেকেছে আমায়। কে?
—মিছিলের সেই মুখ।

তবু এ ভাষা 'যে-তে যে-তে এক নদীর সঙ্গে দেখা' নয়। মিছিলের সেই ছলনাময়ী মুখ হারিয়ে যায়। বলা বাহুল্য 'ছলনাময়ী মুখ'টি এখানে খুবই তাৎপর্যের। কিন্তু ছলনাময় নয় 'বাবরালির চোখের মতো আকাশ'। কিছু মাত্রাবৃত্তের নানা ভাঙাগড়ায় কবিতা পড়তে পড়তে চমকে উঠি 'সালেমনের মা' পড়তে গিয়ে। এ যে সাদামাটা বাংলা, অথচ প্রতি

অনুভবের জন্য রয়েছে এক এক পদ। 'পাঁচ ইস্টিশন পেরনো মিছিল' 'অলিগলির গোলকধাঁধায়' 'পিঁচুটি পড়া চোখের দুকোণ জলে ভিজিয়ে' যাই পড়ি না কেন, বুঝি বাংলা কবিতার গড়ন বদল, ঋতু বদল হল। প্রতিটি কবিতার মধ্যে তো অন্তর্লীন থাকে গল্প-উপাদান। রোমান্টিক কবিতায় গল্প উপাদান ঠেলে দিয়ে কবি সামনে দাঁড়ান। ফুল ফুটুকের কবিতাগুলির কাহিনি বিবৃত হচ্ছে বটে, কবির গলার স্বরও শুনছি, কিন্তু কবিকে দেখছি না। কবি জনগণের সত্য উপলব্ধির মধ্যে মিশে গেছেন।

সুভাষ 'নাজিম হিকমতের কবিতা'র সঙ্গে হিকমত কৃত একটি কবিতা-পরিচয় ছেপেছিলেন। সুভাষের কথাই যেন বলছে তা : "কবিতায়, গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। এমন এক ভাষায় তিনি লেখেন—যা বানানো নয়, কৃত্রিম নয়, সহজ, প্রাণবন্ত, বিচিত্র, গভীর, একান্ত জটিল—অর্থাৎ অনাড়ম্বর সেই ভাষা। সে ভাষায় উপস্থিত থাকে জীবনের সমস্ত উপাদান।"

এই যে 'বানানো নয়, কৃত্রিম নয়'—সে ভাষা সুভাষের বহুশ্রুত 'পদাতিক' বা 'চিরকুট'কে এমন অভিধা দিয়ে কি বিজ্ঞাপিত করা যাবে? বরং এমন এক ছন্দময় গদ্য, অজস্র চিত্রময়তায় মুখের কথা—ভারভারিক্কি ক্ল্যাসিকাল ল্যাংগুয়েজের ওজন চাপানো নেই, অথচ যা হাল্কা পালকের মতো ব্যক্তিত্বচ্যুত নয়, তেমন শব্দই সুভাষ 'অগ্নিকোণ'-এর কিছু নিরীক্ষা ও পরীক্ষা থেকে পেয়ে যান। কতই না জনবচন প্রবচন ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় তাঁর গদ্যেপদ্যে। গদ্যে ও পদ্যে শব্দ গ্রন্থনার যে লয়, সেই লয়, শম ও তাল ঠিকঠাক মেলালেই বাংলা কবিতার পদ্যছন্দ ও ভার্স লিবর লেখা হয়ে যায়। পদ্যছন্দ দুরস্ত না করে, ভাষার তাল জ্ঞান হয় না কি? সুভাষ ছাড়া সার্থক ভার্স লিবর বাংলায় সম্ভবত আর কেউ সফলভাবে লেখেননি। সুভাষই জানতেন বাংলা ভাষার একটা বড়ো গুণ অনুকার শব্দ, কানে শোনা চোখেও ধরা পড়ে যাবে ছবি। বাংলার চলন হবে আটপৌরে। কে কী কেন কোথায় কবে কাকে ইত্যাদি স্থান কাল পাত্র ইত্যাদির সঙ্গে ক্রিয়াপদের সামঞ্জস্য চাই যেমন, তেমনি কী বাক্য কী পদ দীর্ঘ না হলেই শব্দে শব্দে আন্তঃসম্পর্ক হারাবে না। তখনই

আকাশে তাকালাম
তোমার মুখ
চোখ বন্ধ করলাম
তোমার মুখ
বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ।

বাংলা পুরোনো পয়ারে ছিল যে আট ছয়ের চলনে এক একটি পদ, যাকে বলা যেতে পারে 'আবদ্ধ' ক্লোজড সারকিট, ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তিতে কখনও আবদ্ধ, কখনও পঙ্‌ক্তি পরম্পরায় প্রবহমানতায় গদ্য ও পদ্য, ছন্দ বা পদের গড়ন এক করে দিলেন তিনি। পদ্য পদ্যই রইল, গদ্য গদ্যই। তবে শব্দের অন্তর্গত অর্থ, কোনোটা বহির্দেশে কোনোটা অন্তর্মনে নোঙর ফেলে টান দিয়ে তুলে এনে স্মৃতি ও অভিজ্ঞতা অতীতের সঙ্গে বর্তমানকে এক সুতোয় বেঁধে দিলেন। জন্মালো কবিতা।

রবি ঠাকুর একটি চিঠিতে রাণী মহলানবিশকে লিখেছিলেন ১৯২৯ সালে : 'পদ্য জিনিসটা

সমুদ্রের মতো—তার যা বৈচিত্র তা প্রধানত তরঙ্গের—কিন্তু গদ্যটা স্থলদৃশ্য তাতে নানা মেজাজের রূপ আনা যায়—অরণ্য পাহাড় মরুভূমি সমতল অসমতল প্রান্তর কান্তার ইত্যাদি ইত্যাদি'।

'একে অধিকার যে করবে তার চাই রাজপ্রতাপ
পতন বাঁচিয়ে শিখতে হবে
এর নানা রকম গতি অবগতি।
বাইরে থেকে এ ভাসিয়ে দেয় না স্রোতের বেগে
অন্তরে জাগাতে হয় ছন্দ
গুরু লঘু নানা ভঙ্গিতে। (নাটক/পুনশ্চ)

বিদেশি কবিতা যখন মনে হয় লোকশ্রুতির মতো, কবি নিজেই গল্পের দর্শক হয়ে নায়ক তখন। সোজাসাপ্টা বাংলা অনুবাদ না করে উল্লিখিত গদ্য ধরনে অনুসৃজন করা যায়। সুভাষ তাই করেছেন নাজিম হিকমতের ভাষান্তরণে। পশ্চিমে বর্তমানে আধুনিক চলনই হল গদ্যে; পদ্যছন্দের বা গদ্য শম চিহ্নিত কবিতা অর্থমাফিক ভাষান্তর করা। অবশ্য কমিউনিস্ট দেশগুলি এবং তাদের সহযোগীরা ভাষান্তরণ ঘটাতেন ছন্দ স্পন্দনময় গদ্যে, এমনকি অনুবাদকের স্বনির্ধারিত পদ্যছন্দে। নাজিম হিকমত অনুসৃজন করতে গিয়ে সুভাষ প্রায় কবিতার বিষয়গুলির প্রতিতুলনা পেয়ে গেছেন ব্যঞ্জনহেড়িয়ায় বজবজে, তারও আগে বকসায় সহবন্দি উর্দু কবি পারভেজ শাহেদীর কবিতার বঙ্গীকরণে। গোপন যে আদত কণ্ঠস্বর তাঁর 'শিষ্ট' আধুনিক কবিতা ফুঁড়ে বের হত পদাতিক চিরকুটে, যা শেষ পর্যন্ত সাহস করে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করা গেল 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' যুগে ওই শিষ্ট মধ্যবিত্তপনার তোয়াক্কা না করে। অবশ্য তার পরীক্ষা আগেই হয়েছে সাংবাদিকতায় রিপোর্টাজ লিখে। 'আমার বাংলা'র যে গদ্য পড়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন, সেও এই গদ্যপদ্যর সিং সং।

'আমি জেলে যাবার পর' কবিতাটিকে ধরা যাক।
জেলে এলাম সেই কবে
তারপর গুণে গুণে দশবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করেছে পৃথিবী
পৃথিবীকে যদি বলো, বলবে—
'কিছুই নয়,
অণুমাত্র কাল।'
আমি বলব—
না, আমার জীবনের দশটা বছর।'

আমরা কেউ জানি না তুর্কি ভাষায় সূর্যপ্রদক্ষিণের কোনো লোক-লক্ষ আছে কিনা। এমন কি ইংরাজির 'Ten years off my life'. 'না, আমার জীবনের দশটা বছর' এক কথা হল না। জেলও hole নয়। ট্যানার বেবারস তুর্কি থেকে ভাষান্তরণ করছেন :

Since I was thrown into this hole
the Earth has gone round the sun ten times,
If you ask the Earth, it wil say,

'Doesn't deserve mention
such a microscopic amount of time
If you ask me, I'll say
'Ten years off my life'

The Earthকে ইংরাজিতে ব্যক্তিত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাতে নয়। আবার সুভাষ লিখছেন

যে বছর আমি জেলে এলাম
দ্বিতীয় যুদ্ধের সবে শুরু

ইংরাজিতে পড়ছি

The year I was thrown into this hole
the second world war had not started

অথবা Oh, the time has just flowed
like the blood of a massacred babyর কি ভাষান্তরণ হয়
'টুঁটি টিপে ধরা শিশুর রক্তের মত সময় বয়ে গেল
তারপর সমাপ্ত সেই অধ্যায়'

এই অনুকৃতির তফাৎ নিয়ে কিছু মন্তব্য করছি না, বলছি একটি প্রক্রিয়ার কথা, যে প্রক্রিয়ায় 'সবে শুরু' 'টুঁটি টিপে ধরা' লোক-লজ্জ কবিতায় ডিকশন হয়ে যায়। অনুকার শব্দের যে বাঙালি বিশিষ্টতা—চোখের দেখা—সুভাষ ভাষান্তরণের অনুসৃজনে তা আরও বেশি বেশি করে বাংলা কবিতায় সঞ্চারিত করে দেন। কী তাঁর স্বকীয় কবিতায়—কী গদ্য কী পদ্যছন্দে চলে আসে। লক্ষ করেছি এক একটি বই অনুবাদ করছেন সুভাষ, বাংলা কবিতার ডিকশন ততই ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠছে। ওই হিকমতের কবিতা দিয়ে যার শুরু। গদ্য অনুবাদগুলির প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে টানছি না। পড়ছি পাব্‌লো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ, ওলঝাস সুলেইমেনভের 'রোগা ঈগল', নাজিম হিকমতের আরো কবিতা, পাবলো নেরুদার আরো কবিতা, হাফিজের কবিতা, অমরু শতক, গাথা সপ্তসতী। পড়ছি গদ্য অনুবাদে জীবনী, শিকার কাহিনি, উপন্যাস, ইতিহাস কথন, স্মৃতিকথা, পত্রগুচ্ছ, ডায়েরি। পড়ছি উপন্যাস, প্রবন্ধ, আত্মকথন, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিশেষ ঘটনার মূল্যায়ন ইত্যাদি ইত্যাদি। কবিতা তো বটেই। তবু বলি ওই গদ্য পদ্যর ভাষা আবিষ্কার তাঁর সারা জীবনের সাধনা। অনুসৃজন তাঁকে ওই আবিষ্কারের জন্য আরও বেশি কষ্টসহিষ্ণু করেছিল।

বধির লুডভিগ ভ্যান বিঠোফেন যেমন অন্তরে সুর শুনছিলেন, নবম সিমফনির নরনারী কণ্ঠের কয়ারে বসিয়েছিলেন শীলারের লেখা কবিতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও কি শ্রবণশক্তি হারিয়ে মনে মনে শব্দ শুনতে শুনতে শব্দের মহিমা, যা ব্রহ্মস্বাদ সহোদর, অ্যাট দ্য বিগিনিং দেয়ার ওয়াজ ওয়ার্ড, সে সব আত্মস্থ ও অন্তর্গত করে বাংলার ভাষা-প্রতীক আইকনটি হয়ে উঠেছিলেন? যে 'কঠোপনিষদ' থেকে একদা উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, তাতেই তো বলা আছে 'আত্মা' বিষয়ক জ্ঞানের পথ বড়োই দুর্গম। হয়তো ভাষার আত্মা জানবার পথটাও অমনি নিশিতা দূরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি'।

আমাদের সময়ের স্বপ্ন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা

পরমেশ আচার্য

চল্লিশে যে কিশোর বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে, সংগ্রামের আঁচ গায়ে মেখে পঞ্চাশে যৌবনের যাত্রা শুরু করল, তার কাছে সুকান্ত, সুভাষের কবিতা অন্য এক বার্তা বহন করে এনেছিল। বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা যৌবনের বড় কাছের বড় আদরের বাংলার এই দুই কবি। সরোজ দত্ত, সমর সেন, গোলাম কুদ্দুস, রাম বসুর মতো আরো অনেক কবিই এই সময় এক অন্য কবিতার ঐতিহ্য গড়ে তুলতে কলম ধরেছিলেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে এইসব কবিরা, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা রোমান্টিক কবিতার ধারার পাশাপাশি সমাজ-চেতন বাংলা কবিতার এক ভিন্ন ধারার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে মার্কসবাদী ভাবে ভাবিত ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সাহিত্যচর্চায় উৎসাহী ছিলেন এইসব কবিতা তাদের সংগ্রামী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করত। এইসব কবিতায় তারা তাদের স্বপ্নের ভাষারূপ দেখেছিল। আসলে তাদের কাব্য-প্রেরণা আর সংগ্রামী-প্রেরণার সৃষ্টিশীল এক মেলবন্ধন ঘটেছিল সেই সময়। সে ছিল যৌবনের সংগ্রামী চেতনা আর কাব্য প্রেরণার এক উদ্বেল সময়।

কলেজে কলেজে ছাত্র ফেডারেশনের কর্মীরা দেয়াল পত্রিকায় তাদের সমাজ-চেতন কাব্য-চর্চার পরিচয় রাখত। আর এই কাব্য-সাহিত্যচর্চার প্রেরণা তারা পেত নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র থেকে সুকান্ত-সুভাষ এবং কয়েক গুচ্ছ নতুন যৌবনের কবিদের কাছ থেকে। এইসব কবি সাহিত্যিকরা তাদের বড় প্রিয় ছিলেন। পরিচয়, অগ্রণী, অরণি, স্বাধীনতা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়ই প্রধানত এইসব কবি সাহিত্যিকদের লেখা প্রকাশিত হত। মার্কসবাদী ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের কাছেও এইসব পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব তাই ছিল সর্বাধিক। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে পূর্বসূরি হিসাবে নজরুল বা প্রেমেন্দ্র মিত্র তৎকালীন মার্কসবাদী যুবসম্প্রদায়ের মনের কাছের কবি হলেও বুঝি ঠিক তাদের মনের খোরাক পুরোপুরি জোগাতে পারছিলেন না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, সরোজ দত্ত, গোলাম কুদ্দুস বা সমর সেনের মতো কবিরা মার্কসবাদী চেতনার দূত্যে সময়ের স্পন্দন অনুভব করতে পেরেছিলেন। তখনকার প্রেক্ষিতে মার্কসবাদী ছাত্র-যুব সম্প্রদায়ের কাছে তাই তাদের কবিতার আবেদন ছিল অনেক হার্দ্য। তবে সুভাষ আর সুকান্তর কবিতাই এদের সবচেয়ে বেশি নাড়া দিত। তাই সুকান্ত যখন লেখেন 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন', তখন তার সঙ্গে মন পাতাতে অসুবিধা হয় না বিপ্লবের স্বপ্ন দেখা যাত্রিকদের। এদের কাছে সুকান্তের এই পঙ্‌ক্তি শুধু স্লোগান ছিল না। আসলে স্লোগান কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছিল, বা কবিতা স্লোগানে। দুয়ের মধ্যে বিরোধ ছিল না।

ঠিক যেমন চমকে উঠেছিল; সেদিনের যৌবন সুভাষের অশ্রুতপূর্ব উচ্চারণে,

'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য

ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা;
* ** *
শতাব্দী-লাঞ্ছিত আর্তের কান্না
প্রতি নিশ্বাসে আনে লজ্জা;
* * *
প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা'

এ শুধু বাংলা কবিতার যুগান্তর নয়, বাংলা কবিতা পাঠকদের নব্য দীক্ষা। যৌবনের পরিচয় যে শুধু প্রেম, চাঁদ-ফুল, নারীর উন্মুখ গ্রীবা বা পাখির নীড়ের মতো চোখেই সীমাবদ্ধ নয়; বা বিষাদ বিষণ্ণ বিকেলেই যে শুধু কবিতার ফুল ফোটে না; লাঞ্ছিত আর্তের কান্না যে ধ্বংসের বার্তা বয়ে আনে যৌবন তাতেও সাড়া দেয়। আর সে যৌবনের পদাতিক পদক্ষেপে উদাসীন ঈশ্বরও কেঁপে ওঠে। সুভাষের কবিতা সে যুগের স্বাপ্নিক যৌবনকে গভীর নাড়া দিয়েছিল সন্দেহ নেই। সমর সেন বা সরোজ দত্তের কবিতার মেজাজ কিছুটা আলাদা। মেজাজে সিনিক সমর সেনের কবিতায় মধ্যবিত্ত সমাজের প্রতি যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ বা তীক্ষ্ণ আত্মসমালোচনার সুর তা আমাদের অনেককে আলোড়িত করেছিল সন্দেহ নেই। তবে তার কবিতা আমাদের সংগ্রামী প্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারেনি কখনো।

সরোজ দত্ত মেজাজে চিরদিনের বিদ্রোহী। তাই তিনি শুরুই করেন—'আমার কবিতা কভু কহিবে না আমার কাহিনী/অসতর্ক কোন ছত্রে ধ্বনিবে না ক্রন্দন আমার,/আমার কবিতা নহে দুর্বলের দুঃখের বেসাতি,/নহে সে অপূর্ণকাম অক্ষমের মর্মব্যভিচার।' সেই ১৯৩৯ সালে তার 'লেনিন' কবিতায় লিখলেন—'মরণে মেলেনি ছুটি, মৃত্যু তার হল অর্থহীন,—/মরিয়া জীবন্ত হাতে আজো সে গড়িছে ইতিহাস,/' তার সময়ের বুদ্ধিজীবীদের প্রতি শ্লেষ—'তোমার বুদ্ধির সুধা সুরা হল আঁধারে পচিয়া/সে অগ্নি-পানীয়ে নিত্য জ্বলে তব ঘৃণ্য পাকস্থলী/' সরোজ দত্তের সেই বিখ্যাত পঙ্‌ক্তি—'যতই থাক তোমার বাঁশীর জোর,/মন্ত্রের জোর শিকড়ের জোর,/মনে রেখো ওস্তাদ, বিষের থলি আজ পূর্ণ হয়েছে/আমার কানায় কানায়/মনে রেখো আজ পূর্ণিমা।' পঞ্চাশের দশকে চিরবিদ্রোহী সরোজ দত্ত বা ব্যতিক্রমী কবি সমর সেন সম্পর্কে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সুভাষ-সুকান্তই আমাদের হৃদয়ের কবি হয়ে উঠেছিলেন। সুভাষ-সুকান্তের কবিতাই আমাদের বিদ্রোহী মেজাজে প্রেরণা জুগিয়েছিল। আসলে আমাদের মনে হত ওরা আমাদের ভাষাতেই কবিতা লিখেছেন। এতটা একাত্মতা তখন বুঝি আর কারো কবিতার সঙ্গেই তেমন করে গড়ে ওঠেনি। এই সময় রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, গোলাম কুদ্দুসের কবিতাও আমাদের প্রিয় ছিল। এদের অনেক কবিতাই আমাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল। অথচ আজকের বামপন্থী বা মার্কসবাদী বলে পরিচিতরা এদের খোঁজও রাখে না। হায়! বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা। আসলে সেদিনের যৌবন বিপ্লবের স্বপ্ন দেখত। প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় তারা ছিল অভ্যস্ত। সামাজিক অবিচার, অন্যায় ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তারা সরব হতে ভীত ছিলেন না। আজ বুঝি সে যৌবনের উন্মাদনা

হারিয়ে গেছে। আজ ক্ষমতার অধিকারী হয়ে নিজের স্বার্থবোধের বাইরে তাকাতেও বুঝি ভুলে গেছে তথাকথিত বামপন্থীরা। কাজেই কাব্য-সাহিত্যের রুচিও বদলে গেছে হয়তো।

সন্দেহ নেই, পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বাংলার মার্কসবাদী ভাবে ভাবিত ছাত্র-যুব সমাজের হৃদয় দখল করে রেখেছিল সুকান্ত-সুভাষের অদম্য কবিতা। তখন সদ্য আঠারো পেরনোদের মুখে মুখে এদের কবিতার পঙ্‌ক্তি। সুকান্তের, 'আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ/স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি', বা, 'চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ/প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,/এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—/নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার/অবশেষে সব কাজ সেরে/আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে/করে যাব আশীর্বাদ,/তারপর হব ইতিহাস' এইসব পঙ্‌ক্তি সদ্য আঠারো পেরনোদের রক্তে দোলা দিত। এইসব পঙ্‌ক্তি এদের প্রাণে যে সাড়া জাগাত তাতে কোনো ছলনা ছিল না। একই সুর ছিল সুভাষের আহ্বানে, 'কমরেড আজ নবযুগ আনবে না', বা 'দিন এসে গেছে, ভাইরে—/রক্তের দাম রক্তের ধার/শুধবার'। সুভাষ যখন বলেন, 'লক্ষ লক্ষ হাতে/অন্ধকারকে দু-টুকরো ক'রে/অগ্নিকোণের মানুষ/সূর্যকে ছিঁড়ে আনে' বা, 'আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন/মিছিলের একটি মুখ।' কিংবা, আকাশে তাকালাম/তোমার মুখ/চোখ বন্ধ করলাম/তোমার মুখ/বজ্রকে বধির করে তুমি আমায় ডাকছ/...আমি আসছি/দুহাতে অন্ধকার ঠেলে ঠেলে আমি আসছি' তখন সংগ্রামী যৌবনের স্বপ্নের কথাই বলেন। এই স্বপ্ন না দেখতে জানলে যেমন বিপ্লবী হওয়া যায় না, তেমনি স্বপ্ন ছাড়া কী কবিতা লেখা যায়? সুভাষ আমাদের সেই স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছিলেন।

আজকের প্রজন্মের কাছে হয়তো এসব কথা খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য মনে নাও হতে পারে। হয়তো বা অনেকের কাছে হাস্যকরও মনে হতে পারে। কেননা, বর্তমানের ক্যারিয়ার-ইস্ট প্রতিযোগিতার বাজারে এইসব পঙ্‌ক্তি অর্থহীন ভাবালুতা বলেই হয়তো গণ্য হবে। অনেকে তো এইসবকে কবিতা বলেই স্বীকার করবে না। আসলে কবিতার সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক যতদিন কবিতা লেখা হবে ততদিনই চলবে। একমাত্র কবিতার মৃত্যুতে এই বিতর্কের সমাপ্তি। কাজেই সে বিতর্কে না গিয়েও বলা যায় এসব কবিতা 'লেকের ধারে বেড়াতে বেড়াতে চিনেবাদাম খাওয়ার আনন্দ নয়' বা ড্রয়িংরুমের ঠাণ্ডা আমেজে তন্বী নারীর দেহের গন্ধসুখের মৌতাত নয়। এসব কবিতা এমনকি বিষণ্ণ নিঃসঙ্গতার সিনিক অনুভবও নয়। এসব কবিতা মিছিলের মুখ থেকে উৎসারিত তাই এর আওয়াজ কখনো বজ্রকঠোর, কখনো আগুনের নীল শিখার মতন রাগে রী রী করা, কখনো সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে, দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জট। এ কবিতার আবেদন আলাদা। 'মধ্যবিত্ত মনের উচ্ছিষ্টাংশের ফেনিল রোমন্থন' নেই এ কবিতায়। এমনকি এসব কবিতা, 'রিরংসার উদ্‌গতি' মাত্র নয় বা 'প্রাতিস্বিক অস্তিত্বের গূঢ়ৈষী চেতনা ও আধিদৈবিক বেদনার বিপ্লব্ধ ধন'ও নয়। লাশকাটা ঘরে চিৎ হয়ে না থেকে এ কবিতা মিছিলের পায়ে পায়ে হাঁটে। আর সে পদক্ষেপে উদাসীন ঈশ্বরও কেঁপে ওঠে। এ কবিতা বলে, 'হে বিষাদ, তুমি যাও/এখন আমার সময় নেই,/তুমি যাও/...চেয়ে দেখ, হে বিষাদ—/একটু সুখের মুখ দেখবে ব'লে/আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে/চুল সাদা করে আহম্মদের মা/'

একটা সময় ছিল যখন স্বপ্নগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠত মিছিলের পদধ্বনিতে, আর সেই পদধ্বনির স্বরলিপি আমরা দেখতাম সুভাষদার কবিতায়। আমাদের স্বপ্নগুলি প্রাণের জোয়ারে মাতাল হয়ে উঠত। তারপর দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরে গেল। সে চলার যেন আর শেষ নেই। কখন যে সুভাষদার চুলে পাক ধরল আমরা টেরও পেলাম না। যাত্রা হল শ্লথ। স্বপ্ন সকল কেবলই দূরে সরে যায়। মায়াময় অধরা স্বপ্ন বুঝি বিষাদের রূপ নিতে চায়। সুভাষদা বলে ওঠেন—'হে বিষাদ, তুমি আমার হাতের কাছ থেকে স'রে যাও।/জল আর কাদায় ধান রুইতে হবে।/হে বিষাদ,/হাতের কাছ থেকে স'রে যাও,/আগাছাগুলো নিড়োতে হবে।' কিন্তু 'যায় না;/বিষাদ তবু যায় না।/আমি রাগে অন্ধ হই,/আমার বেদনাগুলো তার দিকে/ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারি।/তারপর কখন/কাজের মধ্যে ডুবে গিয়েছি জানি না/চেয়ে দেখি/দূরে ব'সে সেই আমার বিষাদ/হাসতে হাসতে আমি তাকে/দুরন্ত শিশুর মত কোলে তুলে নিই।' 'এখন সেই বয়েস, যখন দূরেরটা বিলক্ষণ স্পষ্ট—শুধু কাছেরটাই ঝাপসা দেখায়।' তাই চলারও বিরাম নেই। কিন্তু কিছুটা যেন আত্মমগ্ন। মাঝে মাঝে বুঝি একা, কিন্তু মিছিলের মধ্যে একা। সুভাষদার জীবনবোধে মানুষ, মিছিল, ভালোবাসা আর ফুল যেন একাকার হয়ে আছে। পঞ্চাশ-ষাটের বিপ্লবী জীবনবোধে এই শব্দগুলিই প্রাধান্য পেয়েছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়, তার জীবনবোধে, ফুল যেন এক অন্য অর্থে ফুটে ওঠে। তার, 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'-এর মতো চমকে দেওয়া পঙ্‌ক্তিতেই ফুটে ওঠে ফুলের প্রতি তার দুর্বার টান। ফুল নিয়ে যে 'কাব্যিকতা' বা ফুলের ঘায়ে মুর্ছা যাওয়ার ফুল বিলাসিতা, যেখানে সমাজ ও সময়ের শব্দ পৌঁছয় না, সেই ফুল বিলাসিতার বিপরীতে ফুলকে এক অন্য অর্থে ঋদ্ধ করে তোলেন সুভাষ তার কবিতায়। যা বাংলা কবিতায় আগে কখনো দেখা যায়নি। সুভাষ যখন বলেন,—'ফুলকে দিয়ে মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই/ফুলের ওপর কোনদিনই আমার টান নেই।/তার চেয়ে আমার পছন্দ/আগুনের ফুলকি—/যা দিয়ে কোনদিনই কারো মুখোস হয় না'—তখন তার এই মনোভাবই প্রকাশ পায়। তাই সুভাষ লেখেন—'শান বাঁধানো পাথরে/আগুনের ফুল তুলে/আমরা আসছি!' বা 'উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তোলার/এই তো সময়'।/আসলে ফুল আর ভালোবাসাই সুভাষের কবিতার, সুভাষের হৃদয়ের, সুভাষের সত্তার সারসংক্ষেপ। কিন্তু এই ফুল আর ভালোবাসা এক ঋজু প্রত্যয়ের প্রতীক। আর তাই তো ধ্বংসের বার্তায় ঋজু উঠে দাঁড়ান, মিছিলে পা মেলান। 'শতাব্দী লাঞ্ছিত আর্তের কান্না/প্রতি নিঃশ্বাসে আনে লজ্জা;' তাই 'দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য/চিনে নেব যৌবন আত্মা।' চল্লিশ-পঞ্চাশ-ষাটের বিপ্লবী যৌবন তাদের পথ ঠিকই চিনে নিয়েছিল। সে পথে কবিতা ছিল কিন্তু তথাকথিত 'কাব্যিকতা' তেমন ছিল না। এখানেই বুঝি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার প্রখ্যাত পঞ্চপাণ্ডব বা পরবর্তী অস্তিত্ববাদী অথবা তথাকথিত 'এ্যাংরি-হ্যাংরি' আসলে আত্মরতির—তরুণতর প্রজন্মের কবিদের সঙ্গে সুভাষ এবং সমসাময়িক মিছিলপ্রিয় কবিদের তফাৎ। নজরুলকে স্মরণে রেখেও বুঝি বলা যায় বাংলা কবিতায় সামাজিক আদর্শবাদে জারিত কবিতার পুরোধা সুভাষ মুখোপাধ্যায়। যে কবিতা শোষিত মানবাত্মার রক্তে রাঙা ভালোবাসায় ঋদ্ধ। দুঃখের হলেও এ কথা বুঝি সত্যি আজকের বামশাসকরা এ কবিতার তাৎপর্য উপলব্ধিতে বা রসগ্রহণে ব্যর্থ।

সে একটা সময় ছিল যখন বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ দাস, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে আর অমিয় চক্রবর্তীর প্রায় একাধিপত্য। এরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র। এদেরকেই বাংলা আধুনিক কবিতার পুরোধা হিসাবে গণ্য করা হত। পাশ্চাত্য ভাব, ভাবনা ও আঙ্গিকের প্রভাবেই প্রধানত এদের কবিমানস গড়ে উঠেছিল। এদের কবিতায় তার ছাপও স্পষ্ট। আত্মমুখী এই কবিকুলের মধ্যেই কিছুটা আলাদা মেজাজের কবি ছিলেন অরুণ মিত্র বা সমর সেন। এই কবিকুলের মধ্যে বিষ্ণু দে, সমর সেন, অরুণ মিত্র বামপন্থী বলেও পরিচিত ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার রোমান্টিক-সিনিক-প্রাতিস্বিক আবহ অতিক্রম করা বুঝি এদের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। এদিক দিয়ে সুভাষ ব্যতিক্রম সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার পোক্ত ঐতিহ্যে সুভাষ যেন এক উল্কাপাত ঘটালেন। তার ব্যতিক্রমী কণ্ঠ চিনে নিতে কিন্তু অসুবিধা হয়নি এইসব প্রতিষ্ঠিত বাংলা কবিদের। সুভাষ এদের কাছ থেকে অকুণ্ঠ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। সুভাষ ভাগ্যবান তিনি এইসব বাংলা কবিদের বন্ধুত্ব ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হননি। এতে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিদের হৃদয়ের ঔদার্যই প্রমাণিত হয়। এই ঔদার্যের কণামাত্রও দেখাতে পারেনি বামশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। সুভাষের দুর্ভাগ্য বামপন্থী শাসকদের প্রতিকূল মনোভাবে শেষ জীবনে তাকে এক অনন্য একক লড়াই চালাতে হয়েছে। আর এই অবস্থার সুযোগ নিয়েছে বিরোধী মতাদর্শের সুযোগান্বেষী রাজনীতিকরা।

ইতিহাসের পরিহাস, যে আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি সুভাষ, সেই আন্দোলনের নেতৃত্বের অবজ্ঞা আর অবহেলাই শেষ পর্যন্ত তার প্রাপ্য হল। অনেক বামপন্থী কবিতাপ্রেমী এই ঘটনার জন্য সুভাষকেই দায়ী করেছেন। শেষ জীবনে সুভাষ বহু ক্ষেত্রে বাম সরকারের কিছু নীতি ও আচরণের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। আর তাতেই তিনি এদের কাছে ব্রাত্য হয়েছিলেন। অথচ কেন এই মিছিলের কবি, ভালোবাসার কবি, যার কাছে মানবতাবোধই মনুষ্যত্বের একমাত্র পরিচয়, যার কবিতায় নিপীড়িত মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও দায়বোধ শেষ অবধি অনির্বাণ, তিনি কেন শেষ জীবনে বামশাসনের বিরুদ্ধ সমালোচনায় সবাক কখনো কখনো, সে কথা তারা কেও ভেবে দেখার প্রয়োজন পর্যন্ত বোধ করেনি। বাম সংস্কৃতি মন্ত্রীর কাছে আত্মরতির কবির মর্যাদা মিছিলের কবির চেয়ে বেশি। অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক কবি-সাহিত্যিকরা অনেকেই হঠাৎ যেন অচ্ছুত বা অবজ্ঞার পাত্র হয়ে উঠলেন এদের কাছে। অন্যদিকে মিছিলের শতহস্ত দূরে থাকা বা কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি বিরূপ কবি-সাহিত্যিকরা রাতারাতি এই বামশাসককুলের রাজদরবারের রত্ন হয়ে উঠলেন। যদি রাজনৈতিক কারণে এমনটা হয়ে থাকে তাহলে তা অতীব দুঃখের কথা। কমিউনিস্ট আন্দোলনের বিভাজন যদি প্রধানত জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের বিরুদ্ধ মতাদর্শের কারণে ঘটে থাকে এবং সে কারণে মিছিলের কবিরা প্রথম ফ্রন্টের সমর্থক হিসাবে দ্বিতীয় ফ্রন্টের নেতৃত্বের কাছে অচ্ছুত বা অবজ্ঞার পাত্র হয়ে থাকেন, তাহলেও আত্মরতি-ইষ্ট কবিরা কীভাবে এদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেন তা বোঝা শিবেরও অসাধ্য। আসলে সংগ্রামী চেতনায় রঙিন ভালোবাসা দিয়ে যে কবিতা সৃষ্টি হয়, সেই কবিতাই সংগ্রামের প্রেরণা জোগায় এই সত্যকেই তথাকথিত

জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের মতাদর্শে বিশ্বাসী বিভক্ত কমিউনিস্টদের বড় শরিকের সাংস্কৃতিক নেতৃত্বন্দ অস্বীকার করেছেন। তা না হলে অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোধা কবি-সাহিত্যিকদের এভাবে ব্রাত্য করে দিয়ে অন্য জগতের কবি-সাহিত্যিকদের কাছে টানার এই প্রচেষ্টার অন্য ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। এ কথা ভাবার কারণ নেই হঠাৎই কবিতা-সাহিত্য-শিল্পের বিচারে শুদ্ধ নন্দনতত্ত্বের মাপকাঠিই স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠল মার্কসবাদী বলে পরিচিত সাংস্কৃতিক প্রশাসকদের বিচারে। মনে রাখতে হবে শুদ্ধ নন্দনে বিশ্বাসী বাংলার পুরোধা কবিরা কিন্তু সুভাষকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে কখনো কার্পণ্য করেননি। সুভাষ আসলে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থবাদীদের শিকার মাত্র। তাতে অবশ্য সুভাষের কিছু এসে যায়নি। সুভাষ শেষ পর্যন্ত সুভাষই থেকেছেন। পাল্টে গেছে বামপন্থীরা। বাম আন্দোলনের অবক্ষয় আর অবক্ষয়ের কবিদের বর্তমান মেলবন্ধনে দূরে দাঁড়িয়ে হাসে পুঁজিবাদী সংস্কৃতির কর্তারা। যে পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে জেহাদেই তৈরি হয়েছিল বাম বা মার্কসবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে।

সময়টা গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিক। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসের ডাকে সশস্ত্র বিপ্লবের রক্তঝরা দিনের অবসানে নতুন করে পার্টি পুনর্গঠনের সময়। সবে বে-আইনি কাল কাটিয়ে পার্টি প্রকাশ্যে এসেছে। অনেক শহিদের স্মৃতিপ্লুত হৃদয় নিয়ে জমায়েত ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। তখনো বুঝি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার নাম হয়নি। শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে গোলাম কুদ্দুসের কবিতা—'ইলা মিত্র স্তালিন নন্দিনী, ফুচিকের বোন।' আমাদের প্রতি লোমকূপে শিহরণ। আজো ভুলতে পারি না সে দুর্বার আবেগ। যদিও স্তালিন আজ আর আমার মতো অনেকের কাছেই বিপ্লবের প্রতীক নয় বরঞ্চ স্বৈরাচারী নায়ক। তবুও সে সময়ের আবেগের নির্মল সততা আজো মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল। এই আবেগকে অস্বীকার করার কোনো অবকাশ নেই। সুভাষের কবিতা যেন আমাদের সেই অমলিন আবেগেরই প্রকাশ। গোলাম কুদ্দুস, সরোজ দত্ত, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন এবং আরো অনেক কবিই তখন এই বিপ্লবী আবেগের অংশীদার। এদের কবিতায় আমরা আমাদের হৃদয়ের কথা মনের ভাবের প্রকাশ দেখতাম। আমরা সুভাষ, সুকান্তর মতো এদের কবিতাও পড়তাম। এখনো পড়তে পারি। এখনো পড়ি। এইসব কবিদের এবং তাদের সৃষ্টিকে অস্বীকার করার অর্থ বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐতিহ্যকেও অস্বীকার করা। জানি না বর্তমান সরকারি বামপন্থীরা সে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন কিনা। তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি যে অবজ্ঞা বা উপেক্ষার পরিচয় রেখেছেন তাতে বুঝি নিজেদেরই অমর্যাদা করেছেন এরা।

যারা বলেন সুভাষ শেষ জীবনে আদর্শচ্যুত হয়েছেন, তাদের অবগতির জন্য তার শেষ জীবনের কবিতা থেকে অসংখ্য পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে দেখানো যায় সুভাষ শেষ পর্যন্ত নিপীড়িত মানুষের প্রতি হৃদয়ভরা ভালোবাসা নিয়ে সেই পুরোনো সুভাষই ছিলেন। হয়তো বলার ভঙ্গি কিছুটা বদলেছিল। সেটাই তো স্বাভাবিক। জীবন তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। নিপীড়ক আর নিপীড়নের কায়দা যখন পাল্টায় তখন এদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কায়দাও পাল্টাতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে কাদের পক্ষে কলম ধরা হয়েছে; নিপীড়ক না, নিপীড়িত? সুভাষ

কিন্তু শেষ জীবন পর্যন্ত নিপীড়িতের পাশে থেকেই কলম চালিয়েছেন। হয়তো সে কলমের আঁচ স্বাভাবিকভাবেই বামশাসকদের গায়েও লেগে থাকবে। তার জন্য দায়ী কিন্তু সুভাষ নয়। বাম আন্দোলনের অবক্ষয় ও অধঃপতনই দায়ী এর জন্য। পুঁজিপতি আর পুঁজিবাদের তল্পীবহন করে তো আর মার্কসবাদী থাকা যায় না। তখন মার্কসবাদ মুখোস হয়ে দাঁড়ায়।

জীবন সায়াহ্নে সুভাষ বাম আন্দোলনের অধঃপতনে যারপরনাই ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছিলেন। তার বিদ্রোহী কলম সে অধঃপতনকে ধিক্কার জানিয়েছিল। একদা কংগ্রেস শাসকদের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট কবিদের কলম ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপে সরব হয়েছিল। ক্ষমতার গদিতে বসে কংগ্রেসের যে অবক্ষয় ও অধঃপতন ঘটেছিল সমাজ সচেতন কবি সাহিত্যিকদের লেখায় তা ফুটে উঠেছিল। প্রায় ঠিক একই প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার মদমত্তে বামেদের অবক্ষয় ও অধঃপতনও অবশ্যই সমাজ সচেতন সৎ কবিসাহিত্যিকদের লেখার বিষয় হতে পারে শুধু নয়, বোধহয় হওয়া জরুরি। সুভাষ তার এই নৈতিক দায়িত্বই পালন করেছিলেন মাত্র। আমাদের কৈশোরের, যৌবনের স্বপ্নগুলি আজ যখন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে তখন সুভাষের কবিতায় সে ইতিহাসের স্বাক্ষর দেখতে পাই। সুভাষ শেষ পর্যন্ত আমাদেরই কবি। আজ যখন সৎ আদর্শনিষ্ঠ বামকর্মীরা ক্রমেই বামশাসনে ব্রাত্য হয়ে যাচ্ছেন তখন তাদের সুভাষের মতোই এক ব্রাত্য কবির বড় প্রয়োজন ছিল। সুভাষ বুঝি বাম আন্দোলনের অনন্য বিবেক।

সুভাষ যখন লেখেন—'ঝাণ্ডা বয় কেউ-কেটারা/ঠাণ্ডা ঘরে রয় নেতারা।/মাটিতে আর পা পড়ে না/কুর্সি ছেড়ে আর নড়ে না।/' বা, 'বাবু হয়ে ব'সে গদিতে।/ভুলে গেছে ভুঁয়ে পা দিতে।/দেশের লোকের ছাড়ছে নাড়ি।/বাড়ছে দলের গাড়ি বাড়ি।/মন্ত্রীমশাই করেন কী?/পরের ধনে পোদ্দারি।/গরিবের জন্য পোড়ে মন/গুছিয়ে নেন বাছাধন।' তখন খুব ভুল করেন কি? এখন এইসব পঙ্‌ক্তি যদি বামশাসকদের গায়ে জ্বালা ধরায়, তাহলে বলতে হয়—'ঠাকুর ঘরে কে? আমি কলা খাইনি।' আসলে চল্লিশের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক অবধি সুভাষের কবিতার ধারাবাহিকতা ও বিবর্তন লক্ষ করলে দেখা যাবে গণমানসের কল্যাণই তার কবিতার নির্যাস। তার এই লক্ষ্য থেকে সুভাষ কখনোই বিচ্যুত হননি।

যে কবি চল্লিশের দশকে লিখেছিলেন—'পেট জ্বলছে, ক্ষেত জ্বলছে/হুজুর, জেনে রাখুন/খাজনা এ-সন মাপ না হলে/জ্ব'লে উঠবে আগুন।' সেই কবিই ১৯৭৯ সালে লেখেন—'লাল নিশান নিয়ে একদল মজুরের এক বিশাল মিছিল আসছে।/আমার মনে হল, লেনিন যেন চেঁচিয়ে বললেন।/শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—/একটু পা চালিয়ে, ভাই একটু পা চালিয়ে।' কিন্তু মিছিল বুঝি কোথায় আটকে গেছে। মিছিলের কবি উৎকণ্ঠিত, ১৯৮৫তে 'টানা ভগতের প্রার্থনা' কবিতায় লিখলেন—'বাজে রঙের মিশালে আর সাত নকলে/আমাদের সে নিশানের/সে রং আর নেই।/ফিকে তো বটেই, তা ছাড়া কী জানো,/রোদে একটু পুড়লে/জলে একটু ভিজলেই উঠে যাচ্ছে।/মাটি থেকে তুলে তিনটে রং গনগনে আঁচে জ্বাল দিলেই/টকটকে লাল হবে।/ভাই ও ভাই/' কিন্তু কবির প্রার্থনা বুঝি বিফলেই যায়। তবু কবির চলার শেষ নেই। কিন্তু মিছিল বুঝি ফাঁকা হতে থাকে। কবি যেন কিছুটা বিমর্ষ, কিছুটা একা। বছর গড়িয়ে যায়, ১৯৮৯তে কবি লেখেন—'আমাকে চিনবে না।/অনেকটা

রাস্তা উজিয়ে/আজ এই পড়ন্ত বেলায়/আমি আসছি।/মাথাভর্তি মাঠভাঙ্গা ধুলো/দুটো পায়/কাটায় কাটাছেড়া দাগ।/বলি চেনা লোকেরা সব/গেল কোথায় গো?' না।•কেও সে ডাকে সাড়া দেয় না। তাই কবি বলেন—'আমার সেই ডাক/আর কাউকে না পেয়ে/মাথা নিচু করে/আবার আমার কাছেই ফিরে আসে।।' বিদ্রোহী কবির এই ব্রাত্যোপলব্ধি বুঝি আমাদের সকলের পাপের ফল। চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরের আমাদের স্বপ্নগুলি শতাব্দীর শেষের আগেই ভেঙে চুরমার। সুভাষের এই উপলব্ধি তো আমাদের সকলের যারা একদিন একই পথের পথিক ছিলাম। আসলে সুভাষ আমাদের ব্রাত্য বিদ্রোহী সত্তার কথাই লিখেছেন তার শেষ জীবনে। অবশ্য শাস্তিও তাকে কম পেতে হয়নি। সে শাস্তি হাসিমুখে নিয়ে তিনি তার কলম চালিয়ে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। এবং সে কলমে নিপীড়িত মানুষের ব্যথা-বেদনার কথাই ফুটে ওঠে। নিপীড়কের প্রতি শ্লেষ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপে উচ্চকিত তার কলম জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সুভাষ যদি বামপন্থী না হন তাহলে এদেশে বামপন্থী খুঁজে পাওয়া যাবে না সাতাশ বছরের বাম রাজত্বেও।

আজ মনে পড়ে বীরভূমের মল্লারপুর স্টেশনে ভোরের ট্রেনের জন্য অপেক্ষারত সুভাষদা ও আমার মধ্যরাতের কথোপকথন। সুভাষদা আক্ষেপ করছিলেন,—'একটা কোন চাকরীও যদি পেতাম ভাল হত।' আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। সালটা ঠিক মনে নেই, পঞ্চাশের দশকে কোনো এক সময়. সম্ভবত। সুভাষদা তখন কাগজে গ্রামবাংলা সম্পর্কে লিখছেন গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় হিসাবে। শান্তিনিকেতনে এসেছেন কোনো উপলক্ষে। সম্ভবত সুনীল সেন আমায় বলেন সুভাষদা বীরভূমের গ্রামে যেতে চান, তুমি তো কিছুদিন গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলে, নিয়ে যেতে পারবে? আমি একপায়ে খাড়া। একদিন রওনা হলাম। মল্লারপুর স্টেশনে নেমে কিছুদূরে মল্লারপুর গ্রাম। কৃষকসভার শক্ত ঘাঁটি। পাশে মাইল দুয়েক দূরে 'গোয়ালা' গ্রাম, একদা লাল দুর্গ বলে পরিচিত ছিল। বীরভূমের কৃষক সভার এক স্থপতি দেবেন রায়ের বাড়ি মল্লারপুর গ্রামে। সেখানেই উঠলাম। ধরণী রায় তখন বীরভূম কৃষকসভার সম্পাদক। একই গ্রামে বাড়ি। বোধহয় সম্পর্কে ভাই। দেবেনদা, ধরণীদা দুটি চরিত্র। প্রায় উপন্যাসের চরিত্র। যাইহোক দেবেনদার সঙ্গে সুভাষদার পরিচয় করিয়ে দিলাম। দেবেনদা অবশ্য সুভাষদা কত বড় কবি সে বিষয়ে কোনো ধারণাই রাখেন না। কিন্তু কলকাতা থেকে এক লেখক কমরেড এসেছে এই যথেষ্ট। খাওয়ার জোগাড়ে লেগে গেলেন। নিজের খাওয়ার জোগাড় নেই তেমন, কিন্তু গ্রামের বহু বাড়িতেই অবারিত দ্বার। এক বৌদির বাড়িতে আমি আগে মল্লারপুর এলেই খেতাম আর দেবেনদার ঘরে চাটাই পেতে শুতাম। সকালে দেবেনদার বুড়ি মা শালপাতায় একগাদা মুড়ি-কলাই আর কাঁচা লঙ্কা খেতে দিতেন। প্রথম দিন ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছিলাম পরিমাণ দেখে। দেবেনদা নিজের পাতার সঙ্গে আমার অর্ধেকটাও সাবাড় করে আমায় রেহাই দিয়েছিলেন। সুভাষদার অবস্থাও তাই হয়েছিল।

দুপুরের খাওয়া সেরে রোদ পড়ার আগেই বেরিয়ে পড়লাম সুভাষদাকে নিয়ে। যাব ম্যানেজার পাড়া, ডামড়াগ্রাম হয়ে নিমপাহাড়ি কমরেড টুরকু হাঁসদার বাড়ি। মাইল পাঁচ-

ছয় হাঁটতে হয়। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গেলে সময় কম লাগে। ক্যানেলের পাড় দিয়ে একটু বেশি। ম্যানেজার পাড়া থেকেই সাঁওতাল কমরেডদের উষ্ণ আবাহন। ডামড়া আর নিমপাহাড়িতে বাউড়ি, বাগদি, গোয়ালা আর সাঁওতাল বাড়িতে যে সাদর আতিথেয়তার পরিচয় পেয়েছিলেন, সুভাষদা মুগ্ধ। আসলে আমি একদা কৃষকসভার আওতায় বয়স্কশিক্ষার কেন্দ্র চালাতাম কিছুদিন। সেই সূত্রে কমরেড মাস্টার হিসাবে পরিচিত। কয়েক বছর পর আমাকে পেয়ে তাই কমরেডরা গ্রামের যাবতীয় খবরাখবর জানাতে ব্যগ্র। কে কে মারা গেছে। কারা অসুস্থ। কার সন্তান হয়েছে। কার ভাগের জমি নিয়ে মহাজনের সঙ্গে ঝামেলা। শহিদ দিবস কীভাবে পালিত হচ্ছে এইসব হাজারো কথা জানাতে উদ্‌গ্রীব গ্রামের লোকেরা। আমি যে তাদের আত্মীয়, আপনজন, কমরেড। সরকারি রিলিফের কাজে এক চৌকো মাটি কেটে আট আনা মজুরি। প্রখর গ্রীষ্মে দিনে এক চৌকো পাথুরে মাটি কাটতে প্রাণ বেরিয়ে যায় বুঝি। নিজেদেরই ভাত জোটে না। সেই ভাত বিনা দ্বিধায় ভাগ করে খেয়েছেন কমরেডের সঙ্গে। আজো সে স্মৃতি আমার অমলিন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি ননী ভৌমিকের আগন্তুক গল্পের পটভূমি এই ডামড়া-নিমপাহাড়ি গ্রাম। এখানেই আগন্তুক কমরেডদের পুলিসের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে তিন সাঁওতাল কমরেড শহিদ হন। এদের স্মরণে প্রতি বছর শহিদ দিবস পালিত হত। একদা ছাত্রনেতা সরোজ হাজরা এই আগন্তুকদের একজন ছিলেন। গল্পের শেষে সেই সাঁওতাল রমণীর কথা 'কেনে ভুল করলিরে কমরেড' আজো মনকে উদাস করে। কয়েক বছর আগে বন্ধু সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিনিকেতনের সুনীল সেনকে নিয়ে ডামড়া গিয়েছিলাম। টুরকুদা, শ্যামদা মারা গেছেন। রামদা মৃত্যুশয্যায় প্রায় চিকিৎসাহীন। ডামড়া গ্রামের শহিদ দিবসের সভার সেই মাঠটা আর খুঁজে পেলাম না। জানি না এখনো শহিদ দিবস পালিত হয় কিনা।

যাইহোক, ব্যাপার-স্যাপার দেখে সুভাষদা হতবাক। আমার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন তো'। আমি বললাম কিছুই না কম বয়সে এদের আশ্রয়ে ছিলাম তাই আমার উপর এদের মায়া পড়েছিল। দুদিন বিভিন্ন গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরে, এদের দেওয়া পাটশাক সেদ্ধ, একটুকরো পেঁয়াজ আর মোটা ভাত খেয়ে, চাটাইয়ে শুয়ে সুভাষদা এদেরই একজন হয়ে গেলেন। জানি না বাংলার কজন কবির এমন অভিজ্ঞতা আছে। টুরকু হাঁসদা, রাম বাউড়ি, শ্যাম বাউড়ি তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষের সময় ধানের গাড়ি লুঠ করতেন। লম্বা, পেটানো কালো শরীর মেদহীন। লাঠি হাতে একা দশজনের মোকাবিলা করতে পারতেন। ওই অঞ্চলে এরাই কমিউনিস্ট পার্টি ও তার প্রভাব গড়ে তুলেছিলেন। টুরকুদা একদা বিধানসভার সদস্য হয়েছিলেন। সুভাষদা মুগ্ধ হয়েছিলেন এই মানুষগুলির পরিচয় পেয়ে। দুদিনের সফর সেরে আবার মল্লারপুর গ্রাম হয়ে স্টেশনে হাজির মধ্যরাতে, ভোরের ট্রেনের অপেক্ষায়।

সুভাষদার তখন আর্থিক অবস্থা নিদারুণ। একটা চাকরি পেলে বেঁচে যান। কিন্তু হাঁটার নেশায় বা মানুষকে ভালোবাসার নেশায় কোনো খামতি ছিল না। আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম সুভাষদার হাঁটার ক্ষমতা এবং যে-কোনো অবস্থায় মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা দেখে।

কখনো মনে হয়নি সুভাষদা একজন বড় কবি বা তথাকথিত 'সেলিব্রিটি'। অবশ্য তখন তিনি ঠিক সেলিব্রিটি ছিলেন না যদিও কবি হিসেবে তার স্বীকৃতি অবিতর্কিত। মানুষ হিসাবে সুভাষদাকে আমার মনে হয়েছিল খুবই কোমল স্বভাবের। কিন্তু কবিতার সুর ঋজু দৃঢ়। এই কোমল স্বভাবের মানুষটি কিন্তু কখনোই আত্মস্বার্থে কোনোরকম আপস করেননি। শেষ জীবন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় কোনো দ্বিধা দেখা যায়নি তার মধ্যে। নিদারুণ আর্থিক টানাটানি সত্ত্বেও ক্ষমতার বা শাসকদের নেকনজরে আসার কোনো চেষ্টা বা ইচ্ছা দেখা যায়নি। এমনকি যে সর্ববৃহৎ সংবাদ প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে বা প্রশ্রয়ে বাংলার বহু তথাকথিত কবি ও সাহিত্যিকদের রমরমা ও নামী-দামি হয়ে ওঠা সেখানেও তিনি চাকরিপ্রার্থী হননি। বাংলার মেরুদণ্ডহীন কবি সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সুভাষদা বুঝি এক অনন্য ব্যতিক্রম।

সুভাষদা কলকাতায় এক বক্তৃতায় বলেছিলেন সবার মতন কবিকেও মানুষ হতে হয়। সুভাষদার মতে— 'আগে মানুষ হতে হয়। তারপর কেউ কর্মী, কেউ হয় কবি। কবিকে কর্মী জোগায় পেটের খোরাক। কর্মীকে কবি দেয় মনের খোরাক।' সুভাষদা সারাজীবন এই মানুষ হওয়ার সাধনা করে গেছেন। তাই সুভাষদা মানুষের কবি। তার কথায়—

'আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।
আমি যেন আমার কলমটা
ট্রাক্টরের পাশে
নামিয়ে রেখে বলতে পারি
এই আমার ছুটি;
ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।'

এর পরও বামশাসকদের সমালোচনার জন্য যদি তাকে কেউ প্রতিক্রিয়াশীল বা ভ্রান্তদর্শী বলে অভিযুক্ত করে তবে অভিযোগকারীর বিবেক-বুদ্ধি বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতে হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের বিবেকের অনুশাসন মেনে মানুষকে ভালোবাসার আদর্শে নিষ্ঠ থেকেছেন। শেষদিন পর্যন্ত সুভাষ মিছিলের কবি, বিদ্রোহের কবি, মানুষের কবি। কোনোদিনই নিজের এই চরিত্রচ্যুত হয়ে আত্মরতির কবি হয়ে ওঠেননি। তাই আমাদের সময়ের স্বপ্নের কবি সুভাষদার শেষ জীবনের কিছু কবিতা আমাদেরও স্বপ্নভঙ্গের কথা হয়ে ওঠে। সুভাষদা আমাদেরই কবি, আমাদের সময়ের স্বপ্নের কবি, স্বপ্নভঙ্গের সময়ের কবি।

ছন্দ-প্রকরণ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুমিতা চক্রবর্তী

"এটা কোনও চিন্তা করে করি না যে এভাবে লিখব কবিতাটা। তবে আমি শুরু করেছিলাম ছন্দ মিলিয়েই। যখন শুরু করেছিলাম তখন আমি বাংলা কবিতার আধুনিকতা বিষয়ে তার তৎকালীন ছন্দ বা গদ্যরীতি বিষয়ে বিশেষ কিছুই জানতাম না। লোকে ভালো বলেছে, লিখে গেছি।"—এই উক্তি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। একটি সাক্ষাৎকারে অদ্রীশ বিশ্বাসকে এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন (পত্রপুট, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সংখ্যা, শারদীয় ১৪০২)। এই কথাগুলি সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন ১৪০২ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ তখন সুভাষ মুখোপাধ্যায় বয়সে এবং মনের দিক থেকে অনেকটাই চলে এসেছেন জীবনের প্রান্তীয় পর্বে। সারাজীবন কবিতার বহু বিচিত্র রূপকর্মে যেভাবে তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেছেন সেই সৃষ্টিসম্ভার অনেকটা সম্পূর্ণভাবেই তখন পাঠকের সামনে উপস্থিত। সেই সঙ্গে রাজনৈতিক ভাবনা-চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর যে মতবদল ঘটেছিল তা-ও অপ্রকাশ নেই কারোর কাছেই। এজন্যই কবিতার প্রকরণ বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সময়ের উক্তিটি দিয়েই লেখা শুরু করা গেল যখন এই অসামান্য ভাষাশিল্পীর রচনাকর্মের সমগ্রতা অনেকটা একসঙ্গে উদ্ভাসিত থাকবে পাঠকের চোখের সামনে এবং মনের ভিতরে।

পূর্বোক্ত বাক্যগুলির ঠিক পরেই যে কথাগুলি বলেছেন কবি তা বিতর্ক তুলুক বা না তুলুক, তাঁর ক্ষেত্রে আর একটু ভাবতে আমাদের বাধ্য করে। তাঁর অল্পবয়সের কবিতা কাদের কাছে ভালো লাগত—এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—"সাধারণত রাজনৈতিক জগতের লোকজনরাই প্রতিক্রিয়াটা জানাত। তাদের তো সেভাবে নন্দনতত্ত্বের ধারণা ছিল না। রাজনীতির লোকেদের কোনওকালেই ভালো থাকে না। সারা পৃথিবীর ক্ষেত্রেই এটা সত্য, যত খারাপই শোনাক। তাদের ভালো-মন্দ মানে কবিতার সামগ্রিকতা বা হয়ে-ওঠার ভালো-মন্দ, বিষয়ের বা আদর্শের ভালো-মন্দ। সে সব তো আমরা ভালোই পারতাম। ফলে আমার ছন্দ-মিলের কবিতার কদর হলো।" (পূর্বোক্ত, পত্রপুট, পৃ. ৪২)

আবার গদ্য-কবিতা লেখার ব্যাপারেও নিজস্ব ভাবনা তিনি ব্যক্ত করেছেন ওই লেখাতেই—

"...আমার ছন্দ মিলের কবিতার কদর হলো। চলছিল, একসময়ে গদ্যকবিতা লিখতে শুরু করলাম। এই শুরুটা কিন্তু ভেবেচিন্তেই করেছিলাম। মানে, প্ল্যান করে গদ্য কবিতার দিকে আসি আমি। তবে, গদ্য কবিতাকে যতটা পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিক থেকে নিয়েছিলাম ততটা প্রাণ থেকে নিতে পারিনি। আমার মনে হয় গদ্য কবিতায় একটা ফাঁকি থাকে, যেটা থাকা কবির পক্ষে অনুচিত।" (পত্রপুট, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২)।

এই প্রসঙ্গেই কবি ব্যাখ্যা করেছেন কীভাবে গদ্যকবিতা সম্পর্কে এই দ্বিধা তাঁর কেটেছিল। কাছাকাছি সময়ে অন্য একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, লিখেছিলেন গোলাম কুদ্দুস। কবিতা

গদ্যরীতিতে রচিত কিন্তু তাঁর সুগভীর আন্তরিকতা এবং পাঠকদের কাছে কবিতাটির বিপুলভাবে পরিগৃহীত হবার ঘটনা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে সচেতন করে তুলল। তিনি অনুভব করলেন—কবিতা গদ্যেই লেখা হোক অথবা নিরূপিত ছন্দে, মূল কথাটা হলো কবির অন্তরের উপলব্ধি সেখানে ব্যঞ্জিত হচ্ছে কী না এবং পাঠকের হৃদয়ে তা সঞ্চারিত হতে পাচ্ছে কী না। এরপর থেকেই কবিতার রূপরীতিতে নিরূপিত ছন্দ অথবা গদ্য—কী ব্যবহৃত হবে সে বিষয়ে তাঁর দ্বিধা সম্পূর্ণ কেটে যায়। এই বিরল প্রতিভাগুণে সুভাষ মুখোপাধ্যায় আজও এক কবি-প্রধান। তিনি কবিতার প্রতিটি বিন্দুতে, প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে গভীরভাবে আন্তরিক। তাঁর এই আন্তরিকতা তাঁর ভাবনার স্ববিরোধেও অনুভূত হয় বলেই কোনো পর্বেই আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে অগ্রাহ্য করতে পারিনি।

প্রত্যেক কবিরই কিশোর বয়সে একজন বা একাধিকজন আদর্শ কবি থাকেন, যাঁর ভাবনা এবং ভাষাভঙ্গি তিনি কিছুটা অনুসরণ করেন সচেতন বা অসচেতন ভাবে। আমরা জানি, বিশ শতকের প্রথম পর্বে কবিদের (সত্যেন্দ্রনাথ মোহিতলাল, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন ইত্যাদি) পাশাপাশি ছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ অগ্রজ রবীন্দ্রনাথ। তাঁদের শিল্প বিশ্বাস এবং শিল্পরীতিতে স্বাতন্ত্র্য থাকলেও রাবীন্দ্রিকতার স্পর্শ সেখান অভ্রান্ত। তুলনায় তিরিশের কবিরা রবীন্দ্র-অনুরাগী হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের কাব্যাদর্শ আবর্তিত হয়েছিল কয়েকজন ইউরোপীয় কবিকে ঘিরে—বোদল্যের, মালার্মে, ইয়েটস, এলিয়ট। কিন্তু চল্লিশের কবিরা সেভাবে ইউরোপীয় কবিদের দ্বারা আকৃষ্ট হননি। কবিতা রচনার প্রথম পর্বে এই মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালি কিশোরদের কাব্য-অভিজ্ঞতার ভুবনে রবীন্দ্রনাথ-ই ছিলেন সর্বাধিক মুগ্ধ করা কবি। এই স্বীকৃতি আমরা অরুণ মিত্র, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন—"কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেলেবেলা থেকেই মন-প্রাণ জুড়ে ছিলেন। ছ-সাত বছর বয়সেই রবীন্দ্রনাথের গান শুনেছি, গেয়েছি।" (পত্রপুট, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯)।

স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছাত্র যখন ছিলেন এবং যখন আশুতোষ কলেজে আই. এ. পড়তে শুরু করেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সময় ১৯৩৭-৩৮ তখন তাঁর কবিতা কিছু কিছু ছোট পত্রিকায় মুদ্রিত হতে শুরু করেছে। তিনি সুপরিচিত হয়ে উঠলেন ১৯৩৮ সালে শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'চীন : ১৯৩৮" কবিতাটির জন্য। একটি কবিতার প্রকরণ অনেক সময়ে আপনা থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে যায় যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। বাংলার জনমানসে ১৯৩৩-৩৪ সাল থেকে এক পর্বান্তর সূচিত হয়েছিল—বিশেষ করে শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে। তখন বিশ্ব রাষ্ট্রনীতিতে ফ্যাসিবাদ পরাক্রমের সঙ্গে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। শিক্ষিত বাঙালি সমাজে একই সময়ে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে সাম্যবাদের চেতনা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামও তখন যথেষ্ট জোরালো। সার্বিকভাবে ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ এবং ঔপনিবেশিকতা বিরোধী সচেতনতার শরিক সকলেই। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে আন্তর্জাতিক প্রতিবাদ জেগে উঠেছিল বাঙালিও ছিল তার সহপন্থী। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সরব। এই পরিস্থিতিতে মানুষের মন চাইছিল প্রতিরোধের কবিতা, গণশক্তির উজ্জীবিত ঘোষণায় মেলাতে চাইছিল নিজের কণ্ঠস্বর। এই আকাঙ্ক্ষার যথার্থ

প্রতিধ্বনি হয়ে বেজে উঠল ১৯৩৮ সালের শারদীয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত, কবি অরুণ মিত্র (তখন আনন্দবাজারে কর্মরত ছিলেন) নির্বাচিত দুটি কবিতা—দিনেশ দাসের 'কাস্তে' এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'চীন : ১৯৩৮'। সাময়িকতার বৃত্ত ছাপিয়ে এই কবিতা এখনও আমাদের হৃদয়ের সংক্ষুব্ধ বেদনাকে ধারণ করে। কেবল জাপান ও চিন শব্দ দুটির জায়গায় বসিয়ে নিতে হয় ভিন্ন দেশের নাম।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাটির প্রথম স্তবক—

জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাকাও
কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও
লালনিশানের নিচে উল্লাসী মুক্তির ডাক
রাইফেল আজ শত্রুপাতের সম্মান পাক।

ছন্দ সরল কলাবৃত্ত। প্রতি স্তবকে তিনটি করে পর্ব, প্রতি পর্বে ছয় মাত্রা। ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত কবিরা প্রায়শই ব্যবহার করেন উদ্দীপ্ত মনোভঙ্গি এবং বেগবান চলন মূর্ত করবার জন্য। বিষ্ণু দে এই ছন্দে বহু ভাস্বর কবিতা লিখেছেন—'ঘোড়সওয়ার' ও 'ক্রেসিডা'র দৃষ্টান্ত সকলেরই মনে পড়বে। কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী', 'ফরিয়াদ', 'আমার কৈফিয়ৎ', 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' সবই ছয় মাত্রিক কলাবৃত্তে লেখা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও এই ছন্দটিকে, কেবল 'পদাতিক'-এ নয় পরবর্তী কবিতাগ্রন্থগুলিতেও (চিরকুট, অগ্নিকোণ) প্রয়োগ করেছেন স্বাভাবিক মসৃণতায় এবং স্বচ্ছন্দ তেজোময়তায়। পরবর্তী দুটি সংকলন থেকে দুটি দৃষ্টান্ত—

১.

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ,
রুখব দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্ব রাজ।

(জনযুদ্ধের গান : চিরকুট)

২.

দিন এসে গেছে, ভাইরে—
বিদেশীরাজের প্রাণভোমরাকে
নখে নখে টিপে মারবার।

(অগ্নিকোণ : অগ্নিকোণ)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ছন্দের প্রয়োগে অতি তরুণ বয়সেও কখনও কোনো স্খলন দেখা যায় না, সে কথা বলা বাহুল্য। জীবনের মধ্যপর্বের পর মিশ্র কলাবৃত্ত, দলবৃত্ত এবং গদ্যরীতির কবিতাতেও সমানভাবে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছিলেন কবি।

মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারেও কিন্তু এই প্রথম পর্ব থেকেই মনোযোগী ছিলেন তিনি। অর্থাৎ এই সচেতনতা প্রথমাবধি তাঁর চিত্তলগ্ন ছিল যে ছন্দের জন্য কবিতা নয়, কবিতার

জন্যই ছন্দ। কাজেই কবিতার ভাববস্তু আর উপলব্ধির সঙ্গে একাত্ম করেই গড়ে তুলতে হবে ছন্দের অবয়ব।

মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে অবশ্য একটু বিশিষ্টতা লক্ষ করা যায়। সাধারণত আমরা এরকম শুনেছি যে, ভাবগম্ভীর কোনো উপলব্ধি, কোনো মহৎ আদর্শ অথবা ভাবনার ভাষারূপ অথবা কোনো আখ্যান বিবৃতির ধীরগতি অথচ অত্যন্ত প্রলম্বিত নয়—খানিকটা স্বাভাবিক বাচনের গতিবেগকে যা স্মরণ করায়—সেই ধরনের বাণী মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দে শ্রুতি-স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। অধিকাংশ কবির ক্ষেত্রেই সত্য এ কথা। ব্যতিক্রম নন কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা বিষ্ণু দে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম পর্বে যখন মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন তখন তাঁর মনোভঙ্গিতে অনেক সময়ই যেন কিছুটা তির্যক কটাক্ষ ঝলকায়। যেন তিরিশ-চল্লিশের দশকের কবি—যাঁর সামনে চির অভ্যস্ত, ঐতিহ্য ভাবনাশ্রয়ী, স্বস্থ পৃথিবীর প্রথাসিদ্ধ চেহারা ভীষণভাবে ঘুরে গেছে মহাযুদ্ধ, সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনে—তিনি আর সুপ্রাচীন ছন্দটির সসম্ভ্রম গাম্ভীর্যে আস্থা রাখতে পারছেন না। তাই এই পুরোনো ছন্দটি যে জীবনযাপনের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি ছিল তা এইকালে কিছুটা আক্রমণযোগ্য, অন্তত পরিহাসযোগ্য হয়ে উঠেছে।

'বিকেলে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাসা চিজ! অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ!'

(নির্বাচনিক : পদাতিক)

আট এবং দশ মাত্রার দুটি পর্বের বিন্যাসে রচিত মহাপয়ার ছন্দে যে মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তা কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা পয়ারে এবং মধুসূদন রবীন্দ্রনাথের পয়ার রচনার অভ্যাসে আমরা প্রতিফলিত হতে দেখিনি। এই ধরনের সবিদ্রূপ আপাত-লঘুতা পয়ার ছন্দে প্রধানতই ব্যক্ত করেছেন তিনি। যেন ওই মাত্রা সমতা এবং পর্ব সমতার শ্রুতি-সৌষম্য—বা যে-কোনো রকম সৌষম্য বোধের নিশ্চিত আধার আজকের যুগে ব্যঙ্গেরই লক্ষ্য হতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উদ্ধৃত কবিতাংশটির প্রথম পঙ্‌ক্তির দ্বিতীয় পর্বে দশ মাত্রার পরিবর্তে নয় মাত্রা পাওয়া যায় লিখিত বিন্যাসের সাক্ষ্যে। কিন্তু উচ্চারণে এক মাত্রার অভাব আদৌ অনুভূত হয় না। উক্ত পঙ্‌ক্তিটি দু-ভাবে উচ্চারণ করা যেতে পারে। 'লেক' শব্দটি অনেকেই কিছুটা টেনে এবং মাঝে একটি ই-স্বরের আগম ঘটিয়ে উচ্চারণ করেন 'লেইক'। অথবা 'প্রত্যহ' শব্দটিকে তিন মাত্রার পরিবর্তে সহজেই চার মাত্রায় 'প্রত্ তহ' রূপে উচ্চারণ করা যায় যেখানে স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে যাবে এক মাত্রা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এ জাতীয় প্রয়োগ এত ঘটিয়েছেন যে এ বিষয়ে আর বাগ্‌বিস্তার বাহুল্য।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে দেখি মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দে ঝংকৃত হয়ে উঠেছে গণ-চেতনায় উদ্দীপ্ত কবির বিপ্লবী সংকল্প। সেখানে পরিহাসের লেশমাত্র নেই। দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত হয়েছে প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে এবং ছন্দের গম্ভীর প্রবহমানতায়। অথবা জীবনের গভীরতম সেই উপলব্ধি যেখানে বেদনার সমুদ্র মন্থন করে উঠে আসে বিষাদ ছোঁয়া মহার্ঘ জীবন প্রত্যাশা। আমরা

একটু দীর্ঘ একটি অংশ উদ্ধৃত করে কথাটি বোঝাবার চেষ্টা করছি। সেই সঙ্গে এ-ও লক্ষ করব যে এই কবিতাটিতে মিশ্র কলাবৃত্ত ব্যবহৃত হলেও চিরাচরিত পয়ারের আট-ছয় বা আট-দশ পর্বের মাত্রা বিন্যাস কিন্তু সেখানে নেই—

'দুচোখে প্রতীক্ষা তার,
স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে
ওঠে ডাক শহরে শহরে।
রাস্তার শ্মশান থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে
মাঠের ফসল দিন গোনে।
প্রতিজ্ঞাকঠিন হাতে
একে একে তারা সব
চোখের শোকাশ্রু মুছে ভাবে
ঘরে ঘরে নবান্ন পাঠাবে।
পথে পথে পদশব্দ ওঠে,
আকাশে নক্ষত্র ফোটে;
নদী করে সম্ভাষণ, পাখি করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধনেত্রে
ধান আর ধান।'

(স্বাগত : চিরকুট)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বলাকা' কবিতাগ্রন্থে মিশ্র কলাবৃত্ত ছন্দের যে রূপবৈচিত্র্য এনেছেন—যাকে তিনি বলতেন মুক্তক ছন্দ—সেই পদ্ধতিই সুভাষ মুখোপাধ্যায় অনেকটা প্রয়োগ করেছেন। এখানে প্রতি পঙ্‌ক্তির পর্বসংখ্যা সমান নয়। চতুর্থ পঙ্‌ক্তিতে দুটি পর্ব, দ্বাদশ পঙ্‌ক্তিতে দুটি পর্ব এবং ত্রয়োদশ পঙ্‌ক্তিতেও দুটি পর্ব। পর্বের মাত্রা-সংখ্যাতেও সমতা নেই। যে তিনটি পঙ্‌ক্তিতে দুটি করে পর্ব আছে সেগুলিতে মাত্রার বিন্যাস যথাক্রমে আট + দশ, আট + ছয় এবং আট + চার। যে পঙ্‌ক্তিগুলি একপার্বিক সেগুলিতে আট, দশ এবং ছয় মাত্রার প্রয়োগ ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথও 'বলাকা'-র ছন্দোবৈচিত্র্যময় কবিতাগুলিতে চার, ছয়, আট এবং দশ মাত্রার পর্বই প্রধানত ব্যবহার করেছেন। এগুলি সবই প্রথাসিদ্ধ লঘু পয়ার ও মহাপয়ার ছন্দের অভ্যস্ত মাত্রা-সংখ্যা বিশিষ্ট পর্বের দৃষ্টান্ত।

রবীন্দ্রনাথ 'বলাকা'-র কবিতাগুলিতে বিশেষভাবে অনিঃশেষ গতিবেগকে জীবন্ত করে তুলেছেন পয়ারের ওই বাঁধাধরা ছক ভেঙে দিয়ে বন্যার স্রোতের মতো, বিহঙ্গের আকাশ বিহারের মতো তরঙ্গোচ্ছ্বাসের এবং মুক্ত উড়ালের ছন্দহীন ছন্দের মতো প্রবাহিত হয়ে চলেছে 'বলাকা' কবিতাগ্রন্থের ছন্দঃস্রোত। বিশেষভাবে প্রাণের দুর্দম গতিবেগই 'বলাকা'-র ছন্দে প্রস্ফুটিত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় যখন এভাবেই রুদ্ধ প্রাণের পল্বলকে সরিয়ে প্রাণাবেগের গতিকে কিছুটাও সঞ্চারিত করতে চান, তখন স্বাভাবিকভাবেই 'বলাকা'-র ছন্দের স্মৃতি তাঁর মনে ফিরে আসে। এভাবেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরাধিকার হয়ে ওঠেন শিল্পরূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে আরও মনে পড়ে যে তাঁর বিখ্যাত 'বধূ' কবিতাটির উৎস থেকে জাত 'বধূ' নামের অপর একটি কবিতা যখন লিখলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় তখন সেখানেও রবীন্দ্র-অনুসরণে কলাবৃত্ত ছন্দ পাঁচ এবং সাত মাত্রার পর্ব তিনি বিন্যস্ত করলেন কবিতায়। সাধারণত সাত মাত্রার কলাবৃত্ত পর্ব বিশেষ দেখা যায় না। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায় পর্বের বিন্যাস ঘটিয়েছেন স্বতন্ত্রভাবে। তাই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মিল থেকেও মিল নেই তাঁর লেখায়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

'বেলা যে পড়ে এল জলকে চল'—এখানে পর্ব বিন্যাসে মাত্রা-সংখ্যা যথাক্রমে সাত পাঁচ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন—'গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এল'—এখানে পর্ব দুটি বিপরীতক্রমে বিন্যস্ত পাঁচ + সাত। এছাড়াও লক্ষ করা যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির শব্দ বিন্যাসে উচ্চারণ যতটা স্বরধ্বনির অবকাশ সৃষ্টি করতে পারে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শব্দ বিন্যাসে হলন্ত দলের তুলনামূলক আধিক্য। তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতার সুর আবেগঘন, করুণবিষণ্ণ লিরিকের—

'হেথাও ওঠে চাঁদ ছাদের পারে
প্রবেশ মাগে আলো ঘরের দ্বারে
আমারে খুঁজিতে সে ফিরিছে দেশে দেশে
যেন সে ভালোবেসে চাহে আমারে।'

কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচিত শব্দ সমবায়ে সম্পূর্ণ অন্য বাগ্‌ভঙ্গি এবং আত্মব্যঙ্গ-বিদ্ধ এক ধরনের তীব্রতা ফুটে ওঠে—

'ছাদের পারে হেথাও চাঁদ ওঠে—
দ্বারের-ফাঁকে দেখতে পাই যেন
আসছে লাঠি উঁচিয়ে পেশোয়ারী
—ব্যাকুল খিল সজোরে দিই তুলে।'

(বধূ : পদাতিক)

কবিতা রচনার প্রথম পর্বে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দলবৃত্ত ছন্দে লিখতে প্রায় দেখি না। দলবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে সাধারণভাবে আমরা কিছুটা লঘুতা, কিছুটা হাল্‌কা চালের ব্যঙ্গ পরিহাসের ভঙ্গিকে মিলিয়ে দেখতে অভ্যস্ত। সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রথম পর্বে এই ব্যঙ্গ-পরিহাসের ভঙ্গিটিকে সবরকম ছন্দেই চারিয়ে দিয়েছেন এমন আমরা দেখেছি। আলাদা করে দলবৃত্ত সেজন্য প্রযুক্ত হয়নি। তবে অন্য এক ধরনের কবিতায় তিনি দলবৃত্ত প্রয়োগ করেছেন যেখানে কবিতার উপস্থাপনায় আছে লোকায়ত ভঙ্গির আধার। সেগুলি হাল্‌কা চালে বলা হলেও ব্যঙ্গের কবিতা নয়; আত্মোপলব্ধির কবিতা। এগুলি 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬) প্রকাশিত হলে প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করল পাঠকের। সময় ১৯৬৬। তারপরেই এই অনুভব ও নির্মাণ কৌশলকে তিনি অনেকবারই মিলিয়ে দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হতে পারে 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬)-এর অন্তর্গত 'খেলা দেখে যান' কবিতাটি।—

এই ছিল না—
এই তো আছে!
এই আছে, এই ফক্কা।
বুকের মধ্যে
রঙের তাস
হরতনের টেক্কা।
.....
মাথার ওপর
টাঙানো নীল
বিনিপয়সায় তাঁবু।
খেলা দেখে যান!
খেলা দেখে যান!
খেলা দেখে যান, বাবু।

এই কবিতাংশ বাক্‌চালের লঘুতা থাকলেও অন্তরঙ্গ বিভাবে আছে জীবনের সেই সুগভীর উপলব্ধি যেখান থেকে শেক্‌স্‌পিয়র বলেছিলেন—জীবন এক চলন্ত রঙ্গমঞ্চ।

আরও পরবর্তী সময়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় এই দলবৃত্ত ছন্দ এত সুষ্ঠুভাবে প্রযুক্ত হয়েছে যে সেইসব কবিতার কিছু কিছু পঙ্‌ক্তি হয়ে উঠেছে প্রবাদ-প্রতিম। একটি উদাহরণ—

আপনি, মশাই, গেছেন বদ্‌লে
বদ্‌লে গেছেন, ছি ছি!
আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁ চিঁ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ছন্দ-নির্মাণের কুশলতা অনেক সময়ই প্রথাসিদ্ধ তিনটি ধারায় প্রবাহিত হয়নি। গদ্যরীতিতে অনায়াস স্বাচ্ছন্দ এবং কথ্যরীতির স্বরভঙ্গি যেভাবে তিনি নিয়ে আসতে পারেন তাকে প্রথাসিদ্ধ গদ্যরীতিও বলা যায় না। তা যেন গল্প বলারই একটি বিশেষ ধরন। আবার কবিতার বর্ণাভাও সেখানে দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন দেখা যাক 'লাল গোলাপের জন্যে' কবিতাটির কয়েকটি পঙ্‌ক্তি—

শৃঙ্খলের ক্ষতগুলো
ভাল ক'রে আজও শুকোয় নি;
প্রাণের সব তার
এক সুরে এখনও বাঁধা হয় নি;
সর্বনাশের কিনার থেকে
পৃথিবী
বরাবরের মতো এখনও স'রে আসে নি।

এই অংশে স্বাভাবিক কথ্যরীতিতেই শব্দ বিন্যস্ত হয়েছে। বাংলা বাক্যে যে স্বাভাবিক পদ-

সন্নিবেশ—কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া (SOV) তা-ও এখানে যথাযথভাবে রক্ষিত। কবিতার মতো করে না সাজিয়ে টানা গদ্যের শৈলীতে লিখলে এই অংশকে কথপোকথনের গদ্যও বলা যেত। এই কথ্য গদ্যের মেজাজে অনেক কবিতাই লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'মেজাজ', 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ', 'কাল মধুমাস' ইত্যাদি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এমন অনেক কবিতাই আছে যেখানে তিনি নিরূপিত ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কিন্তু সেই ছন্দ তার নিরূপিত দেওয়ালগুলি প্রতিনিয়ত ভাঙতে থাকে। ফলে সেই দেওয়ালগুলি নির্দিষ্ট কোনো মাপের মধ্যে থাকে না কিছুতেই। অথচ এতই সহজ, আটপৌরে এবং বিশ্বস্ত সেই মুক্ত ছন্দ—যেখানে ছন্দের নিরূপণ এবং অ-নিরূপণ এক সঙ্গেই লগ্ন থাকে। আমার এরকম তিনটি উদাহরণ দেখে নিতে পারি।—

(১) লাগ লাগ লাগ ভেল্‌কি।
চাল-চিনি-মাছ তেল-ঘি॥
ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি খিড়কির দোরে।
চোর নিয়ে যায় পুলিশ ধ'রে॥
ওঁ হ্রীং স্বাহা ওয়াগন ফট্‌।
যে বেটা নজর দিবি সে বেটা হট্‌॥

('ছি-মন্তর', কাল মধুমাস, ১৯৬৬)

চারমাত্রার পর্ব বিশিষ্ট দলবৃত্ত ছন্দের কাঠামো কবিতাটিতে দেখাই যাচ্ছে। তৃতীয় ও চতুর্থ পঙ্‌ক্তির শব্দবিন্যাসে চারমাত্রার পর্ব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু তার আগের এবং পরের দুটি করে চারটি পঙ্‌ক্তিতে মাত্রার সন্নিবেশ ততটা নিখুঁত নয়। যেমন প্রথম পঙ্‌ক্তিটি এভাবে পড়া যেতে পারে—

১	১	১	২	২
লাগ	লাগ	লাগ	ভেল্‌	কি

প্রথম পর্বে তিন মাত্রা। তিনটি বা দুটি হলন্ত দল নিয়ে ছড়ার ছন্দের একটি পর্ব গড়ে ওঠার বহু দৃষ্টান্তই আছে বাংলার ছড়ায়। দ্বিতীয় পর্বটিতে দুটি হলন্ত দলকেই দুই মাত্রা ধরে নিয়ে চার মাত্রায় নিয়ে আসবার পদ্ধতিও ছড়ার ছন্দে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথের লেখা বিখ্যাত উদাহরণ— 'বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ ঝুপ্‌'
অথবা পঙ্‌ক্তিটিকে এভাবেও পড়া যায়—

২	২	২	১	১
লাগ	লাগ/	লাগ	ভেল	কি

প্রথম পর্বে দুটি হলন্ত দলকেই দ্বিমাত্রিক উচ্চারণে প্রলম্বিত করে চারমাত্রা ধরে নেওয়া এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রথম হলন্ত দলটিকে দু-মাত্রা এবং দ্বিতীয় দুটি দলকে একমাত্রা ধরে পর্বটিকে চারমাত্রার পরিসরে নিয়ে আসা। উচ্চারণভঙ্গির পার্থক্য হবে দুটি ক্ষেত্রেই। কিন্তু সেই উচ্চারণ পথচল্‌তি মাদারির নিজস্ব সুরকে কোনোভাবেই ব্যাহত করবে না।

উদ্ধৃত কবিতাংশের ষষ্ঠ বা শেষ পঙ্‌ক্তিটির পর্ব-বিভাজন অত্যন্ত দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়।—'যে বেটা মজর দিবি সে বেটা হট্'। স্বাভাবিক উচ্চারণে পঙ্‌ক্তিটিকে তিনটি পূর্ণপর্ব এবং একটি অপূর্ণ পর্বে নিয়ে আসা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে প্রথম পর্ব 'যে বেটা' এবং তৃতীয় পর্ব 'সে বেটা'-র প্রথম মুক্ত দলদুটিকে দুই মাত্রা ধরতে হবে। সেভাবে পড়া কিছু কঠিনও নয় আর গ্রামীণ ছড়ার ছন্দে অপ্রত্যাশিতও নয়। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে স্তবকটির পূর্ববর্তী পাঁচটি পঙ্‌ক্তির কোনোটিতেই দুটির বেশি পর্ব নেই। কাজেই যে-কোনো মুহূর্তে ছন্দ শরীরের গঠনে ইচ্ছামতো বৈচিত্র্য নিয়ে আসার এই অভ্যাসের ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছন্দ-নির্মাণের অভ্যাস যেমন নিয়ম মেনে নিখুঁত, তেমনই নিয়ম ভেঙেও নিখুঁত হয়ে দেখা দেয়।

(২) 'মহকুমার সদরে ভাই
দেখে এলাম কাণ্ড
একজন ডালে একজন পাতায়
খোঁজে গাছের কাণ্ড
দেখতে তালপাতার সেপাই
মাথাগুলো প্রকাণ্ড
তাকায় না ফলফুলে
লক্ষ্য একদম মূলে
বলে না অবিশ্যি খুলে
তারা ছাড়া বাকি সবাই
কেন অকালকুষ্মাণ্ড'

('হেঁ-হেঁ আলির ছড়া', কাল মধুমাস, ১৯৬৬)

কোন ছন্দের খাপে আমরা এই স্তবকটিকে রাখতে পারি? আমাদের স্বীকার করতে হয় কলাবৃত্ত, মিশ্রকলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত এই তিনটি ছন্দেরই উচ্চারণ-পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে গেছে এই অংশটিতে। 'মহকুমার সদরে ভাই' পর্বটি দলবৃত্তের চার মাত্রাতেই স্বাভাবিক। 'খোঁজে গাছের কাণ্ড' হতে পারে কলাবৃত্তের পঙ্‌ক্তি। বিশেষ করে উদ্ধৃত স্তবকটির ঠিক পরের তিনটি ছত্র—

'এ কয় ওরে, শিখো রে
পৌঁছতে হয় কী ক'রে
সোজা সটান শিকড়ে—'

এই অংশটি দলবৃত্তে উচ্চারিত হওয়া নিশ্চয় সম্ভব কিন্তু কলাবৃত্তের স্বরতরঙ্গই যেন উচ্চারণের স্বাভাবিক ধ্বনিটি নিয়ে আসে। 'বলে না অবিশ্যি খুলে' এবং 'কেন অকালকুষ্মাণ্ড' পর্বদুটি মিশ্রকলাবৃত্তেই স্বাভাবিক শোনায়। যুক্ত ব্যঞ্জনের বাড়তি ধ্বনিগুলিকে শোষণশক্তিতে টেনে নেবার প্রক্রিয়া এখানে লক্ষণীয়। 'একজন ডালে একজন পাতায়', এবং 'দেখতে তালপাতার সেপাই' পঙ্‌ক্তিটিকে সহজেই গদ্যের পঙ্‌ক্তি বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলা কবিতায় ফ্রি ভার্স

অর্থাৎ যাকে প্রকৃত অর্থে বলতে পারি মুক্ত ছন্দ; যেখানে মিশে আছে যে-কোনো রীতিতে উচ্চারিত পর্বে কবির ইচ্ছা-নির্ধারিত মিশ্রণ—সে জাতীয় কবিতা খুবই কম রচিত হয়েছে। অমিয় চক্রবর্তী ছাড়া এরকম লেখা অল্প কিছু লিখেছেন সমর সেন ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের চেয়ে কিছু বেশিই লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

(৩) বাবুমশয়
আপনি সায়েব
আমি আপনার বাবুর্চি
হয়ে গায়েব
পর্দার পাছে
চৌপহর দিন চৌকার আঁচে
খোদা জানেন
যা পুড়ছি
করছি তৈয়ার
ফরমাচ্ছেন যা

('রসুই', ছেলে গেছে বনে, ১৯৭২)

স্বাভাবিক উচ্চারণে যে পর্ব-বিভাজন উঠে আসবে সেখানে মাত্রা-গণনার রীতিতে মিশ্রকলাবৃত্তের পদ্ধতি স্বীকার করে নিতে হবে আমাদের। 'আমি আপনার বাবুর্চি এবং 'পর্দার পাছে' যথাক্রমে দশ মাত্রার এবং পাঁচ মাত্রার মিশ্রকলাবৃত্তের পঙ্‌ক্তি হলেই স্বাভাবিক উচ্চারণ হয়। যদিও 'বাবুর্চি শব্দটিকে চার মাত্রার বলেই ধরতে হবে। অথচ সমগ্র কবিতাংশটি পাঠ করলে দ্রুত কলাবৃত্ত এবং দলবৃত্ত ছন্দের পঠন-পদ্ধতির একটা মিশ্রণ আপনা থেকেই একটা তৈরি হয়ে যায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ছন্দ-পর্যালোচনায় তাই নিয়মকে মানা এবং নিয়মকে পেরিয়ে যাওয়া—এই দুটি প্রবণতারই অপরিসীম শক্তি অনুভব করি আমরা। ছন্দ-শিল্পী রূপে এখানেই তাঁর কৃতিত্ব। ছন্দোময় কবিতা স্বভাবতই—ছন্দের শৃঙ্খলা মেনেই সুন্দর হয়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছন্দ-শৃঙ্খলা মেনে সুন্দর কবিতা অজস্র লিখেছেন। গদ্যেও লিখেছেন বহু মনোহর কবিতা। সেই সঙ্গে ছন্দের শৃঙ্খলা ভেঙে ভেঙে নতুন ছন্দঃস্পন্দ সৃষ্টি করেছেন তিনি বহু কবিতায় এবং অনায়াসে। তেমনই তিনটি দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হল। বাংলা কবিতায় তাঁর পূর্বসূরী এবং উত্তরসূরী হিসেবে দু-তিন জনের কথাই স্মরণে আসে। তাঁদের মধ্যে একমাত্র অমিয় চক্রবর্তীই তাঁর পাশে দাঁড়াতে পারেন।

সুভাষ ছেড়ে যাননি, পাশেই ছিলেন

অমিয় ধর

।। ১।।

কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯১৯-এর ১৩ ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু ২০০৩-এর ৮ জুলাই। তাঁর ৮৪ বছরের জীবনের ৪০ বছর কেটেছে (১৯৪০-১৯৮০) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদের গৌরব নিয়ে। এই ৪০ বছরে সি. পি. আই-এর ভুল-ত্রুটি, গৌরব-অগৌরব, তার ভাঙা-গড়া অনেক কিছুরই সাক্ষী তিনি। ১৯৪০-এ সুভাষের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ। ওই বছরই লেবার পার্টি ছেড়ে তিনি সি. পি. আই-এর সঙ্গে যুক্ত হন। তবে পার্টির সদস্যপদ পেতে তাঁকে দু-বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তখন তো আর ডেকে ডেকে 'পার্টি কমরেড' করা হত না। মধ্যবিত্ত ঘর থেকে যারা আসত তাদের শ্রমিক-কৃষক বা ছাত্র ফ্রন্টের কাজের মধ্যে বাজিয়ে নিয়ে তবে সদস্যপদ দেওয়া হত। লেবার পার্টিতে থাকতে কবিতা লেখা, সাহিত্য বা রাজনীতির আলোচনাচক্রে যোগ দেওয়া এসব তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছাত্র-আন্দোলন আর ডক-শ্রমিকদের মধ্যেও সুভাষ কাজ করতেন। অর্থাৎ কিনা তাঁর মধ্যবিত্ত শ্রেণি-পরিচয়ের গণ্ডিটা ডিঙিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছিলেন। কতটুকু সফল হয়েছিলেন সে কথায় যাব না; তবে বজবজের ব্যঞ্জনহেড়িয়ায় শ্রমিক বস্তিতে তাঁর জীবন-যাপনের দিনগুলির (১৯৫২-১৯৫৪) কথা মনে রেখে বলা যায় তাঁর আন্তরিকতায় কোনো খাদ ছিল না।

যোশীর স্বপ্ন বড় ছোঁয়াচে

সেই উত্তাল চল্লিশে সুভাষ যখন পার্টির সদস্যপদ পেয়েছিলেন, তখন পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী। কমরেড যোশীর প্রতি সুভাষের ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। "পি. সি. যোশীর পার্টিতে মানুষ হয়েছি"—এ গর্ব তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অটুট ছিল। যোশীর উদারতা, আদর্শনিষ্ঠা, তাঁর সহজ-সরল জীবন-যাপন ও মানুষকে ভালোবেসে, তাকে বুঝিয়ে কাছে টানার তাঁর যে অদ্ভুত ক্ষমতা, তা সুভাষকে আকৃষ্ট করেছিল।

কমিউনিস্ট পার্টিতে কর্মীরাই মেরুদণ্ড ('Cadres decide everything')—যোশী এ কথাটা খুব মানতেন। পার্টিকর্মীদের মত-প্রকাশের অধিকারকে মর্যাদা দিতেন, তাদের সুখ-দুঃখের সমস্ত খবর রাখতেন, সব সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন। 'গণতন্ত্র' বাদ দিয়ে শুধু 'কেন্দ্রিকতার' জবরদস্তি তাঁর আচরণে কখনোই প্রকাশ পেত না। তা ছাড়া, এদেশের সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে যা কিছু ভালো, তা নিজের করে নিয়েই যে 'কমিউনিস্ট কালচার' গড়ে তুলতে হবে, এ শিক্ষাটা যোশী পার্টির সর্বস্তরে চারিয়ে দিতে পেরেছিলেন। সে যুগের বহু কৃতী লেখক-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়েছিলেন বা পার্টির সহযাত্রী

বন্ধু হতে পেরেছিলেন। সুভাষ লিখেছেন, "যোশীর কাছে ছিল বুদ্ধিজীবী আর লেখক শিল্পীদের বিশেষ কদর।" তাই যোশীর মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ১৯৪৩-সালে পার্টির প্রথম কংগ্রেসে যোগ দিতে পেরেছিলেন। "যোশীর স্বপ্ন বড় ছোঁয়াচে"—এ শুধু কবি সুভাষের কথা নয়। জাতীয় আন্দোলনের সহিংস-অহিংস নানা স্তরের মধ্য দিয়ে যাঁরা কমিউনিস্ট হয়েছিলেন তাঁরাও অনেকে যোশীর যুগের (১৯৩৫-১৯৪৭) পার্টির জন্য গর্ব করে থাকেন। কমরেড সরোজ মুখার্জি (পরবর্তীকালে সি. পি. এমের অগ্রগণ্য নেতা) যোশীর অবদানের কথা মনে রেখে লিখেছেন,—"চল্লিশের দশকে পি. সি. যোশীর নেতৃত্বে পরিচালিত পার্টির সাংগঠনিক কার্যকলাপ খুবই নিখুঁত ছিল। রাজনৈতিক পলিসি ও কর্মপদ্ধতি সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটিতেই গৃহীত হতো। তার ভুল, ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সকলেই সমষ্টিগতভাবে দায়ী। কিন্তু সংগঠনকে মজবুত করে গড়ে তোলা, সংগঠনকে সমাজের সমস্ত স্তরে প্রসারিত ও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অসীম।" তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে "কমিউনিস্ট পার্টি একটি জাতীয় রাজনৈতিক পার্টিতে পরিণত হয়।"—(ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা—২য় খণ্ড/পৃ. ১৫২, ২৫২)।

আর একজন মানুষও কবি সুভাষকে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করেছিলেন—তিনি কমরেড সোমনাথ লাহিড়ী। সুভাষ লিখেছেন,—"যোশীকে বাদ দিলে পার্টিতে এই ছিলেন আরেক অসাধারণ আশ্চর্য মানুষ। যাঁর কিছুতেই কোন মোহ ছিল না। ক্ষুরধার বুদ্ধি। রাজনীতিতে বরাবরই উগ্র।...ভেতরে অসম্ভব নরম মন। বাইরে শক্ত খোলস।...লাহিড়ীর কথা শেষ হওয়ার নয়।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ১৩৪)। এই "নমস্য মানুষটির" কাছে সুভাষ ভালো কমিউনিস্ট হওয়ার প্রেরণা যেমন পেয়েছেন, তেমনি ভালো গদ্য লেখার তালিমও নিয়েছেন। বেশির ভাগ সময় মতে না মিললেও তাঁর প্রতি "লাহিড়ীর ভালবাসায় কখনও টান পড়েনি।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ১৩৪)।

প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার

পার্টিতে তখন জনযুদ্ধের আমল (১৯৪২-৪৪)। এই 'জনযুদ্ধের নীতি ও কার্যক্রম' গ্রহণের আগে সি. পি. আই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদীদের ভিতরকার সংঘাত বলে ঘোষণা করে। দেশবাসীকে স্বাধীনতার লক্ষ্যে অগ্রসর হতে আহ্বান জানিয়ে তাদের কাছে প্রচার করতে থাকে—এ যুদ্ধে ব্রিটিশকে কোনো সাহায্য নয় (না এক পাই, না এক ভাই)। কিন্তু ১৯৪১-এর ২২ জুন, নাৎসি জার্মানি পৃথিবীর প্রথম এবং একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করে, তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়, ফলে যুদ্ধের প্রকৃতি দ্রুত বদলে যায়। ওই জুন মাসেই কলকাতায় 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি' গঠিত হয়। ১৯৪১-এর ৭ ডিসেম্বর, জাপানি আক্রমণে পার্ল হার্বারের পতনের পর, যুদ্ধ প্রকৃত অর্থেই বিশ্বযুদ্ধের আকার ধারণ করে।

জার্মানি, ইটালি ও জাপানের ফ্যাসিবাদী অক্ষশক্তির সঙ্গে ব্রিটেন, আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নসহ (মিত্রশক্তি) বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় জনশক্তির সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক হিসেবে সি. পি. আই যুদ্ধ সম্পর্কে তার পূর্ববর্তী অবস্থান (Prolatarian Path) বদলে নিয়ে সোভিয়েতেসহ মিত্রশক্তির প্রতিরোধ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' (Peoples war) বলে ঘোষণা করে।

ইতিমধ্যে গান্ধীজী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন (৮ আগস্ট ১৯৪২)। গান্ধী, নেহরু, আজাদ প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা কারাবন্দি। তবুও ভারতের ব্যাপক অঞ্চলে গণ অভ্যুত্থান ঘটে গেল। এদিকে কমিউনিস্ট পার্টি মিত্রশক্তির অংশীদার ব্রিটেনের যুদ্ধায়োজনকে সমর্থন করে জাপানি ফ্যাসিস্টদের রুখবার সংকল্প ঘোষণা করল। কবি সুভাষ লিখলেন—

বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ,
রুখবো দস্যুদলকে আজ,
দেবে না জাপানী উড়োজাহাজ
ভারতে ছুঁড়ে স্বরাজ।—(জনযুদ্ধের গান)

বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদ বিরোধী জনযুদ্ধের নীতির প্রতি আস্থা রেখে সি. পি. আই সে-দিন গান্ধীজীর 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলন আর সুভাষচন্দ্র বসুর 'দিল্লি চলো' অভিযান সম্পর্কে নেতিবাচক ভূমিকা নিয়ে, সে আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিল। ফলে কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসসহ জাতীয়তাবাদী বিপ্লবীদের কাছে ব্রিটিশের মিত্র হিসাবে নিন্দিত হয়। এবং ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের হাতে জনযুদ্ধের প্রচারক কমিউনিস্টরা আক্রান্ত হতে থাকে। ইতিমধ্যে (৮ মার্চ, ১৯৪২) ঢাকায় ফ্যাসিস্ট গুণ্ডাদের ছুরিকাঘাতে তরুণ কমিউনিস্ট লেখক সোমেন চন্দ নিহত হয়েছেন। এই নৃশংস ঘটনার প্রতিবাদে ২৮ মার্চ, ১৯৪২-এ কলকাতায় ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ও স্থাপিত হয়েছে। কবি বিষ্ণু দে ও কবি সুভাষ সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক। সুভাষ গভীর প্রত্যয়ে লেখেন—"দেশপ্রেম ধমনীতে, বিশ্ববোধ ধ্যানে;/ক্ষিপ্রগতি পরাক্রান্ত হাতের পরশু।" ১৯৪২-এর জুলাই মাসে কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে ভারত সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ায় কমিউনিস্টরা প্রকাশ্যে কাজ করার সুযোগ পায়। ১৯৪২-এর সেপ্টেম্বরে বোম্বাইতে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভায় "জনযুদ্ধের নীতি ও কার্যক্রম" অনুমোদিত হলে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জির সম্পাদনায় 'জনযুদ্ধ' সাপ্তাহিক প্রকাশিত হয়। সুভাষ লিখছেন, "জনযুদ্ধ সাপ্তাহিক বেরোচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের মায়া কাটিয়ে আমিও তখন সেই কাগজে সবে জুটেছি। সোমনাথ লাহিড়ীর কড়া শাসনে আমি তখন গদ্য লিখতে শিখছি।...সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে আমাদের মাইনে ছিল পনের টাকা। নেতা থেকে আমাদের মত চুনোপুঁটি সবারই ছিল এক মাইনে।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ১৮-২০)। সে এক কঠিন সময়, মুক্তিপাগল মানুষের আবেগের কাছে কমিউনিস্টদের ফ্যাসিস্ট বিরোধী জনযুদ্ধের নীতি গ্রহণযোগ্য হয়নি। এদেশের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের মূল ধারা থেকেও পার্টি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। 'কমিউনিস্টরা বৃটিশের দালাল' এই কুৎসা উপেক্ষা করে তারা যে সে-দিন মাথা উঁচু করে ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছিল, তার কারণ পার্টির শীর্ষ নেতৃত্বে যোশী, লাহিড়ী, অধিকারী প্রমুখ আদর্শনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী এবং হৃদয়বান মানুষেরা ছিলেন। তাঁরা পার্টিশৃঙ্খলার নামে 'কেন্দ্রিকতার' চাবুক

হাতে জনযুদ্ধের নীতি পার্টির উপর চাপিয়ে দেননি। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকতা ও ফ্যাসিবিরোধী যুক্তফ্রন্টের নীতি ও আদর্শের পথে পার্টিকর্মীদের অনুপ্রাণিত করতে পেরেছিলেন। সুভাষ লিখেছেন, তাঁরা সেদিন ''পি. সি. যোশীর পার্টিতে মানুষ'' হয়েছেন; তাই ''তখনকার ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও নিখাদ দেশভক্তি আর একনিষ্ঠ জনসেবার জোরে অত বড় দুঃসময়েও কমিউনিস্ট পার্টি দেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছিল।''—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ৪২)।

সুভাষ তখন কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী। ''চার পাঁচজন সহকর্মীসহ 'কমিউন'-এ থেকে সারা কলকাতা দৌড়ঝাঁপ'' করে পার্টির নানা কাজ করে চলেছেন। দারুণ ব্যস্ত, কবিতা লেখার সময়টুকু পর্যন্ত পান না। কখনো গ্রাম ও শিল্পাঞ্চল ঘুরে 'জনযুদ্ধে'র পাতায় রিপোর্তাজ লিখছেন। কখনো 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘে'র যুগ্মসম্পাদক হিসাবে বিষ্ণু দে-র সঙ্গে হিন্দু-মুসলিম সাহিত্যিক ও শিল্পীদের সংগঠিত করে বলছেন, ''ফ্যাসিজম শুধু রণচণ্ডীর এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী সর্বনেশে দল নয় বা সাম্রাজ্য বণ্টনেই তার শেষ নয়। সেটা একটা মরীয়া মনোভাব। যার উৎস ঘৃণা, অবজ্ঞা—যার বৃদ্ধি অবিশ্রাম উত্তেজনায়, হিংসায় ও রক্তপাতে। তাই শিল্প ও সাহিত্য স্বভাবতই সেখানে হাঁপিয়ে মরে।''—('ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা' : ২য় খণ্ড—সরোজ মুখোপাধ্যায়; পৃ. ৩১)।

জনযুদ্ধের পক্ষে ছাত্রসমাজকে অনুপ্রাণিত করতে সুভাষ লেখেন—''পূর্বতোরণে শত্রুর খরনখর, পশ্চিমে প্রতিহত ঝঞ্ঝাবাহিনী। শহীদ সেবাস্তোপোলে আর দুর্জয় স্ট্যালিনগ্রাডে মুক্তিকামী দুনিয়ার বজ্রবাহু। হয় বাঞ্ছিত মুক্তি, নয় দাসত্ব-লাঞ্ছিত শৃঙ্খল—দ্বিতীয় পথ নেই।''—(একসূত্রে, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৪২)। ভারতের পূর্বতোরণে জাপানি বোমায় বিধ্বস্ত নগর-গ্রাম। 'গৃহকলহকে দূরে ঠেলে', একজোট হয়ে, 'ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা' তুলে সুভাষ ঘোষণা করেন—'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার'। এদিকে বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারিতে বিধ্বস্ত দেশের 'সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু' আর 'শবের গলিতগন্ধ'। ভাণ্ডারে খাদ্য নেই। 'শূন্য পেটে চাষবাস চুপ/কারখানায় পড়েছে কুলুপ।' তবুও মানুষ হাতের শৃঙ্খল ভাঙার জন্য উন্মুখ।

নতুন জন্মের ডঙ্কা বাজে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল। চূর্ণ-বিচূর্ণ ফ্যাসিবাদী শক্তি। বিজয়ী লালফৌজ ১৯৪৫-এর ৯ মে বার্লিনে উড়িয়ে দিল মুক্তির লাল নিশান। পূর্ব ইউরোপ মুক্ত—মুক্তির দূত লালফৌজকে পাশে নিয়ে দেশে দেশে তখন জনশক্তির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার উৎসব। তার ঢেউ এসে লাগে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে।

জনযুদ্ধের নীতি ও আদর্শে অনুপ্রাণিত সুভাষ নিশ্চিত জেনে গিয়েছেন, ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ে আর সোভিয়েতের নেতৃত্বে জনশক্তির বিজয়ে এশিয়া-আফ্রিকার পদানত জাতির সামনে মুক্তির পথ এবার উন্মুক্ত। ''দিন এসে গেছে, ভাই রে—বিদেশী রাজের প্রাণভোমরাকে নখে নখে টিপে মারবার।'' সাম্রাজ্যবাদী দুঃশাসনের ভিত উপড়ে ফেলতে—''ধনুকের মত

বাঁকা পিঠগুলো টান করে ঘুরে দাঁড়ায়"...'অগ্নিকোণের পোড়খাওয়া যত মানুষ।" কবির স্থির বিশ্বাস, তাঁর গর্বের ভারতবর্ষের মুক্তিও আসন্ন।—

গঙ্গার জোয়ারে এসে লাগে
ভল্গার তীরের স্পর্শ
চোখে নব সূর্যোদয় জাগে;
মুক্তি আজ বীরবাহু
শৃঙ্খল মেনেছে পরাভব;
দিগন্তে দিগন্তে দেখি
বিস্ফারিত আসন্ন বিপ্লব।

কিন্তু সে বিপ্লব তো পূর্ব ইউরোপের মতো 'লালফৌজে'র হাত ধরে এখানে আসবে না। তবে কি লাল নিশান কাঁধে বিদ্রোহী সেনাদের পাশে নিয়ে "রক্তের পাঁকে শত্রুকে পুঁতে" "লক্ষ লক্ষ হাতে অন্ধকারকে দুটুকরো করে" যে-পথে মুক্তির সূর্যকে ছিঁড়ে আনতে চলেছে "অগ্নিকোণের মানুষ"—সে পথেই কি ভারতের জনশক্তি অর্জন করবে তার স্বাধীনতা? কবি নিশ্চিত নন। কারণ—"এখানে বিচিত্র স্রোত/মুক্তির একাগ্র লক্ষ্যে আসে;/আজকের তুরঙ্গ ইতিহাসে/দেশপ্রেম বল্গা ধরে।/পদক্ষেপ কেবলি চঞ্চল।"—(ঘোষণা)।

মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও সবারই তো লক্ষ্য পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্তি—স্বাধীনতা। তাই, "গ্রামেগঞ্জে শহরে বাজারে/দুর্জয় সঙ্কল্প নেয় হাজারে হাজারে।/মৃত্যুকীর্ণ পথে হই জড়ো;/নতুন জন্মের ডঙ্কা বাজে...।" মুক্তির দাবিতে শুরু হয় কারারুদ্ধ রাজবন্দিদের অনশন। রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিতে ও দমননীতির বিরুদ্ধে ছাত্রমিছিলে (আগস্ট, ১৯৪৫) "গর্জে উঠল বজ্রের সেই আওয়াজ"—"যতদিন বীর বন্দীরা জেলে থাকবে—আমরা শান্তি মানব না।" (ফের আসব)। ইংরেজ মালিকদের বিরুদ্ধে বাহাদুর ট্রাম-শ্রমিকদেরও ধর্মঘট শুরু হয় (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫)। ১৯৪৫-এর ২৫ ডিসেম্বর কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা'র আত্মপ্রকাশ ঘটে—সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি—সোমনাথ লাহিড়ী আর সুভাষ তার অন্যতম সাংবাদিক। লালকেল্লায় বন্দি আজাদ হিন্দ্ ফৌজের বিচারের বিরুদ্ধে কংগ্রেস, লীগ ও কমিউনিস্ট অনুগামী ছাত্র ও শ্রমিকের দৃপ্ত মিছিল রাজপথ কাঁপিয়ে এগিয়ে যায়। আর রশীদ আলি দিবসে কলকাতা উত্তাল হয়ে ওঠে গণ-অভ্যুত্থানে (ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬)। সুভাষ লিখছেন—"ক্লাইভ স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে আছি। ছাত্রদের এক বিরাট মিছিল। সেই মিছিলে হাত ধরাধরি করে উড়ছে তিন তিনটে নিশান—কংগ্রেস, লীগ আর ছাত্র-নওজোয়ানদের। রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছে মাথায় হেলমেট লাগানো টমিগান আর রাইফেলধারী পুলিশ।"...(গদ্যসংগ্রহ-১/পৃ. ৫২-৫৫)। খবর আসে বোম্বাই-করাচিতে শুরু হয়েছে ভারতীয় নৌ-সেনাদের বিদ্রোহ (ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)। তাদের সমর্থনে ধর্মঘট করেছে ভারতীয় বৈমানিকরা। ১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই, ডাক-তার ধর্মঘটের সমর্থনে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। সুভাষ সেই আন্দোলনে সামিল হয়ে লিখলেন—"পথে পথে আজ হোক মোকাবিলা। দেখি কার কত শক্তি। স্ট্রাইক! স্ট্রাইক সাদাকে করব কালাপানি পার—তবে যুদ্ধের শান্তি।"

অনেকেরই মতো সুভাষও সেদিন ভেবেছিলেন গণবিপ্লবের পথে স্বাধীনতার সূর্যতোরণে উপনীত হয়েছে তাঁর গর্বের ভারতবর্ষ। কবি বিশ্বাস করেছিলেন, "রাস্তা লোকে লোকারণ্য/পরোয়া আজ কাকে/যে দেবে প্রাণ, জীবন দেবে/বরমাল্য তাকে।" প্রায় মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছিল সে স্বাধীনতার 'বরমাল্য'। কিন্তু ব্যর্থ হল সে উদ্যম, অসমাপ্ত রয়ে গেল গণবিপ্লব—কংগ্রেস ও লীগ নেতৃত্বের দ্বিধা ও বিপ্লবভীতির কারণে। সুভাষ লিখছেন—"বসে থাকলেন পাকা চুল নেতারা। শুধু বসে থাকলেন না, গুণ্ডা দুর্নাম দিয়ে বসিয়ে দিলেন তাঁরা গোটা শহরের মানুষকে।...কিন্তু ইংরেজের টনক নড়ে গিয়েছিল। সেপাই সান্ত্রীও আর তার বাধ্য নয়। এবার মানে মানে সরে পড়াই ভাল। নইলে কপালে অনেক দুঃখ।"—(গদ্যসংগ্রহ-১/পৃ. ৫৫)। ১৯৪৬-এর মার্চেই ক্রিপ্‌স-এর নেতৃত্বে ভারতে উপস্থিত হল সাম্রাজ্যবাদী অক্ষ-ক্রীড়ার ক্যাবিনেট মিশন। সুভাষ যে ঘোষণা করেছিলেন, "লাখো লাখো হাত এক হলে বলো পরোয়া কাকে?" আর সাম্রাজ্যবাদীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছিলেন—"শয়তান! চাও ভাঙতে কলিজা গুলিতে, গ্যাসে?" গুলিতে, গ্যাসে নয়, ক্যাবিনেট মিশনের পাশার চালে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে গঠিত জাতীয় সংগ্রামের ঐক্যের কলিজা সেদিন ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেল। "১৯৪৬-এর ২৯ জুলাই যে শহর উত্তাল হল গণ-অভ্যুত্থানের গরিমায়, সেখানেই তিন সপ্তাহ কাটার আগে ঘটল এমন অমানুষিক সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ যা অকল্পনীয়, যা সব-কিছু হিসাবকেই ভেস্তে দিয়েছিল।"—(তরী হতে তীর—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪০৪)। অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় এরপর লিখেছেন, "পার্টির সবাই যে যেখানে আছে, সেখানে সাধ্যমতো ঐ বিপর্যয়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশীদের সাহায্য করেছিল নিশ্চয়, কিন্তু আকস্মিক প্রলয়ের সামনে তা প্রায় সমুদ্রে গোষ্পদতুল্য মনে হয়।" (ঐ/পৃ. ৪০৮)। যথেষ্ট প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেই দাঙ্গাকারীদের প্রতিরোধে সুভাষও সেদিন শ্রমিকদের সঙ্গে রাত জেগে লাঠি হাতে পাহারা দিয়েছেন ট্রামশ্রমিকদের 'কর্মিউন'।

১৯৪৬-৪৭-এর যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বাংলা আর নিজাম শাসিত তেলেঙ্গানায় জমিদার, মহাজন ও তাদের সহযোগী পুলিশের বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। তেলেঙ্গানায় তা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। যা শেষ পর্যন্ত "অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানার" জন্ম দেয়। আর বাংলার গ্রামাঞ্চলে বর্গাদারের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছড়িয়ে পড়ে তেভাগা-আন্দোলন। সুভাষ লিখছেন—"ইংরেজ গেল। কিন্তু যেতে যেতে রাস্তায় বেশ কিছু কাঁটা ছড়িয়ে দিয়ে গেল। তারপর বছর না যেতে দেশ ভাগ। ভাইয়ে ভাইয়ে খুনোখুনি চলল কলকাতার রাস্তা জুড়ে। মৃত্যুকে এত বীভৎস হতে কেউ কখনো দেখেনি। ভরে গেল রাস্তা চালচুলোহীন উদ্বাস্তু মানুষের ভিড়ে।"—(গদ্যসংগ্রহ-১/পৃ. ৫৫)।

নিশির ডাক শুনে বেরিয়ে

"এরপর এল রণদিভের আমল। আত্মঘাতী পথে পার্টিকে ঠেলে দেওয়া হল। যোশীর গণপার্টিকে চুলোয় দিয়ে ভেঙে চুরমার করা হল সমস্ত গণসংগঠন। নেহরু সরকারকে উৎখাত করতে ডাক দেওয়া হল সশস্ত্র সংগ্রামের।"—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

"তখন তুমিও কম যাওনি, কমরেড। তোমাদের মত রণচণ্ডীদের নিয়ে তখন চাবুক হাতে রথ চালাচ্ছিলেন রণদেব।

তাত্ত্বিকদের রায় বেরিয়ে গেল। পচাগলা সরকার। প'ড়ো বাড়িটাতে দরকার আরও শুধু একটা জোরালো ধাক্কার। তাহলেই মাটিতে সপাটে মুখ থুবড়ে পড়বে।

নেহরু কে? সাম্রাজ্যবাদের দোসর। সমাজতন্ত্রের ভেজাল দিয়ে ধনতন্ত্রকে দেশের লোকের গা-সহা করতে চাইছে। সাপের মুখে চুমো, আবার ব্যাঙের মুখেও চুমো—ঘরে-বাইরে এই তার নীতি। সামনের দিকে চাইছে বটে, কিন্তু হাঁটছে পেছনের দিকে।

প্রকৃতির নিয়মকানুনগুলো পর্যন্ত তোমরা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলে, ভাইসাহেব। যেটা ভাঙতে চাও, তার চেয়েও শক্ত হওয়া চাই যা দিয়ে ভাঙবে।

সেই জোর না থাকায় চোট খেয়ে খোদ হাতিয়ারটাই ভেঙে খান খান হয়ে গেল।"—(সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গদ্য সংগ্রহ ২য়/পৃ. ৪৪৭)।

দাঙ্গা বিধ্বস্ত, খণ্ডিত ভারত ১৯৪৭-এর ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের পথে স্বাধীনতা পেল। গণঅভ্যুত্থানের পথে, বিপ্লবের পথে তো স্বাধীনতা এল না। অনেক কিন্তুর পর সি. পি. আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটি বললেন, "যতক্ষণ বৃটিশ ভাইসরয় না যাচ্ছে ততক্ষণ এ স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা হবে না। তবে হাতে ক্ষমতা আসায় তা এক অর্থে স্বাধীনতার দিকেই ভারতের অগ্রগতি।" ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সি. পি. আই-এর দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোশীর 'জাতীয় গণফ্রন্টে'র রণনীতি বাতিল হল। 'দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদ ও জাতীয়তাবাদী বিচ্যুতি'র অভিযোগে যোশী অভিযুক্ত হলেন। তাঁকে সরিয়ে বি. টি. রণদিভে হলেন পার্টির সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৮-৫০)। ক্ষমতা হাতে নিয়েই বললেন,—"পার্টিকে এখন জনগণতন্ত্রের জন্য লড়তে হবে—যেখানে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাবে।"—(পিপলস্ এজ, ২১ মার্চ ১৯৪৮)। রণদিভের এই জনগণতন্ত্রের তত্ত্বটি আসলে, ওয়ার্শতে অনুষ্ঠিত ৯ পার্টির সম্মেলনে উত্থাপিত কমরেড ঝ্দানভের আন্তর্জাতিক দলিলের ছায়া অবলম্বনে রচিত। ("The peole's democratic goverment as a bloc headed by the working class—a bloc of peasant, people, etc., i.e. one in which the bourgeoisic has no place. He says that the bloc has introduced nationalisation, gone beyond bourgeois democracy, etc.—meaning towards socialism."—Documents of the History of the Communist Party of India, Vol. VII, 1948-1950; page 464)। এর পর থেকেই পার্টির মধ্যে 'জাতীয় গণফ্রন্ট' আর 'জনগণতন্ত্রের' মতাদর্শগত সংঘাত শুরু হয়ে যায়।

রণদিভের নেতৃত্বে এবার সি. পি. আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করলেন, "এ আজাদী ঝুঠা"—নেহরু সরকার আসলে ব্রিটিশ-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের আজ্ঞাবহ জমিদার-বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীল সরকার। একে অবিলম্বে উৎখাত করতে হবে। পলিটব্যুরোর অন্যতম সদস্য ভবানী সেনও তখন এই তত্ত্বের বলিষ্ঠ সমর্থক। পি. সি. যোশী নিরবচ্ছিন্নভাবে

রণদিভের সমালোচনা করতে থাকেন। ডাঙ্গে, রামমূর্তি, অজয় ঘোষ প্রমুখ নেতারাও রণদিভে-নীতির সমালোচনায় মুখর হলেন। রণদিভে তাঁর সমালোচকদের নেতৃত্ব থেকে বহিষ্কার ও কোণঠাসা করলেন। পার্টির 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি' থেকে 'গণতন্ত্র' কথাটা কার্যত বাতিল করে স্ট্যালিনীয় কায়দায় পার্টিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। ("for nearly two and a half years there was no collective functioning in the party. It was the general secretary who functioned assisted by one or two polit bureau members in the name of the PB. Even in conditions of utmost terror, no Communist Party can properly function at the whims of an individual or two. This small coterie ruled the party with the help of intimidation."—ঐ, Vol. VII, 1948-1950; XIV)।

রণদিভে তাঁর মতের সমালোচকদের শুধু পার্টি থেকে বহিষ্কার নয়, দু-একজনকে খতম করার ষড়যন্ত্রও করেছিলেন (সংকীর্ণতাবাদী ভেদপন্থার পতাকাবাহী ভালচন্দ্র ত্র্যম্বক রণদিভে—গৌতম চট্টোপাধ্যায়/পৃ. ১২)। সুভাষ সেই 'রোমহর্ষক', 'কুৎসিত' ঘটনাটিকে তাঁর 'কমরেড, কথা কও' উপন্যাসেও তুলে ধরেছেন—

"অস্বীকার করে লাভ নেই, কমরেড ভাইসাহেব। তখন তোমারও মিলিটারি মেজাজ। কেউ একটু বেগড়বাই হলেই হাতে মাথা কাটছ। যাকে তাকে পুলিশের চর বলে মনে করছ।

খবরটা ঠিক কিনা তুমি জান না, কিন্তু গুজব হিসেবেও কি তোমার কানে আসেনি যে পার্টির এক গদিচ্যুত নেতাকে ইহলোক থেকে সরাবার ব্যবস্থা হয়েছিল?"—(গদ্যসংগ্রহ-২য়/পৃ. ৪৪৭-৪৮)।

বেপরোয়া রণদিভে এবার সারাভারত রেল ধর্মঘটের ডাক দিয়ে শহরের পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকে সশস্ত্র সংগ্রামের দিকে ঠেলে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গ (২৬ মার্চ, ১৯৪৮), ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মাদ্রাজ রাজ্যে পার্টি ইতিমধ্যে বে-আইনি ঘোষিত হয়েছে। শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্রফ্রন্টের এবং পার্টির অনেক কর্মী ও নেতা সে-সময় কারারুদ্ধ হলেন। সুভাষও গ্রেফ্‌তার হলেন, তবে কিছুদিন পরে ছাড়াও পেলেন। তিনি লিখেছেন—"১৯৪৮ সালে প্রথমবার ছাড়া পেয়ে পার্টির কাগজ বার করার কাজে আবার পুরোদমে লেগে গেলাম। 'স্বাধীনতা' তখন বেআইনি। ছাপাখানাও বাজেয়াপ্ত। আমরা তখন ছোটখাটো প্রেস থেকে আজ যে কাগজ বার করি, কাল তা বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ২৭৩)। কাগজের জন্যে টাকারও খুব দরকার। কাগজের ম্যানেজার শচীন সেনের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা হল সুভাষের কিছু কবিতা নিয়ে ছোট একটা বই বের করা হবে। "সেটা বিক্রি করে কিছুটা টাকা তোলা হবে। এইভাবেই বার হয়েছিল 'অগ্নিকোণ' "—১৯৪৮-এর অক্টোবরে। সত্যি বলতে কি, সুভাষের কবিতা লেখায় ছেদ পড়েছিল ঢের আগেই। 'চিরকুট' এপ্রিল ১৯৫০-এ প্রকাশিত হলেও তার কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ১৯৪১-১৯৪৬-এর মধ্যে। এরপর সুভাষ কবিতা লিখেছেন কদাচিৎ। ওই যা 'অগ্নিকোণ'-এর গোটা পাঁচেক কবিতা। লিখবেন কি—তখন তো "সশস্ত্র সংগ্রাম আর মুক্ত অঞ্চলের স্বপ্নে" তাঁরা মশগুল। "বিপ্লবটা সেরে নেওয়ার

পরই লেখাপড়ার ব্যাপারগুলো আসবে। বিপ্লবের আগে সংস্কৃতি নয়। ঘোড়ার আগে গাড়ি নয়।"—('চিঠির দর্পণে/পৃ. ১৯৬)। রণদিভের বিপ্লবের ডাক এসে গেছে। নেহরু সরকারকে ফেলবার জন্যে "রেল ধর্মঘটের তখন তোড়জোড় চলছে। হাওয়া বেশ গরম।" (চিঠির দর্পণে/পৃ. ১৯৫)।

"দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা
অনাগত এক দিনের ফতোয়া
মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লট্‌কে দিয়ে
মিছিলে এগোয়
আকাশ বাতাস মুখরিত গানে
গর্জনে তার
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা।"—(একটি কবিতার জন্যে)

অনেকের মতো সুভাষও সেদিন বিশ্বাস করেছিলেন, সশস্ত্র বিপ্লবের পথে 'পচাগলা' নেহরু সরকারকে উৎখাত করলেই তাঁদের ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে যাবে—"নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা।" রণদিভে-ভবানী সেনের নেতৃত্বে জোরকদমে চলেছে তখন বিপ্লবের প্রস্তুতি। দেশব্যাপী রেল ধর্মঘটেই নাকি নড়বড়ে হয়ে যাবে জনবিরোধী সরকারের ভিত। তখন জনগণ এসে দাঁড়াবে বিপ্লবী বাহিনীর পাশে, শুরু হবে সশস্ত্র সংগ্রাম। তাই, নারকেলডাঙার রেল বস্তিতে-বস্তিতে ধর্মঘটের সমর্থনে সুভাষও সেদিন শ্রমিক নেতাদের প্রচারসঙ্গী। ১৯৪৮-এ পুজোর পরে পরেই তিনি আবার ধরা পড়ে দমদম জেলে আটক হলেন। —"আমি তখন দমদম জেলে। রেল-ধর্মঘট যাচ্ছেতাই রকমের ব্যর্থ। নতুন ডেটিনিউ আর আন্ডারট্রায়ালের ভিড়ে জেল উপছে পড়ছে। কতজন যে বরখাস্ত হয়েছে চাকরি থেকে তার ইয়ত্তা নেই।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ২৭৩)। নেতারা গোপন পথে জেলের কমরেডদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন—অনির্দিষ্ট কালের জন্য অনশন ধর্মঘট করতে হবে এবং কারারক্ষীদের সঙ্গে সংঘর্ষে যেতে হবে। "নিশির ডাক শুনে বেরিয়ে পড়ে পার্টি তখন জলে ডুবছে, তবু তার হুঁশ নেই। তখনও বাইরের নেতারা সমানে আমাদের গ্যাস দিচ্ছে—সারা দেশ তোমাদের পেছনে। ...রেললাইন উড়িয়ে দিয়ে। সশস্ত্র পাহারাদারদের সঙ্গে বন্দুকের লড়াই করে তোমাদের তারা ছিনিয়ে নেবে। জেলের ভেতর থেকে দাঁতে দাঁত দিয়ে তোমরাও লড়ো। সাতচল্লিশ দিনের অনশন থেকে বেঁচে উঠে আমাদের তখন হাড্ডিসার চেহারা। ভীম পালোয়ান সেপাইদের সঙ্গে আমরা নাকি তখন লড়ব।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ৪১)। দমদম জেলের সেই অনশন আর লড়াইয়ের ঘটনা নিয়ে সুভাষ পরবর্তী কালে লিখেছেন তাঁর 'হাংরাস' উপন্যাস (১৯৭৩)। তার আগে ১৯৭১-এ, "খুব রসিয়ে রসিয়ে বলা" 'জেলখানার গল্পে'ও স্মৃতির অ্যালবাম থেকে তুলে ধরেছেন সেই লড়াইয়ের টুকরো একটা ছবি, যা চোখের জলে ভেজা—

"দাঁতে দাঁত দিয়ে সব ব'সে থাকা
কিছুতে না-খাওয়া,
সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বারান্দায় জল ঢেলে রাখা
টিয়ার গ্যাসের জন্যে, সারা রাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি—
তবু কী আনন্দে, ভাবো,
কেটেছিল জীবনের সেই দিনগুলি।
বলতে বলতে জল আসে আমাদের দুজনেরই চোখে।
মুখগুলো ভেসে ওঠে; মনে পড়ে
প্রভাত-মুকুল-সুমথকে।

জেলের ভেতর ব্যারিকেড-লড়াইতে সেদিন যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেই গোবর্ধন-প্রভাত-সুমথ-মুকুলদের কথা সুভাষ কোনোদিন ভোলেন নি। আর বৌবাজারের মোড়ে তাঁদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য যে মা-বোনেরা (লতিকা-প্রতিভা-গীতা-অমিয়া) সেদিন প্রাণবলি দিয়েছিলেন, তাঁদের কথাও তিনি ভুলতে পারেন না। "সে কথা ভুলব কেমন করে? আমাদের রক্তে জমা থাকল সেই ঋণ।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ৪৪)।

দমদম জেলে, সুভাষের লেখালিখির কাজ বন্ধ। মিটিং, অনশন ধর্মঘট আর ব্যারিকেড লড়াই নিয়েই তো দু-বেলা তারা ব্যস্ত। কিছু অনুবাদ, আর অনশন ধর্মঘটের দু-একটি গান ছাড়া বিশেষ কিছুই লেখেন নি। সশস্ত্র সংগ্রাম আর মুক্ত অঞ্চলের স্বপ্নে সবাই তখন মশগুল। সুভাষ মেনে নিয়েছিলেন, "বিপ্লবটা সেরে নেওয়ার পরই লেখা-পড়ার ব্যাপারগুলো আসবে। বিপ্লবের আগে সংস্কৃতি নয়। ঘোড়ার আগে গাড়ি নয়।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ১৯৬)। এরপর দমদম জেল থেকে একদল রাজবন্দির সঙ্গে সুভাষও স্থানান্তরিত হলেন আলিপুরদুয়ারের বক্সা জেলে। দমদম জেলে অনেকদিন থাকবার পর ঠাঁই-নাড়া হয়ে সুভাষের ভালোই লাগল। সামনে পেছনে সশস্ত্র পুলিশের মিছিল। বড় বড় গাছের ছায়ায় আবছা পথ আর দূর থেকে ভেসে আসা ঝরনার ছল্‌ছল্‌ শব্দ। পাথরে পা টিপে টিপে তাঁরা পৌঁছেছিলেন পাহাড়ের ওপরে—'মেঘের গায়ে জেলখানা'য়। বহুদিন পর, সেই স্মৃতির একটা টুকরো ছবি হয়ে ফুটে ওঠে তাঁর 'এই পথ' কবিতায়—

"আমি আজও ভুলি নি
সামনে পেছনে সশস্ত্র পাহারা
আকাশ পত্রজালে ঢাকা
আমরা বন্দীর দল
পাথরে পা টিপে টিপে উঠছি।
হঠাৎ আমরা কথা বন্ধ করলাম
তারপর কান পেতে শুনতে লাগলাম
স্তব্ধ পাহাড়ে
ছলাৎ ছল ছলাৎ ছল
এক অদৃশ্য ঝর্ণার শব্দ।"

সর্বনাশা অভিজ্ঞতা

আগে-পরে প্রায় আড়াই বছর রাজবন্দি থেকে, ১৯৫০-এর নভেম্বরে সুভাষ মুক্ত হলেন। বাইরে এসে দেখলেন পার্টিতে তখন প্রচণ্ড দলাদলি। এতদিন হাতে মাথা কেটেছেন যে রণদিভেপন্থীর দল, তারা খুবই কোণঠাসা। "এমনিতে মনে হবে যেন 'ফর এ লাস্টিং পীস ফর এ পিপলস পিপল্‌স্ ডিমোক্রেসি'র কলমের এক খোঁচাতেই পার্টির গৃহীত লাইন বাতিল হয়ে গিয়েছিল। আসলে তা নয়। চলতি লাইনের বিরোধিতা পার্টির ভেতরেই ছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল সে লাইনের সর্বনাশা অভিজ্ঞতা।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ৬০)। ১৯৫০-এর মে মাসেই রণদিভেকে পার্টির নেতৃত্ব থেকে সরিয়ে দিয়ে সাধারণ সম্পাদকের পদে বসানো হয়েছে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের অন্যতম নেতা চন্দ্র রাজেশ্বর রাওকে (জুন থেকে ডিসেম্বর ১৯৫০)। সশস্ত্র সংগ্রামকে এবার গ্রামের দিকে ঠেলে দিয়ে বলা হল চিনের কৃষক বিপ্লবের পথই তেলেঙ্গানার পথ—ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লবেরও পথ। প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির পর তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামও শেষ পর্যন্ত (অক্টোবর ১৯৫১) বন্ধ করে দেওয়া হল।

কমরেডদের দুঃসাহসিক বীরত্ব সত্ত্বেও রণদিভেপন্থীদের সশস্ত্র জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লাইন কমিউনিস্ট পার্টির প্রভূত ক্ষতির কারণ হয়ে ওঠে এবং গণসংগঠনেও চরম বিপর্যয় নেমে আসে। "Tremendous damage was done to the basic fabric of the party, apart from decimation of its members. The party was brought to the verge of collapse. The membership fell drastically to 20,000 from 89,000 at the time of the second party congress."—(Documents of the History of the C.P.I. Vol;. VII, 1948-1950; page XIV). সুভাষও বারবার আক্ষেপ করেছেন, "যোশীর গণপার্টিকে চুলোয় দিয়ে ভেঙে চুরমার করা হল সমস্ত সংগঠন।"

যোশী যে প্রতিভাধর শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের একজায়গায় এনেছিলেন, রণদিভের স্টিমরোলারের ধাক্কায় তাঁরা যে যেদিকে পারে পালাতে পথ পায়নি। 'লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' ও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের তখন ভগ্নদশা। সুভাষ লিখেছেন, "কেন্দ্রীয় দল থেকে রবিশঙ্কররা আগেই ছুটে গিয়েছিলেন, যাঁরা থেকে গেলেন, তাঁরাও আর শেষ পর্যন্ত তিষ্ঠোতে পারলেন না। যে অতিবিপ্লবীরা গলায় রসুড়ি দিয়ে গান বার করতে চেয়েছিলেন, 'মাথার ওপর ঝুলছে খাঁড়া' হেঁকে স্টেজ খালি করে তাঁরাও একদিন বেরিয়ে গেলেন।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ৫৪)।

সুভাষ মনে করেন, রণদিভের আমলে পার্টির সব থেকে বড় বিপর্যয় ঘটে মূল নেতৃত্বের মধ্যেই। নেতারা এ ওকে দেখিয়ে বলতে থাকেন—ও 'পুলিশের স্পাই', ও 'পঞ্চমবাহিনী' ওমুকে 'বুর্জোয়ার দালাল'। নেতাদের মধ্যেকার দলাদলি, পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস—পার্টি সংগঠনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে যায়। যোশীর পার্টিতে মানুষ হয়েছেন বলে সুভাষ জানেন, "পার্টি ঠিক একটা পরিবারের মত। কমরেডে কমরেডে যে ভাব ভালোবাসা হয়, যে সহমর্মিতা গড়ে ওঠে, বাইরে তার তুলনা নেই। তার কারণ এ আত্মীয়তা লড়াইয়ের

ময়দানে সহযোদ্ধার সঙ্গে সহযোদ্ধার।" যোশী পার্টিকে ৯০ হাজার সদস্যের একটা 'সুখী পরিবার' হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৪৮, কলকাতা) যোশীকে আক্রমণ করে রণদিভে বলেছিলেন, " 'সুখী পরিবার' হওয়া পার্টির উদ্দেশ্য নয়, 'বিপ্লবী সংগঠন' গড়াই তার কর্ম, যে-কর্মে তেমন আমরা এগুতে পারি নি।"—(তরী হতে তীর/পৃ. ৩১৪)। রণদিভের বিপ্লবী অভিভাবত্বে পার্টি ও গণসংগঠনের কী সর্বনাশা বিপর্যয় ঘটেছিল তা আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে। বিপ্লবের এক ধাক্কায় পার্টির সদস্য সংখ্যাই ৯০ হাজার থেকে কমে গিয়ে ২০ হাজারে দাঁড়াল। বিপর্যয়ের পর নেতারা ভুল স্বীকার করলেন। তাতেই যেন তাঁদের সাতখুন মাপ! কিন্তু তাঁদের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসা বা ভুলের কারণ অনুসন্ধানের কোনো আন্তরিকতা তেমন দেখা গেল না। তাঁরা অনেকেই ব্যস্ত রইলেন দলাদলিতে বা একে অন্যের ওপর দোষ চাপাতে। অথচ তাঁদের ভুলের মাশুল গুণতে হয়েছে পার্টির সাধারণ কর্মীদের। তাদের মধ্যে তখন দারুণ বিভ্রান্তি আর হতাশা।

সুভাষ লিখেছেন—"আমাদের চারদিকে তখন পালাই পালাই রব। ইস্কুলে-কলেজে আপিস-কাছারিতে ঢুকে পড়ে অনেকেই এতদিনের ব্যক্তিগত ক্ষতিগুলোকে যতটা পারে পুষিয়ে নিতে চাইছে। বাতাস ভরে উঠেছে হাহুতাশে। পার্টির ওপর তাদের অভিমান লাইন ভুলের জন্যে নয়। যেন কোনো ছেলেধরা ফুল শুঁকিয়ে তাদের ফুস্‌লে নিয়ে গিয়েছিল। এখন তারা হাত কামড়াচ্ছে।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ১৩২)। সুভাষ 'হাহুতাশ' করে বা অন্যের উপর দোষারোপ করেই নিজের দায়িত্ব এড়ালেন না। তিনি অকপটেই স্বীকার করেছেন যে, রণদিভের সেই সর্বনাশা পার্টি লাইন তিনি সেদিন অম্লানবদনে মেনে নিয়েছিলেন। এমনকি ভবানী সেনের 'বুর্জোয়া' রবীন্দ্রবিরোধী লাইনের প্রতিও তাঁর সমর্থন ছিল। তবে নিজের দুর্বলতার কথাও সুভাষ গোপন করেননি—"পার্টিতে বহিষ্কার আর ফাঁসির মধ্যে কোনো ফারাক নেই। ক্ল্যানবিভক্ত আদিম সমাজেও এই রীতির চল ছিল। ক্ল্যান থেকে কাউকে বার ক'রে দিলে এলাকার বাইরে তাকে পড়তে হত বৈরী ক্ল্যানের খপ্পরে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা যেত তার গর্দান। সে যুগে সন্দেহবশে বলি কি কম হয়েছে? আমরা সব তখন জো-হুজুর। টুঁ শব্দও করিনি।" (চিঠির দর্পণ/পৃ. ২৭৪)।

এ প্রসঙ্গে একটি কথা বোধহয় বলা দরকার। কমিউনিস্ট সংগঠনের 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি' অনুযায়ী পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচি বা শীর্ষ নেতৃত্বের প্রস্তাবাদি রাজ্য থেকে শাখা পর্যন্ত ব্যাপ্ত সংগঠনের প্রতিটি স্তরের নেতা ও কর্মীকে মেনে চলতে হয়। পার্টিতে থাকতে গেলে এ শৃঙ্খলা না মেনে উপায় নেই। তবে মানানোর ব্যাপারটা লেনিনীয় না স্ট্যালিনীয় পদ্ধতিতে হবে সেটাই আসল কথা। পি. সি. যোশী 'গণতন্ত্র' ও 'কেন্দ্রিকতা'র মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের লেনিনীয় পদ্ধতি মেনে, সদস্যদের মতামতকে মর্যাদা দিয়ে, তাদের পার্টির নীতি ও কর্মসূচির পক্ষে টেনে আনার পক্ষপাতী ছিলেন। অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ও লিখেছেন, "একটা বিষয়ে লেনিনের সঙ্গে যোশীর সাদৃশ্য এই যে, দেশে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই ভিন্ন অন্য কোনো বিষয়ে তার চিন্তা নেই।...ব্যবহারে জড়তা নেই বরং আছে সহজ আন্তরিকতা, বুঝলাম অপরকে টানার শক্তি এ রাখে।...জানি না যোশী

ছাড়া অন্য কেউ সেদিন পার্টিপ্রধান থাকলে তার মতো আমাকে পার্টিতে টেনে নেওয়া ঘটত কি না...।"—(তরী হতে তীর/পৃ. ২৩৩-৩৪)। রণদিভের বিপ্লবী ধাতটা ছিল অন্য ধরনের। স্ট্যালিনীয় পদ্ধতিতে কেন্দ্রিকতার স্টীমরোলার চালিয়ে, বিরোধী মতামতকে স্তব্ধ করে, পার্টির মধ্যে ত্রাস সৃষ্টি করে তিনি তাঁর 'বিপ্লবী' নেতৃত্ব জাহির করতেন। ফলে 'পুলিশের চর', 'প্রতিবিপ্লবী', 'বুর্জোয়ার দালাল' ইত্যাদি কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে পার্টি থেকে বিতাড়িত হবার ভয়ে অনেকে সেদিন টুঁ শব্দটি করেন নি। সে কথা সুভাষ কবুলও করেছেন!

তাছাড়া ভারতীয় ক্ষেত্রে বিপ্লবের স্তর, বিপ্লবের পদ্ধতি, বিপ্লবী হিংসা প্রয়োগের অনিবার্যতা, সমাজতন্ত্র, মার্কসবাদও হিউম্যানিজম, গণতন্ত্র, পার্টিতন্ত্র ইত্যাদি বিষয়েও সুভাষের সে সময় কোনো গভীর রাজনৈতিক বোধ ছিল না বলেই মনে হয়। এসব বিষয়ে পার্টিনেতার কথাকেই তখন বেদবাক্য বলে মনে করতেন। 'আত্মদীপ' হয়ে বিচার-বিশ্লেষণের সাহস তিনি অর্জন করেছিলেন খ্রুশ্চভের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত পার্টির বিশতম কংগ্রেসের (১৯৭৫) পর।

এক বই পড়া বিপ্লবীর রূপান্তর

জেল থেকে বেরিয়ে কিছুদিন পর সুভাষ পার্টির নির্দেশে 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদনার (১৯৫১) দায়িত্ব নিলেন। 'পরিচয়' ঘাড়ে নিয়ে তাঁর নাজেহাল অবস্থা। তার টাকার ব্যবস্থা, গ্রাহক পাকড়ানো, বিজ্ঞাপন জোগাড়, লেখা আদায়—সব ভারই তখন তাঁকেই বহন করতে হয়েছে। কাগজে তো পার্টির। কাজেই এ তো পার্টিরই কাজ। আর সম্পাদকের দায়িত্ব তিনি তো ঘাড় পেতেই নিয়েছেন। তবে একটু অনুযোগ জানাতেও ভোলেননি—"অবশ্য আমি যখনই সম্পাদক হয়েছি, তখনই দেখেছি পার্টির আপন হাত জগন্নাথ। হয়ত সে সময়গুলো পার্টির দুর্দিন ছিল বলে। কিন্তু অন্যদের বেলায় তা নয়। নাকি পার্টি আমাকে খুব লায়েক ঠাওরে ছিল?"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ৬৬)। যাইহোক, 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্ব সে যাত্রায় (১৯৫১-৫২) সুভাষ বেশ যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন।

সুভাষকে লেখা একটা চিঠিতে স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য জানিয়েছেন—"তুমি সম্পাদক হওয়ার পর 'পরিচয়ে'র উন্নতি হয়েছে।...'পরিচয়' তার পূর্বগৌরব হয়ত এখনো ফিরে পায়নি। কিন্তু মাঝখানের শোকাবহ নিমজ্জমান দশা থেকে তুমি অর্থাৎ তোমার আমল যে, তাকে প্রকৃতিস্থতার ডাঙায় টেনে তুলেছে এ কথা কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নিয়মিত পাঠক অস্বীকার করতে পারবে না।...যেখানে এখনো আমাদের মধ্যে 'সাহিত্যের আবহাওয়া—কানাকানি আর রেষারেষিতে ভারাক্রান্ত' এবং এর পেছনে রাজনৈতিক আকাশে এত বড় ভুলভ্রান্তির ঝড়ঝাপ্টার পরে স্বচ্ছতা ও সুস্পষ্ট পথনির্দেশের অভাব এখনো রয়েছে, সে-ক্ষেত্রে 'পরিচয়ে'র সাংস্কৃতিক প্রতিফলন এসবের কত বেশি ঊর্ধ্বে উঠতে পারে শুনি?"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ১১০)।

সুভাষ রাজনীতিতে 'বরাবরই গোঁড়া'। জেল থেকে সবে বেরিয়েছেন, তখনও তেলেঙ্গানার সশস্ত্র সংগ্রামের আগুন নেভেনি। তিনিও বিপ্লবী আবেগে 'টগবগ করে' ফুটছেন।

কিছুদিন আগেই তো ভবানী সেনের 'বুর্জোয়া রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ক ঝাদানভীয় মতামতকে সমর্থনও করেছেন। তবে রণদিভে-ভবানী সেন পর্বের বিপর্যয় থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে বদলাবার চেষ্টাও যে তাঁর শুরু হয়েছে, স্বর্ণকমলবাবুর চিঠি থেকে তা অন্তত বোঝা যায়।

'পরিচয়ে'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণের কিছুদিন পর, ১৯৫১-এর ১৭ আগস্ট, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুভাষ তাঁর বিবাহ-পর্বটাও সেরে ফেলেন। এবং বিয়ের ঠিক আটমাস পর, ১৯৫২-র মে মাসে স্বামী-স্ত্রী মিলে তাঁরা চলে যান বজবজের ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামে শ্রমিকদের মধ্যে বসবাস করতে।—

"একদিন উঠে বসলাম বজবজের বাসে। নেমেছিলাম চড়িয়ালে। গ্রাম ব্যঞ্জনহেড়িয়া। চটকল আর তেলকলের মজুরদের বাস। মাটির ঘর। সামনে এঁদো-পুকুর। আঠারো টাকা ভাড়া। দুজনেই সর্বক্ষণের কর্মী। বিনা ভাতাতে। লেখালেখি থেকে মাসে সাকুল্যে আয় পঞ্চাশ টাকা।"..."ভোরে গেট মিটিং। সকালে দুটো নাকেমুখে গুঁজেই চলে যেতে হয় বাসে সটান আলিপুরের ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে।...সন্ধেবেলায় ফিরে হয় পার্টি অফিস, ইউনিয়ন অফিস, নয় বস্তিতে। গীতার সঙ্গে ওখানেই কোথাও দেখা হয়ে যায়।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ১৩২ ও ১৫৩)। এই যে জীবন-যাপন, তা যে 'শখের মজদুরি' নয় তা অক্লেশেই বলা যায়। ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের অধিকাংশ বাসিন্দাই গরিব মুসলমান, চটকল-তেলকলের শ্রমিক। তাদের জীবনের সঙ্গে সুভাষ ও গীতাদেবী আস্তে আস্তে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেখানকার মানুষজনের ওপর তাঁদের "এক অসম্ভব মায়া" পড়ে গিয়েছিল। শ্রমিক বস্তিতে থেকে তাদের সুখ-দুঃখ, তাদের জীবন-সংগ্রামের একজন হয়ে, যাকে বলে 'জীবনে জীবন যোগ' করে সুভাষ বুঝেছিলেন, 'শ্রমিক' বা 'শ্রমিকশ্রেণি' মার্কসীয় পুথির পাতায় পড়া নিছক বিপ্লব-সাধনের যন্ত্র নয়। তারাও সুখে-দুঃখে আন্দোলিত, দোষে-গুণে মিশ্রিত রক্ত-মাংসেরই মানুষ। ব্যঞ্জনহেড়িয়ায় সুভাষ আড়াই বছর ছিলেন (মে ১৯৫২-নভেম্বর ১৯৫৪)। তিনি লিখেছেন, "বজবজে না গেলে, গিয়ে না থাকলে জীবনে অনেক কিছুই অজানা থেকে যেত।" এবং "বেশ বুঝতে পারছি, এই দুই আড়াই বছরে মানুষের ভালোমন্দ সম্বন্ধে আমার বিচারের মাপকাঠি বদলেছে।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ২৭০)। এ কথা ঠিক, তাঁর বজবজ-বাসের অভিজ্ঞতা তাঁর রাজনৈতিক বোধের ক্ষেত্রে, তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সুভাষ বুঝেছিলেন, শুধু পুথি-পড়া বিদ্যেয় রাজনীতি করা চলে না। আর রাজনীতি যদি নিজের বোধ ও অভিজ্ঞতার অন্তর্গত না হয়, তা হলে শুধু আবেগ আর কলা-কৃতি সম্বল করে বিপ্লবের ভালো কবিতা লেখাও যায় না। বুদ্ধদেব বসুর প্রশংসাধন্য 'পদাতিক'-এর কবিতা বা সহযোদ্ধাদের মুখে মুখে ফেরা 'চিরকুট' বা 'অগ্নিকোণে'র অসামান্য সব পংক্তিকে পেছনে ফেলেই এগিয়ে আসে 'ফুল ফুটুক'-এর 'জয়মণি, স্থির হও', 'সালেমনের মা', 'সুন্দর', 'এক অসহ্য রাত্রি', 'ফুল ফুটুক না ফুটুকে'র মতো রসোজ্জ্বল সব কবিতা। বোঝা যায়, তাঁর আবেগ তাঁর অভিজ্ঞতার অন্তর্গত গভীর অনুভূতি হয়ে তাঁর কবিতায় এখন হিরকদ্যুতিতে জ্বলছে। বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্রও একটা চিঠিতে (২১.৯.১৯৫২) তাই লিখছেন, "এবং সবচেয়ে প্রয়োজন...বজবজের আবেগ অভিজ্ঞতার ছাপগুলোকে অন্তত এক

ডজন কবিতায় রূপান্তরিত করা। তুই হাসলেও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবি যে এই কবিতাগুলো দিয়েই কাব্যজীবনের একটা নতুন যুগ শুরু হয়ে যাচ্ছে; ঠিক এই মুহূর্তে যতগুলো সম্ভব কবিতার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করাই কবিপৌরুষ।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ১৬৮)। তাঁর কবিতা যে বাঁক নিচ্ছে সে বিষয়ে সুভাষও যে কত সচেতন, তা বোঝা যায় যখন লেখেন, "আমার মুশকিল হয়েছে টুকরো টুকরো ছবিগুলোকে একটি আবেগের স্রোতে কিছুতেই ভাসাতে পারছি না। আসলে উপলব্ধির মধ্যে যথেষ্ট গভীরতা এখনও আনতে পারিনি। তবে আগের চেয়ে আত্মবিশ্বাস বাড়ছে। যে চক্রের মধ্যে এতদিন ঘুরপাক খাচ্ছিলাম, যার জন্যে বারবার নিজেকে পুনরাবৃত্তি করছিলাম তা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি বলে মনে হচ্ছে।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ২৭১)। অর্থাৎ কিনা স্বপ্ন ও মায়ার মতিভ্রম কাটিয়ে উঠে, সমাজ-সঙ্গের প্রাণবান অংশ হিসেবে মিছিলের একজন হয়েই সুভাষের সত্তার উত্তরণ ঘটছে। তাই আত্মবিশ্বাসেই তিনি এখন বলতে পারেন—

"এই পৃথিবীতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে
দেখ
আমি জটায় বাঁধছি
বেদনার আকাশগঙ্গা।"—(জয়মণি, স্থির হও)

কবিতার প্রসঙ্গ আপাতত বাদ দিয়ে ব্যঞ্জনহেড়িয়া পর্বে সুভাষের রাজনৈতিক বোধের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটল তা এবার আলোচনা করব। সুভাষের স্বীকৃতি অনুযায়ী—"ছাত্রজীবনে আমরা ছিলাম বই-পড়া বিপ্লবী। সব সময়ে জান-লড়িয়ে দেওয়া শহিদ-শহিদ ভাব। চুলে তেল নেই। রসকষহীন কথা। কাউকে তেল-চকচকে দেখলেই ধরে নিতাম নির্ঘাত সে শ্রেণিশত্রু। বজবজে এসে এ যে দেখি উল্টো উৎপত্তি।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ২৭৫)।

১৯৪৮-এর রণদিভে পর্বের সর্বনাশা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠে পার্টির নীতি ও কর্মসূচি আবার এক বাঁক নিচ্ছে। সুভাষের প্রত্যয় "কম্বু রেখার মতই আমরা উঠব"। কারণ পৃথিবীর ইতিহাস যে অন্য কথা বলে—"নিভন্ত আগুনের চিতায়/জন্ম নেয়/মহিমান্বিত জীবন।" ১৯৫১ সালের প্রথম পার্টি কর্মসূচি গ্রহণের মধ্য দিয়ে বেদনাদায়ক ভ্রম-সংশোধনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিপ্লবী হঠকারিতার ফলে জনতার সঙ্গে পার্টি ও গণসংগঠনের যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গিয়েছিল, তা পুনঃসংযোগের প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়। তবে সশস্ত্র সংগ্রামের স্বপ্ন-মায়া আর মতিভ্রম সি. পি. আই নেতৃত্বের এক অংশ তখনো কাটিয়ে উঠতে পারে না। কমরেড অজয় ঘোষের নেতৃত্বে যোশী-ডাঙ্গে প্রমুখের 'নেশন্যাল ফ্রন্ট' আর রণদিভেপন্থীদের জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টের তত্ত্বকে মিলিয়ে পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ রাখার আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও পার্টিকর্মসূচিতে মারাত্মক ত্রুটি থেকেই যায়। 'বাম' সংকীর্ণতাবাদীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মৌলিকভাবে সঠিক অবস্থান গ্রহণে সমর্থ হয়। ১৯৫১-৫৫ এই সময়কালে পার্টির ভেতরে মতাদর্শগত প্রশ্নগুলো নিয়ে যখন টানাপোড়েন চলছে, সুভাষ তখন বজবজে গিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে থেকে, তাদের জীবনের সঙ্গে নিজেদের জীবন যোগ করেই শ্রমিক আন্দোলনের সহৃদয় সহযাত্রী হয়ে উঠলেন। তাঁর

জীবনের অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত হয়েই সুভাষের রাজনৈতিক বোধ নতুন দিশা খুঁজে পেল—মানুষকে বাদ দিয়ে রাজনীতি নয়, রাজনীতির কবিতাও নয়। মার্কসের সেই বাণী সুভাষের অন্তরের সত্য হয়ে ফুটে উঠল—"মানব-সম্পর্কিত কোনো-কিছুই আমার পর নয়" ('Nothing human is alien to me') আর জীবনের পরম সুখ হল 'সংগ্রাম'। (Reminiscences of Marx and Engels, Moscow, page. 226)। মানুষের জীবন আর সংগ্রাম সুভাষের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে স্পন্দিত হচ্ছে তাঁর কবিতায়—"মাটিতে পা, আকাশে হাত। মিছিলে।" পা মিলিয়েই তিনি 'সুন্দর'কে অনুভব করেন—"যখন ভোঁ বাজতেই/মাথায় চটের ফেঁসো জড়ানো এক সমুদ্র/একটি করে ইস্তাহারের জন্যে/উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল/যখন তোমাকে আর দেখা গেল না—/তখনই/আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।" তত্ত্ব এখন কর্মের, স্বপ্ন এখন জীবনের হাত ধরাধরি করেই মিছিলে পা রাখছে।

শুধু পুথি-পড়া বিদ্যেয় যে রাজনীতি করা চলে না, চটকল শ্রমিকদের মধ্যে থেকে, তাদের আন্দোলনের একজন হয়েই সুভাষ তা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছেন—"এর আগে বোনাসের দাবিতে চটকল মজুরদের তাতাবার অনেক চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু কোনোবারই ফল হয়নি। দাবিগুলো ছিল এমন উচ্চগ্রামে বাঁধা যে, এ অবস্থায় তা পাওয়া সম্ভব বলে তারা মনে করেনি। এবার হল আশ্চর্য ব্যাপার। এবার দাবিগুলো রাখা হয়েছিল এমন, যা সবাই মিলে হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। বোনাসের দাবিটা যে লোকের মনে ধরেছে ঘরে বসেই একদিন তা টের পেয়ে গেলাম। পাড়ার লোকে পুকুরে স্নান করছিল। হঠাৎ কানে এল তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, বোনাসের টাকায় কে কী করবে। কেউ দেবে বউকে রূপোর নাকছাবি, কেউ দেবে ছেলেমেয়েদের ঝকমকে পোশাক, কেউ তার ভাঙা চাল নতুন করে ছেয়ে নেবে। বোনাস বলতে শুকনো টাকার গাছ নয়, মনে মনে অঙ্কুরিত হয়েছে ছোট্ট ছোট্ট কল্পতরুর চারা।

যেদিন আমাদের মিছিল, সেদিন এক কাণ্ড। বাসা থেকে বেরিয়ে দেখি পুকুরপাড় বেয়ে চলেছে সারবন্দী মানুষ।...প্রত্যেকের হাতে ছোট ছোট কাঠের গায়ে জড়ানো লাল কাগজের নিশান। সে এক দৃশ্য বটে। যেন সবাই যাচ্ছে কোন উৎসবে।...কেল্লা ফতে করে সেদিন রাত্রে সবাইকে গুছিয়ে নিয়ে আমরা বজবজে ফিরেছিলাম। ফেরাটাও ছিল একটা উৎসবের মতন। দাঁত-খিঁচোনো চিৎকার নেই, আকাশে ঘুসি মারা নেই, সবাই যে-কে সেই। উৎসবের মেজাজ নিয়ে যেন সবাই কাজে গিয়েছিল। কাজ সেরে ফিরছে। একটাই মিছিল, তাতে বিচিত্র সব আবেগ। সার বেঁধে চলেছে স্নেহভালবাসা আর মধুরতা। হাসিঠাট্টা, ভালো-লাগা, মন্দ-লাগা—সবই সেই মিছিলের অন্তর্গত।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ২৭৫-৭৬)। সুভাষের রাজনৈতিক বোধ এবার "কোটালের বানে মাথা উঁচু করে পাথুরে মাটিতে পা টিপে দৃপ্ত মিছিলে এগোয় দুর্দমনীয় স্পর্ধা"য়। এখন তাঁর কাছে আর অসম্ভব মনে হয় না—"তুমি আলো, আমি আঁধারের আল বেয়ে/আনতে চলেছি/লাল টুকটুকে দিন"—আর "অফুরন্ত স্বপ্ন দেখার/শান্তির পৃথিবী।" কারণ, "ধ্বংসের চেয়ে সৃষ্টির,/অন্ধকারের চেয়ে আলোর দিকেই পাল্লা ভারী

হচ্ছে।" সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশতম কংগ্রেসে (১৯৫৬) ক্রুশ্চেভ ঘোষণা করেছিলেন, পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রের বিজয়ী আত্মপ্রতিষ্ঠার পর বিশ্বযুদ্ধ আর অনিবার্য নয়। ভারতসহ পৃথিবীর কোনো কোনো দেশে গৃহযুদ্ধ ব্যতীতই শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চিনসহ বিশ্বের ১২টি কমিউনিস্ট পার্টির 'ঘোষণা'য় ও ১৯৬০ সালে ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টির 'বিবৃতি'র মধ্যেও ক্রুশ্চেভের ওই মতামতই সমর্থিত হয়েছিল। সুভাষও তাই নির্দ্বিধায় ঘোষণা করেছেন—

পৃথিবীকে নতুন করে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে, শোনো,
ক্রুশ্চভের গলায়।
নির্বিবাদে নয়, বিনা গৃহযুদ্ধে
এ মাটিতে
সমাজতন্ত্র দখল নেবে।—(মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)

এ তো অনেক পরের লেখা (১৯৬২) রাজনৈতিক বোধের কথা। ১৯৫৭-র আগেই সুভাষের রাজনৈতিক বোধের মধ্যে বিশ্বশান্তি, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান আর শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের সম্ভাবনার কথা স্থান করে নিয়েছে ('অফুরন্ত স্বপ্ন দেখার/শান্তির পৃথিবী', 'চলো সুখে শান্তিতে বাঁচি'—ফুল ফুটুক)। তিনি অকপটেই স্বীকার করেন "এখন আমি আর ঠিক সেদিনের সে-আমি নেই।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ২৭৩)।

'ভূতের বেগারে'র কাজিয়া

শান্তিপূর্ণ বা সশস্ত্র সংগ্রাম, যে পথেই এ দেশে সমাজতন্ত্র আসুক না কেন শ্রমিকশ্রেণির মুখ্য ভূমিকা সেখানে থাকবেই। তাই, তাদের শিক্ষিত করা, তাদের মধ্যে শ্রেণিচেতনা জাগিয়ে তোলার কাজটা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা চলে না। 'বোনাস' ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়ে শ্রমিকরা যেমন আন্দোলন করবে, তেমনি রাজনৈতিক অধিকার নিয়েও তাদের আন্দোলন করতে হবে। এজন্য তাদের রাজনৈতিক শিক্ষা দরকার, তাদের সাক্ষরতাও দরকার। শ্রমিকরা নিজেরা পড়ে বুঝুক "গতর খেটে দল বেঁধে কাজ করে বলে সমাজকে ঢেলে সাজার কলকাঠি ওদের হাতে। শৃঙ্খল ছাড়া ওদের হারাবার কিছু নেই।" উৎপাদনের ক্ষেত্রে, সমাজকে ঢেলে সাজাবার ক্ষেত্রে শ্রমিকের শ্রমশক্তির গুরুত্ব যে কতখানি, তা সহজ সরল ভাষায় তাদের বুঝিয়ে দেবার জন্য সুভাষ ১৯৫৪ সালে 'ভূতের বেগার' নামে একখানা বই লেখেন। বইটির ভূমিকায় লেখা হল—"গোড়াতেই বলে রাখা ভালো, এটা ভূতের গল্প নয়। কার্ল মার্কসের 'মজুরী পুঁজি' (ওয়েজ লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল) বইটি অবলম্বন করে অর্থনীতির কথাগুলো সহজ বাংলায় বলবার চেষ্টা করেছি।

কাজটা কঠিন। কিন্তু তাহলেও সাহস করে এ কাজে এখনই হাত দেওয়া দরকার। আমাদের দেশে মার্কসবাদ-পড়া পণ্ডিতের অভাব নেই। দুঃখের বিষয়, তারা বিদ্যের জাহাজ হয়ে বসে আছেন—কম লেখাপড়া জানা মানুষদের কাছে খানিকটা জ্ঞান পৌঁছে দেবার তেমন

চাড় তাঁদের তরফ থেকে দেখা যাচ্ছে না।"

বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে 'স্বাধীনতা' (২ জানুয়ারি, ১৯৫৫) পত্রিকায় অভিযোগ করা হয়, মার্কসের 'মজুরি ও পুঁজি' বিষয়ে সহজ করে লিখতে গিয়ে লেখক 'বিজ্ঞানের শুদ্ধতা বা যথার্থতা' ক্ষুণ্ণ করেছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পক্ষে রাজ্য সম্পাদক জ্যোতি বসু সুভাষকে জানিয়ে দিলেন, "এই কায়দায় মার্কসীয় অর্থনীতির প্রচার সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য"—(২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৫)। পার্টির সেই এক-তরফা সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, জগদীশ দাশগুপ্ত, সতীন চক্রবর্তী প্রমুখ বুদ্ধিজীবীরা। সুভাষ এই ঘটনার উল্লেখ করে পরবর্তীকালে লিখেছেন, "আমার লেখা 'ভূতের বেগার' নিয়ে পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে তখন জোর কাজিয়া চলেছে। 'বুদ্ধিজীবী' বলে পার্টিতে যাদের হেলাফেলা করা হয়, 'ভূতের বেগারে'র পেছনে তারা সবাই এককাট্টা। ফলে নেতারা পড়েছেন ফ্যাসাদে।...এদিকে প্রকাশকের মাথায় হাত। পার্টির নিষেধাজ্ঞা থাকায় পার্টির দোকান বইটি রাখেনি। ভয়ে পার্টির কেউ সেই বই কেনেনি। অপছন্দের বই বলে পার্টি আঁতুড়ঘরে নুন দিয়ে মারল। ক্ষমতায় না থেকেই এই।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ২৬৯)।

দরজা খুলে দাও, লোকে ভেতরে আসুক

"কমিউনিস্ট নামের পার্টিতে নাম লিখিয়েছি। সুতরাং আমি নির্ভেজাল কমিউনিস্ট; অতএব অভ্রান্ত মার্কস্‌বাদী এবং নির্ভুল বৈজ্ঞানিক। এই উদ্ভট নৈয়ায়িকতায় আজ আর কেউ বিশ্বাস করে না।

তাতে কমিউনিজম বা মার্কস্‌বাদ কোনোটাই বরবাদ হয়ে যায়নি। শুধু নির্বুদ্ধিতা আর অন্ধবিশ্বাসের পাশে ট্যাঁড়া পড়েছে।

যে আমার সঙ্গে নেই, সে আমার শত্রু—এই যুক্তিতে পুরনো বহু সহযাত্রীকে আমরা তো দূরে ঠেলেই ছিলাম, তাছাড়া যারা কাছে আসতে পারত তারাও ভয়ে সরে গেল।"—(চিঠির দর্পণে/পৃ. ৬৯)

১৯৫৪ সালের একেবারে শেষদিকে গীতা ও সুভাষ বজবজের পাট তুলে দিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। রাজনৈতিক বোধের ক্ষেত্রে সুভাষ আর তখন 'বই-পড়া বিপ্লবী' নন। মানুষের ভালোমন্দ সম্বন্ধে তাঁর বিচারের মাপকাঠিও বদলে গেছে।

১৯৫০-এ পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব থেকে রণদিভেপন্থীরা অপসারিত হলেও, তাঁর আমলের ত্রাসের ভূত ১৯৫৫-তেও পার্টির কাঁধ থেকে একেবারে নেমে যায় নি। 'জাতীয় গণফ্রন্ট' আর 'জনগণতান্ত্রিক ফ্রন্টে'র মতাদর্শগত বিরোধও পার্টির মধ্যে অব্যাহত রয়েছে। কমরেড অজয় ঘোষ বিরোধকে কোনোমতে চাপা দিয়ে পার্টির ঐক্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৫৬ সালে পালঘাটে অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেসে নেশন্যাল বুর্জোয়াদের মঞ্চ কংগ্রেসের সর্বাত্মক বিরোধিতার লাইনই পার্টির ভেতরকার গরিষ্ঠ বামপন্থী অংশের সমর্থন লাভ করে।

১৯৬১ সালে বিজয়ওয়াদায় অনুষ্ঠিত সি.পি.আই-এর ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মসূচিতে গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে জাতীয় বুর্জোয়ার অংশগ্রহণের বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। তবে বাম-ঝোঁকের অনুগামীদের খুশি করতে "কংগ্রেসের সঙ্গে একটি সাধারণ ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট না গড়ে" তাদের সঙ্গে "ঐক্য ও সংগ্রামের" ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও সে-কর্মসূচির গতিমুখ যে জাতীয় বুর্জোয়ার প্রগতিশীল অংশকে নিয়ে গণতান্ত্রিক মোর্চা গঠনের অনুকূলেই ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। পার্টির সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষের উদ্যোগে গৃহীত ওই আপসমূলক রাজনৈতিক প্রস্তাবটি তখন অধিকাংশ পার্টি সদস্যের সমর্থনও লাভ করে। তবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা কী হবে—সে প্রশ্নে পার্টির মধ্যে মতবিরোধ থেকেই যায়।

১৯৬২ সালে ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষ, ৮১ পার্টির দলিলকে (১৯৬০ সালে চিনের কমিউনিস্ট পার্টি যা অনুমোদন করেছিল) চ্যালেঞ্জ করে 'পিকিং-এর চিঠি (১৪ জুন ১৯৬৩), মস্কোর বিবৃতি (১৮ জুন ১৯৬৩) ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে সি.পি.আই-এর ভিতরকার মতপার্থক্য এবার প্রকাশ্য হয়ে পড়ে। পার্টির ভিতরের অতিবাম অংশটি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট পার্টিকে সংশোধনবাদী আখ্যা দেয়। এবং 'যুদ্ধ অনিবার্য', 'গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে শান্তিপূর্ণ পথে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব কোনো কালে কোনো দেশেই সম্ভব নয়', 'বিশ্বশান্তি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলার অর্থ সাম্রাজ্যবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা'—চিনের ১৪ জুনের (১৯৬৩) চিঠির এইসব মাওবাদী বক্তব্যকে তারা সমর্থন করে। ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের প্রশ্নেও পার্টির অতিবাম অংশটি চিনের পক্ষ নিয়ে নেহরু সরকারকেই অভিযুক্ত করে। সোভিয়েট নীতির সমর্থক সি.পি.আই নেতৃত্বের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের বিরুদ্ধে 'কংগ্রেসের দালাল', 'দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদী, 'পুলিশের চর' ইত্যাদি কুৎসা রটনা করে পার্টি থেকে বেরিয়ে যায় এবং মাওবাদের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবে'র রণধ্বনি দিয়ে ১৯৬৪ সালে সি.পি.আই (এম) গঠন করে। সি.পি.আই তার সপ্তম পার্টি কংগ্রেসে (বোম্বাই ১৯৬৪) সোভিয়েট পার্টির নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের শরিক হিসেবে চিনা পার্টির বিভেদপন্থী নীতির বিরোধিতা করে। সীমান্ত সংঘর্ষে চিনের আক্রমণাত্মক ভূমিকার নিন্দা করেও পার্টি নেতৃত্ব পঞ্চশীল নীতির ভিত্তিতে সীমান্তবিরোধ মীমাংসার জন্য ভারত ও চিন সরকারের কাছে দাবি জানায়। জাতীয় ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ, দেশি-বিদেশি একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত শোষণের অবশেষের বিরুদ্ধে সংগ্রামে "শ্রমিকশ্রেণি, কৃষক, পেটি বুর্জোয়া এবং জাতীয় বুর্জোয়ার প্রগতিশীল অংশকে" মিলিত করে গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে তোলার রণকৌশল গ্রহণ করে। এবং ১৯৬০ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে গৃহীত ৮১ পার্টির (চিনা পার্টিরও সমর্থন ছিল) দলিলের প্রতি সি.পি.আই পুনর্বার সমর্থন জানিয়ে সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য দিয়ে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সম্পূর্ণ করার কর্মসূচি ঘোষণা করে (বোম্বাই, ১৯৬৪; ৭ম পার্টি কংগ্রেস)। সুভাষ এই কর্মসূচি সমর্থন করে মূল পার্টিতেই থেকে যান। তাছাড়া সি.পি.আই-এর সদস্য হিসাবে তাঁর গর্ব—সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত

বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের তিনিও একজন 'পদাতিক'। বিশেষ করে সোভিয়েট পার্টির বিশতম কংগ্রেসে (১৯৫৬) ক্রুশ্চেভের সেই ঘোষণা—'মৃত্যু নয় জীবন, ধ্বংস নয় সৃষ্টি, যুদ্ধ নয় শান্তি' সুভাষকে সেদিন গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। মানবিক প্রচ্ছদে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের তাৎপর্য অনুধাবন করেই তিনি লেখেন—

"পৃথিবীকে নতুন ক'রে সাজাতে সাজাতে
ভবিষ্যৎ কথা বলছে, শোনো
ক্রুশ্চভের গলায়।
নির্বিবাদে নয়, বিনা গৃহযুদ্ধে
এ মাটিতে
সমাজতন্ত্র দখল নেবে।"—

কিন্তু মাওবাদী বিভেদপন্থায় যারা নড়ল, যাদের "মাথায় একরাশ বইয়ের পোকা/কিলবিল করছে :/চোখ খুলে তাকাবার/মন খুলে বলবার/হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখবার" সাহস যাদের নেই তাদের উদ্দেশেই সুভাষ বলেন, "পুরনো মানচিত্রে আর চলবে না হে,/ভূগোল নতুন ক'রে শিখতে হবে।" এবং

"সহযোদ্ধার প্রতি যে ভালোবাসা একদিন ছিল
আবার তাকে ফিরিয়ে আনো;
যে চক্রান্ত
ভেতর থেকে আমাদের কুরে কুরে খাচ্ছে
তাকে নখের ডগায় রেখে
পট্ ক'রে একটা শব্দ তোলো।

দরজা খুলে দাও,
লোকে ভেতরে আসুক।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুভাষ 'খোলা হাতে, খোলা মনে' তাঁর এই রাজনৈতিক বোধের কথাই বলে গিয়েছেন।

।। ২।।

সুভাষ ছেড়ে যাননি, পাশেই ছিলেন

"'পদাতিক' বেরিয়ে যাওয়ার পর লেবার পার্টি ছেড়ে আমি কমিউনিস্ট পার্টিতে আসি। ডক শ্রমিকদের মধ্যে কাজ দিয়ে আমার রাজনীতিক জীবনের হাতেখড়ি। কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি যেটুকু দিয়েছি, আমি পেয়েছি তার বহুগুণ বেশি! পার্টির কর্মসূচী, প্রস্তাব, রণকৌশল, রণনীতি—আমার পাওয়ার উৎস এসবেরও বাইরে। আমি পেয়েছি দেয়ালে পোস্টার মেরে, অফিসঘর ঝাঁট দিয়ে, মিছিলে গলা মিলিয়ে, কাগজে ডাকটিকিট সেঁটে, খেতখামারে কলকারখানায় কাজ করা হাতের ছন্দে, বস্তীতে আর কুঁড়েঘরে, মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে।

কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার সাহস জুগিয়েছে, লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে সচিত্র বোল ফুটিয়েছে।

এক জীবনে আমার কাছে এই ঢের।"

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়,
আনন্দবাজার, ৩০.৮.১৯৮০

দীর্ঘ ৪০ বছর সুভাষের কমিউনিস্ট জীবন। এই কালপর্বে পার্টি নেতৃত্বের অনেক সিদ্ধান্তই অনেক সময় তাঁর মনঃপূত হয়নি। তবু পার্টি সদস্যের আচরণবিধি মেনেই তা পালন করেছেন, কখনো শৃঙ্খলা ভাঙেন নি। কিন্তু ১৯৭৮-এ ভাতিন্ডায় অনুষ্ঠিত সি. পি. আই-এর একাদশ কংগ্রেসে পার্টির রণনীতি (strategy) ও রণকৌশলের (tactics) ক্ষেত্রে কর্মসূচিতে কিছু মৌলিক পরিবর্তন করা হয়। সুভাষ এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারলেন না। তাই পার্টির সদস্যপদ নবীকরণ (renewal) না করে পার্টি থেকে সরে দাঁড়াবেন ঠিক করলেন।

অবশেষে ১৯৮০ সালে সুভাষ সি. পি. আই-এর সদস্যপদ ত্যাগ করেন। তারপর তিনি আর কোনো পার্টির সদস্য হননি। ১৯৮০ থেকে ২০০৩—এই তেইশ বছর কোনো দলের সদস্য না থেকেও একজন রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি হিসাবে সুভাষ কী ধরনের ভূমিকা পালন করে গিয়েছেন সে প্রসঙ্গই এখানে আলোচনা করা হবে।

এক সাক্ষাৎকারে সুভাষ বলেছেন, "কমিউনিস্ট পার্টি ছেড়েছি একটি বিশেষ কারণে। পার্টির জরুরি অবস্থার সমালোচনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি বলে। জরুরি অবস্থা ঘোষণার যথেষ্ট যৌক্তিকতা ছিল। কারণ দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলি তখন বিপজ্জনকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল" (এষা দে-র নেওয়া সাক্ষাৎকার। ৭.৯.২০০৩ প্রতিদিন-এ প্রকাশিত)। ১৯৭৫ সালে ইন্দিরা গান্ধীর জরুরি অবস্থা ঘোষণাকে সি. পি. আই নেতৃত্ব সমর্থন করেছিলেন। সুভাষের বিচারে পার্টির সেই পদক্ষেপ সঠিকই ছিল। কিন্তু ১৯৭৮ সালে ভাতিন্ডায় অনুষ্ঠিত সি. পি. আই-এর একাদশ পার্টি কংগ্রেসে যখন বলা হল "ভুল চিন্তার জন্যই আমরা জরুরি অবস্থাকে সমর্থন জানিয়েছিলাম। জরুরি অবস্থাকে সমর্থন জানানোটা তাই গোড়া থেকেই ভুল ছিল।" সুভাষ পার্টির এই মত মেনে নিতে পারেন নি। এছাড়াও তাঁর পার্টি ছাড়ার মূলে আরো কিছু মতাদর্শগত বিরোধও যে ছিল সে কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন—ভাতিন্ডা কংগ্রেসের রাজনৈতিক পর্যালোচনায় 'আর. এস. এস.-জনসংঘ ও বি. এল. ডি.' নিয়ন্ত্রিত 'জনতাদলে'র মতোই 'ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর দুষ্টচক্র' নিয়ন্ত্রিত 'কংগ্রেস'কেও জনগণের শত্রু বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই দুই শত্রুর বিরুদ্ধে একই সঙ্গে লড়বার জন্য সি. পি. আই তার 'জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা' গঠনের রণকৌশল থেকে সরে এসে 'বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকল্প' গড়ে তোলার কথা বলেছে। আর এই বিকল্প গড়ে তোলার ভিত্তি হিসেবে সি. পি. আই-সি. পি. এম ঐক্যের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। ভাতিন্ডা কংগ্রেসে গৃহীত সি. পি. আই-এর এই রণকৌশলকে সুভাষ ভ্রান্ত বলেই মনে করেন। সি. পি. এম কংগ্রেসকে 'প্রধান শত্রু' আর জনতা দলকেই মিত্র হিসেবে গণ্য করে। সি. পি. আই-কে তারা 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি' বলে ঘৃণা করে। তাদের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তোলার জন্য সি. পি. আই

নেতাদের ব্যাকুলতাকে সুভাষ তাঁদের দীনতা বলেই মনে করেন। তাছাড়া সি. পি. এম তো "সব সময় একমুখে দুকথা বলে।" তারা সোভিয়েত বিরোধী, মাওবাদী, বিভেদপন্থী এবং 'ঘৃণা, বিদ্বেষ আর কুৎসার' রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তাই বন্ধু হিসেবেও তারা নির্ভরযোগ্য নয়। সুভাষ লিখেছেন—"জাল চিঠির জোরে ডাঙ্গের মত নেতার গায়ে কাদা লেপে দলত্যাগীদের যে পার্টির জন্ম হল—ঘৃণা, বিদ্বেষ আর কুৎসাই হল তার মূলধন।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ৪৩)

এমনকি কমরেড সোমনাথ লাহিড়ীর মতো 'নমস্য মানুষ'-ও নাকি 'বৃটিশের গুপ্তচর'। এমন একটি জঘন্য কুৎসা সি. পি. এম নেতারা উৎপল দত্তকে দিয়ে 'দিন বদলের পালা'য় প্রচার করিয়েছিলেন। তাঁদের এই নিম্নরুচির কাজকে সুভাষ কোনোদিন ক্ষমা করতে পারেননি।

"নিছক গায়ের জোরে পার পেয়ে গেল এত বড় মিথ্যে। থিয়েটারের এক ভাঁড় মাঠভর্তি লোকের সামনে এমন একজন বড় মানুষকে সেদিন ছোট করেছিল, যিনি শুধু কমিউনিস্ট হিসেবেই নয়, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নায়ক হিসাবেই সারা ভারতের এক নমস্য মানুষ।

আমরা কেউই যে সেদিন রাগে ফেটে পড়িনি, প্রতিবাদে গর্জে উঠিনি—আমাদের সে অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ৪৩)।

মতাদর্শগত সংগ্রামের ক্ষেত্রে সি. পি. এম তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে শুধু কুৎসাই রটনা করে না, প্রয়োজনে তাদের নৃশংসভাবে খুন করতেও দ্বিধা করে না।

সুভাষ লিখেছেন—"মানবতার নিরঙ্কুশ প্রতিষ্ঠা যার গোড়ার কথা, চোখ বুজে সেই সাম্যবাদের নাম জপ করতে করতে ধাপে ধাপে নেমে অমানুষ হয়ে যাওয়ার নজির সাম্প্রতিক ইতিহাসে এদেশেও আকছার পাওয়া যাবে।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ৪০)।

"ডাঙ্গেপন্থীদের চিনে নিন এই মাটিতে কবর দিন", "কালো হাতে ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও", "ধোলাই হবে পেটাই হবে"—ইত্যাদি কথা শুধু মিছিলের স্লোগান, আর দেয়াল লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। সি. পি. এম নেতাদের প্রত্যক্ষ মদতে তা হাতে-কলমে প্রয়োগও করেছে তাদের তথাকথিত 'ক্যাডারবাহিনী'। বর্ধমানে কংগ্রেসি মস্তান বলে পরিচিত একটি যুবককে হত্যা করে তার রক্ত তার মায়ের মুখে লেপে দেওয়ার যে-মধ্যযুগীয় বর্বরতা সি. পি. এম ক্যাডাররা প্রদর্শন করেছিল, প্রায় তেমনি আর একটি নজিরও তারা রাখে এক নকশাল তরুণকে খুন করার সময়। সুভাষ লিখেছেন—"মার্কসবাদী কমিউনিস্টের বাবার সামনে নকশাল ছেলেকে কী নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল, তার বীভৎস বিবরণে যাব না। অন্যদিকে গুরুমারা বিদ্যেয় নকশালরা যে মার্কসবাদী কমিউনিস্টদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিল, কে সে কথা অস্বীকার করবে?"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ৪০)।

১৯৭০ সালের ২৫ ডিসেম্বর, ব্যারাকপুরের চিড়িয়ামোড়ে একটি মিছিল পরিচালনার সময় অজাতশত্রু বর্ষীয়ান সি. পি. আই নেতা কমরেড সুরেন ধরচৌধুরী সি. পি. এমের ক্যাডারবাহিনীর 'ধোলাই-পেটাই'-এ গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঘটনাটি সুভাষকে দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিল। কারণ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—'কমিউনিজমের

উৎস হিউম্যানিজম, ঘৃণা তার প্রেরণা নয়'। তাই সি. পি. আই থেকে সরে দাঁড়ানোর ১৯ বছর পরেও সুরেন ধরচৌধুরীর মৃত্যুর ঘটনা স্মরণ করে তিনি লিখলেন, 'কমরেড, কথা কও' (১৯৮৯) নামে 'সাহসী, স্পষ্ট, মুখোশ-খোলা রাজনৈতিক উপন্যাস'। সুরেন ধরচৌধুরী হলেন 'কমরেড, কথা কও' উপন্যাসের 'ভাই সাহেব'। তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবী। ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনি আন্দামানে কারাদণ্ড ভোগ করেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে শ্রমিক সংগঠনে কাজ করেছেন, পার্টির স্বার্থে সংসারী পর্যন্ত হন নি। পার্টি ভাগের সময় তিনি তাঁর জায়গা ছেড়ে এক পাও নড়েন নি—সি. পি. আইতেই থেকে গিয়েছেন। সি. পি. এমের চোখে তিনি তখন "হদ্দমুদ্দ দক্ষিণপন্থী"—শোধনবাদী। এই অপরাধেই কি তাঁকে প্রাণ দিতে হবে? জন্মের পর থেকেই সি. পি. এম দলটি সি. পি. আইকে 'শোধনবাদী' 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি' বলে ঘৃণা করে এসেছে। সুভাষ মনে করেন, তাদের সেই ঘৃণার প্রকাশে যে-প্ররোচনা ছিল, তারই পরিণতি 'ভাইসাহেব' তথা সুরেন ধরচৌধুরীর মতো কমিউনিস্টের মর্মান্তিক মৃত্যু। শুধু এই উপন্যাসে নয়, তাঁর কবিতায়, 'চিঠির দর্পণে', আত্মজীবনীতে ও বিভিন্ন গদ্য রচনায় এই ঘৃণা, বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসার উৎস নির্দেশ করে সুভাষ তার কারণ বিশ্লেষণে অগ্রসর হয়েছেন। তিনি জানেন, সি. পি. এম বা নকশালপন্থী রাজনীতির মূলে রয়েছে সোভিয়েত বিদ্বেষী মাওবাদী চিনের আশ্রয়-প্রশ্রয়। এদেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনে তার সূত্রপাত হয়েছিল রণদিভের আমলে (১৯৪৮-৫০)। সুভাষ লিখেছেন—"এরপর এল রণদিভের আমল। আত্মঘাতী পথে পার্টিকে ঠেলে দেওয়া হল। যোশীর গণপার্টিকে চুলোয় দিয়ে ভেঙে চুরমার করা হল সমস্ত গণসংগঠন। নেহরু সরকারকে উৎখাত করতে ডাক দেওয়া হল সশস্ত্র সংগ্রামের।

গড়ার বদলে ভাঙা, ভালবাসার বদলে ঘৃণা, প্রাণ দেবার বদলে প্রাণ নেওয়া, উদারতার বদলে সংকীর্ণতা, বন্ধুকে শত্রু আর শত্রুকে বন্ধু করা, ভারত-সোভিয়েত সহযোগিতাকে সন্দেহের চোখে দেখা, আন্তর্জাতিকতা ছেড়ে কূপমণ্ডুক হওয়া—বিষবৃক্ষের এই বীজ তখনই বোনা হয়েছিল।

তার বিস্তারিত ইতিহাসে আমি যাব না। সে যোগ্যতাও আমার নেই। শুধু এইটুকু সবিনয়ে জানিয়ে রাখি যে, সে পর্বের বহু কলঙ্ক সম্পর্কে অনবহিত থাকলেও তখনকার পার্টি লাইন আমি বিনা প্রশ্নে মাথা পেতে মেনে নিয়েছিলাম।

আমার শুধু একটা অভিযোগ। সেই পর্বের পার্টিনেতারা আজ পর্যন্ত মনপ্রাণ খুলে কোনো আত্মসমালোচনা করেন নি। করলে পার্টির যত না ক্ষতি হত, তার চেয়ে ঢের বেশি লাভ হত। নতুন করে বারবার একই গাড্ডায় পড়তে হত না। তাহলে পার্টিও ভেঙে টুকরো টুকরো হত না।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ৪২)।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, রণদিভের বেপরোয়া হঠকারী লাইনের যাঁরা বিরোধী ছিলেন, তাঁরাও সেদিন 'পুলিশের চর' 'শ্রেণিশত্রু', 'দক্ষিণপন্থী শোধনবাদী' ইত্যাদি অপবাদে পার্টি থেকে বিতাড়িত হওয়ার ভয়ে বাধ্য হয়ে সেই লাইনকে সমর্থন করেছিলেন। পার্টির

মধ্যে গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরে, কার্যত সেদিন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রণদিভের একনায়কতন্ত্র। "তাঁর মতের সমালোচকদের শুধু পার্টি থেকে বহিষ্কার নয়, সম্পূর্ণ খতম করার উদ্যোগ নিতেও তিনি দ্বিধা করেননি। সে ইতিহাস যেমন রোমহর্ষক, তেমনই কুৎসিত।"—(সংকীর্ণতাবাদী ভেদপন্থার পতাকাবাহী ভালচন্দ্র ত্র্যম্বক রণদিভে—গৌতম চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১২)। সুভাষও তাঁর 'কমরেড, কথা কও' উপন্যাসে প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে সেই 'রোমহর্ষক' 'কুৎসিত' ঘটনাটির উল্লেখ করেছেন—"খবরটা ঠিক কিনা তুমি জান না, কিন্তু গুজব হিসাবেও কি তোমার কানে আসেনি যে পার্টির এক গদিচ্যুত নেতাকে ইহলোক থেকে সরাবার ব্যবস্থা হয়েছিল?"—(গদ্যসংগ্রহ-২য় খণ্ড; পৃ. ৪৪৮)।

১৯৬২ সালে চিনের ভারত আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে সি. পি. আই-এর একাংশ যখন মাওবাদ আশ্রয় করে, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও কুৎসা সম্বল করে, পার্টি ভেঙে বেরিয়ে গিয়ে সি. পি. এম তৈরি করে তখন তার তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক নেতা হিসেবে দেখা গেল সেই সংকীর্ণতাবাদী, বিভেদপন্থী বি. টি. রণদিভেকেই।

সুভাষ তাঁর দীর্ঘ পার্টিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝেছেন, যে পার্টির ভিত্তি মাওবাদ, যার শীর্ষ নেতৃত্বে থাকেন রণদিভে, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার বা চারু মজুমদারের মতো বিপ্লবী নেতারা, সে পার্টির 'গাইড টু এ্যাকশনে' ঘৃণা, বিদ্বেষ ও হিংসার বাড়াবাড়ি না হয়ে যায় না। তাই, সি. পি. এমের সঙ্গে ঐক্য গড়ে তুলতে যেসব সি. পি. আই নেতা অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন, তাঁদের উদ্দেশেই সুভাষ বলেছেন,—"আজ আবার দুদল মিলে যাবার কথা হচ্ছে। যাঁরা ছিলেন ভাঙবার পাণ্ডা তাঁরাই আজ চটপট জোড়াতালি দিয়ে একটা গোঁজামিলের তাল করেছেন। ওঁদের এই ভাব-ভাব, আড়ি-আড়ি খেলার মাঝে থেকে যে প্রাণগুলো চলে গেল, বাজে খরচা দেখিয়ে ওঁরা যেন তার হিসেবটা মিলিয়ে দেন।

মার্কসবাদ ভিত্তি হলে আলবৎ মিলবে। খিড়কি দিয়ে তাতে মাওবাদ ঢুকে পড়তে চাইলে?

সাতখুন মাপ হয়ে যাবে সি. পি. এম ক্ষমতায় এসেছে বলে? দু-দশটা এম. এল. এ. দু-চারটে এম. পি. পাওয়ার জন্যে পার্টির উঁচু মাথা ধুলোয় লুটিয়ে দিতে হবে? যারা আজ একরকম কাল একরকম, যারা সব সময় একমুখে দুকথা বলে, সেই হরবোলা আর বহুরূপীর দলে তারা নিজেরা ভিড়ে গেলে কারো কিছু বলার থাকত না।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ১৪)।

ভাতিন্ডা কংগ্রেসের (১৯৭৮) পর সি. পি. আই-এর নেতৃত্বে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের কাছে সুভাষ আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। ১৯৬৪ সাল থেকে সি. পি. আই নেতৃত্ব 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সাধনের জন্য যে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা' গঠনের কথা বলে আসছিলেন, ভাতিন্ডা কংগ্রেসে সেই রণনীতি ও রণকৌশল থেকে তাঁরা সরে এসে বলেছেন, "বামপন্থী এবং গণতান্ত্রিক জাতীয় বিকল্প গড়ে তোলার কাজ আমাদের পার্টির কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব এবং নিরলস উদ্যোগের দাবী করে।...এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল...সি. পি. এম এবং আমাদের পার্টির মধ্যে ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক গড়ে তোলা।"—(ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির একাদশ কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক পর্যালোচনা/পৃষ্ঠা

৩৯-৪০)। সি. পি. এম নেতৃত্ব তাঁদের দশম কংগ্রেসে (জলন্ধর, ১৯৭৮) গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবে সি. পি. আইকে 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি' বলে উল্লেখ করেছে। সংশোধনবাদী অধঃপতনের জন্য তাদের নিন্দামন্দও করেছে। 'দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি'র নেতারা সি. পি. এমের সঙ্গে ঐক্য গড়তে আগ্রহ প্রকাশ করলেও "কেরালায় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতায়" তাদের ছেদ এখনো পড়েনি বলে সি. পি. এম তাদের বাড়ানো হাত ধরতে আগ্রহী নয় এবং সি. পি. এমের মূল লক্ষ্য যে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করা, সে কথাও স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করা হয়েছে। "বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির ঐক্যের জন্য এই সংগ্রাম জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।"—(ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি—মার্কসবাদী; রাজনৈতিক প্রস্তাব; ১৯৭৮ জলন্ধর; পৃ. ৪১)।

কাজেই সুভাষ লিখেছেন, "জনগণতন্ত্রের গোঁ ধরে যাঁরা পার্টি থেকে বেরিয়ে গিয়ে আলাদা দল গড়েছিল" (খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ১৩)—তারা কিন্তু তাদের সেই মত এখনো বদলায়নি। একজোটে থেকে বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণি ক্ষমতা ভাগাভাগি করে জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়বে না শ্রমিকশ্রেণির নেতৃত্বে জনগণতান্ত্রিক মোর্চা হবে? এই মতাদর্শগত প্রশ্নটি এড়িয়ে সি. পি. আই-সি. পি. এমের জোড়াতালি দেওয়া ঐক্যে সুভাষের সমর্থন নেই। তিনি মনে করেন, দেশের প্রধান শত্রু ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী আর. এস. এস. নিয়ন্ত্রিত বি. জে. পি. পরিচালিত এন. ডি. এ. জোট। আর এই জোটকে প্রতিহত করার সঠিক হাতিয়ার হল সি. পি. আই-এর ভাতিন্ডা পূর্ববর্তী 'জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা'। তাছাড়া সি. পি. এমের অন্ধ কংগ্রেস বিরোধিতার রাজনীতিকে বা ইন্দিরা গান্ধীকে ফ্যাসিবাদী 'ডাইনী' হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে হঠানোর জন্য প্রতিক্রিয়াশীল 'জনতাপার্টির' সঙ্গে তাদের গাঁটছড়া বাঁধার রণকৌশলকে সুভাষ বিপজ্জনক রাজনীতি বলেই মনে করেন। এবং পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টকে শিখণ্ডী রেখে সরকারি প্রশাসনে ও সমাজের সর্বক্ষেত্রে দলতন্ত্র কায়েমের যে গাজোরি সংকীর্ণ রাজনীতি সি. পি. এম করে চলেছে, তা যুক্তফ্রন্টের নীতি ও আদর্শের পরিপন্থী বলেই সুভাষ মনে করেন।

সুভাষের এই সি. পি. এম বিরোধিতার কথা বা সি. পি. এমের 'ছায়াসঙ্গী' সি. পি. আই নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের কথা আনন্দবাজার, বর্তমান, যুগান্তর প্রভৃতি কাগজে তিনি খোলামনেই প্রকাশ করেছেন। তাঁর সেইসব 'খোলামনে'র কথাগুলিকে তাঁর পার্টিবন্ধুরা অনেকেই 'পদাতিকের পদস্খলন' বলেই নিন্দা-মন্দও করেছেন। তবুও তিনি থামেন নি। খোলামনের কথাগুলি খোলা হাতেই লিখে গিয়েছেন। তাঁর সেইসব লেখা ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত 'খোলা হাতে খোলা মনে' এবং ১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'কুড়িয়ে ছিটিয়ে' গ্রন্থ দুটির মধ্যেই লিপিবদ্ধ আছে।

রাজনীতি বিষয়ে সুভাষের মূল বক্তব্য হল, এদেশের রাজনীতিতে আর. এস. এস. নিয়ন্ত্রিত জনতাপার্টি বা বি. জে. পি. জোটের উত্থান ঘটায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মোর্চায় জাতীয় বুর্জোয়ার অংশগ্রহণের গুরুত্ব অনেকটাই বেড়ে গেছে। তাই জনতাপার্টি বা বি. জে. পি. জোটের সঙ্গে ইন্দিরা বা রাজীব কংগ্রেসকে একই সারিতে রেখে কংগ্রেসকে পুরোপুরি শত্রুর

কোঠায় ফেলতে তিনি রাজি নন। তাঁর এই রাজনৈতিক অবস্থান থেকেই সুভাষ রাজীব গান্ধীর পক্ষে ভোটের প্রচারে যেমন অংশগ্রহণ করেছেন (নবম লোকসভা নির্বাচন, ১৯৮৬) তেমনি শাহবানুর মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় কাঁচিয়ে দেওয়ার জন্য রাজীব গান্ধীকে 'আজিব রাজীব' বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়েন নি (কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ২৩)। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বোধহয় বলা উচিত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সুভাষ মেয়ের মতো স্নেহ করতেন; তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রের জন্য। মমতার প্রতি তাঁর স্নেহের কথা তিনি অকপটে স্বীকারও করেছেন—"মাঝে মধ্যে আমার পরিবারের খোঁজখবর নেয়। মেয়েটা বড় ভাল। তবে মাঝে মধ্যেই বড় অপরিণত রাজনীতি করে। ওকে বলেছিও সে কথা।"—(তারিক হাসানের সাক্ষাৎকার/আজকাল; ১৩ জুলাই ২০০৩)। স্নেহের টান থাকলেও বি. জে. পির জোটসঙ্গী 'তৃণমূল কংগ্রেসে'র পক্ষে ভোটের প্রচারে কিন্তু একবারও নামেন নি। এক্ষেত্রে 'পদাতিকের পদস্খলন' অন্তত ঘটে নি।

সুভাষ মনে করেন, সরকারি ক্ষমতায় থেকে সি. পি. এম যে দলবাজি করছে তিনি তার বিরোধিতা করেন বলেই রাজ্যের সরকার তাঁর "উপর হাড়ক্ষ্যাপা ক্ষেপেছে"—(কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ৬৯)। মরিচঝাঁপি থেকে উদ্বাস্তুদের হটিয়ে দিতে সি. পি. এম সরকার যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছিল সুভাষ তার নিন্দা করেছিলেন। কানোরিয়ায় সংগ্রামী শ্রমিকদের পাশে যেমন দাঁড়িয়েছেন তেমনি "ভিখিরি পাশোয়ান যখন হারিয়ে যায়, সাংবাদিক দিবাকর মণ্ডলকে যখন প্রাণ দিতে হয়, বানতলায় নৃশংসতা হলে, জলাভূমি বেহাত হলে, সবুজ ধ্বংস হলে" পদাতিক কবি পথে নামেন। হুসেন-এর স্টুডিওতে শিবসেনা-বিজেপির তাণ্ডবের প্রতিবাদেও পথে নামেন। বামফ্রন্টের কোনো মন্ত্রীর 'সান-রাইজ অপারেশনে'র ফলে কলকাতার হকাররা উচ্ছেদ হলে বা খালপাড়ের গরিব মানুষেরা বাস্তুচ্যুত হলে সুভাষ প্রতিবাদ না করে পারেন না। কোনো বিকল্প ব্যবস্থা না করেই ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্কের চাপে, উন্নয়নের নামে ফুটপাতের হকার বা খালপাড়ের হতদরিদ্র মানুষগুলির জীবন ও জীবিকার উপর যখন বুলডোজার চালানো হয়, তখন কে কী মনে করবে ভেবে তিনি মুখ বুজে থাকেন নি—প্রতিবাদ করেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য সি. পি. এমের পছন্দের লোক নন বলে দলের লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে যে কদর্য আচরণ করে, সুভাষ তারও তীব্র প্রতিবাদ করে লেখেন—"আর উপাচার্য নেহাৎ একটা মাইনে-করা পদও নয়—ওটা হ'ল কৃতবিদ্যের একধরনের স্বীকৃতি। পদ নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা। লেখা-পড়ায় মতি থাকা এমন একজন মানুষ, যিনি নতুন নতুন খাতে উচ্চশিক্ষার ধারাকে বইয়ে দেবেন। যিনি নিছক বাঁশ দিয়ে তোলা দলের লোক নন। কিংবা মাথাবিকোনো আপ্তগরজীও নয়।...সরকারের কাছে আমাদের অনুরোধ, দলের লোকদের সামলান। উপাচার্য যে কৃতবিদ্য তা সবারই জানা ছিল। তাঁর যে এত বুকের পাটা আছে, সেটা কেউ জানত না। তিনি যে কাজের লোক, সেটা আপনারা আমাদের একটু পরখ করে নিতে দিন। ওঁর রাস্তা থেকে দয়া করে দলের লোকদের একটু সরিয়ে নিন।...তা না করলে, আমরাও রাস্তায় গিয়ে বসব।"—(কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ৭৭-৭৯)।

ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগরি অফিসারদের সংগঠন 'ফেটো', তাদের বৃত্তিগত সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য এবং প্রশাসনিক বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে তাদের বেতন আর মর্যাদার

তফাত ঘোচানোর দাবিতে ধর্মঘট করে। তাদের সেই দাবিগুলি সরকার নিয়োজিত প্রশাসন কমিটির সুপারিশেও সমর্থিত। বামফ্রন্ট সরকার ফেটোর দাবি মানতে নারাজ। সুভাষ ফেটোর আন্দোলনের সমর্থনে কলম ধরেন—"এঁরা সরকারের পতন চাননি। শুধু সকাতরে চেয়েছেন তাঁদের প্রতি সরকারের ন্যায্য বিচার।...সরকারের নিজের বসানো প্রশাসন সংস্কার কমিটি যা সুপারিশ করেছে তাতেও ফেটোর দাবি মানা হয়েছে। সেটা হওয়াই স্বাভাবিক। কেননা আজ যারা পশ্চিমবঙ্গে সরকারের নেতা গদি পাওয়ার আগে তাঁরাও ঐ এক কথাই বলতেন। ফেটোর সদস্যরা কাজ বন্ধ করেছেন বলেই কি তাঁদের গোঁসা?"—(কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ১১২)।

বামফ্রন্ট জমানায় সুভাষ যে সব প্রতিবাদ করেছেন, দুর্গত মানুষের পাশে থেকে যে সব আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন তার অনেকগুলিই সি. পি. এমের দলবাজির বিরুদ্ধেই গিয়েছে। সেই কারণে সি. পি. এম সুভাষের উপর 'হাড়খ্যাপা'। জ্যোতি বসুর উদ্দেশে নিবেদিত 'সুখ যায়, স্মৃতি থাকে' নামের রচনায় (১৭.৩.৯৭-এ লেখা) সুভাষ আত্মপক্ষ সমর্থনে যা লিখেছেন তা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—"রাজ্যে ক্ষমতায় আসবার পর মার্কসবাদী পার্টি হতে চেয়েছে সর্বগ্রাসী। নিজেদের ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস না করায় নীতিনিয়মের বাইরে গিয়ে হাতধরা লোকদের বসানো হয়েছে। গণসংগঠন আর পার্টি-সংগঠনের মধ্যে কোনো ফারাক রাখা হয়নি। গণতন্ত্রের জায়গা নিয়েছে পার্টিতন্ত্র। কারো কাছে জানা আর শেখার কিছু নেই। নেতা হলেই সে সবজান্তা। জোহুকুমের সাতখুন মাপ। দলে ভিড়লে 'আছে'-র দল 'নেই'-দের ট্যাঁকে পুরতে পারবে। জোর যার মুলুক তার। বেড়ে গেছে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা আর নিজের কোলে ঝোল টানার ভাব। ভাঙা রেকর্ডের মতন এখনও সমানে আওড়ে যাওয়া—মার্কসবাদ, সমাজতন্ত্র, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, লাল সেলাম আর শ্রমিক শ্রেণির পার্টি। এত কিছু দেখেও জ্যোতিবাবু কেন চুপ করে আছেন?"

সুভাষ বামফ্রন্টের বিরোধী নন, সি. পি. এমের দলবাজির বিরোধী। তিনি 'উন্নততর' বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে। তাই, এ রাজ্যের বিরোধীদের নেতিবাচক ভূমিকার নিন্দা করে লিখেছেন, "আজকের বিরোধীরাও এ রাজ্যে শুধু সরকারের খুঁত কেড়ে তরে যেতে পারবেন, এ ভরসা কম। গদিতে না বসলে কিছুই করা যায় না—এই ভাবনাটাই অনেকের পক্ষে কাল হয়েছে।...সরকারে থেকে যে কাজ করব বিরোধী হয়ে সে-কাজে বাদ সাধব—এই কি গণতন্ত্র?"—(কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ৩২)।

স্বাধীনতার পর বামফ্রন্টের আমলে দলবাজি সত্ত্বেও "যেটুকু ভূমি-সংস্কার হয়েছে, তাতেও গ্রামের কিছুটা ভোল ফিরেছে। রাস্তার ছড়াছড়িতে গ্রাম আর তত দুর্গম নেই।...গঞ্জ-বন্দরগুলোও তো ক্রমশ শহর হয়ে উঠেছে।"—(কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ১২৫)। জ্যোতি বসুর কাছে সুভাষের তাই প্রত্যাশা—"আমার গলা কেটে ফেললেও জ্যোতিবাবুকে আমি ব্যগ্রতা ক'রে বলব—আপনি তাকিয়ে দেখার মতন যে প্রতিমা গড়েছেন লগ্ন বয়ে যাবার আগে এবার তার চক্ষুদান করুন।"—('সুখ যায়, স্মৃতি থাকে'—সুভাষ মুখোপাধ্যায়; ১৭.৩.৯৭)। এ থেকে অন্তত বোঝা যায়, সুভাষ বামফ্রন্ট বিরোধী বা একেবারে বিপরীত মেরুরও লোক নন।

দলে না থেকেও দলীয় রাজনীতিতে

যাঁরা সুভাষকে "কংগ্রেসী ঠাউরে ব'সে আছেন" বা যাঁরা তাঁর "পদস্খলনের" জন্য তিরস্কার করেছেন বা তাঁকে "একেবারে বিপরীত মেরুর রাজনীতির সংস্রবে"র লোক বলে মনে করেছেন—আমার মনে হয় তাঁরা তাঁর রাজনৈতিক অবস্থানটা ঠিক ধরতে পারেননি বা ইচ্ছে করেই তাঁকে 'বিপরীত মেরুর রাজনীতি'র লোক বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

১৯৬৪ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত সি. পি. আই-এর যে রাজনৈতিক লাইন ছিল সুভাষ তাকেই সচেতনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। কোনো দলে না থাকলেও এস. এ. ডাঙ্গে র মতাদর্শের তিনি অনুগামী এবং এ. আই. সি. পি (বা ইউ. সি. পি. আই) দলের সমর্থক। কমিউনিস্ট পার্টিতে থেকে পার্টি লাইনের বিরোধিতা করলে বিতাড়িত হওয়ার বিড়ম্বনা ঘটে। সুভাষ তাই নিজেই দল থেকে সরে দাঁড়িয়ে ভাতিন্ডা পূর্ববর্তী সি. পি. আই লাইনের সমর্থনে প্রচার করেছেন। অর্থাৎ কিনা দলের একজন হয়ে কথা না বলে নিজের বিশ্বাসের কথাটাই তুলে ধরেছেন—"দলীয় রাজনীতিতে বিশ্বাস করা আর দলের হয়ে রাজনীতি করা। দুটো আলাদা জিনিস। এর মধ্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় করার কিছু নেই। গণতন্ত্রে কারো সেই ব্যক্তিস্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া যায় না।"—(কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ৯০)। পার্টি শৃঙ্খলার নামে 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'র নামে কমিউনিস্ট পার্টিতে 'গণতন্ত্র' বাদ দিয়ে যে 'কেন্দ্রিকতার' ব্যক্তিতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র চলে সুভাষ তারও বিরোধী। সুভাষ সেই অর্থে আর দলভুক্ত কমিউনিস্ট নন।

সুভাষ তাঁর নিজের রাজনৈতিক মেরুতে সুস্থির থেকেই সি. পি. আই ও সি. পি. এম নেতাদের কাছে বারবার জানতে চেয়েছেন :

(ক) "জাতীয় বুর্জোয়াকে এখুনি শত্রুর কোঠায় ফেলব নাকি যতদূর সম্ভব তাকে সঙ্গে নিয়ে সাম্রাজ্যবাদ আর তাদের দোসর দেশী একচেটিয়াদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করার মোর্চা গড়ব?"—(খোলা হাতে খোলা মনে)।

(খ) এই মোর্চা কি শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে গড়া হবে (সি. পি. এম পার্টির লাইন মেনে) না বুর্জোয়াদের সঙ্গে নেতৃত্ব ভাগাভাগি করে নিয়ে (১৯৭৮-এ ভাতিন্ডা কংগ্রেসের আগে পর্যন্ত সি. পি. আই লাইন মেনে) বামপন্থীরা সেখানে থাকবে?

(গ) "শ্রমিকশ্রেণি কি শুধু নিজের পাওনাগণ্ডা নিয়েই মাথা ঘামাবে? নাকি সে সবার আগে দাঁড়িয়ে জাতির বৃহত্তর স্বার্থে লড়বে?"—(খোলা হাতে খোলা মনে)।

এসব প্রশ্ন শুনে কি মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনের শেষ দিকে "একেবারে বিপরীত মেরুর রাজনীতির সংস্রবে চলে গিয়েছেন"?—(দেশ; ১৭ জুলাই ২০০৩-এ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য)। আমার তা কখনো মনে হয় নি। বরং তিনি তাঁর নিজের মেরুতেই ছিলেন। না হলে তিনি কখনোই এভাবে বলতে পারতেন না—"মার্কসবাদ মিথ্যে হয়ে গেছে—এ কথা আমি কবে কোথায় বললাম? নাকি তাঁর অবচেতনের কথাটা তিনি আমার মুখে বসিয়ে পার পেতে চান? মিথ্যে কথা এমন অনায়াসে যে বলা যায়, সেটা আমার কল্পনারও বাইরে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন আজ যারা বরবাদ করে দিয়েছে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের

নয়া-দোস্ত সেই চীন যাদের প্রাণের বন্ধু—এদেশের সেই সি. পি. এম আর তাদের নবার্জিত বন্ধু সি. পি. আইয়ের সামনে এখন বিক্রমাদিত্যের তালবেতালের মুখে প্রশ্ন ঝুলছে; মার্কসবাদের নিধন চাই, না শোধন চাই?''—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ৩৫)। সুভাষ মার্কসবাদের শোধন বা নিধন কোনোটাই চান নি। তিনি শুধু চেয়েছিলেন—১৯৫৭ সালে ও ১৯৬০ সালে সোভিয়েত, চিন সহ বিশ্বের ১২টি ও ৮১টি কমিউনিস্ট পার্টির ''ঘোষণা'' ও ''বিবৃতি''র ভিত্তিতে ভারতের কমিউনিস্টরা দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক বাস্তব পরিস্থিতিকে জেনে বুঝে মার্কস-লেনিনবাদের সৃজনশীল প্রয়োগের দিকে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাক। ওই দুটি দলিলের ভিত্তিতে ১৯৬৩ সালের 'কমিউনিস্ট' (১১নং সংখ্যা) পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়েছিল—''জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে শ্রমিকশ্রেণি ও কমিউনিস্ট পার্টিদের লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজকে শেষ অবধি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া, কৃষক ও দেশপ্রেমিক জাতীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জাতীয় ফ্রন্টকে মজবুত ও আরো বিকশিত করা এবং জাতীয় গণতন্ত্র অধনতান্ত্রিক পথে অগ্রগমনের জন্য অবস্থার প্রস্তুতি করা।''

জাতীয় বুর্জোয়াদের অন্ধবিরোধিতা বা তাদের সম্পর্কে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিহার করে এদেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সাম্রাজ্যবাদ ও তার দেশীয় দোসর ধর্মীয় ফাসিবাদী শক্তি, একচেটিয়া পুঁজি ও সামন্ত শোষণের অবশেষের বিরুদ্ধে ব্যাপক মোর্চা গড়ে তুলে এদেশের অসমাপ্ত গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করুক। সুভাষ তাঁর জীবনের শেষ দিকে এই ব্যাকুল আবেদনই কংগ্রেস-কমিউনিস্টসহ ধর্মনিরপেক্ষ দেশপ্রেমিক দলগুলির কাছে রেখেছিলেন। ১৯৮৫ সালে কংগ্রেসের কাছে আবেদন করেছিলেন—

''কংগ্রেস কি নিছক একটি দল? আর পাঁচটা দলের মত? শুধুই সদস্য আশ্রিত? নিয়মিত সম্মেলন আর সাংগঠনিক নির্বাচনই কি তার গণতন্ত্রের একমাত্র মাপকাঠি হবে? নাকি সে তার স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র, বিশ্বশান্তির আদর্শকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিয়ে দ্রুত জীবনের জোয়ার আনবে? প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াইতে প্রগতির অন্যান্য শক্তিগুলোকে সে কি তার সহযোদ্ধার মর্যাদা দেবে না? কংগ্রেসের ক্ষমতার উৎস দিল্লি নয়। নিচু হয়ে শিকড়গুলো শক্ত করতে হবে। অপ্রিয় হলেও কথাটা সত্যি।''—(কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ৪)।

এর ঠিক পাঁচ বছর আগে (১৯৮০) দেশের মূল সংকটের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য কমিউনিস্ট পার্টির কাছেও সুভাষ আবেদন করেছিলেন—

''যার চোখ আছে সেই দেখছে। দেশের গতিক ভালো নয়। সাধারণ মানুষের মুশকিল তেমন আসান হচ্ছে না। মুখ বুজে মার খেতে খেতে কেউ কেউ মরিয়া হয়ে উঠেছে। দেশ জুড়ে একটা অস্থির উচাটন অবস্থা। গরীবের ঘাড়ে সংকটের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে বড়লোকেরা চাইছে ঝাড়া হাত-পা হতে। সাম্রাজ্যবাদ সদর দরজায় না এসে খিড়কি দিয়ে ঢুকে পড়ার ফন্দি আঁটছে।

দেখে-শুনে হুঁশিয়ার হওয়া দরকার। কিন্তু আতঙ্কে যাদের নাড়ি ছাড়ার দশা, তারা হয় ভীতু নয় ভণ্ড।''—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ১২)।

ভয়ে হাত গুটিয়ে বসে না থেকে হাতা গুটিয়েই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিজোটের বিরুদ্ধে কমিউনিস্টদের রুখে দাঁড়াতে হবে।

এ আগুনে, এই রাংঝালে

সুভাষ মানেন দেশের যা পরিস্থিতি তাতে বিভিন্ন কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলা বিশেষ জরুরি। তবে চটপট জোড়াতালি দিয়ে, গোঁজামিল দিয়ে যে-ঐক্য তাতে তাঁর সায় নেই। কারণ তিনি জানেন, "যারা কমিউনিস্ট তাদের কখনও সুযোগ-সুবিধের রাস্তায় মেলানো যায় না।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ১৪)। এ কথা তো ঠিক, মতাদর্শগত কারণেই ১৯৬৪ সালে সি. পি. আই ভেঙে সি. পি. আই (এম) হয়েছিল। তারপর সি. পি. আই (এম) ভেঙে হয় সি. পি. আই (এম-এল)। আবার সি. পি. আই ভেঙে এ. আই. সি. পি বা ইউ. সি. পি. আই এবং সি. পি. আই (এম) ভেঙে পি. ডি. এস গঠিত হয়েছে। ওইসব ভাঙনের মূলেও আছে আদর্শগত বিরোধ। তাই খোলা মনে আত্মসমালোচনা করে, নিজেদের ভুল-ত্রুটি অকপটে স্বীকার করে, তা সংশোধন করে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তিতে মতাদর্শগত সংগ্রামের পথেই কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে আবার মিলতে হবে।

"সারা দেশের কাছে কে আজ প্রধান শত্রু? সাম্রাজ্যবাদ আর তার দেশী চেলা-চামুণ্ডারা না ইন্দিরা কংগ্রেস?"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ১৬)। কংগ্রেসের মাথায় ইন্দিরা, রাজীব না সোনিয়া এ প্রশ্ন সুভাষের কাছে অবান্তর। আসলে তিনি বলতে চেয়েছেন, দেশের মূল শত্রুকে প্রথমে চিহ্নিত করা দরকার। তারপর সম্ভাব্য মিত্রদের জেনেবুঝে কাছে টেনে মূল শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াইতে নামতে হবে। "জাতীয়গণতন্ত্র বা জনগণতন্ত্র হল সমাজতন্ত্রে পৌঁছুবার একটা ধাপ।" কোন 'তন্ত্র' বলে, কটা ধাপ পেরুতে হবে, বা "নেতৃত্ব কার হাতে থাকবে সেটা নির্ভর করবে সংগ্রামের গতিপ্রকৃতির ওপর।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ১৩)। সুভাষ মনে করেন, মূল শত্রু চিহ্নিত করতে বা তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সম্ভাব্য মিত্রদের জেনে-বুঝে কাছে টানার ক্ষেত্রে কমিউনিস্টদের বারবার 'ঐতিহাসিক ভুল' হয়েছে। দেশের অবস্থা নড়বড়ে, এলোমেলো হলেই যে 'প্রগতির জয়জয়াকার' হয় না, ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী আর. এস. এস. নিয়ন্ত্রিত জনতাপার্টি বা বি. জে. পি. জোটের সাফল্যের পর কংগ্রেসের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলা সাচ্চা বিপ্লবীদের নিশ্চয়ই হুঁশ হয়েছে।

পরিশেষে সুভাষ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, "কমিউনিজমের হাতে এমন এক চুম্বক আছে যা সৎ কর্মঠ আত্মত্যাগীদের টেনে আনে। নিচের মানুষ তাদের মুখ চেয়ে থাকে। দরকার এদের সবাইকে এক করার বীজমন্ত্র। শুধু মাথাগুলো এক করলেই হবে না পৌঁছুতে হবে হৃদয়ে।"—(খোলা হাতে খোলা মনে/পৃ. ১৫)। আর হৃদয়ে এই বিশ্বাসই বহন করতে হবে "সমাজতন্ত্র তো শুধু শ্রমিক শ্রেণির নয়, গোটা মানবজাতিরই মুক্তির নিশানা।"—(কুড়িয়ে ছিটিয়ে/পৃ. ২৮)। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বীজমন্ত্র বুকে নিয়েই সুভাষ সহযোদ্ধা বন্ধুদের উদ্দেশে বলে গিয়েছেন—"আমি ছেড়ে যাইনি। একপাশে সরে শুধু উত্তরের অপেক্ষায় আছি; আর মনে মনে বলি :

'রক্তে পা ডুবিয়ে হাঁটছে
নিষ্ঠুর সময়
সারা পৃথিবীকে টানছে রসাতলে
এখনও আকাশচুম্বী ভয়।
অথচ সামনেই হাত আরেকটু বাড়ালে—
রয়েছে বন্ধুর হাত,
সুখশান্তি
বাঞ্ছিত জগৎ—
যদি একবার বোঝো তুমি
থুথু দিয়ে জোড়া যায় না,
জুড়তে হয় ভগ্নমনোরথ—
এ আগুনে,
এই রাংঝালে।"

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, সুভাষ ছেড়ে যাননি, আমাদের পাশেই ছিলেন। মূল শত্রুকে চিহ্নিত করে সম্ভাব্য মিত্রকে পাশে নিয়ে লড়াইয়ের যে-ডাক সুভাষ দিয়েছিলেন তা শেষ পর্যন্ত তাঁর বন্ধুদের কানে পৌঁছেছিল বলেই মনে হয়। তাই ২০০৪-এ আর. এস. এস নিয়ন্ত্রিত এন. ডি. এ জোটকে প্রতিহত করে সনিয়ার নেতৃত্বে কংগ্রেস জোট দিল্লির ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। সি. পি. আই-সি. পি. এম তাদের সক্রিয় বন্ধুত্বের হাত কংগ্রেসের দিকে বাড়িয়ে না দিলে তা কখনোই সম্ভব হত না। সুভাষ বেঁচে থাকলে দেখে খুশিই হতেন।*

---

* বইপত্র ও তথ্য জুগিয়ে বন্ধুবর প্রণব বিশ্বাস প্রভূত সহযোগিতা করেছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাসের জগৎ

তপোধীর ভট্টাচার্য

কবি-প্রাবন্ধিক শঙ্খ ঘোষ রক্তকরবীর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'কবির অভিপ্রায়'-এ এমন কিছু মন্তব্য করেছেন, যা প্রস্তাবিত এই বয়ানের সূচনায়, যেন অবধারিত সংকেতের মতো, মনে এল। কবিতার থেকে কবির ব্যক্তিগত মুখই যখন হয়ে উঠতে চায় বড়ো, 'তখনই লেখা আর পাঠকের মাঝখানে লেখকের শুকনো উপাদানটাকেই লেখকের অভিপ্রায় বলে ভুল করতে থাকি। লেখাকেই আমরা চাই, লেখককে নয়। নিষ্ঠুর শোনালেও কথাটা সত্য যে সোনার ধানটুকুকেই চাই আমরা। নৌকোয় যিনি তুলে দিয়েছিলেন, তাঁকে নয়। আমরা সকলেই আছি একটা ব্যক্তিগণ্ডির মধ্যে বাঁধা। ব্যাপক এই বিচ্ছিন্নতার দিনে সেই গণ্ডিকেই করে তুলছি সত্য থেকে সত্যতর। শিল্পসাহিত্য পারে সেই গণ্ডিটা একটু খুলে দিতে, আমাকে আমার বাইরে বার করে আনতে পারে সে কিছুটা। কোনো লেখা তখন হয়ে দাঁড়ায় সংসারের সঙ্গে আমার সংযোগসূত্র। সমালোচনারও দাম সেই সংযোগটাকেই দেখতে পাওয়া, দেখতে চাওয়া। কিন্তু তার বদলে আবারও যদি আমাদের টেনে নেওয়া হয় লেখকেরও কোনো নিজস্ব ব্যক্তিগণ্ডির দিকে, আবার তবে তৈরি হয় নতুন রকমের এক আবদ্ধতা। সেই আবদ্ধতায়, লেখার চেয়ে বড়ো হয়ে ওঠে লেখকের মূর্তি, আর image, লেখার সঙ্গে সম্পর্কহীন সেই ইমেজ-গত বিজ্ঞাপন।' (গদ্যসংগ্রহ : ৬/২০০২ : ৪০-৪১)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পরিগ্রহণ সম্পর্কেও কথাগুলি একটুখানি বিশেষ ধরনে প্রাসঙ্গিক। তবে 'লেখকের কোনো নিজস্ব ব্যক্তিগণ্ডির দিকে' অভিনিবেশ সত্যিই 'নতুন রকমের এক আবদ্ধতা' তৈরি করে কিনা এবং সব কিছু ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে ওঠে কিনা 'লেখার সঙ্গে সম্পর্কহীন' লেখকের 'ইমেজগত বিজ্ঞাপন'—তা নিয়ে কূটতর্ক হতেই পারে। 'কোনো লেখক বা কবির প্রবলভাবে ও বহুবার উচ্চারিত বিশ্বাস, আস্থা, শত্রু-মিত্র সম্পর্কিত প্রত্যয়, শিল্পের সামাজিক কৃত্য, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক চিহ্নায়ন ইত্যাদি সম্মিলিত ভাবে একটু-একটু করে যে লেখকের মূর্তি আর পাঠকের প্রত্যাশা গড়ে তোলে—তাকেও কি 'নিজস্ব ব্যক্তিগণ্ডি' বলব? বলব 'আবদ্ধতা' আর 'ইমেজগত বিজ্ঞাপন'। তাহলে সম্পূর্ণ অনান্দনিক কারণে, বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের ভিত্তিভূমি যদি জগৎ-ব্যাপ্ত গোপন লোভ-স্খলন-পাটিগণিতের সংক্রমণে শিথিল হয়ে যায় এবং লেখক অনিবার্য বিপরীতমুখী আবর্তে নন্দনবিরোধী প্রতিক্রিয়াপন্থী শিবিরে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন— তাঁর প্রাক্তন বিশ্বাসের প্রেরণাময় উচ্চারণগুলিকে কি অপরিণত মননের ফসল বলে খারিজ করে দেব? লক্ষ করব না, কীভাবে বিচিত্র অবভাসে সেই লেখক ছদ্ম-সংযোগের চাপে ওমোহে 'লেখার সঙ্গে সম্পর্কহীন' নতুন এক নঙর্থক 'ইমেজ-গত বিজ্ঞাপন' হয়ে উঠছেন। এমনকী, স্বয়ং লেখকও যদি তাঁর নতুন অবস্থানের নব্যবাস্তবে নিজের হয়ে-ওঠার পর্যায়কে লঘু করে দেখাতে চান, মানব না। বলব, এও আরেক 'নিজস্ব ব্যক্তিগণ্ডি'

ও মূর্তি ভাঙার ভুল চেষ্টা—একে মানি না কারণ তা ইতিহাস ও ঐতিহাসিকতাকে অস্বীকার করছে। বরং ফিরিয়ে আনব শঙ্খের ওই বাচন; 'লেখাকেই আমরা চাই, লেখককে নয়। নিষ্ঠুর শোনালেও কথাটা সত্য যে সোনার ধানটুকুকেই চাই আমরা : নৌকায় যিনি তুলে দিয়েছিলেন, তাঁকে নয়।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দেহাবসানের পরে তাঁকে সমগ্রতায় বুঝে নেওয়ার চেষ্টা হবে এটাই প্রত্যাশিত। স্বভাবত কবিসত্তা প্রাধান্য পাবে; কিন্তু তাঁর বিচিত্র স্বাদের গদ্যকৃতিকেও লক্ষ করব তাঁর আত্মনির্মাণ এবং বিনির্মাণ; অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের অনন্বয় সম্পর্কিত গোপন অস্বস্তি নিরাকরণের সচেতন উদ্যম। দৃঢ়প্রোথিত বিশ্বাসের শিকড়-বাকড় প্রকৃতপক্ষে তত দৃঢ় ও তত প্রোথিত ছিল না, এই বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে কি নির্ভার গদ্য ব্যবহারের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল? তবু, আজ যখন মোহনা থেকে উৎস ও ক্রমবিকাশের পর্যায়ের দিকে তাকাই, বিশ্বাসের নির্মাণ থেকে বিশ্বাসহীনতার অপনির্মাণে পৌঁছানোর সম্ভাব্য পথরেখাকে খুব সতর্কভাবে লক্ষ করে যেতে হয়। আর, মনে রাখতে হয়, কবিকে সত্যিই তাঁর জীবনচরিতে পাওয়া যায় না সর্বদা। কবির মরজীবনের ভ্রান্তি ও অন্ধবিন্দুগুলি মোহনায় পৌঁছানোর পরে বুদ্বুদের মতো সময়-প্রবাহে মিলিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর সৃষ্টি অটুট থাকে স্রষ্টা-নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নিয়ে। তাই সৃষ্টিতে প্রতিফলিত বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের উত্তাপ স্রষ্টার সময়-লালিত ভাবাদর্শ-ভাবাদর্শরিক্ততা কিংবা বিশ্বাস-বিশ্বাসশূন্যতার উত্তাপ ও উত্তাপহীনতার আততি থেকে স্বাধীন ও সার্বভৌম। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাঁর সৃষ্টির জগতে খুঁজব তাঁর বিশ্বাস গড়ে তোলা ও হারানোর অন্তরঙ্গ ইতিবৃত্ত।

দুই

'আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই'

অজস্র স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির ভিড় থেকে 'আমার কাজ' কবিতার এই অভিব্যক্তি স্বতশ্চল ভাবে মনে এল। আন্তরিকতায় ঋদ্ধ উচ্চারণেই তো তাঁর অন্তর্জীবনের সঞ্চালক বিশ্বাস দীপ্যমান হয়ে উঠেছে। এই বিশ্বাসের জন্যে, এই বিশ্বাসের জোরে লেখেন সুভাষ। তাঁর লৌকিক ভাষা

আর বাংলা কথ্যভঙ্গির সাবলীল রূপদক্ষ ব্যবহারের কথা সবাই বলেছেন। এই কবিতায় প্রায়োগিক সামর্থ্যের চেয়েও বেশি কিছু আছে; আছে এই ঘোষণা যে কবি প্রবলভাবে দাঁড়িয়েছেন বহমান ইতিহাসের পক্ষে, হৃৎস্পন্দনের মতো স্বাভাবিক ভাবাদর্শের পক্ষে। এই ভাবাদর্শ চলমান মানুষের; বলা ভালো, সেই ভয়হীন মানুষের যে আধিপত্যবাদী শক্তির চাতুর্য-বিছানো প্রতাপের দৃশ্য ও অদৃশ্য জালকে উপেক্ষা করতে পারে। এই ভাবাদর্শ স্বভাবে প্রতিস্পর্ধী কারণ তা বেসরকারি জীবনবীমার প্রতিবেদন। তাই সুভাষের কবিতার ভাষার কোষে কোষে অনুরণিত হয়েছে লোকায়তের সহজ পৌরুষ ও অঙ্গীকার। কথাগুলিকে পায়ের ওপর দাঁড় করানো, প্রত্যেকটি ছায়ার চোখ ফোটানো ও স্থির ছবিকে হাঁটানোর আকাঙ্ক্ষায় ব্যক্ত হয়েছে নিঃসংশয় বিশ্বাসের দীপ্তি। এইজন্যে কবির অভিজ্ঞানে প্রচ্ছন্ন আত্মগৌরব ও সেই আত্মগৌরবের উচ্চবর্গীয় স্বভাবকে সুভাষ নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। লিখতে পারেন চলমানতায় অস্খলিত থাকার প্রত্যয়ের কথা, জনতার মুখরিত সখ্যে নিজস্ব নির্জন খুঁজে নেওয়ার কথা, নিরবয়ব ভিড়ের মধ্যে সহযোদ্ধাদের খুঁজে পাওয়ার কথা। এই উচ্চারণ মূলত কিন্তু নিজের জন্যে। যেন নিজেকে অবিরত মনে করিয়ে দেওয়া, শিল্পের সামাজিকতা অলঙ্ঘ্য।

তবে এই সঙ্গে এটাও স্পষ্টভাবে লিখতে হয় যে কোনও কবি বা শিল্পীর সামাজিক সক্রিয়তা এবং সমাজকর্মী বা রাজনৈতিক কর্মীর সামাজিকতা ঠিক একরকম নয়। কখনও কখনও এই সত্য আমরা ভুলে যাই বলে অকারণ সমস্যা তৈরি হয়। সৃষ্টিশীল কবি নিজের নিভৃত অনুভব ও প্রকট অভিজ্ঞতার দর্পণে যেমন নিজেকে যাচাই করবেন, তেমনি নিজের অন্তর্বৃত বিশ্বাসের বহির্বৃত অভিব্যক্তি এবং তার পারম্পর্য—বৈধতা—প্রাসঙ্গিকতা নিয়েও মুখ্যত আপন শিল্পসংবিদের মুখোমুখি দাঁড়াবেন। এই দ্বিবাচনিকতা যতদিন অক্ষুণ্ণ থাকে, বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের ওপর প্রবল আঘাত নেমে এলেও কবি বা শিল্পীর কেন্দ্রীয় বোধ অবিচলিত থাকে। অবিরত আত্মমথিত হবে কবি-লিখিয়েরা : এটাই স্বাভাবিক। মনে রাখবেন, সমকালীন ঘটনাপুঞ্জ ও ধারণা-সমবায়ের মধ্যে সবটাই সত্য নয়, অনেকখানি অবভাসও তাতে প্রচ্ছন্ন থাকে।

অবভাস ও সত্যের সংঘর্ষে সমকালের মধ্যেই কীভাবে সহাবস্থান করছে গতি ও প্রতিগতি : একজন প্রকৃত কবি তা বুঝে নেবেন আপন সত্তার সৃজনশীল অভিক্ষেপে এই প্রত্যাশা আমাদের। কিন্তু এমন যদি হয় যে সাময়িকের অবভাস কবি-লিখিয়েকে একদেশদর্শী করে তুলছে তাহলে ক্রমশ পুঞ্জীভূত-হওয়া ক্ষোভ-তিক্ততা-অভিমান তাঁর মূল বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের ভরকেন্দ্রকে শিথিল করে দিতে পারে। তখন চেতনা ও উপলব্ধির উত্তাপ সম্পর্কে ভরসা হারিয়ে ফেলে তিনি নিজের চারদিকে অনিবার্যভাবে গড়ে তুলবেন বিশ্বাসহীনতার চক্রব্যূহ। আত্মসৃষ্ট সেই চক্রব্যূহে প্রবেশ করার জন্যে অবধারিতভাবে তৈরি হবে কোনও রন্ধ্রপথ, কিন্তু নির্গমের উপায় থাকবে না। বরং চেতনার ইতিহাস নিঙড়ানো ভাবাদর্শের, বিশ্বাসের, গতিময়তার উত্তাপ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে অনিবার্যভাবে তৈরি হবে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া।

তখন কবি আর লিখতে পারেন না : 'ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।' ক্রমশ বিভ্রান্তির

চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থাকেন কবি। তাঁর বিবেক নিজের প্রাক্তন বিশ্বাসকে নিজেই ব্যঙ্গ করতে প্ররোচিত করে। তারপর সেই মুহূর্তও আসে, যখন আধিপত্যবাদী ও জনবিরোধী প্রতাপের আয়ুধে তিনি রূপান্তরিত হয়ে যান। আত্মহননের এই প্রক্রিয়ায় স্থূলতার অতিরেক দেখা দেয়, বিকার ও বিদূষণের শিবিরে সম্পৃক্ত হয়ে যান। চেতনা ও বিশ্বাসের বিভিন্ন পর্যায় থাকে; এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ের মৌলিক ভিন্নতাও থাকতে পারে। কবি-লিখিয়েরা ভিতর ও বাহিরে দ্বিরালাপে সম্পৃক্ত থেকে অনবরত এই স্তরান্তর থেকে আপন শিল্প-বোধের স্বরান্তর যাচাই করে নেবেন : এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু তাঁরা ভুলবেন না কখনও, আত্ম-বিনির্মাণ আর আত্মবিনাশ এক কথা নয়। পাশাপাশি নান্দনিক ও সামাজিক স্তরে চিহ্নায়নের নতুন প্রকরণ কীভাবে গড়ে উঠছে অনবরত, কীভাবেই বা দেখা দিচ্ছে নিশ্চিহ্নায়নের কুহক : সৃষ্টিশীল কবি-লিখিয়েদের কাছে আমরা তা বুঝে নিতে চাই। বুঝে নিতে চাই কীভাবে এই প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক আধুনিকতা, অন্তর্ঘাতকদের দাপটে নির্মিত অবক্ষয়ী আধুনিকতা এবং পণ্যায়ন—মনোবিকার—বিমানবায়ন স্পৃষ্ট প্রত্ন-আধুনিকোত্তর প্রবণতার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বুঝতে চাই, ভাবাদর্শের আলো নির্বাপিত হয়ে যাওয়াতেই বিবর্তনের পথে প্রতিভাবাদর্শের কুহকে নিমজ্জিত হয়ে গেছে কিনা কবিকৃতি।

তিন

এমন হতেই পারে যে প্রত্যাশা-ভঙ্গের বেদনা ও ক্ষোভ প্রবল হয়ে উঠছে কোনও-কোনও পাঠকের মধ্যে। আবার কোনও-কোনও পাঠক সুবিধাজনক 'নিরপেক্ষ' অবস্থানে থেকে ভাবতেই পারেন, লেখার 'পাঠ্যতা' নিয়ে ভাবনাকে ব্যস্ত রাখা ভালো এবং উচিত। তেমন পাঠকের কাছে 'ভাবাদর্শ' কেবল বানিয়ে তোলা চাপিয়ে 'দেওয়া' অনাবশ্যক উৎপাত মাত্র। বস্তুত সমালোচনার নামে ব্যক্তিগত রুচি ও আবেগ এত বেশি প্রাধান্য পায় যে চর্চিত পথের বাইরে গেলে সুস্থ বিতর্কের বদলে অসুস্থ আক্রমণ ঘনিয়ে ওঠে অচিরেই। বরং বাক্‌শিল্প দিয়ে সতর্ক সাবধানী অগভীর বিচরণ ঢেকে রাখাই নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংকীর্ণ জগৎ থেকে মুক্তি মানে কি আরেকটি চতুরভাবে লুকিয়ে-রাখা দায়শূন্য মনের ছাঁচ মেনে নেওয়া? এবং 'মুক্তি'র মানে কি আত্মবিরোধী সমাজবিরোধী নন্দনবিরোধী পারম্পর্য-বিরোধী সুবিধাবাদী অবস্থানে চলে যাওয়া? নিশ্চয় একজন সার্থক কবি তাঁর শিল্পবোধের ন্যায়-পারম্পর্য দিয়ে আমাদের উদ্ভাসিত করে তুলবেন আর তাঁর সৃজনীশক্তি দিয়ে পাঠকেরও সৃজনী ক্ষমতা উস্‌কে দেবেন। এত ঠিক 'বিচিত্র পথের সম্ভাবনাটা শিল্পের বড়ো সম্ভাবনা, স্তরের পর স্তরের উন্মোচন শিল্পের বড় উন্মোচন।' (শঙ্খ : কবির অভিপ্রায়)।

কিন্তু বহুস্তরে সম্ভাবনার এই বিচিত্র উন্মোচন ভাবাদর্শ-নিরপেক্ষ কোনও প্রক্রিয়া কি হতে পারে আদৌ? অতএব সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিসত্তার ক্রমিক প্রয়াণ বিশ্লেষণ করে পাঠক বহু গুরুতর জিজ্ঞাসার মীমাংসা করতে চাইবেন। খুঁজে নিতে চাইবেন মর্মগত কোনও স্থিতিস্থাপকতা কিংবা তার অভাব, ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া ও অনন্বয়ের তাৎপর্য, আত্ম-উদ্ভাসন থেকে আত্মপ্রতারণায় পৌঁছে যাওয়ার ইতিহাস-নির্ধারিত

নিষ্কর্ষ। সতর্ক ও সংবেদনশীল পাঠক নিশ্চয় মনে রাখেন, 'যখন একটা লেখার সমগ্র থেকে তার একটা অংশকে ছিঁড়ে নিয়ে কথা বলতে থাকি, সেটা নিশ্চয় ভুল পড়া' (তদেব)। তবে ভ্রান্ত পাঠের আরও অনেক ধরন আছে যা বাংলা সাহিত্যে প্রচলিত সমালোচনা-ধারায় আকছার দেখা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাসের জগৎ গড়ে ওঠা আর একটু একটু করে সেই জগৎ ভেঙে যাওয়ার প্রকৃত তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে এইসব জরুরি কথা মনে রাখতে হয়। একে কেবল মূর্তি তৈরি করা আর মূর্তি ভাঙার প্রচলিত সহজিয়া ধারণা দিয়ে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না।

বাংলা কবিতায় যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চিরজীবী, তিনি যুগপৎ ভালোবাসার ও রাজনীতির কবি। কবি স্বয়ং বিভিন্ন সময় তাঁর ভালোবাসা ও রাজনৈতিক বিশ্বাসের কথা জানিয়েছেন। এতে সন্দেহ নেই যে এই ভালোবাসা ও রাজনীতির সংজ্ঞা একটু আলাদা; এরা যতখানি ব্যাপক, ততখানি গভীর। এই নিরিখে ভালোবাসাই রাজনীতি, রাজনীতিই ভালোবাসা। যতদিন সুভাষের এই যুগলবন্দি অক্ষুণ্ণ রয়েছে, ততদিন কবিতার নির্যাসে ও প্রকরণে তিনি আশ্চর্য শিল্পী। তিনি মার্কসবাদী নাকি মানবতাবাদী : এই মিথ্যা ও অর্থহীন বিতর্ক যাঁরা জিইয়ে রেখেছেন, তাঁর মার্কসবাদ ও মানবতাবাদকে বুঝেছেন শুধু সফরী-সঞ্চরণের মধ্য দিয়ে। এবং, তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত ও প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তি-শৃঙ্খলায় আধারিত সিদ্ধান্ত দিয়ে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেও টুকরো করে দেখেছেন।

তিনি নিজে কী জানিয়েছেন, তা উপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত : 'কমিউনিস্ট পার্টিকে আমি যেটুকু দিয়েছি, আমি পেয়েছি তার বহুগুণ বেশি। পার্টির কর্মসূচি, প্রস্তাব, রণকৌশল, রণনীতি—আমার পাওয়ার উৎস এ সবেরও বাইরে। আমি পেয়েছি দেয়ালে পোস্টার মেরে, অফিসময় ঝাঁট দিয়ে, মিছিলে গলা মিলিয়ে, কাগজে ডাকটিকিট সেঁটে, খেতখামারে কলকারখানায় কাজ করা হাতের ছন্দে, বস্তিতে আর কুঁড়েঘরে মাদুরে আর ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে। কমিউনিস্ট পার্টি আমাকে তন্ন তন্ন করে দেখার চোখ দিয়েছে, অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার সাহস জুগিয়েছে, লাগসই শব্দ দিয়ে আমার মুখে সচিত্র বোল ফুটিয়েছে।' (খোলা হাতে খোলা মনে : ১৯৮৭; ১৫)

এ তো কথার কথা মাত্র নয়। একটু অভিনিবেশ দিয়ে পড়লেই বুঝি প্রতিটি শব্দ আন্তরিক অনুভূতিতে স্পন্দিত খাঁটি বিশ্বাসের আলোয় দীপ্যমান। সাম্প্রতিক সমালোচকদের মধ্যে যেহেতু এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার যুক্তিশৃঙ্খলায় স্বেচ্ছা-সমর্পিত হওয়ার প্রবণতা প্রকট, মার্কসবাদের প্রতি সোচ্চার আনুগত্য ঘোষণাকে তাঁরা যতদূর সম্ভব লঘু করে দেখাতে চান। কিন্তু স্বয়ং সুভাষ খোলাখুলি লিখেছিলেন (অন্যমনে; জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৬৯; ৮৮) : 'মানবতা আর দেশাত্মবোধ থেকে রাজনীতি মোটেই দূর অস্ত নয়। কাঙালি দরজায় এলে ভিক্ষে দিয়ে তাকে বিদায় করলাম। কেউ সেই মন কাঁদাকে রাজনীতি বলবে না। কিন্তু অতই যদি দরদ থাকে, শুধু তাকে চোখের সামনে থেকে তখনকার মত বিদায় করেই ক্ষান্ত হব না। দারিদ্র্যকে বিদায় করার পথ দেখতে হবে। তখনই চলে আসবে রাজনীতির কথা। দরদটাকে মুখের বদলে বুকের মধ্যে এবং তাৎক্ষণিকের বদলে বরাবরের করে নেবার কাজটাই হবে

রাজনীতি। এ রাজনীতির সত্তা আমার কবিতার সত্তা থেকে পৃথক নয়। রাজনীতি ছোট জিনিস নয়। তাকে যখনই ছোট করে দেখি, তখনই আমরা ছোট হয়ে যাই।[৮] কবিসত্তা ও রাজনৈতিক সত্তা তাই সূক্ষ্ম, গভীর, ব্যাপক ও ঐতিহাসিক অর্থে কখনও স্বতন্ত্র হতে পারে না। এমনকী, যখন গ্রহণ ও সংলগ্নতার বদলে আসে প্রত্যাখ্যান ও নিরাকরণের উচ্চারণ; তখনও নেতিবাচক ভাবে এই দুই সত্তার অবিচ্ছেদ্যতা প্রমাণিত হয়। লুই আলড্যুস্‌রের একটি মন্তব্য এ-প্রসঙ্গে মনে আসছে : '...The limed relation between men and the world, including History (in political action or inaction), passes through ideology, or better, is ideology itself.' (For Marx, 233)

চার

সুতরাং, বহু বহু বার পুনরুচ্চারিত 'মে-দিনের কবিতা'র (পদাতিক) পঙ্‌ক্তিগুলি থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে এই ভাবাদর্শের, বিশ্বাসের আলো থেকে আরও বিশ্বাসের দীপ-পরম্পরা জ্বালিয়ে তোলার প্রত্যয়—এ কথাই লিখব। লিখব যে ভালোবাসা ও রাজনীতির যুগলবন্দি রচনার মধ্য দিয়ে সেদিনকার তরুণ পদাতিক কবি প্রবীণ অশ্বারোহী সহযাত্রীদের কাছেও জীবনের নতুন স্থাপত্য রচনার বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন। সেদিন এই উচ্চারণকে হয়তো কেউ কেউ ভেবেছিলেন তারুণ্যের উচ্ছ্বসিত আবেগ; আজও, ইতিহাসের মৃত্যু ঘোষণার বহিরঙ্গ চমকে বিভ্রান্ত হয়ে, কেউ কেউ একই আপাত-বিজ্ঞজনোচিত অতিসরলীকরণের আশ্রয় নিচ্ছেন। ভাবছেন,

'তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালোবাসতে'

নিছক কথার কথা মাত্র। আর, প্রারম্ভিক চারটে পঙ্‌ক্তি শুধু ছন্দ-স্পন্দিত সুখ-পাঠ্য আবৃত্তি-যোগ্য 'কবিতা'র প্রতিশ্রুতি :

'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা,
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।'

কখনও কখনও দেখা যায়, প্রত্যক্ষ সামাজিক প্রেরণা বিশুদ্ধ এবং উত্তুঙ্গ হলেও তার শিল্পিত অভিব্যক্তি সর্বদা সার্থক হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রেও সুভাষ আশ্চর্য ব্যতিক্রম। জীবনানন্দ দাশের 'ঝরাপালক' পরবর্তী রচনাসম্ভারের তুলনায় যতখানি অপরিণত—'ফুল ফুটুক', 'যতদূরেই যাই', 'কাল মধুমাস'-এর তুলনায় 'পদাতিক' ততখানি অপরিণত নয় নিশ্চয়।

গভীরতর অর্থে সমস্ত সার্থক কবিই বহতা সময়ের পঞ্জীয়ক। তবে পদাতিকের সুভাষ কলম হাতে তুলে নিয়েছেন মুখ্যত সময়ের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক অন্তঃস্বর প্রকাশ করার তাগিদে। পদাতিকের কবিতাগুচ্ছ প্রমাণ করে যে সময়ই প্রকৃত লেখক, কবি অনুলেখক মাত্র। পরবর্তী কালে যিনি মুখের ভাষা, লোকায়ত বাচন ও অপ্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতার অনুপুঙ্খ দিয়ে কবিতার

বাচনবিশ্বকে নির্মাণ করবেন, তাঁর প্রবণতার পূর্বাভাস এই প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলিতেও পাওয়া যায়। চারদিকে যখন ক্ষয় ও ধ্বংসের পরিবেশ দিন দিন প্রকট হয়ে উঠছে, মতাদর্শের শক্তি ছাড়া তিনি বিচ্ছিন্নতার ব্যক্তিসর্বস্ব চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু এরকম যে হয়নি, এটা বাংলাভাষার সৌভাগ্য। নইলে নানা ধরনের পরস্পর-বিরোধী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কবি একরৈখিক ও একমাত্রিক হয়ে উঠতে পারতেন। যাঁরা রাজনৈতিক ভাবাদর্শের উপর খড়্গহস্ত, তাঁরা এই বিষয়টি বিবেচনা করেন না। ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে আগাগোড়া বৃহত্তর ও গভীরতর অর্থে পদাতিক রয়ে গেছেন, এই সত্যের তাৎপর্য তাঁদের কাছে ঈপ্সিত মাত্রায় স্পষ্ট হয় না কখনও।

পরিণততর পর্যায়ের বাক্-কুশলতা, কবিত্বের আভা, সংযোগ গড়ে তোলার নৈপুণ্য না থাকলেও 'পদাতিকে'র বিভিন্ন কবিতার বাচনে সুভাষ নিঃসন্দেহে বিবরণের 'উদ্বৃত্ত' পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। 'নবযুগ' নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা কিংবা 'লাল উল্কি', 'বুর্জোয়াদের মায়া', ইত্যাদি শব্দ-ব্যবহার সত্ত্বেও 'আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি' বা 'আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি' ইত্যাদির প্রত্যক্ষতায় আপন অর্জিত বিশ্বাসের ঘোষণাই লক্ষণীয় ('সকলের গান')। অবশ্য, সব মিলিয়ে, শব্দপুঞ্জ থেকে চিহ্নায়কে পৌঁছানোর পথ এখনও রপ্ত হয়নি। চলমান মুহূর্ত-সমবায় থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতার পঞ্জীয়ন করতে গিয়ে ভাষণের অতিরেক প্রকট হয়ে পড়েছে; কথার বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠেনি। ছন্দনৈপুণ্য, বাক্-কুশলতা, শ্লেষ-প্রয়োগ, অন্তর্বৃত নাট্য-স্বর ঝিলিক দিয়েছে যদিও রাজনৈতিক বক্তব্যের গুরুভার উপস্থিতিতে সেইসব আড়ালে পড়ে গেছে। অতি পরিচিত রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ও চিহ্নায়কের বহুল প্রয়োগে বোঝা যাচ্ছে, সুভাষ তখনও বিদ্যুৎ-সঞ্চারী বাক্‌শিল্পের কারিগর হয়ে ওঠেননি। আসলে ভাবাদর্শের আলো তখনও চেতনার বাহির মহলে রয়ে গেছে, পরবর্তী পর্যায়ের মতো। ভাবনার কোষে-কোষে ছড়িয়ে পড়েনি। যত প্রসারিত হয়েছে আলোকিত পরিধি, বাক্‌রীতি তত ক্ষিপ্র দ্যুতিময় বিশ্বাসের কিরণে অন্তর্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। তবু আসন্ন সুভাষিতের পূর্বাভাস 'পদাতিক' পর্যায়েই এভাবে দেখা যাচ্ছে :

'ঊর্মিল ভুঁই হাঁটে বনহীন
তেপান্তরে;
সরু সরু ঘাস, শিরে বুঝি তার
শিশির ঝলে!

দুই দিকে দূর বালুদের দেশ,
মধ্যে নদী
শ্বাস টেনে টেনে পায়ে পায়ে রাখে
চিকনরেখা।'

কোনও কবি-লিখিয়ের সমস্ত রচনা একই মাত্রাসম্পন্ন ও লক্ষ্যভেদী হয় না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও হয়নি। তবুও কত রকম ছোটোখাটো স্তর-উপস্তর পেরিয়ে তিনি শিল্পের

উৎকর্ষে পৌঁছেছেন এবং তাঁর এই একান্ত নিজস্ব যাত্রাপথে কতভাবে কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের কখনও প্রকট আর কখনও প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি তিনি অনুভব করেছেন : এইসব মুছে নেওয়ার জন্যে জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করলে চলে না। যে-সমস্ত প্রাজ্ঞ সমালোচক নিজেদের মধ্যবর্গীয় অবস্থান অনুযায়ী সমস্ত প্রত্যয়কেই সংশয়ের চোখে দেখেন এবং বৌদ্ধিকতার অহংকারে পারম্পর্যহীনতা দায়বদ্ধতা ও বিশ্বাস থেকে স্খলনকেই 'মুক্তির' সমার্থক বলে ভাবেন, বহুল-প্রচারিত হওয়ার সুবাদে তাঁদের সুভাষ-বিষয়ক বয়ান খোদ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিকৃতি ও ভাবাদর্শের নিরন্তর দ্বিরালাপের সত্যকে আড়ালে নিয়ে গেছে।

কোনও প্রাজ্ঞ সমালোচক ভেবেছেন, সুভাষ যখন উচ্চগ্রামে তাঁর রাজনৈতিক প্রত্যয়গুলি উচ্চারণ করেছেন, তখনই নাকি তাঁকে সবচেয়ে ভানযুক্ত মনে হয়েছে। এই 'ভান' শব্দটি অত্যন্ত আপত্তিকর কেননা খোলা মনে তাঁর কবিতা পড়লে যে-দিকটি সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করে, তা হল কবির নিবিড় আন্তরিকতা। বরং রাজনৈতিক প্রত্যয়ের স্পষ্ট ও ঋজু উচ্চারণ সম্পর্কে সমালোচকের অসহিষ্ণুতা এতে ধরা পড়েছে। বিশ্বসাহিত্যে কিন্তু নাজিম হিকমত, লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, পাবলো নেরুদা, লোরকার দৃষ্টান্তও রয়েছে। 'নিজের প্রত্যয়ের উপরোধেও' 'বড় সার্থকতা অর্জিত বা আয়ত্ত হয় না'—এই মন্তব্য তাহলে ধোপে টেঁকে না। তাছাড়া 'উপরোধে' শব্দটি অবিশ্বাসীর শ্লেষকে গোপন রাখেনি। অসাম্য-লাঞ্ছিত সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন ও বিশ্বাস পারে ব্যক্তি-সর্বস্বতার নরক থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে। সেই স্বপ্ন ও বিশ্বাসকে ব্যঙ্গ-প্রত্যাঘাত—অস্বীকার করে সরকারি সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকপালেরা কালের স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থের পোষকতা করেন—ইতিহাস তা বার বার দেখিয়েছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি-জীবনের প্রথম পর্বে যদি এমন কবিতা লিখে থাকেন যা সভা-সমিতিতে পঠিত হতে পারে এবং সকলে তাতে গলা মেলাতে পারে—তাহলে তাঁর বিশ্বাসের প্রায়োগিক কার্যকারিতাই প্রকাশিত হয়েছে বলা যায়। কবিতা তো শুধুই নিভৃত গুঞ্জনের নয়। আসল কথা হচ্ছে, কবি কলম হাতে নিয়ে কোনও আরোপিত শিল্পের ধারণায় মিথ্যা কথা লিখেছেন কি না! বস্তুত সুভাষ আগাগোড়া নিজস্ব বিশ্বাস অনুযায়ী অনুভূতির সত্যই প্রকাশ করতে চেয়েছেন। যতদিন তাঁর কেন্দ্রীয় বিশ্বাস সুদৃঢ় ছিল, স্খলন-জনিত ছদ্ম-সত্য বাচনকে আক্রমণ করেনি। তাছাড়া একই কবি উদ্দেশ্য-সাধক কবিতার পাশাপাশি অন্য আরও বিভিন্ন ধরনের কবিতা লিখতে পারেন। এটাই স্বাভাবিক; এতে নিশ্চয় এটা প্রমাণিত হয় না যে কবি নিজেকে দ্বিধা-ত্রিধা-বহুধা বিভক্ত করে সত্তার মধ্যে অজস্র জলবিভাজন-রেখা তৈরি করে ফেলেছেন। তার মানে কি এই যে, কবি ভণ্ড ও সুবিধাবাদী যিনি পরিস্থিতি অনুযায়ী নানা মাপ ও রঙের আলখাল্লা পরে নেন! সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই দ্বিচারিতা অন্তত করেননি; এমনকী, পরে যখন তিনি প্রাতিষ্ঠানিক পণ্যসাহিত্যের শিবিরে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছেন, তখনও নয়।

পাঁচ

'সাধারণ্যে পরিচিত অভিজ্ঞতাকে, অথবা বলা ভালো কতকগুলি খবরকে, তিনি আবেগ

স্পন্দিত করে তুলতে চেয়েছিলেন'—এ ধরনের আপাত-সহজ মন্তব্যের মধ্যে কোথাও যেন বাচন-ভঙ্গির ইশারায় লুকিয়ে থাকে এই প্রক্রিয়ার প্রতি উচ্চবর্গীয় সমালোচকের অসমর্থন কিংবা আপত্তি। যেন দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার সংবাদ কিছুতেই কাব্য হয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু সমালোচক এটা লক্ষ করেননি যে কবির সেইসব আপাত-প্রত্যক্ষ বাচনেও পরিচিত বস্তুজগৎ অপরিচিতীকৃত হয়ে গেছে। 'কবির সজাগ আত্মবীক্ষণের উজ্জ্বল নিদর্শন' ও 'তাঁর আধুনিক জগৎবীক্ষার' দৃষ্টান্ত হিসেবে যেসব কবিতাকে আলাদা করে দেখাতে চান সমালোচক, তাদের সত্যিই কি এভাবে আলাদা করা যায়? রাজনৈতিক চেতনার ওপর ভর-করে-দাঁড়ানো জীবনবোধ যেসব সমালোচকের কাছে 'ত্রুটি' বলে বিবেচিত হয়েছে এবং এর বিপ্রতীপে যাঁরা মানবিকতাকে দাঁড় করাতে চেয়েছেন—এঁদের গোত্র পরিচয় তো আমরা জানি। দেশে-বিদেশে এঁরা মার্কসবাদ ও মানবিকতাবাদের মধ্যে বিজ্ঞজনোচিত জলবিভাজন-রেখা কল্পনা করে নেন।

এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ ধরে নেন : 'রাজনীতি তো প্রেম, মৃত্যু, প্রকৃতির মতো মানব-ভাগ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত নয়। ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতি, যুগপরিবর্তন, মতপরিবর্তন, ঘটনাবর্তের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাসি খবরের কাগজের মত মূল্যহীন হয়ে যায়।' এটা কি ঠিক কথা হল? অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের জটিল আততিতে যুগে যুগে কত জনগোষ্ঠীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে তা কি তর্ক করে বোঝাতে হবে? এলুয়ার, লোরকা, নেরুদার মতো আরও কত অসংখ্য কবি-লিখিয়ের ভাগ্য ঘটনাশ্রয়ী রাজনীতিই নির্ধারণ করে দিয়েছে। আসলে আধুনিকোত্তর যুক্তি-শৃঙ্খলা স্পষ্টভাবে ঘোষিত হওয়ার আগেই বর্গগত অবস্থানের সীমাবদ্ধতা থেকে বহু বুদ্ধিজীবী-সমালোচক প্রগতি-মতাদর্শ-রাজনীতি-ইতিহাসের প্রতি অস্বস্তি ও অনীহা প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মনে হয়েছে মার্কসবাদী কবির উপলব্ধি-বীক্ষার উপর মতাদর্শের দাবি সর্বতোমুখী বলে স্রষ্টার বহুকৌণিক চৈতন্য বজায় রাখা কঠিন। অর্থাৎ মার্কসবাদের যান্ত্রিকতা সম্পর্কে যে-আপত্তি বহুচর্চিত, কার্যত তা আপত্তিকারীদের মধ্যেই বেশি সংক্রামিত হতে দেখি। কেননা তাঁরা যান্ত্রিকভাবে পূর্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নেন যে মার্কসবাদের প্রত্যয়-সম্পন্ন কবি-লিখিয়েরা বহুকৌণিক চৈতন্য বজায় রাখতে পারবেন না। এই ধারণা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তথাকথিত দুই পর্বের রচনা সম্পর্কে যান্ত্রিকভাবেই প্রয়োগ করা হয়েছিল এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা সম্পর্কেও করা হয়েছে।

কিন্তু স্বয়ং সুভাষ বহুবার তাঁর শিল্প-স্বভাবে বিশ্বাসের স্থায়ী ভূমিকার কথা জানিয়েছেন। 'কবিতার বোঝাপড়া' নামক বিখ্যাত বয়ানে তিনি জানিয়েছেন : 'মিছিলের ঠিক যে জায়গায় আমি দাঁড়িয়ে থাকি, সেখানে আমি একক। ঠিক একই জায়গায় দুজনের ঠাঁই হয় না। সকলের সঙ্গে থেকেও এক জায়গায় আমি নির্জন, নিঃসঙ্গ।' তার মানে জনতার মুখরিত সখ্য সর্বাত্মক ভাবে গ্রহণ করার পরেও সমান্তরালভাবে অটুট থাকে ব্যক্তিগত নির্জনতার পরিসরও। জীবনে, শিল্পে অনস্বীকার্য এই দ্বিবাচনিকতার উপস্থিতি যাঁদের বিবেচনার বাইরে থাকে, তাঁরাই কেবল ঘুরপথে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পৌঁছে যান। জীবনের মতো বিশ্বাসেরও নানা সংরূপ, নানা অভিব্যক্তি নানা টানাপোড়েন থাকে।

চেতনায় এই দ্বিরালাপের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুরণন থেকে বদলে যায় বক্তব্যের নান্দনিক মাত্রা সম্পর্কিত ধারণা, সেইসব ধারণার সঙ্গে লিখন-শৈলীর সুড়ঙ্গ-লালিত সম্পর্ক, সম্পর্কের বিন্যাস থেকে বিনির্মাণের আয়োজনে তৎপর হওয়ার প্রেরণা। এইসবই সঙ্গীতের বাদী ও সংবাদী সুরের আততির মতো ব্যক্ত হয় বাচনে। সেই বাচনে গভীর গভীরতর বিশ্বাসের স্পন্দন যেমন থাকে, বিশ্বাস-সম্পর্কিত জিজ্ঞাসাও থাকে। অন্তত এই আত্মমন্থন ততদিনই অটুট থাকে যতদিন কবি আত্মপ্রতারণার আবর্তে স্বেচ্ছাবন্দিত্ব স্বীকার করেননি। পণ্যায়নের, বিদূষণের সোনার হরিণ যখন কবিকে আত্ম-বিস্মৃত করে দেয়, তখন চারদিকে অবারিত হয়ে ওঠে প্রত্যাবর্তনহীন কৃষ্ণ-বিবর। এই অন্ধবিন্দুর গ্রাস দুর্বার হয়ে ওঠার আগে সুভাষ বার বার লিখেই প্রমাণ করেছেন যে সমস্ত লেখাই গভীরতর অর্থে রাজনৈতিক কেননা জীবন-যাপনে প্রতিফলিত সময় ও সমাজের অজস্র চাপ সৃষ্টিশীলভাবে মোকাবিলা করার নামই লেখা। নানা ধরনের চাপ, অনন্বয়, পরস্পর-বিরোধিতা প্রভৃতির মধ্যে কীভাবে ব্যক্ত হয় ইতিহাসের টানাপোড়েন, আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্রমিক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, এইসব লক্ষ না করে জীবন-পর্যবেক্ষণও সম্পূর্ণ হয় না।

সুভাষ ক্রমাগত সময়ের, কখনও উত্তাপময় আর কখনও দহনময় স্বরূপ আপন সংবেদনায় অনুভব করেছিলেন। সময়বোধ তাঁর কাছে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো স্বাভাবিক ছিল। এইজন্যে অবধারিত ভাবে তিনি হয়ে উঠেছিলেন ইতিহাসের মানুষ, রাজনীতির মানুষ। তাঁর কবিতা লেখা তাই চলমান ইতিহাসকেই লেখা। এই প্রেক্ষিতে 'কবিতার বোঝাপড়া'র এই বয়ান তাঁর বিশ্বাস-স্পন্দিত শিল্পিত নির্মাণের জগৎটিকে ভালোভাবে চিনিয়ে দেয় : 'শ্রমিক আন্দোলন করতে করতেই আমার চারপাশের জীবন আমাকে লেখার দিকে ঠেলে দিল।...লেখকের মনে হয়, যে-বস্তু নিয়ে আমি লিখছি, শব্দ যে-বস্তুর প্রতীক সেই বস্তুগুলোকে যদি আমি বদলাতে না পারি, তার চেহারা যদি পাল্টে দিতে না-পারি তাহলে লেখার কোনো মানে হয় না। কিন্তু এও তো ঠিক যে, লেখার ভেতর দিয়েই বস্তুকে বদলানোর খানিকটা আগ্রহ আমরা ফুটিয়ে তুলতে পারি। আমি নিজের জীবনে দেখেছি যে লিখে সত্যিই কাজ হয়, কিন্তু শুধু লেখা নয়, জীবনের সঙ্গে যদি বারবার নিজের সম্পর্ককে হাতে-কলমে ঝালিয়ে নেওয়া না-যায়, তাহলে শব্দগুলো নিছক আওয়াজ হয়ে উঠে লেখককে খানিকটা দমিয়ে দেয়। তখন তার স্রেফ পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে লেখার জগৎ থেকে। আমার মনে হয় যে, বারবার এই লেখার জগৎ এবং কাজের জগৎ, তার মধ্যে আসা যাওয়ার ভেতর দিয়ে আমরা দুটিকেই সজীব রাখতে পারি।'

এই প্রত্যয়কে কি লঘু করে দেখা যায় কখনও? জীবনের সঙ্গে যতদিন নিজের সম্পর্ককে বারবার ঝালিয়ে নিতে পেরেছেন, সুভাষের কবিতায় সৃজনের স্রোত স্তিমিত হয়নি। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অবস্থান যেখানেই হোক, অন্তর্বৃত বিশ্বাস যতদিন অটুট ছিল, চলমান জীবন থেকে রূপান্তরশীল উচ্চারণপুঞ্জ স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে এসেছে তাঁর কবিতায়। লেখার জগৎ ও কাজের জগৎ-এর মধ্যে নিরন্তর আসা-যাওয়াকে কোনও পূর্ব-নির্ধারিত প্রতিবেদনের প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন প্রাতিষ্ঠানিকতায় যদি স্থাপন না করি, তাহলে লেখা ও কাজের সজীবতাকে

অক্ষুণ্ণ রাখার অন্য একটি তাৎপর্য বুঝে নিতে পারি। যতদিন 'জীবনের ডালে' কবির 'নাড়া বাঁধা' ছিল, ততদিন বাচনও নিছক আওয়াজ হয়ে দাঁড়ায়নি এবং বিশ্বাস-হীনতার অবসাদ তাঁকে আক্রমণ করেনি। 'চিরকুট'-এর পর্যায়েই সুভাষের মনে হয়েছিল :

'হে দিগ্‌ভ্রান্ত, আমি তো বুঝি
তোমার জটিল হারানো পথে
বাতি যে ধরব সেটুকু পুঁজি
আলেয়ার নেই।'

(কাব্যজিজ্ঞাসা)

যেভাবে সরাসরি এই পর্যায়ে তিনি 'দিকে দিকে জয়োদ্ধত/জীবনের উদ্দাম ঘোষণা'র কথা (এই আশ্বিনে) লিখেছেন, পরবর্তী স্তরে এই বাক্‌ভঙ্গি পরিত্যক্ত হল। কেননা কবির বাচনিক সূক্ষ্মতা অনেকটা পরিমাণে বিশ্বাসের সংহতি ও সর্বাত্মকতার ওপরও নির্ভর করে। কবির ক্রমিক প্রয়াণ তাঁকে বিবরণের প্রত্যক্ষতা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় ইশারাধর্মী বাচনের কথ্য-ভঙ্গিতে, চিহ্নায়কের গ্রন্থনায়। এই উত্তরণ সম্ভব হয় বিশ্বাস মনন ও অনুভূতির কোষে-কোষে ছড়িয়ে যায় বলে—বহির্বৃত নির্লোকের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই কোনও।

ছয়

'একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ
রাগে রী-রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে
দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা
খুলে খুলে পড়ে'

'অগ্নিকোণ' বইতে 'একটি কবিতার জন্য'-এর এই সূচনায় বুঝতে পারি, আপন বিশ্বাস অটুট রেখেই সুভাষ ক্রমাগত নিজেকে ভাঙছেন। পৌঁছাতে চাইছেন কথ্য বাক্‌ভঙ্গির কাছাকাছি কেননা তিনি মূলত যাদের জন্যে জীবন পুনর্গঠনের কথা লিখছেন, তাদের প্রান্তিক অবস্থানে পৌঁছানোর জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক লিখন-রীতির সাদৃশ্য-সম্ভাবনাও মুছে ফেলতে চান। নতুন কবিতার জন্যে চাই নতুন ভাষা যাতে সেই ভাষায় চিরনবীন বিশ্বাসের সার্থক প্রতিফলন হতে পারে। এই প্রতিফলনে ভাবাদর্শের উত্তাপে শরিক-হওয়া সহযাত্রীরা 'যেন একজন আর একজনের আয়না' হয়ে উঠতে পারে। এই বিশ্বাস এমন যাকে প্রতিনিয়ত পুনর্নির্মাণ করে নিতে হয়। স্বভাবত বিশ্বাস ও ভাবাদর্শের আর-এক নাম ধারাবাহিকতা। এই ধারাবাহিকতার সূত্রে আসে 'ফুল ফুটুক' এবং পরবর্তী সব কাব্যগ্রন্থগুলি। যাত্রার নিরবচ্ছিন্নতায় সুভাষের কবিসত্তাকে চিনে নিতে হয়, অন্য কোনও ভাবে নয়। বুঝে নিতে হয় 'ফুল ফুটুক'-এর পর্যায় থেকে তাঁর বাচনের ক্রমাগত নির্ভার ও শাণিত হয়ে ওঠার রহস্য। 'জয়মণি, স্থির হও' কবিতায় তিনি যে সারাদিন আলোড়িত-করা এক স্বপ্ন এবং দিগন্ত থেকে দিগন্ত জুড়ে বাড়িয়ে দেওয়া হাতের কথা লেখেন—এদের প্রকৃত তাৎপর্য বুঝে নিতে হয় এই উচ্চারণের সামর্থ্যে : 'নিভন্ত

আগুনের চিতায়/জন্ম নেয়/মহিমান্বিত জীবন।' যে-পাঠক তা করবেন না, তিনি প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে মিছিলের ছলনাময়ী মুখের ওপরে বেশি গুরুত্ব আরোপ করবেন কিংবা 'জটায় বাঁধছি/বেদনার আকাশগঙ্গা'য় খুঁজে নেবেন রাজনৈতিক মতবাদ থেকে মুক্তিকামী কবিসত্তার ইঙ্গিত।

কত রকম ভাবে কবি সামাজিক ও ব্যক্তিসত্তার মধ্যে দ্বিরালাপের গ্রন্থনা তৈরি করতে চান, এই কাব্যগ্রন্থেই প্রথম বিপুলভাবে ব্যক্ত হল, 'বাঁয়ে চল, বাঁয়ে', 'সালেমনের মা', 'একটি লড়াকু সংসার', 'গাছে গাছে', 'আগুনের ফুল', 'লাল টুকটুকে দিন', 'ছিটমহল', 'গাজনের গান', 'শুধু ভাঙা নয়', 'সন্ধ্যামণি' এবং অবশ্যই প্রবাদ-প্রতিম 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে আমরা অনেকান্তিক কবিসত্তার যাত্রাকে অনুভব করি। সেই যাত্রা বিশ্বাসের, ভাবাদর্শের, শুদ্ধতার, সংলগ্নতাবোধেরও। অতএব—

'ভেঙো নাকো, শুধু ভাঙা নয়
মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়
.....
আস্ত একটি জীবনকে গড়ে আনা যাক
একটুও যার ভাঙা নয়।'

এই উচ্চারণের যাঁরা অতিভাষ্য করেন, তাঁরা হয়ত 'কাণ্ড দেখ' কবিতার এই দুটি পঙ্‌ক্তিতে আবিষ্কার করবেন রাজনৈতিক ভাবনার 'বন্দিশালা' থেকে মানবিকতাবোধে সুভাষের উত্তরণ : 'ঘোমটা সরিয়ে দেখে ভালবাসা/জীবনের মুখ'। কেন না 'ফুল ফুটুক না ফুটুক' বইতে যে ফুল ফোটানোর প্রসঙ্গ এসেছে, তাকে এসব বিজ্ঞ সমালোচকেরা ভাবতে পারেন রাজনৈতিক মতবাদ থেকে সরে এসে মুক্ত 'জীবন যৌবনের সৌন্দর্যসুকুমার সৃজনশীলতার প্রতীক'-এর দিকে আড়চোখে তাকানো। একটু আগে একেই বলেছি রাজনীতির 'সংক্রমণ-মুক্ত' নব্য যান্ত্রিকতার নিদর্শন। এ সম্পর্কে আর বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন।

'যত দূরেই যাই' বা 'কাল মধুমাস' সংকলনের বেশ কিছু কবিতাই অজস্র পাঠকের স্মৃতিতে চিরস্থায়ী জায়গা করে নিয়েছে। 'ভোর হবে, তাই এত অন্ধকার ব্যথায় মোচড়ায়' (এদিকে) -এর মতো অসংখ্য স্মরণীয় পঙ্‌ক্তির জন্য নয় কেবল; নয় সুভাষের লিখন-শৈলীর ঝকঝকে নিদর্শনের জন্যেও। বরং এই জন্যে যে সময় ও সমাজের সঙ্গে নিরন্তর দ্বিরালাপ আত্ম-প্রসারণের পথে তাঁকে নিয়ে যায় আত্ম-নিরাকরণের পথে নয়। তাই যত দিন গেছে সুভাষের কবিতাবিশ্বে নিবিড়তর হয়ে উঠেছে সমাজ ও প্রত্নকথা, আদিকল্প ও সাম্প্রতিক পরিসরের অনন্য উদ্ভাসন। এই নিবন্ধের অন্যত্র ব্যবহৃত মন্তব্যকে ফিরিয়ে এনে লিখতে পারি, এইসবই তাঁর ভালোবাসার কবিতা, রাজনীতিরও কবিতা কিংবা সব কবিতাই অবিরল আত্মপরিক্রমার, জগৎ সন্ধানেরও। তাই বড়ো স্বাভাবিকভাবে গানের মতো বেজে ওঠে তাঁর এই পঙ্‌ক্তিগুলি :

'আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি
লক্ষ্মীর পা
আমি যত দূরেই যাই।'

এতে সন্দেহ নেই যে 'দিন আসবে', 'এই ভাই', 'ছেলে গেছে বনে', 'একটু পা চালিয়ে ভাই' ইত্যাদি বই থেকে কিংবা 'যা রে কাগজের নৌকো', 'ধর্মের কল' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ থেকে প্রত্যেক পাঠক নিজস্ব অভিরুচি অনুযায়ী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পীসত্তা সম্পর্কে তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। এটাই স্বাভাবিক। কেউ বা তাঁর নির্মাণকলা নিয়ে ভাববেন, কেউ বা তাঁর অনুষঙ্গ প্রয়োগ থেকে শিল্প-সংবিদ সম্পর্কে ধারণা তৈরি করে নেবেন। কিন্তু সবকিছুই যে তাঁর কেন্দ্রীয় বিশ্বাসের সঙ্গে সময় ও পরিসরের বহুমাত্রিক দ্বিবাচনিকতার অনেকান্তিক অভিব্যক্তি : এই মর্মসত্য অনুভব করতে না পারলে খণ্ডিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়কেই শুধু পাব আমরা। তাঁকে এই টুকরো-করে-আনাও যে সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদী যুক্তি-শৃঙ্খলার পরিপোষক, এই সতর্কীকরণ দিয়ে আমরা নিজস্ব পাঠের প্রস্তাবনা করতে পারি আজ।

বানানো তো বটেই, কিন্তু মনেই হয় না বানানো :
সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছড়া
মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছড়া লেখা কথাটা ঠিক নয়। হওয়া উচিত ছড়া কাটা। ছড়া কাটতে হয় মুখে-মুখে। কলমের মুখে নয়। ঠাকুমা দিদিমারা এখনো মুখে-মুখে ছড়া কাটেন। পুরনো ছড়া নয়, নতুন ছড়া। তাঁদেরই বানানো।

আমাদের দেশে—আমাদের দেশে কেন, সব দেশে দেশেই প্রথমে ছিল একটা মৌখিক ঐতিহ্য। ওরাল ট্র্যাডিশন। তারপরে এল লৈখিক ঐতিহ্য। রাইটিং ট্র্যাডিশন। ছড়া, বচন, বাঁধা, হেঁয়ালি প্রভৃতি লোকের মুখে মুখে গজিয়ে উঠত। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত। পুরুষানুক্রমে। যুগ যুগ ধরে। সেসব সৃষ্টি কাগজে কলমে ধরে রাখার চেষ্টা করা হতো না। তাই অধিকাংশই বুদ্বুদের মতো উঠে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যেত।

সংগ্রহ করে রাখার উদ্যম শুরু হয় পশ্চিমেই। ছাপার অক্ষরে। ক্রমশ প্রচার বাড়ে। যে ছড়া নিতান্ত সাময়িক সেটা সময়ের বেড়া পেরিয়ে যায়। যে ছড়া একান্ত স্থানীয় সে ছড়া স্থানের সীমানা উত্তীর্ণ হয়।...

খাঁটি ছড়া কলমের মুখে ফুটলেও তার ধরনটা হবে অশিক্ষিত মানুষের মুখে ফোটা ছড়ার মতো। দেশের মৌখিক ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশ খাবে। সহজেই মুখস্থ হয়ে যাবে। সহজেই মুখে মুখে ঘুরবে।

এই কথাগুলো সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও হ'তে পারতো; যখন আমরা তাঁর ছড়ার বইগুলোর পাতা ওলটাই, মুখে-মুখে ব'লে নিজের কানে শোনবার বা শোনাবার আগে, তখন তো এমন-সব কথা মনে পড়তেই, এবং *মিউয়ের জন্যে ছড়ানো-ছিটোনো*-র বেলায় তো বটেই। কিন্তু ওপরের ওই উদ্ধৃতি আসলে অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা থেকে তোলা, এবং হয়তো আরো তুলতেও হবে, এবং এক্ষুনিই তুলতে হবে তাঁর অন্য একটা লেখা থেকে :

কবিতার মত ছড়ার কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, ছড়া বানাবার। ছড়া হয় আকস্মিক, ইররেগুলার। সেখানে আর্ট আছে, আরটিফিসিয়ালিটির স্থান নেই।

জনসাধারণের কাছ থেকে আমি কত কিছু নিচ্ছি, অনেক কিছু পাচ্ছি, তার বদলে তাদের দিচ্ছি কি? কিছু না। ফলে তাদের উপযুক্ত করে কিছু দেওয়ার জন্যে একপ্রকার জনসাহিত্যের মত আমি ছড়াকে নিলাম। এমন লেখা যা সেল্‌ফ-কনশাস্ না হয়ে পড়ে। যা পড়ার দরকার নেই, শুনলেই সবাই বোঝে, বুঝতে পারে। যাদের আমরা অশিক্ষিত, সাদামাটা ভাবি তাদের কাছেই আমার অনেক শেখার আছে।

লোক ছড়ায় কতদিনের অভিজ্ঞতা, ফোক উইস্‌ডম ধরা থাকে, এছাড়া নানান্ সম্প্রদায়ের ছড়ায় এথ্‌নিক ব্যাপারও থাকে।...

ছড়া হবে ইররেগুলার, হয়তো একটু আনইভেন। বাক্‌পটুতা, কারিকুরি নয়।

কবিতা থেকে ছড়া আলাদা। ছড়াকে কবিতার মধ্যে ঢোকাতে গেলে কবিতাকে ব্যাপ্ত করে নিতে হয়। কবিতা তো যে কোনোভাবেই হয়, যে কোনো ছন্দে, এমন কি গদ্যেও। ছড়ার কিন্তু একটাই ছন্দ, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন ছড়ার ছন্দ *[আধুনিক ছান্দসিকেরা কখনও তাকে বলেছেন স্বরবৃত্ত, কখনও-বা কলাবৃত্ত]*, একটু দুলকি চালে চালে, শাস্ত্রসম্মত একটা নামও আছে তার। ছড়া ঐ ছন্দেই লেখা যায় শুধু।

আমিও ওতেই লিখেছি। হয়তো কোথাও কোথাও অন্যরকম করছি। কিন্তু আসল ছন্দটা ওই। আর ছড়ার মিল। দু সিলেবল হবেই। তিন সিলেবল হলে আরও ভালো হয়। আর শেষে কোনো যুক্তাক্ষর থাকবে না।

না, অন্নদাশঙ্কর যেভাবে ভেবেছেন; সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও যে সবসময় সে-ভাবেই ভাবতেন, তা হয়তো নয়। তবে ভেতরে-ভেতরে কোথাও হয়তো-বা সংযোগ কিংবা সহযোগের একটা সূত্রও ছিলো। না-হ'লে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শেষ দিকে নিশ্চয়ই *মিউ-এর জন্যে* ছড়া অমন অকাতরে ছিটিয়ে দিতেন না। কিন্তু সে তো অনেক দিন হাত মকশো করার পর, নানা ধরনের টিপ্পনী কাটার বা নানা কথার খই ফোটাবার পর। আর কে না জানে সত্যি কথাটা, রবীন্দ্রনাথ যেমনভাবে ব'লে গিয়েছিলেন *খাপছাড়া* বইয়ের একেবারে গোড়াতেই :

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।

লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।

অন্নদাশঙ্কর যে নানা ধরনের ছড়ার ঘাতঘোঁৎ, রকমশকম, চালচলন জানতেন না, তা কিন্তু নয়। লিমেরিক, ক্লেরিহিউ, রূথলেস রাইমস, ব্যালাড, এমনকী *খাপছাড়া, ছড়া, ছড়ার ছবি* জাতীয় বইয়ের লেখাকে অব্দি তিনি ছড়া হিসেবে পাশ মার্ক দেননি, *গল্পসল্প*-র প্রত্যেকটি গল্পের সঙ্গে লগ্ন ছড়াগুলোকেও নয়। এ-সবের মধ্যে, তাঁর মতে, ছিলো "কারিকুরি, বাকপটুতা", সে-সব তাঁর মতে "একজন মহাকবির পাকা হাতের লেখা"।

অশিক্ষিত পটুত্বের কণামাত্র নিদর্শন নেই। চতুর, কৌশলী রচনা। পদে-পদে বাগ্‌বৈদগ্ধ্য। বাগ্‌বিভূতি। নিটোল নিপুণ পদ্য বলতে পারি, কিন্তু ছড়া? আমার ছড়ার ধারণার সঙ্গে মেলে না। রবীন্দ্রনাথ যা-ই লেখেন তা সাহিত্য হয়। কিন্তু লোকসাহিত্য? চাষী, তাঁতী, জেলে, জোলার মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ার মতো রসাত্মক বাক্য? না বোধ হয়।

অন্নদাশঙ্করের জনসাহিত্যের ধারণার এই 'কঠোর' কষ্টিপাথরে ঘসবার পরে রবীন্দ্রনাথও যদি না-উৎরোন, তবে পাশমার্ক জুটবে কার? সুকুমার রায় কিংবা তাঁর পর থেকে যাঁরা বাংলায় ছড়াকে নানানভাবে খেলিয়ে নানান দিকে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন, তাঁদের বুঝি যৎকিঞ্চিৎ গ্রেস দিয়ে পাশ নম্বর জুটিয়ে দেয়া যাবে? সুনির্মল বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অজিত দত্ত, পরিমল রায়, বুদ্ধদেব বসু, সুনীলচন্দ্র সরকার (যাঁর *কালোর বই*-তে ছড়াগুলো কিন্তু ছিলো মামার), অশোকবিজয় রাহা, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিষ্ণু দে, অমিতাভ চৌধুরি, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়—আরো যে কত নাম মনে প'ড়ে যাবে আমাদের—প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, সত্যজিৎ রায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—এঁরাই কি কখনও এই নিক্তিতে মাপলে পাশ ক'রে যেতেন? অন্নদাশঙ্কর অবিশ্যি নিজের অনেক ছড়াকেও ছড়া বলতে নারাজ : তার

ওপর ছড়া যদি সর্বজনীন হয়, সবাইকার মুখে-মুখেই ঘুরতে পারে, তবে তাঁর নিজের ছড়া *সমগ্র*-য় তিনি ছোটোদের বড়োদের ব'লেই বা দু-রকম ভাগ করেছিলেন কেন? অথচ এই কথাটি তিনি বারে-বারে জপিয়ে গেছেন *খুকুমণির ছড়া*-র মধ্যে যা আছে তার তুলনা প্রায় কোথাও মিলবে না।

অন্নদাশঙ্করের সব কথাকেই অবশ্য বেদবাক্য মনে ক'রে ব'সে থাকতে হবে, এমন-কোনো মাথার দিব্যি কেউ কাউকে দেয়নি। কিন্তু তাঁর সব কথার মধ্যে থেকে একটা মোদ্দা কথা বেরিয়ে আসে, আর সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের *মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো* যেখানে একটা জৌলুশে ভরা শিরোপা পেয়ে ব'সে আছে। কোন সুভাষ মুখোপাধ্যায়? না, যাঁর সম্বন্ধে ছড়া কেটেই অমিতাভ চৌধুরি একবার বলেছিলেন :

চুরুট মুখো সুভাষ মুখো
মস্ত বড়ো কবি,
কেশর ফোলা, স্কন্ধে ঝোলা
তরুণ দলের নবি।

২

আমাদের যাদের মগজের মধ্যে তত্ত্বকথার আওড় তেমন পাকায় না, আমরা কিন্তু ওই তথাকথিত *সফিস্টিকেশনের* জন্যে কোনো ছড়াকে নাকচ ক'রে দিইনি। আর এই কথাটাও আমরা মানিনি যে ছড়াকে শুধু একটা গণ্ডিবাঁধা ছকের মধ্যেই পা ফেলতে হবে, একটু পা চালিয়ে গণ্ডির বাইরে চ'লে যাওয়া তার কাছে নিষিদ্ধ।

তুমি আর আমি (পোশাক তফাৎ)
দেখা হল কাল পার্কে
ধার না চাইতে বললে হঠাৎ :
'এ জগতে ভাই কার কে?'

এই আশ্চর্য দার্শনিক সারসত্যটি শুনে কিন্তু আমরা ছেলেবেলা থেকেই চুটিয়ে হেসে এসেছি। এটাকে কবিতা বলবো, না ছড়া বলবো, না খোদ শঙ্করাচার্যের টীকাভাষ্য বলবো—এই নিয়ে আমাদের মগজের মধ্যে কোনো ওস্তাদ জাদুগর এসে শুড়শুড়ি দিয়ে যায়নি। এটা যিনি অনায়াসে, তুড়ি মেরেই, লিখে দিতে পারেন, তিনিই যখন পরে লেখেন :

পুব দখিনে
আগুন বোনে
সাত সাগরের ঝি।

আকাশ কেন
নীলবর্ণ?
সাপে কাটল কি?

সাপে কাটুক, খোপে কাটুক
আছে আমার
মন্ত্র-পড়া ফুঁ—

যা রে
সাপের বিষ
দিয়েন বিয়েন
ফুঃ।

তখন আমরাও তুকতাক ঝাড়ফুঁক মন্ত্রপড়া ওঝার বুলি দিয়েই যে ভিয়েৎনামের সেই সর্বনেশে দিনগুলোর বিষ ঝেড়ে দিতে চেয়েছি, আর অবাক হ'য়ে ভেবেছি ছড়া (না কি কবিতাই) কীই না করতে পারে? তার মুখে কিছুই আটকায় না, একটা আস্ত বিশল্যকরণীই যেন হ'য়ে আছে ছড়া। আর পরক্ষণেই আবার *আমার বাংলা*-র লেখকের কাছ থেকেই পেয়ে গিয়েছি ভালোবাসা বনিবনা মিলমিশের এই সুর :

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে
থাকুক গে পাহারা।

দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।

ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।

কত-যে রকম : *হরে-কর-কমবা*! আর কত-যে সাবলীল, অনায়াস! ব্যঙ্গ থেকে ঘৃণা, দৃপ্ত অভিশাপ; সেখান থেকে ফের সব কচকচি সব বেড়াজাল ডিঙিয়ে গিয়ে আস্থার ভালোবাসার জানানদারি : এক হাতেরই কলম কত রকম যে ভেলকি দেখায়! যেন এই আশ্চর্য কলমের মধ্যে শুধু এক রঙেরই কালি পোরা নেই, আছে হরেক রঙ, হরেক বাহার।

ছড়া যে তার নিজের মধ্যে গন্ধমাদন ধ'রে রাখতে পারে, সমাজ সংসারের সবকিছু, রাজনীতির প্যাঁচাল আর পাঁচালি, ইতিহাসের শোরগোল আর চোরাবালি সে কিন্তু ওই *খুকুমণির ছড়া*-র মধ্য থেকেই আমরা জেনে ফেলেছি, যেদিন সুবুদ্ধি তাঁতির ছেলের কুবুদ্ধি ঘনিয়েছিলো, আর আক্রাবাড়ি দিয়ে সে ব্যাঙের ছা মেরেছিলো। তারপর যে আজিডাঙা কাজিডাঙা, মধ্যেকার ধনেখালিতে হাজার-হাজার ব্যাঙের ছা ঢাল নিয়ে এসে হাজির হবে,

সে তো ইতিহাসই তার খানাবদোষ-এর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলো। একটা ছড়ার বইতে সেই ব্যাঙের ছবিও ছিলো, সেপাইদেরই ছবি; কিন্তু সেই ছড়া পড়তে-পড়তেই তো আমাদের মনে প'ড়ে যায়, কীসের কথা বলা হচ্ছে আসলে, মনে প'ড়ে যায় যে ফরাসি সৈন্যদের তাদের সাজপোশাকের বাহার দেখেই Frog বলা হ'তো। আজনীতি রাজনীতি আরো কত শত নীতি ছুঁলেও যে ছড়ার জাত যায় না, সে-কথাটাও নিশ্চয়ই সেই আদ্যিকাল থেকেই আমরা জেনে এসেছি। ছড়া ছেলেভোলানো মেয়েভোলানো ঘুমপাড়ানি যেমন হয়, তেমনি ঘুম তাড়ানিও হয়, আর সেই ঘুমতাড়ানি ছড়ার একটা ছোট্ট সংকলন বেরিয়েছিলো আমাদের ছোটোবেলায়—যার মধ্যে ছিলো সুকান্ত ভট্টাচার্যদের ছড়া। সুকান্ত ভট্টাচার্যের ছড়ার বইয়ের নামও তো দিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় : মিঠেকড়া।

হঠাৎ দেশে উঠল আওয়াজ হো হো হো হো হো!
চমকে সবাই তাকিয়ে দ্যাখে সিপাহী বিদ্রোহ!

শুধু মিঠে বুলিই নয়, কড়া ধমক। যা রে সাপের বিষ যা দিয়েন বিয়েন ফুঃ। বোঝাপড়া তো শুধু কবিতাই করে না, মিঠেকড়া সব ছড়াও করে, আত্মরক্ষার তাগিদেই করে। আর সেখানে সচেতন হ'লেই যা দোষ কী, সাবধানের তো মার নেই।

কিন্তু 'ছড়া কীসে হয় কে জানে/যে জানে সে জানে, সে-ই জানে!' সে-ই তো লিখতে পারে, কাজির কথা, কাজিয়ার কথা, পাজির কথাও, পাঝাড়ারও কথা। নিজের কথাও সে লিখতে পারে। ঘরের কথাও, পরের কথাও। এবং বুকের ব্যথার কথাও।

এই এক জব্বর মুশকিল। ছড়া নিয়ে লিখতে গেলেই মুখের কথাও কেমন ক'রে যেন ছড়ার ছন্দ পেয়ে যায়। কিন্তু সত্যিকার ছড়ার সঙ্গে যতই সে মিলেজুলে থাকতে চাক না কেন, ছড়ায় শলাপরামর্শর ধরন একটু আলাদাই। মুখের কথা হ'লেই যদি ছড়া হ'তো, তাহলে তো কোনো কথাই ছিলো না। ছড়া সবখানে ছড়িয়ে থাকতো, শুধু কুড়িয়ে আনার ওয়াস্তা। শুনে মনে হয়, দেখেও মনে হয়, কোনো কারিকুরি কারুকিরি, কোনো কারিগরিই বুঝি নেই। যেন ফুশমন্তরেই সব হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু তা তো নয়—কলকব্জা খুলে সাফ করতে লেগে গেলেই দেখা যায়, আরে ব্বাস, এর মধ্যেও এত কাণ্ড ছিলো। শুধু একটু-আধটু কথার খেলাই নয়, কথার আগলও বটে। কোনো খেলাই তো নিয়মকানুন বাদ দিয়ে হয় না। আঁটঘাট বেঁধে, নিজের নিয়মকানুন নিজেই তৈরি ক'রে, তার মধ্যেই সে কারদানি দেখায়। আর একেক ছড়ার একেক সাজ, একেক কথার একেক ধাঁচ, এবং নাচও।

খড় খড়িয়ে
ধড় গড়িয়ে
ঘুরে বেড়াই
গাব্দা গোব্দা
রং-চটা এক
কাঠের লাট্টু।

এই রয়েছি, পরক্ষণেই চলে গেলাম

কোথায় গেলাম? কোথায় গেলাম?
কী যেন নাম
দাঁড়ান ভাবি—
টিম বাক্‌টু।
আমি একজন আদমি রইস।
রাস্তা মোকাম
সড়ক সরাই।
আমিই সওয়ার
আমিই সহিস
থাকার মধ্যে একটা শুধু
ছোট্ট টাট্টু।
চাবুক হাতে তারই পিঠে
তামাম মুলুক দাবড়ে বেড়াই
কোথায় তেতো কোথায় মিঠে
যার কাছে যা আছে তাতে
ভাগ বসাতে—
জিভের আগায় চেখে ফেলতে
খুব বেশি নয়—
একটু আধটু।

এই ছড়ার ছাঁচ কোথায় ছিলো? আগে থেকেই মজুত ছিলো—মগজে কিংবা কোনো গুদোম ঘরে? নাকি লিখতে-লিখতেই—চলতে-চলতেই—সে তৈরি ক'রে নিয়েছে নিজের রং ঢং, তন্ত্রমন্ত্র, ছড়ার ছন্দ? নিজে-নিজেই হ'য়ে গেছে? না কি শুরু হ'য়ে যাবার পর, মুখের কথাটি কলমের ডগায় হুড়মুড় ক'রে আসার পর, তার নিজেরই গড়া-সব কড়া আইনকানুন তাকে একটু-আধটু দাবড়ে দিয়ে সজুত ক'রে রেখেছে? মজুতদারি নয়, সজুতদারি—হাত ধ'রে-ধ'রে সামলে-শুমলে পথ দেখিয়ে নিয়ে-যাওয়া; একটু পা ফস্‌কে গেলেই তো দফা রফা—পা পিছলে তো আলুর দমই হয়। ছড়া, সহজ, সাবলীল, মজার, কিংবা তেমন মজারও নয়—কিন্তু প্রতিটি ছড়াই তার নিজের মাপকাঠি তৈরি করে, নিজেকে দাড়িপাল্লায় চড়ায়। একদিন দুম ক'রে আচমকা একটা দারুণ ছড়া লিখে ফেললেই বুঝি ছড়া কাটার সবকিছু নখের ডগায় নখের আয়নায় এসে গেলো? প্রতিটি ছড়াই নতুন—আর প্রত্যেকবারই নতুন ক'রে যুদ্ধ—কথার সাথে, ভাবের সাথে, কথারই মারপ্যাঁচের সাথে, আর প্রত্যেকবারই ছড়া হয় সিন্ধুবাদের কাঁধ থেকে বাড়তি বোঝা ঝেড়ে ফেলবারও লড়াই। কোনো ম্যাজিকওলা যখন তার হাতসাফাইয়ের খেলা দেখায়, তখন কাউকে সে কি টের পেতে দেয় কী তার কারিগরি, কী তার কৃৎকৌশল? অথচ একবার সে যখন ব'লে দেয় কীভাবে সে খেলা দেখিয়েছে, তখন মনে হয়, ও মা এ তো ভারি সহজ। কোনো পকেটমারই কি কখনও তার হাতের কেরামতি কাউকে জানান দিতে

চায়? লোকে জানলেই যে তার কপালে থাকবে শুধু আড়ং ধোলাই! লুকিয়ে রাখার কৌশলটাই শেষ অব্দি কাজে লাগে—চোখে আঙুল দাদা হ'য়ে থাকাটা নয়!

কানে শুনতে সহজ, চোখে দেখতে সহজ। কিন্তু কঠিনস্য কঠিন কাজ। ভেবে-ভেবেও কখনও যে তার কূল পাওয়া যাবে, এমন মোটেই মনে হয় না।

৩

সেই কবেই তো রবীন্দ্রনাথই আমাদের শিখিয়েছিলেন কেমন ক'রে কেউ পড়বে লৌকিক ছড়া, বচন, কিংবদন্তি : *লোকসাহিত্য* বইতে তিনিই তো পই-পই ক'রে আমাদের বুঝিয়েছিলেন "ছেলেভুলানো ছড়া" তো কেবল শিশুসেব্যই নয় : বালতোষিনী সেইসব ছড়ায় সমাজ সংসার পরিবেশ প্রতিবেশ ছায়া ফেলে গিয়েছে, কীভাবে তারই মধ্যে প্রতিধ্বনিত হ'য়ে উঠেছে আমাদের ব্যথা-বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্যান-ধারণা তা তিনি যেমনভাবে খুলে দেখিয়েছিলেন, তা নিছক সারগর্ভ তাত্ত্বিক আলোচনাই হ'য়ে ওঠেনি (সে তো সে ছিলোই), বরং হ'য়ে উঠেছিলো ছড়ারই সৃজনশীল অনুসরণ। কোনখানে যে উদ্ধৃত ছড়া শেষ হ'তো আর কোনখানে শুরু হ'তো আলোচনার (সে-আলোচনা তো আমাদের খুলে-খুলে সব দেখিয়ে দেবার ব্যাপারই ছিলো), তা-ই অনেক সময় বোঝা যেতো না। ছেলেভোলানো ছড়া ছেলেদের কতটা ভোলাতে পেরেছে কে জানে, খোকা ঘুমুলে পাড়া জুড়োয় বটে কিন্তু বর্গির হাঙ্গামাও কেমন ক'রে তারপর সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ে; সে যে কেমন ক'রে ঘুমপাড়ানি গানেরই ধুয়ো ধরে, সে-সব কথার মধ্যে ইশারা-ইঙ্গিতে আরো কত কথাই বলা হ'য়ে যেতো, তা কিন্তু খুব-একটা ছেলে ভোলানো ব্যাপারই ছিলো না। আরো নিশ্চয়ই অনেকেরই মনে প'ড়ে যাবে *খুকুমণির ছড়া* বইয়ে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর লেখার কথাও। কে জানে কবে থেকে লোকে মুখে-মুখে ছড়া কেটে আসছিলো, কিন্তু যখন সেদিকটায় নজর গিয়ে পড়লো, সংগ্রহ সম্পাদন সঞ্চয়ন সংকলনের কাজ চলতে লাগলো, তখনই হয়তো বাংলা ছড়ার একটা নতুন জন্ম ঘ'টে গিয়েছিলো; সে পুরোনো ছড়াকে অস্বীকার করেনি, কিন্তু তাকে আত্মস্থ ক'রে নিয়েও নতুনভাবে তা-ই নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলো, নতুন-নতুন মৌলিক ছড়াও বুনে যেতে শুরু করেছিলো। ছোটোদের বড়োদের কোনো ভাগ করেনি কেউ জেনেবুঝে, কিন্তু তবু কেমন ক'রে যেন ছোটোদের সব মাসিকপত্রের চাহিদা মেটাবার জন্যেই ছোটোদের পাতেই সে-সব পরিবেষণ করা হচ্ছিলো। ছেলে ভোলানো ছড়া গাইতেন মা ঠাকুমা ঠানদি দিদিমারা—তাঁরা তো বড়োই, তবু তাঁদের মনে আর মুখে সে-সব টাটকা ও তাজা নতুন প্রাণ পেয়ে যেতো। আর ছোটোদের কাছে তা প্রায় নতুন হ'য়ে এসেই পৌঁছুতো।

অনেকদিন আগে আমি একটা মস্ত মোটা বই দেখে বোমকে গিয়েছিলুম, *অ্যানোটেটেড মাদার গুজ*, নার্সারি রাইম মাদার গুজ রাইমের সে-এক ইলাহি সংকলন আর তার সঙ্গে ছিলো ছবি, কিন্তু আর যা ছিলো সেটাই আমাকে টেনেছিলো বেশি—প্রায় প্রতিটি ছড়ার ব্যাখ্যা, কেন কখন কোন উপলক্ষে কী কথা বলতে সেই ছড়া লেখা হয়েছিলো—নার্সারি রাইম বটে, কিন্তু সেটা নেহাৎই নার্সারির বইই ছিলো না। বড়োদের পড়বার ও ভাববার

অনেক উপাদান তাতে আশ্চর্যভাবে ছড়িয়ে ছিলো। ঠিক এমনিভাবেই আরো-একটা বই বেরিয়েছিলো, *অ্যানোটেটেড অ্যালিস,* তাতে লুইস ক্যারলের অ্যালিস কাহিনী দুটোর শুলুকসন্ধান সবই ছিলো, আর ছিলো অ্যালিসের কাহিনীর মধ্যে যে-সব ছড়া বা লালিকা ছিলো তার খতিয়ান ও ব্যাখ্যা।

এই কথাগুলো আমার এখন এই জন্যেই মনে প'ড়ে যাচ্ছে যে রবীন্দ্রনাথ, রামেন্দ্রসুন্দর কিংবা যোগীন্দ্রনাথ সত্ত্বেও কখনও সামনে ছড়াগুলো সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে তেমনতর কোনোকিছুই আমাদের দেশে লেখা হয়নি। আর সে-সব কাহন যদি না-ই লেখা হয় তবে আমরা ভালো ক'রে বুঝবোই বা কী ক'রে, রবীন্দ্রনাথ সুকুমার রায় থেকে শুরু ক'রে যাঁরা সব ছড়া কেটে এসেছেন, তাঁদের ছড়া কেমনতর, কতটা অভিনব, কতটা নাম-না-জানা ছড়াকারদের চাইতে আলাদা, সেই যাঁদের ছড়ার জন্যে অন্নদাশঙ্কর বারে-বারে তাঁর টানের কথা ব'লে এসেছেন।

আর এই অব্দি ভেবে আসার পরই নতুন ক'রে আমাদের মনে প'ড়ে যায় *মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো* সব ছড়াগুলো। সে-বই এমনকী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আগেকার সব ছড়ার চাইতে অন্যরকম। কিন্তু আগেকার ছড়ায় কি সত্যি-সত্যিই এই পরিণতির কোনো ইঙ্গিতই ছিলো না। এ-বইয়ের ব্লার্বে, মলাটের পাতায়, প্রকাশক যা বলেছিলেন, তা একটু মনে ক'রে নেয়া যাক :

> গত চার দশক ধরে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বহু বিপ্লব ঘটিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কখনো বিষয়ে কখনো প্রকরণে। এবার তিনি হাত বাড়িয়েছেন ছড়ার রাজ্যে। এবং প্রথম [অবশ্য প্রথম ছড়া নয় এ-সব] আর্বিভাবেই এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটালেন—**মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো** বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংযোজন হয়ে থাকবে। থাকবে, কেননা, ছড়ার রাজ্যে নতুন এক ভূখণ্ড যুক্ত করলেন তিনি। প্রাচীন প্রবাদের মতো অমোঘ ও স্মরণীয়, সংহত ও মিলদার, টাটকা ও সাম্প্রতিক এই-সব ছড়া একবার পড়লেই বুকে গেঁথে যায়। গঠনে দারুণ মজা করেছেন তিনি। দৈনন্দিন জীবন থেকে সমধর্মী কিছু শব্দ বেছে নিয়েছেন, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন জুতসই একেকটি পংক্তি। যেমন, **'চা কফি, কোকো/এই বাস রোখো', 'ক্ষীর রাবড়ি পায়েস/খাটুনির পর আয়েশ,' 'কেষ্টনগর, মেদ্‌নিপুর/ওই দোকানটা রং-রিপুর,' 'সিঁড়ি রেলিং আলসে/দাদুর চোখে চালশে,' 'আমড়া তেঁতুল জলপাই/গরম দুধে বল পাই।'** এমন অজস্র অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত ছড়ায় ঠাসা এই বই।

৬৪টা এ-রকম হিরের টুকরো দিয়ে ঝলমল ক'রে-ওঠা এই বই কিন্তু শুধু ছন্দমিলের খোশখেয়ালেই কথা সাজায়নি, কথার মধ্যে দিয়েই ছুঁয়ে গেছে জীবন, তার দৈনন্দিন, প্রাণের কত হেলদোল, পথের যত তালগোল, আবিষ্কার ও উন্মোচন, ভালোবাসার মনমাতন। টুকিটাকি জুড়ে-জুড়ে কাটুমকুটুমের খেলা করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ, হাতে কলমে, হাত সাফাইয়ে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ওই টুকিটাকিগুলো দেখে মনে হয় এর মধ্যে আবার কারিকুরি কী, এ তো খুব সহজ, কথা সাজালেই হ'য়ে যায়, কথার দোল আর মুখের বোল। কিন্তু কাগজে কলম ছুঁইয়ে দিলেই আপনা থেকেই হয় কি? তাহ'লে লিখুন তো দেখি কেউ :

ভোলা মহাশোল কালবাউশ।
আমনের আগে ওঠে আউশ।

খরশল্লা তপ্‌সে।
চুম্‌রে নিচ্ছে গোঁফ সে॥

সরল পুঁটি মৌরলা।
রাজার ছিল চৌদোলা॥

গুলে বেলে চ্যাং বাচা।
বেঞ্চিতে ব'সে ঠ্যাং নাচা॥

চিংড়ি পাঁকাল পোনা খড়্‌কে।
যা পিছল, যায় পা হড়্‌কে॥

ছিপ হাতে ক'রে জলের ধারে শান্ত হ'য়ে ব'সে থাকতে হয় কখন ফাতনা ন'ড়ে ওঠে, কখন কিছু ঘাই মারে তা দেখবার জন্যে, ব'সে থাকতে জানাটাই আসল, সে না-জানলে বর্শেলের সব কাজটাই বিড়ম্বনা হ'য়ে উঠতে পারে। আর বর্শেলের কাজ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেয়ে ভালো আর কে জানতেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব'সে থেকেও কোনো-কোনোদিন তো ছিপে কিছু ওঠেইনি, কিন্তু ছিপ হাতে ক'রে ঠায় ব'সে থাকতে তাঁর কিন্তু কোনোদিনও আটকায়নি।

ছড়ার সব সহজিয়া কাজের হাল-হদিশ বাৎলাতে গিয়ে তিনি নিজেই তো একবার বলেছিলেন :

'যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে ফুল ফোটাতে।'

ছড়ার প্রসঙ্গে কথাগুলো মনে না এসে পারে না। পদ্য লিখতে পারলেই যে ছড়া লেখা যায় না, প্রাণপণ চেষ্টা করে হাড়ে হাড়ে আমি তা বুঝেছি। ছন্দের কেরামতি, মিলের বাহাদুরি—এ সবই বাইরের চটক। ও দিয়ে ভবি ভোলানো যায় না।

ধ'রে বেঁধে ছড়া হয় না। ছড়ায় নিঃশর্তে নিজেকে ছেড়ে দিতে হয়।

আর তার ফলেই তো আমাদের মনে হয় :

যতই ভাষার কারসাজি থাক, যতই তা হোক শানানো,
পড়লে কিন্তু মনেই হয় না এ-সব আদৌ বানানো।
সুভাষদার ছড়া
যদিও মনগড়া,
অথচ তার সুরটা বুকের গভীর থেকে আনানো॥

পদাতিক হয়ে বাংলার পথে ঘাটে : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গৌতম নিয়োগী

১৩৫৮ বঙ্গাব্দ। ইংরেজি ১৯৫১ সনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বই বেরুলো 'আমার বাংলা'। এগারো বছর আগেই বেরিয়েছে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'পদাতিক'। পদাতিক শব্দটি যদি তাঁর প্রিয় শব্দ এবং আত্মপরিচয়-জ্ঞাপক হয়ে থাকে তাহলে এর চেয়ে সত্যভাষণ আর কিছু হতে পারে না। বরাবরই তিনি পদাতিক, পথে চলতে চলতেই দেশকে জানা, দেশকে জানতে জানতেই মানুষকে ভালোবাসা। আজীবন। সেই ভালোবাসার পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর নানা গদ্যকর্মে। 'আমার বাংলা'য় তার সূত্রপাত। আমৃত্যু সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা ও বাঙালির আপন বান্ধব, আবার, তাঁরই রচনায় বারে বারে ফিরে এসেছে চিরকালীন বাংলার এক নিখুঁত ছবি। সেই নিয়ে দু'চার কথা বলা যেতে পারে এই রচনায়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আমরা বাঙালিরা কবি বলেই জানি ও মানি, বরাবরই। তাঁর প্রাথমিক পরিচয় অবশ্যই কবির, 'পদাতিক' নামে প্রথম পদ্য-গ্রন্থ প্রকাশের (১৯৪০) কাল থেকে প্রয়াণ পর্যন্ত সেই কবির চোখেও ধরা পড়েছে বাংলা ও বাঙালি, নানা সময়কার, নানা মাপের, নানা অবস্থার। তবু পদ্য নয়, গদ্যকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই যেন আমাদের এই রচনায় আমাদের বিশ্লেষণের লক্ষ্য। যদিও প্রধানত কবি হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর ঐতিহাসিক স্থান বলেই হয়তো গদ্যকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আমরা তেমন মর্যাদা দিই না, তবু অজানা নয় যে তাঁর কলমে উঠে এসেছে বহু ধরনের গদ্য : উপন্যাস, আত্মজীবনী, ভ্রমণ, সাংবাদিকতা, চিঠিপত্র, রোজনামচা, গল্প, তত্ত্বনিবন্ধ, কিশোর সাহিত্য, অনুবাদ। গদ্যকার সুভাষ মুখোপাধ্যায় যথেষ্ট উপযুক্ত পৃথক মর্যাদা একদম পাননি, তা-ও নয়। অন্তত প্রয়াত সুবীর রায়চৌধুরীর সম্পাদনা-পরিকল্পনায় এবং পরে অমিয় দেব-এর সম্পাদনাকৃত্যে ও প্রণব বিশ্বাসের আনুকূল্যে 'দে'জ পাবলিশিং' থেকে যে দু'খণ্ড গদ্যসংগ্রহ প্রকাশিত তাতেই আমরা খুশি। পদাতিক হয়ে বাংলার পথে মাঠে-ঘাটে ঘোরা সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে যে বাংলা দেশকে চিনিয়ে দেন, তা কিন্তু গদ্যেই। সেই 'আমার বাংলা' নামক অর্থবহ বই বেরুনোর সময় থেকেই, যার কথা এই রচনার গোড়াতেই উল্লেখ করেছি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গ-দর্শন শুরু হয়েছিল নিশ্চয়ই ছোটোবেলা থেকেই কিন্তু তা সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে। কিন্তু চল্লিশের দশকে যে তা ব্যাপ্ত ও প্রসারিত হলো তারও এক পটভূমি আছে। পদাতিক সুভাষ তখন কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় কর্মী। ১৯৪২-৪৩ সন। তৎকালীন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' কাগজেই প্রথম গদ্য লিখতে শুরু করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাকে এ কাজে ঠেলে দিয়েছিলেন প্রধান উৎসাহদাতা সোমনাথ লাহিড়ী। পরে তারই বন্ধু দার্শনিক-অধ্যাপক ও বামপন্থী ভাবুক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লিখিয়ে নেন, ছোটোদের পত্রিকা 'রংমশাল'-এর

জন্য বেশ কয়েকটি রচনা। ফলে একসময় যা ছিল জনযুদ্ধ পত্রিকার সংবাদ-নিবন্ধ বা রিপোর্টাজ, তাই হয়ে উঠল বাংলা ও বাঙালির আটপৌরে জীবনকে নিয়ে অসামান্য সব রমণীয় রচনা।'আমার বাংলা' নামের সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গদ্যগ্রন্থের এইভাবেই সূত্রপাত।

নিজের 'গদ্যসংগ্রহ'-এর প্রথম খণ্ড যখন বেরুলো, তখন তার এক অতিসংক্ষিপ্ত মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, যাতে তিনি জানিয়েছিলেন "সাহিত্যে আমার হাতেখড়ি হয় গদ্য দিয়ে। 'ধরে ভদ্র' বলে বাংলায় একটা কথা আছে। অনুরাগীদের মন রাখতে গদ্য ছেড়ে যখন পদ্য ধরলাম, তখন গদ্য আমাকে ছেড়ে চলে গেল।" আবার 'কবিতার বোঝাপড়া' বইতেও এক সাক্ষাৎকারে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন : 'আমার লেখা শুরু হয়েছিল গদ্য দিয়ে।' তবে পদ্যের কলম প্রিয় সাথী হলেও গদ্য তাঁকে যেমন কোনোদিনই ছেড়ে যায়নি, তেমনি পদাতিক হয়ে ঘুরে ঘুরে বাংলাকে দেখা এবং তা আমাদের মতন পাঠকদের দেখানোর কাজও তিনি কখনও ছেড়ে দেননি।

গদ্যকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই আমার বিবেচনায় এই চিরকালীন বাংলা দেশের ছবি চেনানো। দেখার চোখই বা ক'জনের থাকে? দেখানোর মতন ভাষাই বা ক'জনের থাকে? তিনি যে লিখেছিলেন, "আমার সবই ঘুরে বেড়িয়ে চোখে দেখে কানে শুনে লেখা"—সে-বিষয়ে আমার মনে অন্তত বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তাঁর লেখার একজন নিষ্ঠাবান পাঠক বা তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুবাদেই এই মত পোষণ করি। আমাদের জীবনবোধের উৎস কী? অন্যতম উৎস যেমন আদর্শ, তেমনি এ-ও তো সত্যি যে দেশকে ও দেশের মানুষকে জানা, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করাও এক উৎস। সেই উৎসের সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন জীবনীশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আবার, সন্ধান আমাদের জানিয়েছেনও।

আমি সাহিত্য সমালোচক নই, সাহিত্য-রসিক মাত্র। সবিনয়ে জানিয়ে রাখি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটি বৈশিষ্ট্য তাকে বিশিষ্টতা দিয়েছে বলে আমার মনে হয়; তা হলো সাধারণ মানুষের মুখের কথা, আটপৌরে ব্যবহারিক বা চলিত শব্দ পদ্যে তুলে আনা। তেমনি গদ্যশিল্পী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সিরিজের চলতি ইডিয়মে একেবারে গল্পের ঢঙে লেখা রচনাগুলির মধ্যেও কি সাধারণ মানুষের মুখের কথাই পাই না? পাই। আর পাই বলেই পদাতিকের অন্য এক রূপ যেন ধরা পড়ে আমাদের সামনে। তিনি যেমন কবি, তেমনি বাংলা ও বাঙালি জীবন-সন্ধানীরূপেই আমাদের আত্মীয় হয়ে ওঠেন। এইভাবেই চিরন্তন বাংলা দেশের, যার মধ্যে এক ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে, তার আত্মীয় হয়ে ওঠেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় আর সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন আমাদের কাছের মানুষ। তিনি আমাদের মিলিয়ে দেন, কতকালের চেনা বাংলা, আমাদের এই বাংলা দেশ, তার রূপ-রস-গন্ধ নিয়ে আমাদের সামনে এসে হাজির হয়।

'আমার বাংলা' এই ধরনের এগারোটি রেখাচিত্রের সমষ্টি। 'গারো পাহাড়ের নীচে', 'ছাতির বদলে হাতী', 'দীপঙ্করের দেশে' একেবারে সেই দিকে যা ছিল ভাগ-না-হওয়া বাংলার একপ্রান্তে, কোনাকুনি উল্টোপ্রান্তের চিত্র 'বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ', 'শালমহুয়ার ছায়ায়',

'পাতালপুরীর রাজ্যে', রয়েছে খোদ রাজধানীকে নিয়ে 'কলের কলকাতা', কলকাতার কাছের এলাকা 'জগদ্দল পাথর'। আবার তিনি পাড়ি দেন একেবারে দক্ষিণপূর্ব কোণে—'চাঁটগায়ের কবিওয়ালা' রচনায়, পরক্ষণেই 'মেঘের গায়ে জেলখানা' রচনায় আমরা চলে যাই উত্তর সীমানায়। শেষে 'হাত বাড়াও' রচনায় যেন দু'এক পাতার মধ্যেই গোটা বাংলাকেই হাজির করিয়ে দেন। সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো সুভাষ বলেন, 'এই আসমুদ্রহিমাচল আমার বাংলা—পর্বত যার প্রহরী, সমুদ্র যার পরিখা।'

না, শুধু এই বাংলার প্রকৃতি আর ভূগোলকে তিনি হাজির করিয়ে যদি তিনি ক্ষান্ত থাকতেন, তাহলে কি আমরা সন্তুষ্ট হতাম! তাই তিনি হাজির করান এমন এক-একটা ছবি, এমন এক-একটা চরিত্র যা দেখে আমাদের চোখ চিক্ চিক্ করতে থাকে। যেমন 'হাত বাড়াও' রচনায় এক বারো-তেরো বছরের উলঙ্গ ছেলের রাস্তায় খুঁটে খেতে চাওয়া খাবারের উচ্ছিষ্টের জন্য থেকে যে দেহ বাঁকিয়ে চতুষ্পদ করে ফেলেছে নিজেকে, তাঁর জ্বলন্ত চোখের সামনে থাকতে পারেননি লেখক। আমরা নিঃশব্দে ভাবি। কখন যেন আমাদের গাল বেয়ে জলের ধারা। ইতিহাসে তেরোশো পঞ্চাশের জ্বলন্ত আর মর্মস্পর্শী দলিল এর চেয়ে বেশি নিখুঁত খুব বেশি আছে কি? কিংবা 'গারো পাহাড়ের নীচে' রচনায় ময়মনসিংহের কথা বললেও বলেননি সেই সরল উপজাতীয় মানুষটির কথা, যার নাম দাফা। যার কথা সুভাষ লিখেছেন 'আমার বাংলা'র মুখবন্ধে : "শীতের হাওয়া দিলে আজও দাফার কথা মনে পড়ে। মাটির ঘরে কাঁথা গায়ে দিয়ে কাঁপছি। কপাটহীন জানালা দরজা দিয়ে দেখছি জ্যোৎস্না গায়ে মেখে দূরে দাঁড়িয়ে আছে গারো পাহাড়। আমি তক্তাপোষে আর দাফা মেজেতে। ঠাণ্ডায় দুজনেরই চোখে ঘুম নেই।" সেই দাফা যে বন্দুকের বিরুদ্ধে লড়াইতে বুকে গুলি লেগে মারা গিয়েছিল, যে 'দাফা মরতে চায়নি, চেয়েছিল মানুষের মত মাথা উঁচু করে বাঁচতে।' আমাদের চোখ আবার ভিজে ওঠে। সেখানেও বাংলার চিরকালীন সাথী দারিদ্র্য কিংবা শাশ্বত এক প্রতিবাদী মানুষের নিখুঁত ছবি যেন উপহার দেন লেখক।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'সারা বাংলাদেশই সেদিন এমনি ছিল'। সেদিন বলতে চল্লিশের দশকের বাংলা, উত্তাল বাংলা, দেশ ভাগ-না-হওয়া বাংলা; তারপর পঞ্চাশ-ষাট-সত্তরের বাংলা ও বাঙালিকেও তিনি সন্ধান করেছেন, দেখেছেন, তুলে এনেছেন। পরিবর্তমান সমাজজীবনের ছবিও পাচ্ছি। স্পন্দিত জীবন। আমরা অবাক হয়ে দেখি কী করে তাঁর মনের রঙের সঙ্গে আমাদের মনের রং মিশে আলাদা একটা রং হয়ে যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা সম্পর্কিত রচনাগুলির কলমই একই সঙ্গে যেন ক্যামেরা।

* * *

ক্যামেরা নিয়ে অবশ্যই একজন গিয়েছিলেন সঙ্গে।

অনিল ভঞ্জ সম্পাদিত 'সপ্তাহ' পত্রিকায় ১৩৯৮-র শারদীয়া সংখ্যায় সুভাষদার স্মৃতিচারণে পাচ্ছি :

"...আমাকে যেতে হবে আবার সেই বর্ধমান। না, এবার আর ধোপার গাধা হয়ে নয়।

বন্যার খবর আনতে। কাগজের রিপোর্টার হয়ে। সঙ্গে যাবে টুনুদা। পার্টির ডাকসাইটে ফটোগ্রাফার সুনীল জানা। শুনে আমি আহ্লাদে আটখানা। বলতে গেলে আমার ভ্রমণের পালা এই দিয়ে শুরু।"

১৩৫৮ বঙ্গাব্দে 'আমার বাংলা' যখন প্রথম বই হয়ে বেরুলো, ১১/বি চৌরঙ্গী টেরাস, কলকাতা ২০-এর ঈগল পাবলিশার্স থেকে তখন সেই বইতে সুনীল জানার তোলা তেরোটি ছবি ছিল; তৃতীয় সংস্করণ থেকে (১৩৬৮) ছবিগুলি বাদ। প্রথম সংস্করণে ছিল খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদ, চিত্তপ্রসাদের আঁকা ছবির অলংকরণ। তবু দু-টাকা দামের ওই বইতে এসব নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখাই যেন বাংলার জনজীবনের ছবি।

সুভাষদা তাঁর স্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে যে বর্ধমান যাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন, তা 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার লেখা। বেরিয়েছিল ১৯৪৩-এর ২৮ জুলাই 'বর্দ্ধমানের ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার নরনারী বিপন্ন' শিরোনামে। ১৯৪২-এর ১৫ জুলাই থেকে 'জনযুদ্ধ'তে গদ্য লিখতে শুরু করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তখন থেকে বাংলার পথে-ঘাটে তাঁর 'ভ্রমণের পালা শুরু'। বর্ধমানের বন্যার প্রতিবেদনটিই 'আমার বাংলা'য় রূপ পেল 'বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ' রচনাটিতে।

একুশ বছর বয়সের আগেই রাস্তায় নেমে যিনি হাঁটতে শুরু করেন, মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতেই যাঁর আনন্দ, তিনি একুশ বছরে প্রথম বইয়ের নাম রাখবেন 'পদাতিক' তা-তে আশ্চর্য নেই, এমনকি, চুরাশি বছর বয়সে চলে গেলেন চিরদিনের মতো যেন হাঁটতে হাঁটতেই। এমনকি, তাঁর কাছে 'রাস্তাই, একমাত্র রাস্তা' মনে হওয়াও স্বাভাবিক। পথ চলাতেই মাঝে মাঝে তাঁর বাঁক-ফেরা, হাঁটতে হাঁটতেই দেশটাকে চিনে নেওয়া। দেশের মাটিকে সোনা বলে ভাবা। আর এই সূত্রেই বাংলা ও বাঙালির চিরকালীন রূপ চোখে দেখে পাঠকদের জানানো।

অনেক পরে, ১৩৭২ সালে 'বাংলা দর্শনের আর এক ঝাঁপি 'ডাকবাংলার ডায়েরি' পেয়ে আমরা যারপরনাই মুগ্ধ। এ বইয়ের কথা পরে। শুধু এখানে এইটুকু মনে করিয়ে দিচ্ছি পাঠকদের যে ওই বই উৎসর্গ করেছিলেন এমনভাবে—'যার পাল্লায় পড়ে 'আমার বাংলা' লিখেছিলাম সেই বন্ধু দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে'। তেমনি 'আমার বাংলা' বই হয়ে বেরুবার আগে সুভাষদা যখন জেলে ছিলেন, তখন কারারুদ্ধ ছিলেন তাঁর আর এক বন্ধু, যাকেই তিনি প্রথম গদ্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করলেন 'বাংলাদেশের জেলখানায় বন্দী কাশ্মীরের ছেলে জলিমোহন কলকে' বলে। যাক্ এসব তথ্যের কচকচিতে গিয়ে আমাদের কাজ নেই, বরং চোখ ফেরাই 'আমার বাংলা'র প্রসঙ্গে সুভাষদার বঙ্গদর্শনের দিকে। তাকিয়েই পণ্ডিত অথচ রসিক আচার্য নীহাররঞ্জন রায়ের 'ভূমিকা'য় উচ্চারিত সেই চমৎকার কথাগুলি :

> তারপর সুভাষ পদাতিক হয়ে বাংলার পথে ঘাটে মাঠে বেরিয়েছিলেন দেশের অগণিত মানুষের পরিচয় নেবার জন্য, তাদের দুঃখসুখ, আনন্দবেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণের জন্য, নিজের যথার্থ পরিচয় পাবার জন্য। সে-সুদীর্ঘ কয়েকটি বৎসর সুভাষের অজ্ঞাতবাস, নাগর সাহিত্যের মুখর

> কোলাহল থেকে আত্মনির্বাসন। এ-অজ্ঞাতবাস, এ-নির্বাসন ব্যর্থ হয়নি; পদাতিক জীবন তাঁকে নতুন ঐশ্বর্যের সন্ধান দিয়েছে, দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয় সাধন করিয়েছে। এই তো যথার্থ আত্মপরিচয়।

আমাদের মনে পড়ে যায়, আচার্য নীহাররঞ্জনও একসময় এরকমভাবেই অবিভক্ত বাংলার জেলায় জেলায় ঘুরে বেড়িয়ে নদী-নালা পেরিয়ে, চাষির বাড়িতে ঘুমিয়ে, ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি দেখেছিলেন, তাই 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' লেখার প্রেরণা পেয়েছেন, যদিও বইয়ের উপাদান সব প্রামাণিক আকর। তাই অভিজ্ঞ নীহাররঞ্জন বুঝতে পারেন, 'দেশকে ও দেশের মানুষকে জানা, হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করা—এর চেয়ে গভীরতর জীবন-উৎসের কথা আমি জানিনে।' আমাদের সৌভাগ্য সুভাষদাও সেই উৎসের সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তার হদিশ আমাদের দিয়েছিলেন।

'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় যা ছিল রিপোর্টাজ, তাই 'রংমশাল'-এ হয়ে গেল পদাতিক কাব্যময় গদ্য। এসব ব্যাপারে তথ্যের খবর যিনি আমার থেকে বহুগুণ বেশি রাখেন, আমার সেই বন্ধু প্রণব বিশ্বাস লিখেছেন, "১৯৪৪-এর ১৪ই জুন 'জনযুদ্ধ'-তে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিবেদন 'বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া, জমি ও জাতব্যবসা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ নিঃস্ব।' এই সংখ্যাতেই প্রতিবেদকের নাম ছাড়া অন্য একটি প্রতিবেদনের শিরোনাম 'কয়লা উৎপাদনে ঘাটতি কেন? আসানসোলে কয়লা মজুরের হালচাল'। এ দুটি রচনার মালমশলা থেকেই পরবর্তী সময়ে 'আমার বাংলা'র জন্যে লেখা হয়েছিল 'দীপঙ্করের দেশে' ও 'পাতালপুরীর রাজ্যে'।"

এমনিভাবে আমরা দেখি তাঁর অনেক লেখাই যা 'আমার বাংলা'য় আছে। তার এক প্রাথমিক খসড়া, হয়তো ভিন্ন নামে, আগেই জনযুদ্ধ-তে বেরিয়েছিল। আবার তাঁর বঙ্গ দর্শনকে তুলে ধরতে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত বাংলা মাসিক 'রংমশাল' পত্রিকা। যে পত্রিকায় সত্যজিৎ রায় ছবি এঁকে দিতেন সুভাষদার রচনার সঙ্গে। 'রংমশাল' কাগজের চৈত্র ১৩৫৩ সংখ্যাতেই বিজ্ঞাপিত হলো :

> ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলার মতো প্রদেশ আর দুটি নেই। শিক্ষায়, সভ্যতায়, স্বদেশপ্রেমে, সহিষ্ণুতায় বাংলার গ্রামের মানুষদের মতো আসল মানুষ খুব বেশী নেই। তাদের কথা ভালো করে জানলে তবেই সত্যিকারের গর্ব করে বলতে পারব : বাংলা আমার, আমার দেশ।

সুভাষদা, সত্যি আন্তর্জাতিক মন নিয়েও বলতে পারতেন, বাংলা আমার, আমার দেশ। কারণ 'আমার বাংলা'য় যা শুরু, তাই তো অব্যাহত রইল আজীবন। 'আমার বাংলা' পর্যায়ের প্রথম রচনা 'গারো হাজং-এর দেশে' ১৩৫৩-এর বৈশাখ সংখ্যায় যখন বেরুলো, তখনই সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়েছিল :

> আমার বাংলা, আমাদেরই দেশ বাংলা। কিন্তু সে দেশের কতটুকুই বা খবর রাখি। আমরা কি সবসময় ভেবে দেখতে পারি কী বিচিত্র এ দেশ—কত

আশ্চর্য মানুষ, কত গভীর তাদের দুঃখ,—এমনি কত কি। 'আমার বাংলা'য় এইসব কথা মনে করিয়ে দেওয়া হবে।'

সত্যি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছেন 'গারো হাজং-এর দেশে', 'গারো পাহাড়ের তলায়', 'দীপঙ্করের দেশে', 'পাতালপুরীর দেশে', 'বন্যার সঙ্গে যুদ্ধ', 'শালমহুয়ার দেশে' রচনায়। আগেই বোধহয় উল্লেখ করেছি এই বইতে তাঁর কলমে এগারোটি রচনা আছে।

ঢাকা বিক্রমপুর যেতে পারবেন অনেকেই কিন্তু ক'জন রহমান মাস্টারের মতন চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে পারবেন? ভোলা যায় কি মাধবের মা-কে? 'কলের কলকাতা'কে আমরা ক'জন চিনি? কিংবা চট্টগ্রামের কবিওয়ালা রমেশ শীলকে? আসলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি মনের আয়নায় যেন বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা ধরা দিয়েছে, তা সে মেদিনীপুর বা ময়মনসিংহ, ঢাকা বা বর্ধমান যাই হোক। মাঠ জোড়া ধান, দেশ জোড়া ক্ষুধা, অক্লান্ত পরিশ্রম আর অশেষ দারিদ্র্য, সব আছে, তবু হারিয়ে যায়নি মানুষ। বাংলার মানুষ। এরকম অনেক মানুষের সান্নিধ্যে তাঁকে আসতে হয়েছিল, সবার মধ্যে যেন একটা মালা গাঁথা যায়। ভাগ্যিস, নতুবা আমাদের ইংরেজি-শিক্ষার হ্যাংওভারের মনে কলকাতা শহুরে চোখে এদের দেখতেই পেতাম না। সুভাষদা তো অন্ধের হস্তি দর্শনের লোক নন। তাই আমরা পাই প্রবহমান লোকায়তিক এক বাংলার অপরূপ কথা, এক পদাতিকের অভিজ্ঞতায়।

* * *

এই পদাতিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই জেল থেকে বেরিয়ে চলে যান বজবজ, সেখানেও মানুষ। আসলে সুভাষদার দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে মানুষ। 'টানাপোড়েনের মাঝখানে' নামে এক ভ্রমণকাহিনিতে লিখেছিলেন, মনে নেই—"যখন জেলে গেলাম, মনে হল সেও এক ভ্রমণ। গণ্ডীটা শুধু ছোট। জেলখানাতেও তো ছোট-বড় একটা লোকালয়। দড়িচালী থেকে ঘানিঘর ঘুরে ঘুরে দেখা। মানুষগুলো প্রত্যেকেই যেন রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের বই। পড়ে শেষ করা যায় না।"

জেল থেকে বেরিয়ে বজবজের জীবনও মূর্ত হয়ে ওঠে নানা চরিত্রের মিছিলে, সেই ১৯৫২-৫৪ সময়ের দিনগুলি। উঠে আসে পাগল বাবরালি, সালেমন আর তার মা, ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রাম বা চড়িয়ালের রাস্তা। এই সময়কার 'যখন যেখানে' বইতে (প্রকাশ ১৩৬৭) উঠে এসেছে যেন বাংলারই এক নিখুঁত ছবি। এই জীবন তাঁর কবিতায় উঠে এসেছে, আমরা জানি, এমনকি 'হাংরাস' উপন্যাসেও, কিন্তু 'যখন যেখানে' বইতেও। পড়ে দেখুন, 'বাবর আলির চোখের মত'। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গ-দর্শন চলতেই থাকে। ১৯৫১-তে 'আমার বাংলা'র পর ১৯৬০-এ 'যখন যেখানে'। ওই পর্বের মধ্যে, সুভাষ-অনুরাগীরা তো জানেনই, যে তিনি লিখেছেন অজস্র পদ্য, অনুবাদ করেছেন নাজিম হিকমত, তারই মধ্যে অনুবাদ সহ অনেকগুলি গদ্যের বইও বেরিয়েছে।

তবে, বাংলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ানো, বাংলার নানা অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে, উপরে যতই পরিবর্তনের আঁচড় লাগুক, ভিতরে ভিতরে যে সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে, তার

পরিচয় বাংলার নানা এলাকা ও সেখানকার মানুষদের চিত্র এঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার কাজ অবিরাম করে চলেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই বচন কজনই পারে? প্রকৃত অর্থেই তিনি 'সুবচনী'। এই সুবচনীর বচন নিয়েই গড়ে উঠেছিল 'ডাক বাংলার ডায়েরী'। মজার অথচ কাকতালীয় মিল দেখছি এক জায়গায়। 'আমার বাংলা' বা 'যখন যেখানে' বইতে যেমন এগারোটি করে রচনা, বারোটি নয়, তেমনি 'ডাকবাংলার ডায়েরী'তেও এক ডজনের চেয়ে একটি কম।

আসলে চল্লিশের দশকে আমার বাংলায় যার শুরু তারই অনুবর্তন যেন পরবর্তী পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরের দশকে। নিজের দেশকে ও দেশের মানুষকে জানা ও হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করার কাজে তিনি ঢুঁড়ে বেড়িয়েছেন বাংলার সর্বত্র—উত্তর থেকে দক্ষিণে, পশ্চিম থেকে পুবে। শহর থেকে গ্রামে। বাংলার মানুষজনকে দেখেছেন নিরন্তর, তাদের দুঃখে-সুখে। আর ক্রমাগত লিখে গেছেন সেই দেখার অভিজ্ঞতার কাহিনি। কেন ঘুরে বেড়ানো, কেনই বা লেখা? এর উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন 'ডাকবাংলার ডায়েরী' বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের 'ভূমিকা ও পটভূমিকা'য় :

> কেউ আমায় মাথার দিব্যি দেয়নি লিখতে। ভাল লাগে বলে ঘুরি, ভাল লাগে বলে লিখি।
>
> ভাল লাগা কথাটা বোধহয় ঠিক হল না। টান বললেই বোধহয় ঠিক হয়। কেননা যা দেখি যা শুনি, তাতে অনেককিছুই থাকে যা ভাল লাগার মত নয়। দেশ থেকে তার উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ত মানুষের সুখও নেই শান্তিও নেই।
>
> সব পাঠকের সঙ্গেই যে আমার দেখাটা মিলবে, এটা আশা করা যায় না। তার দুটি কারণ।
>
> এক তো আমাদের সবার চাওয়া এক নয়; যেখানে হয়ত চাওয়ার মিল রয়েছে, সেখানেও হয়ত মত-পথের অমিল।
>
> দুই, লেখকের বুঝতে শুনতে ভুল হওয়া।

আর, প্রথম সংস্করণ (১৯৬৭) বেরুবার ঠিক দশ বছর পর বেরিয়েছিল দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৭৭)। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে উৎসর্গীকৃত বইটির প্রকাশক নবপত্র প্রকাশনের প্রসূন বসু। ১৯৬৭-র ২ ফেব্রুয়ারি তারিখে লিখিত ভূমিকা ও পটভূমিকাতেই সুভাষদা জানিয়েছিলেন : আমি গবেষক নই। আমার ভূমিকা গ্রামবাংলার পথচারীর।

'আমার বাংলা'র পর 'ডাকবাংলার ডায়েরী'র মধ্যে ঘটে গেছে যুগ পরিবর্তন। মাঝের পর্বেই দেশ টুকরো। পুবে পশ্চিমে দশ আনা-ছ আনার ভাগ বাংলার জল-হাওয়া-মাটি। ভাই ভাই তখন দুই ঠাঁই। তাহলেও বাংলা এপারে, বাংলা ওপারে, বাঙালি এপারে, বাঙালি ওপারে। এত কাটাছেঁড়ার পরেও এই নতুন মানচিত্রে, নতুন পশ্চিমবঙ্গেও সেই আসমুদ্রহিমাচল বাংলা।

'সুবচনীর ডাকবাংলার ডায়েরি' নামে এই পর্যায়ে লেখা শুরু হয় 'আনন্দবাজার

পত্রিকা'য়। প্রথম রচনা 'আবার বনগাঁয়' বেরুলো ১৯৫৮-র ১১ সেপ্টেম্বর, সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য : "কোনোখানে গিয়ে যদি ভাল লাগে, আমরা মনে মনে বলি 'পুনদর্শনায় চ'। সেখানে যেন আবার যাই। এই রচনার লেখকও চেয়েছেন তিনি যখন সোনার বাংলার ঘাটে মাঠে বাটে ঘুরেছিলেন তারপর একযুগ কেটেছে। সেই দেশের শুধু ভৌগোলিক রূপের পরিবর্তন হয়নি, সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপান্তরও ঘটেছে বা ঘটতে চলেছে। সেই পরিবর্তন কী, সেটা জানার আগ্রহে আবার তিনি ফিরে গিয়েছেন সেইসব শহরে-গ্রামে-গঞ্জে-বন্দরে। 'ডাকবাংলার ডায়রি' অতএব বাংলারই ডাক।...'সুবচনী' এই ছদ্মনামের আড়ালে যিনি আছেন তাঁর দৃষ্টি কবির, কিন্তু সব তথ্যসন্ধানী।"

এভাবে বাংলায় ঘুরে বেড়ানোর ফসল : 'এপার-বাংলা', 'সোনালি সুতোর পাকে পাকে', 'ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর', 'মানচিত্র ও মানহানি', 'তাল-দীঘি লালমাটি', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা', 'হাসনাবাদ', 'ফুলের লোক্যালে ফেরা', 'নিম নয়, তিতা নয়', 'ক্যাকটাসের ফুল' এবং 'নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর'। শুধু দেখার চোখ আর লেখার হাত নয়, সুবচনী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছিল সবুজ মন, সরস দিল। তাই 'আবার বনগাঁয়' এবং 'আবার বনগাঁয় ২' শীর্ষক মূল নামটি বদলে দিলেন। বড্ডো কেঠো কেঠো যে! হলো 'এপার বাংলা'। 'বজবজে' ও 'বজবজে ২' ছিল মূল শিরোনাম, বইতে হলো 'সোনালী সুতোর পাকে পাকে'। আনন্দবাজারে ছিল 'বর্ধমানের গ্রামে ১' ও 'বর্ধমানের গ্রামে ২' তা বইতে হলো 'ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর'। এভাবেই 'নদীয়ার শহরে বন্দরে' হলো 'মানচিত্র ও মানহানি'। তবে সবই আনন্দবাজার পত্রিকা নয়, এই 'পরিচয়' পত্রিকাতেও (তখন সম্পাদক গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়) প্রথমে বেরিয়েছিল অনেকগুলি লেখা। যেমন 'লালমাটি', বইতে যার নাম হয় 'তাল-দীঘি লালমাটি' বা 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' বা 'গ্রামের নাম নিমতিতা', যা বইতে হলো 'নিম নয় তিতা নয়' অথবা 'ফুলের লোক্যালে ফেরা'।

বাংলা পুনদর্শনের এই পর্যায়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলমে শুধু নানা জায়গায়ই আসেনি, এসেছে নতুন অনেক মুখ। এসেছে বিজয়, এ-কলে সে-কলে বদলি খেটে বেরিয়ে যে তার চায়ের দোকানটি আবার পেয়েছে; এসেছে টমাস, যে বলে, 'পাগল হয়েই ভাল ছিলাম। সেরে উঠে এখনি বরং পাগল পাগল লাগছে।' আর এসেছে মোল্লাদের বাড়ির বুড়ো, সাহেবদের জব্দ করায় যার 'হাতযশ' ছিল—আরও কয়েকজন—যারা সুখ, ভয়, আশা নিয়ে বেঁচে আছে। শুধু কি তারাই? বনপাসের ধরণী চক্রবর্তী, সুবল রায়, বেথুয়াডহরীর বিশ্বাস মশাই, রত্নার চকের শ্রীহরি দিন্দা, নিমতিতার রাধানাথবাবু বা নবদ্বীপ বিশ্বাস। অথবা ভাবতে পারেন কেউ হুগলির তারকেশ্বরের বর্ণনা দিচ্ছেন কোনও দেবমাহাত্ম্য দিয়ে নয়, সেখানকার মোহান্তদের কীর্তিকাহিনি দিয়ে। এলোকেশী সংবাদ অনেকে জানেন। সুভাষদা প্রথম লাইনেই লিখলেন—'বেশ্যাসক্তি, পরদারগমন, ফুসলানো, বলাৎকার, খুন—বাবাজীদের গুণের ঘাট ছিল না'। বিশ্বাস না হয়, পড়ে দেখুন, 'নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর'।

* * *

এ যেন এক অন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কবি নন, লেখক নন, সংবেদনশীল মানুষ। নিঃসঙ্গ পদাতিক। ভুল বললাম, অগণিত মানুষ যাঁর সঙ্গী। আসলে এই ঘুরতে ঘুরতে দেশ দেখা, দেখতে দেখতে চিনে নেওয়া, স্থানকালপাত্র ঝরঝরে ভাষায় তুলে আনার কাজ কী অসাধারণ, তা সে রসে বঞ্চিত গোবিন্দ- দাসদের বোঝানো মুশকিল। 'নারদের ডায়রি' (প্রথম প্রকাশ ১৩৭৬) বা 'ক্ষমা নেই' (১৩৭৮) বইতেও একই সুর। যিনি বলেন 'রাস্তাই একমাত্র রাস্তা', তাঁরই পথচলার কাহিনি।

এই পথ চলার টানেই বাংলার পথে ঘাটে মাঠে ঘুরে বেড়ানোর শেষ রম্যকথা 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'। এই ডাকে শুধু তিনি সাড়া দিয়েছেন? আমরা, তাঁর প্রিয় পাঠক-পাঠিকারাও কি কম দিয়েছি? ১৯৮১তে বই হয়ে বেরিয়েছে, মাত্র কুড়ি টাকা দাম। উৎসর্গ করেছেন : 'বাংলা অন্তপ্রাণ নীহাররঞ্জন রায় শ্রদ্ধাভাজনেষু' বলে আমার আর এক প্রিয় মানুষকে। এই প্রথম কুড়িটি লেখার সমাহার। এর মধ্যে ষোলোটির টাটকা পড়বার স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। ১৯৭৬-৭৭-এ দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় পড়তাম।

যাচ্ছি বনগাঁয়, এবার বনগাঁয় গিয়ে, হালছাড়া শহর, অপুদুর্গার জগৎ, দেখার মত বর্ডার, কাছেই বজবজ, বজবজের অসুখ, আগে ছিল বাহান্ন হাজার, আগে ছিল জঙ্গ লমহাল, উপরে কাঁটা নিচে কাঁটা, মাটির কাজ মাটি না হয়, নদেয় এল বান, সুতোর জটজঙ্গলে, অথ বাঘ ছাগল কথা, মরা ডালে ফুল, নাম রেখেছি নবজীবনপুর, পৌষ পেরিয়ে, এক যাত্রায়, ভুবননগর পেরিয়ে, তামাম শোধ। সব মিলে 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'।

এর প্রথম কিস্তি ১৯৭৬-এর ১৮ ডিসেম্বর বেরুলো আনন্দবাজারে। আমার কাটিংটা হারিয়ে গেছে। বইতে প্রথম লেখা থেকে একটা অংশ তুলে দিচ্ছি। একটু দীর্ঘ হবে উদ্‌ধৃতি কিন্তু বোঝা যাবে সুভাষদাকে। তাহলে শুনুন :

''আমার অনেকদিনের ইচ্ছে নতুন করে আরেকবার 'ডাকবাংলার ডায়েরি' লিখব। প্রথমটা লিখতে শুরু করেছিলাম প্রায় দু-দশক আগে। সে আজ কম দিন হল না।

গ্রামবাংলায় আমি ঘুরতে শুরু করি দুর্ভিক্ষের ঠিক পরে পরে। তখনও যুদ্ধ চলছে। আমার সেই অভিজ্ঞতার কথা 'জনযুদ্ধে'র পৃষ্ঠায় ধরা আছে। পরে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সেই মালমশলা দিয়েই লিখেছিলাম 'আমার বাংলা'। তার আগে অবধি পদ্য লিখে লিখে আমার অবস্থা এমন হয়েছিল যে গদ্য লিখতে গিয়ে কলম ভেঙে ফেলি। আমাকে কিলচড় মেরে গদ্য লিখতে শিখিয়েছিলেন সোমনাথ লাহিড়ী। তিনিই ফুটিয়ে দিয়েছিলেন আমার দেখবার চোখ, শোনবার কান।

তারপর দেশভাগ হয়ে দেশ স্বাধীন হল। দেখা জায়গাগুলি অনেকদিন পরে নতুন করে দেখব মনে মনে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু দেশ আর কালের পাঁচিল পেরোতে পারিনি। আনন্দবাজারে যখন 'ডাকবাংলার ডায়েরি' শুরু করি, তখন আমার ইচ্ছে ছিল একটাই। প্রত্যেকটা জেলারই একটা দুটো অঞ্চলে যাব। দেখার চেষ্টা করব স্বাধীনতার পর কোথায়

কতটা কী বদলেছে। পুরোপুরি না হলেও, সে ইচ্ছে খানিকটা পূরণ করেছিলাম।

আমি গবেষক নই। সব কিছু জরিপ করে দেখতে হলে যে-তালিম দরকার তা-ও আমার নেই। ফলে, আমার জায়গা বাছাইয়ের পেছনে যুক্তির কোনো সূত্র নেই। যখন যেখানে যাবার সুযোগ পেয়েছি গিয়েছি বা চোখে পড়েছে দেখেছি। যা কানে এসেছে শুনেছি। আমার সবটাই হল সেই দেখাশোনার গল্প। শোনা বলতে, অন্য কারো দেখা। গল্পের বদলে অন্য যে কথাটা ব্যবহার করতে পারতাম, তা হল সত্য। কিন্তু অত বড় দাবি করা সম্ভব নয়। বড় জোর বলতে পারি আমার জ্ঞানমতে সত্য। আমরা চোখে যা দেখি তার সবটাই তো ষোলো আনা ঠিক নয়। শোনার কথা বাদই দিচ্ছি। 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' শুরু করবার আগে এই কথাগুলো জানিয়ে দেওয়া ভাল। তাতে পরে ভুল বোঝাবুঝি, একেবারে না হলেও, হয়ত খানিকটা এড়ানো যেতে পারে।''

এভাবেই তিনি গেলেন বনগাঁয়। নানা গ্রাম ঘুরে পাল্লা, সেখান থেকে গণেশপুর, আবার চাকদার বাস, রাত কাটানো ডাকবাংলায়, বিভূতিভূষণের পৈতৃক ভিটের গ্রাম বারাকপুর থুড়ি শ্রীপল্লী। আবার গাইনপুর, মোল্লাহাটি, হরিদাসপুর। আবার এদিকে বজবজ, চড়িয়াল, ব্যঞ্জনহেড়িয়া। ওদিকে চন্দ্রকোণা, খড়্গপুর হয়ে জঙ্গলমহালে, কখনও রানীগঞ্জ বা শিকারপুর বা কৃষ্ণনগর বা শান্তিপুর বা নবদ্বীপ। তবে আমি বিশেষভাবে বলব 'মরা ডালে ফুলে' লেখায় গৌরীপুরের কথা কিংবা 'নাম রেখেছি নবজীবনপুর'—কুষ্ঠ আবাস, সুকুমার আর শেফালী সেনগুপ্তের মতন মানুষদের কথা। যাঁরা নিজেরাও একদা ছিলেন কুষ্ঠরোগের শিকার। যে রোগের প্রকৃতি নিরূপণ করেছিলেন হ্যানসেন সাহেব। তাই কুষ্ঠ না বলে অনেক সময় এই রোগকে বলা হয় 'হ্যানসেনের অসুখ'। বাঁকুড়ার গৌরীপুরের কুষ্ঠ হাসপাতাল ও খেজুরডাঙার আরোগ্যবাস দেখতে দেখতেই নিশ্চয়ই সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভেবেছিলেন একটা বড়ো লেখার কথা। তাই ১৯৮১-তে শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় পেলাম 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' নামে উপন্যাস।

'পৌষ পেরিয়ে' বেরিয়েছিল শারদীয় 'কালান্তর' পত্রিকায়, 'ভুবননগর পেরিয়ে' শারদীয় 'পরিচয়'-তে, 'এক যাত্রায়' শারদীয় 'আনন্দমেলা'তে, আশ্চর্য সব মানুষের কথা। আসলে এ বিষয়ে তো সন্দেহ নেই যে বাংলার নানা প্রান্তের গ্রামজীবনের সঙ্গে এখনকার কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাঁর যোগই ছিল সবচেয়ে বেশি। শুধু বেশি নয় নিবিড় সম্পর্ক। চল্লিশ বছর ধরে ঘোরাঘুরি। আর নিজস্ব গদ্যের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার তাঁর দৃঢ়প্রত্যয়ী হাঁটা, অনুভবী মন, গভীর জীবনদৃষ্টি। ফলে রচনাগুলির জাতবিচারও আমার কাছে কঠিন। রিপোর্টাজ? কম করে বলা হল। ভ্রমণ কথা? না হল না। ফিচার? সে আর কী? হ্যাঁ, উত্তর একটা পেয়েছি মনের ক্যামেরায় বন্দী ছবির কলমের মুখ দিয়ে প্রিন্ট।

এইসব রচনা বিষয়ে তাঁর মনের ভাবনা কী রকম? পড়ে দেখুন, 'তামাম শোধ' লেখাটি। এই একটি লেখা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় আগে কোথাও না ছাপিয়ে সরাসরি 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' বইতে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। সেই লেখা অবশ্যই আত্মজৈবনিক, দুঃখবোধ, আনন্দবোধ, কৃতজ্ঞতাবোধ সব আছে। লিখছেন, ''বছর চল্লিশ হতে চলল

বাংলার গ্রামে শহরে আমার ঘোরাঘুরির বয়েস। ঘোরাঘুরির বৃত্তান্ত নিয়ে লিখেছিও কম নয়। কাগজে বেরোলে তবু লোকে পড়ে, কিন্তু বইয়ের লেখা পড়েছে খুবই কম লোক।" আবার অন্যত্র, "শুধু যাঁরা এতদিন আমার এই ধরনের লেখায় আশকারা দিয়েছেন, তাঁদের আমি মনে মনে ধন্যবাদ দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে চাই। তা না হলে আমার দিক থেকে বড়ই নেমকহারামি হবে। লিখে তো দিলাম, তামাম শোধ, কিন্তু জীবনের ঋণ শোধ করা কি অতই সোজা?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে চাই আমিও। তাঁর লেখাগুলি তো এক গভীর মানবিক উচ্চারণ। বাংলা গদ্য সাহিত্য এমন একজন পদাতিককে আবার কবে পাবে? যার পথ চলাতেই আনন্দ। অথচ যাঁর যাত্রাপথের সেই আনন্দগান ফুটিয়ে তোলায় যিনি সহজ, সরল, চিত্ররূপময়, রসিক। যাঁর কলমের দর্পণে দেখতে পাব চিরন্তন বাংলাকে।

পদাতিক-অগ্নিকোণ-চিরকুট : 'বহ্বারম্ভে বজ্র যেদিন হাসাত'

হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

এক

বিতর্কটা খুব নতুন নয়, মৌলিকও না; তবু সেটা ফিরে ফিরে আসে, শিল্পে সাহিত্যে। আসে কবিতাতেও। যে কবির যে সব কবিতা একটু বিশেষভাবে ঘটনা চিহ্নিত, ঘটনার অভিঘাত এবং রেশ মিলিয়ে গেলে তার কতোটুকু কবিতামূল্য অবশিষ্ট থাকে? শান্ত নদীটির মতো সর্বদা নিস্তরঙ্গ থাকে না সময়, কখনো কখনো সেখানে জাগে কাসুন্দির ঝাঁঝ আর সেই ঝাঁঝালো সময়ে যে সব কবিতা সময়েরই দোসর হয়ে পাঠকের মুখে মুখে ফিরেছে—সামাজিক পরিস্থিতি তথা সময় বদলে গেলে সেইসব কবিতা কি ততোটা আর মুখরোচক থাকে, থাকা সম্ভব কি আদৌ?

সময়—সাধারণত, মানুষের মতোই—বিস্মৃতিপরায়ণ। তবু একেবারে কিছুই থাকে না, এমন কথা হলফ করে বলাটা বোধহয় বাড়াবাড়ি। সকলে নিশ্চয়ই অসচেতন কিংবা অকৃতজ্ঞ অথবা ইতিহাসবিস্মৃত নয়। ঘটনার নিজস্ব গুরুত্বের পাশাপাশি মানুষের কৌতূহল তথা অনুসন্ধিৎসা কবিতার গায়ে উল্কির মতন দাগ রেখে যাওয়া সেই ঘটনাকে পুরোপুরি মুছে যেতে দেয় না। সব ঘটনা না হোক কিছু কিছু, যা অবিস্মরণীয়, সকলে না হলেও কেউ কেউ নিশ্চয় বিশেষভাবে স্মরণ করে, আর সেই স্মরণের পাকা সরণিতে মাইলফলকের স্পষ্টতা নিয়ে বেঁচে থাকে কিছু কিছু কবিতা। বিশেষত পুরনো দিনের যে সব ঘটনাকে নতুন যুগের নতুনভাবে নির্ণীত প্রাসঙ্গিকতায় যথেষ্ট প্রাণবান লাগে, চেনা লাগে, যে আবেদনের অবসান হয়নি পরিবর্তিত যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও—সেইসব ঘটনায় ভর করে গড়ে ওঠা কবিতা তো বেশ কিছুটা বাড়তি পরমায়ু অর্জন করে নিজগুণেই। এবং, বলাবাহুল্য, কবিতার এই 'নিজগুণ' নিছক ঘটনার মুখাপেক্ষী নয়। আর যে-কোনো সাহিত্য-শাখার মতো কবিতাও কনটেন্ট-নির্ভর নয় শুধু; তার ফর্ম, তার নির্মাণনৈপুণ্যও শেষবিচারে মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। নিতান্ত কাঁচা, আকরিক ভাবনাকথার গায়ে কবির কারুবাসনা নিয়ত যে পালিশ, যে পরিচর্যা করে—তাতেই তো তার হিরের দ্যুতি আর কবিতার দ্যোতনা! বিষয় এবং বিন্যাসের এই দোতারার তালমিলেই কবিতার যথার্থ বেঁচে থাকা।

আবার এই বিতর্কের একটি বিপ্রতীপ মুখও আছে। কবিতা যদি শুধু ঐতিহাসিকতার মূল্যে মান্য বা প্রামাণ্য হয় তবে তাতে গবেষকের লাভ থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু যথার্থ কবিতাপ্রেমিকের ভালোবাসা থাকে না। কে জানে, শুদ্ধতাবাদীরা হয়তো বলবেন, তা আদৌ কবিতাই থাকে না! যে সব লেখালিখি, রাজনৈতিক কারণে হয়তো বা, কিছুটা তাৎক্ষণিকতায় আচ্ছন্ন—রাজনীতির প্রসঙ্গ-অনুষঙ্গ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে গেলে তার অনেকটাই যে ফিকে হয়ে যায়, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

তারপর ঝড়ঝাপটা সরে গেলে এমনটা হতেই পারে, এ কথা রাজনৈতিক কবিরা যে না জানতেন, তা নয়। 'যুগের হুজুগ কেটে গেলে' তাঁদের লেখালিখির একটা বড়ো অংশ যে হারিয়ে যেতে পারে, পুরনো আবেগের দাম কমতে কমতে ক্রমশ শূন্যে ঠেকতে পারে—জানতেন তাঁরা। তবু আক্রান্ত প্রহরে তাঁরা সমাজের যথার্থ বিবেক হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন, বধির সময়ের কানে হৃদ্‌গত কথাগুলি পৌঁছে দেবার জন্য উচ্চকণ্ঠ হয়েছিলেন, সাহিত্যের তথাকথিত অমরত্বকে তাচ্ছিল্য করেছিলেন, কারণ তাঁদের অধিকাংশের কাছে রাজনীতি শুধু শখ ছিল না, বাইরের উপকরণমাত্র ছিল না, ছিল বেঁচে থাকার শ্বাসবায়ু, বেঁচে থাকার অনন্য পন্থা। রাজনৈতিক খাণ্ডবদাহনের কালে সচেতন এইসব কবির পক্ষে তখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই কবিতা মানে রাজনৈতিক কবিতা,. কারণ জীবন মানেই রাজনৈতিক জীবন যাপন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকে এই পরিপ্রেক্ষিতে দেখার প্রয়োজন আছে বলেই দীর্ঘ এই উপক্রমণিকা।

দুই

উনিশশো সাতষট্টিতে নতুন করে ছাপা 'পদাতিক'য়ের ভূমিকায় কৌতুকী স্বরে সুভাষ লিখছেন :

> "মাপ করবেন, কত বয়েস?
> সাতাশ।
> ও, তাহলে তো পদাতিক-এরই সমবয়সী!
> আপনি মনে মনে ভাবলেন—দেখলে! কেমন কায়দা করে 'পদাতিক'কে ছোকরা বানিয়ে দিলাম। তাছাড়া কথাটাও তো মিথ্যে নয়—সাতাশ বছর আগেই তো প্রথম 'পদাতিক' বেরিয়েছিল।"[১]

উত্তাল চল্লিশের অসামান্য রাজনৈতিক দিনগুলিতে সদ্য কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়া একুশ বছরের এক তরুণের পক্ষে কবিতার অক্ষরে অক্ষরে যতোটা সরল বিশ্বাস এবং পবিত্র আবেগচিহ্ন দেগে দেওয়া সম্ভব, তার সবটুকু থাকা সত্ত্বেও 'পদাতিক' কিন্তু পার্টিজান পাঠকের বাইরেও অনুরাগী পেয়ে গেল, যাঁরা এইসব তরতাজা কবিতায় জীবনের উত্তাপ ছাড়াও খুঁজে পেলেন নির্মাণের কারিগরি দক্ষতা, টেকনিক্যাল বিচারে জানালেন, এই কবিতা বই নিয়ে এসেছে আদ্যন্ত নতুন এক কবিকণ্ঠকে :

> "তিনি বোধহয় প্রথম বাঙালী কবি যিনি প্রেমের কবিতা লিখে কাব্যজীবন আরম্ভ করলেন না।...এটা বোঝা যাচ্ছে যে এখন আমরা ইতিহাসের এমন একটি পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি যখন বাঙালী কবির হাতেও কবিতা আর শুধুই বীণা হয়ে বাজছে না, অস্ত্র হয়েও ঝলসাচ্ছে।"[২]

আমরা জানি, বিশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বঘটনা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। মহাযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক সূচনা আর পদাতিকের জন্মদিন প্রায় পিঠোপিঠি! জীবনের অপরাহ্ণবেলায়

রবীন্দ্রনাথ তখন 'শেষ লেখা'য় নিমগ্ন এবং তাঁর চোখের সামনেই গড়ে উঠেছে বাংলা আধুনিক কবিতার 'রবীন্দ্রোত্তর' কাল। তিরিশের কবিদের শক্তিশালী কলমে জগৎ ও জীবনের যে নতুন চেহারা পাঠকের সামনে চলে এল তার ভাষারূপটিতে রাবীন্দ্রিক প্রযত্ন অথবা প্রভাব একেবারে নেই, এ কথা বোধহয় বলা যাবে না। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ কবিজীবনে নিজের ভাষাভঙ্গিমা বারবার বদলেছিলেন, সমসাময়িকতার চাপে। এই বহতা নদীর সর্পিল-শঙ্খিল গতিপথে এসেছে 'বলাকা', কিংবা, 'পুনশ্চ' অথবা, 'প্রান্তিকে'র মতো লক্ষণীয় বাঁক—এ কথা একটু ঝুঁকি নিয়েও বলা যায়, তাঁর তরুণতর সমানধর্মাদের মধ্যে, তিরিশে অন্তত, এতখানি স্থিতিস্থাপকতার পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাঁদের কারো কারো বিশ্বাসের জগৎ রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মেরুতে, অমিয় চক্রবর্তীর মতো কেউ কেউ আবার ততোটা প্রতীপ কোণে দাঁড়িয়ে ছিলেন না, কিন্তু সব মিলিয়ে যে ভাষারূপের কবিতায় তাঁরা ব্যাপৃত ছিলেন সেদিন, এক জীবনানন্দ ছাড়া, আর কাউকে বিরাট কিছু নতুনত্বে বিস্ময়কর মনে হয় না এখন। তন্বীর সুধীন্দ্রনাথকে না, 'বন্দীর বন্দনা'র বুদ্ধদেব বসুকে না, উপহার-ঋসড়ার অমিয় চক্রবর্তীকেও না। পরে অবশ্য এঁরা প্রায় সকলেই নিজ নিজ মৌলিকতায় ভাস্বর হয়েছিলেন, বাংলা কবিতার ইতিহাসে রচনা করেছিলেন নিজস্ব দিকচিহ্ন। কিন্তু সে তো পরের কথা।

অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায় চল্লিশের একদম গোড়াতেই বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রতিভতায় গড়া চমকপ্রদ এক কবিতাভাষা নিয়ে এলেন 'পদাতিক'য়ে, যা আর কারও মতন নয়। বিশ্বাস আর বিদ্রূপের আশ্চর্য যোগসাজশে সে ভাষায় নির্মাতার একান্ত নিজস্ব মার্কা বড়ো স্পষ্ট করে মারা ছিল; ছিল ছন্দের ফিট্‌ফাট দোলায়, ছন্দের উপযুক্ত শব্দসন্ধানের অবিশ্বাস্য মুন্সিয়ানায় :

"নখাগ্রে নক্ষত্রপল্লী; ট্যাঁকে টুকরো অর্ধদগ্ধ বিড়ি।
মাংসের দুর্ভিক্ষ নইলে ঋষি মনে হত হাবভাবে।
বিকৃতমস্তিষ্ক চাঁদ উল্লাঙুল স্বপ্নে অশরীরী।

বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।
মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।
সাম্য অতি খাসা চিজ!—অনুচিত কিন্তু রাজদ্রোহ!

'জীবন বিস্বাদ লাগে'—ইত্যাদিতে ইতস্তত দেনা।" (নির্বাচনিক : পদাতিক)

কাটাকাটা পৃথক বাক্যে এইরকম বুদ্ধিবিজড়িত খোঁচা, হয়তো 'ফাল্গুনী কবি'-দেরই, এত অনায়াস শব্দবিচরণ, বাংলা কবিতায় আগে দেখা গেছে কি? শার্পনার দিয়ে একটু তদারকি করলেই যেমন কাঠের পেনসিলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে গ্রাফাইটের তীক্ষ্ণ কালো শিস্—সুভাষ মুখোপ্যায়ের প্রথম দিকের কবিতাগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করলে ততোটা সহজে বেরিয়ে আসে মেধাবী মস্‌করা আর ধারালো বিদ্রূপ, যা বিশেষভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের প্রতি লাগাতার এই তীরন্দাজি 'পদাতিক'য়ের

কমবেশি প্রায় প্রতিটি কবিতাতেই আছে :

"মানি অহিংসা, মেনেছি অসহযোগিতা;
নায়ক অধুনা কংগ্রেসি মনোনয়নে—
সাহিত্যে শখ, পড়ি না ভ্রষ্ট কবিতা;
শিব, সুন্দর স্পষ্ট নিমীল নয়নে।

জনান্তিকেই বুলি কপচানো খাসা তো
চতুষ্পদেই তীর্থ করেছি যোজনা;
বহ্বারম্ভে বজ্র যেদিন হাসাত
সেই দিন ভেবে আমাদের অনুশোচনা।" (আদর্শ : পদাতিক)

রাজনৈতিক কবিতা মূলত একপাক্ষিক এবং একদেশদর্শী—ঠিক! রাতচরা উল্কার মতন উজ্জ্বল উত্থানের পর দ্রুত নির্বাপিত হওয়াই তার নিয়তি। কিন্তু সুভাষের পদাতিকের এই সব ঝকঝকে কবিতারা বক্তব্যের পাশাপাশি বাচনেও এতটা নিখুঁত, সুছন্দে এতটাই সাবলীল যে সহ-মতাবলম্বীদের দেদার হাততালির মতো বিরুদ্ধপক্ষের ঠাট্টা-ঠোকরানো অপ্রস্তুত হাসিটাও তার স্বাভাবিক পাওনা। শব্দে ছন্দে, বাচনে বিন্যাসে এতটা স্মার্টনেস সমর সেনের কবিতাতেও কি দেখা গেছে? বিশেষত ভাষাকথায় তাকলাগানো সহজিয়া চাল, তথাকথিত কাব্যগন্ধ-বর্জিত মুখের ভাষার কাছাকাছি এই উচ্চারণ, অথচ যার আড়ালে নাগরিক পরিশীলন পুরোদস্তুর—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব। মাত্র একুশ বছরের আন্ডার গ্র্যাজুয়েট এক তরুণ কবির পক্ষে আবহমান বাংলা কবিতার ভাষাকে এইভাবে আটপৌরে প্রাত্যহিকতার স্পর্শমধ্যে নিয়ে আসা খুব সামান্য কৃতিত্ব নয়। হাত বাড়িয়ে যে-কোনো অংশ টেনে নেওয়া যায়, তবু এক্ষেত্রে পদাতিকের বিখ্যাত নামকবিতাটিকে পেশ করা যাক :

"যেখানে আকাশ চিকন শাখায় চেরা
চলো না উধাও কালেরে সেখানে ডাকি
হা হতোস্মি সড়কে বেঁধেছি ডেরা
মরীচিকা চায় বালুচরী আত্মা কি?

লাল মেঘ গুহা পাবে না হয়তো খুঁজে
নিজেরে নিখিল মিছিলে মিলাও যদি,
চলো তার চেয়ে মরা খড়ে ঘাড় গুঁজে
হব অপরূপ অপরাহ্ণের নদী।

হরিণসময় লাগামে বাঁধতে পারো?
বিশ শতকেও ফুলের বেসাতি করি,

অতল হ্রদের মিতালি হৃদয়ে গাঢ়
হিংসুক হাওয়া দেহে আঁকে চক্‌খড়ি!"

চল্লিশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে অনেকেই বিপ্লবের কবিতা লিখলেন, কিন্তু কবিতায়, কবিতার ভাষায় এত বড়ো বিপ্লব ঘটালেন কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তিনিই প্রথম। কবিতা জনতার কথকতার কাছাকাছি নেমে এল, অথচ তাতে তার জাত গেল না বরং তার জৌলুস বাড়ল—এমন ইন্দ্রজালও এই প্রথম। এবং এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য মনে হবে :

> "ব্যক্তিগত কবিতার গহন রহস্য তাঁকে কোনোদিন হাতছানি দেয়নি। অথচ যাকে বলা যায় গণকবিতা বা সাধারণ্যের কাব্য, তিনি সে রচনায় স্মরণীয় সিদ্ধির প্রমাণ রাখলেও তাঁর প্রধান সার্থকতা তাঁর ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরে। বাংলা আধুনিক কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় একটা টোন্ বা স্বরক্ষেপের জন্য বিশিষ্ট।"[৩]

আকাঁড়া রাজনীতিকে কবিতায় অনুবাদ করলে যেমন কবিতা হওয়া সম্ভব, 'পদাতিক'য়ের বেশ কিছু কবিতা ঠিক তেমন। সমসময়ে নিজমহলে তুমুল জনপ্রিয়, উত্তরকালে অনুভবী কবিতাপ্রেমিকের কাছে ততোটা নয়। মে-দিনের কবিতা ("প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য..."), সকলের গান ("কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না?"), কানামাছির গান ("একদা ছিলাম উচ্চ আশার কৈলাসে..."), দলভুক্ত ("শ্রদ্ধানন্দ পার্কে সভা; লেনিন দিবস; লালপাগড়ি মোতায়েন...") ইত্যাদি কবিতাগুলি যেন রাজনীতির কবিতাভাষ্য, সমসাময়িকতার জ্বর এবং জোর তার সর্বাঙ্গে। চিৎকৃত, উচ্ছ্বাসে রঙিন, আক্রমণে ক্লান্তিহীন, ছন্দের দোলায় যথারীতি ছটফটে। তারুণ্যের তেজে ভরপুর। পদাতিকের 'ভূমিকা'য় বলা কবির কথাগুলি ভুল নয় "আঠারো থেকে একুশ বছরের একরত্তি ছোকরাদের সঙ্গে দিব্যি জমে বসে গেছে পদাতিক।"[৪]

কিন্তু এমন জনতোষের মুশকিল হল, সময়ের বদল ঘটে গেলে গড়পড়তা কবিতার মতন এগুলি হারিয়ে যায়, সময় শেষ হওয়া ওষুধের মতন চুপিসাড়ে বাতিল হয়ে যায়। বস্তুত 'পদাতিক' যেন উত্তরকালের কাছে একটা জ্বলন্ত শিক্ষা—প্রতিভাবান কবির দায়বদ্ধতা তাঁকে কীভাবে সীমাবদ্ধ করে, তার শিক্ষা, লুই ম্যাক্‌লিশ যেভাবে ভেবেছিলেন, "Duty is the greatest temptation to the poet and the worst." অথচ, চল্লিশের সেই দারুণ দিনগুলিতে, এই দায় কবির কাঁধে জোর করে চাপিয়ে দেয়নি কেউ। জাপানের মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ যেন কবির বিশ্বাসের উপর আক্রমণ, অতএব অস্ত্রহীন কবি যা পারেন, বর্ণে বর্ণে পাল্‌টা মার, কবিতায়, তাই উঠে আসে সুভাষের উত্তেজিত কলমে "জাপপুষ্পকে ঝরে ফুলঝুরি, জ্বলে হ্যাঙ্কাও/কমরেড, আজ বজ্রে কঠিন বন্ধুতা চাও"—শ্লোগানের মতো। উত্তরকালের নিরাপদ দূরত্বে কিছু নান্দনিক নাক-শিট্‌কানো নেতিধারণা এইসব কবিতাকে বাসি খবরের স্বল্পতম মূল্যে ফিরিয়ে দিলেও আমরা দেখেছি, কম দক্ষতাসম্পন্ন বাঙালি কবির হাতে এইসব ইস্যু কতো অর্থহীন একটেরে প্রলাপে বা প্রগল্‌ভতায় সাঙ্গ হয়ে যেত, হয়ে গেছেও, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বুনিয়াদী কবিক্ষমতা সংবাদকে মূলত কাব্য বানিয়েছে। সব কবিতা সমমূল্যবান হয় না। 'পদাতিক'য়ের সব কবিতাও তা নয়। এমনও হয়েছে, গোটা কবিতাটা

হয়তো উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু তার একটি পংক্তি বা একটি চিত্রকল্প অসামান্য হয়ে ঝলসেছে, ধীমান রসিকতায় রাজনীতির চড়া স্বরে জেগেছে ভিন্নতর-সুর। যেমন 'প্রস্তাব-১৯৪০' শুরু হয়েছিল টিপিক্যাল রাজনৈতিক শ্লেষাক্ত বক্তৃতার ঢঙে। কিন্তু শেষ স্তবকে এসে কবিতাটি যেন অন্য উচ্চতা স্পর্শ করল; বিদ্রূপ তখন বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঞ্জনায় বহুকৌণিক :

"অস্ত্র মেলেনি এতদিন; তাই ভেঁজেছি তান।
অভ্যাস ছিল তীরধনুকের ছেলেবেলায়।
শত্রুপক্ষ যদি আচমকা ছোঁড়ে কামান—
বলব, বৎস! সভ্যতা যেন থাকে বজায়।

চোখ বুঁজে কোনো কোকিলের দিকে ফেরাব কান।"

ফুলেল কবি শিল্পীদের পলায়নবাদী অস্তিত্ব আর শিথিল হিপোক্রেসিকে ছদ্ম-আত্মনিন্দার ছলে যেভাবে কবি বিঁধেছেন, তা তুলনাহীন। সৌজন্য, শিষ্টাচার বজায় রেখে এমন মারাত্মক আক্রমণ সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে বিশিষ্টতা দিয়েছে। পদাতিকের কবিতাগুলি এই কবির প্রবল আত্মবিশ্বাসেরও সাক্ষী। সমস্ত তৎসমতার ভার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে একেবারে লোকমান্য ভাষাভঙ্গিমায় পুরনো প্রবণতাগুলিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। তীব্র জীবনীশক্তিতে ভরা কোনো বর্ণময় তরুণ যদি স্রেফ শিস্ দিয়ে গান করার বিন্দাস মেজাজে কবিতা লিখতে গিয়ে সাধারণ মানুষের যন্ত্রণার শরিক হয়ে যান, আর তাঁর সাধ্য ও স্মার্টনেসকে নিয়োগ করেন কমিটেড কবিতার অক্ষরে অক্ষরে—তবে উত্তরকালের পাঠক তাঁকে পদাতিকের সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলে চিনে নেবেন।

তিন

পঞ্চাশের এক শক্তিমান কবি কবিতায় জানিয়েছিলেন, 'আমি স্বেচ্ছাচারী'। প্রত্যেক বড়ো কবিই কমবেশি তাই, সচেতনভাবে স্বেচ্ছাচারী। তবে সকলকে অবশ্য এই কারণে খামোখা এলোমেলো জীবনযাপন কিংবা অস্মিতাময় আত্মঘোষণা করতে হয় না! প্রধানত চল্লিশের কবিদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশের মধ্যে যে শ্রেণীসচেতন রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন, রাজনৈতিক কবিতায় মেধাবী হৃদয়ের পূর্ণ সম্মতি দেখা যায়, তাও তো একরকম সুচিন্তিত স্বেচ্ছাচার। অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কবির পক্ষে অন্যরকমের কবিতা লেখা ছিল বাঁহাতের খেলা, 'পদাতিক' লেখার নিতান্ত উঠতি বয়েসেও তাঁর কবিতা চাইলে গভীর গম্ভীর হতে যে পারত, তার প্রমাণ 'বধূ' কবিতাটি। যারা বলেন, সুভাষের, প্রথমদিকে অন্তত, কবিতার চালচলন বড্ড বেশি প্রেডিক্টেবল, ফলত সস্তা চমকের চেয়ে উঁচু জাতের বিস্ময় সেখানে অনুপস্থিত—তারা নিশ্চয় মানবেন 'বধূ' একাধিক অর্থেই ভিন্ গোত্রের রচনা। আগে, পদাতিকেই, রোমান্টিক আবেগের তথাকথিত মোহমেদুরতাকে এক হাত নিয়েছিলেন তিনি, 'রোম্যান্টিক' নামেই লিখেছিলেন এক দুরন্ত কবিতা, যেখানে তাঁর বাচন পাক্কা কাউন্টার রোমান্টিক কবিসুলভ :

"ঘড়ির কাঁটায় কত যে মিনিট সরছে
মনে অনন্ত সময়ের অধিরাজ্য;
ভুলেছি, জ্যোৎস্না হারিয়ে হরিৎ ধান্য
এখানে বন্দী আনা-তিনেকের বাল্‌বে।"

'এখানে' মানে এই শহরে, কলকাতায়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের যে 'বধূ'কে রচনা করেছিলেন—'পরখ করে সবে করে না স্নেহ' জেনে যার অসুখী শহরবাস ছিল প্রায় কারাবাসের মতন, যার গ্রামীণ সরলতায় গড়া আয়ত দুচোখে এই বিরাট, হৃদয়হীন মহানগর ছিল, "ইঁটের পরে ইঁট মাঝে মানুষ কীট" সুতরাং দমবন্ধ—সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই গাঁয়ের বধূকে বিশশতকী সমাজজীবন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছেন। গ্রামনগরের সাবেক দ্বন্দ্ব ততোদিনে যেন গা সওয়া হয়ে গেছে, শহর এই সরলমতি মেয়েকে ততোদিনে শিখিয়েছে উচিতমাত্রায় সমঝোতা করতে। তবু "গ্যাসের আলো জ্বালা" শহুরে সন্ধ্যায় "কাছেই পথে জলের কলে" জল আনতে গিয়ে তার পুরনো নানারঙের দিনগুলির কথা মনে পড়ে। শহরে মানুষ আছে, খবর আছে, গুজব আছে, কিন্তু প্রকৃতির সবুজ আর নীল নেই, আর্দ্রতা নেই। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানীর ভাষায় :

> "মেট্রোপলিটন শহরে প্রকৃতির সবুজ নেই, শুধু আছে কাগজের কারখানার কাগজ। এই পুঁজিবাদী শহরে মানুষের স্বপ্ন পর্যন্ত কাগজ দিয়ে তৈরি।"[২]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'বধূ'র আলেখ্যে 'পাষাণকায়া' এই শহরে "তেজারতির মতন কিছু পুঁজি" আছে তবে সরাসরি খবরের কাগজের কথা নেই। আছে আর এক সংবাদমাধ্যমের উল্লেখ—"দূরে বেতার বিছায় কোন মায়া।" সব মিলিয়ে অনেক আপস আর নিজের অভিরুচির নানামুখী অবদমন সত্ত্বেও এই বধূর মন ভালো নেই। সমস্ত জোড়াতালির পরও তাই কবিতাতে পাওয়া যাচ্ছে :

'ইহার মাঝে কখন প্রিয়তম
উধাও; লোকলোচন উঁকি মারে—
সবার মাঝে একলা ফিরি আমি
—লেকের কোলে মরণ যেন ভালো।"

'লেক' বলতেই শহরের দক্ষিণভাগের মুদ্রা পাঠকমানসে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, কবি জানতেন। যেমন তিনি জানতেন "মরণ যেন ভালো" বলাটা আসলে কতোদূর কথার কথামাত্র। যে মরতে চায়, সে 'যেন' মরণের কিঞ্চিৎ ন্যাকামি মিশ্রিত আদিখ্যেতার ধার ধারবে কেন? অতএব, এইসব অনুযোগের চেনাজানা বারোমাস্যার পরও 'বধূ' আবার 'মৃদু চালে' জলের কলের লাইনে কলসি কাঁখে গিয়ে দাঁড়ায়, যথাপূর্বং। এবং কবিতার প্রথম ও শেষবাক্য হুবহু এক—"গলির মোড়ে বেলা যে পড়ে এল"—মেরি গো রাউন্ডের মতো শুধু ঘুরে ফিরে একই জায়গায় ফিরে ফিরে আসা। অদৃষ্টের মতো উপায়হীন শহরবাস যার ভবিতব্য, এই পৌনঃপুনিকতায় সে বাঁচে, বাঁচতে চায়।

একটানা অব্যবহিত ঘটনার রাজনৈতিক-সামাজিক তাৎপর্য শ্রেণীদৃষ্টিকোণে যেভাবে

বিশ্লেষিত হয়েছে, কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে 'পদাতিক'য়ে—'বধূ' তার চেয়ে দূরে একাকী, কিন্তু সম্ভাবনায় উজ্জ্বল। কার্যত এখানে তাই কবিতাটিকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হল। পরবর্তী পর্বে, পর্বান্তরে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা কীভাবে কথা বলবে, কোন গভীরতার তলদেশে মগ্ন হয়ে সেইসব কবিতা তুলে আনবে জীবনের নানা মণিমুক্তো—তার নিশ্চিত পূর্বাভাস এই বিশেষ কবিতায় রয়ে গেছে।

'তারপর যেতে যেতে যেতে'—শুধু নদী নয়, জীবনের হরেকরকম বাঁক আর রাজনীতির অনেক রকম পরিবর্তনের সঙ্গে দ্যাখা হয়েছিল কবির। সেই জীবন-সমাজ-মানুষ ও তার নানামুখী বেঁচে থাকার ধরনকে নিয়ে আরও অজস্র অসাধারণ কবিতাও লিখেছিলেন, লিখে পুরস্কৃতও হয়েছিলেন তিনি। তবু প্রহরশেষের আলোয় রাঙা হয়ে আছে তাঁর 'পদাতিক' ভাবমূর্তি, যা অনেক কিছু পাওয়া আর অনেক কিছু হারানো সত্ত্বেও অপরিবর্তিত থেকে গেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং কাব্যগ্রন্থ 'পদাতিক'য়ের এই ধ্রুব জোড়কলম, এই অপরিবর্তনীয় প্রতিচ্ছবি সম্ভবত শুধু কবি নয়, তাঁর বিহানবেলার এই কবিতাগুলির সৎ আবেগ এবং অমলিন তারুণ্যকে বার বার চিনিয়ে দেয়। কবির বয়েস বাড়ে, 'পদাতিক' কখনো একুশের উষ্ণতা হারায় না।

চার

'পদাতিক' এতদিনে এদেশের কবিতামহলে একটা মীথ্ হয়ে গেছে। এতটাই, যে ঠিক তার পরেই প্রকাশিত 'চিরকুট' (১৯৫০) এবং অগ্নিকোণ (১৯৪৮) যেন পাঠকসমাজে ততোটা সমাদর পেল না, যা তাদের প্রাপ্য ছিল। হতে পারে, পদাতিকের প্রথম আলোর ঝলকানিতে যে সব চিত্ত ঝলমল করে উঠেছিল, 'অগ্নিকোণ' ইত্যাদিতে নতুন অপ্রত্যাশিতের চমকপ্রদ অভিঘাত তাদের ততোটা আর মুগ্ধ করতে পারল না; হতে পারে, এর মাঝেই সুকান্ত ভট্টাচার্যের ঐতিহাসিক আসা আর মর্মান্তিক চলে যাওয়া বাঙালি পাঠকমনকে স্মরণের অন্য সরণিতে গিয়ে গিয়েছিল, আরো স্পষ্ট সরলতায় গড়া রাজনৈতিক কবিতার সরণিতে...। তবু রাজনীতির যে কবিতাভাষ্য পদাতিকে বিশিষ্টতা পেয়েছিল, অগ্নিকোণ-চিরকুটের কবিতাগুলি তাকে আরও পূর্ণতা দিয়েছে, বস্তুত কবির প্রথম যৌবনের রাজনৈতিক কবিতাবর্গের সামগ্রিক পরিচয় সম্পূর্ণ করেছে—এ-তে কোনো সন্দেহ নেই।

যেমন সন্দেহ নেই, কালের মাত্রা লক্ষণীয় কিছু গুণগত বদল নিয়ে এসেছে ততোদিনে, সুভাষের কবিতায়। শুধুমাত্র ধ্বংসাত্মক ব্যঙ্গবিদ্রূপে নয়, কবিতার আসল জোর স্বল্পভাষ মন্ত্রগুপ্তিতে, রাজনৈতিক কবিতার স্যাটায়ারসর্বস্ব ভঙ্গিমার বাইরে কিছু গঠনমূলক আয়তন আছে যে, তা-ও কবির এই কবিতাগুলি বুঝিয়ে দিল। চিরকুটের 'কাব্যজিজ্ঞাসা'র গোড়াতেই কবি বলেন "সেদিনের শানিত ধার হারিয়েছি", কিন্তু বলেন না নতুন অর্জনের কথাগুলি। যা বলতে হয় সমালোচককে :

> "তিনি এবং আমরা সেই সময়েই বুঝলাম উজ্জ্বল চকচকে পঙ্‌ক্তি নয়, চতুর নাগরিক বিন্যাস নয়, যে-অর্থ, যে meaning তাঁর কবিতা সঞ্চারিত করতে চাইছে

তা হল প্রত্যক্ষ 'মানুষ'। 'এই আশ্বিনে' এবং 'স্বাগত' এই দুটি কবিতাকে এই কবির বিবর্তনের স্মারক চিহ্ন বলা যায়।"[৬]

উল্লিখিত দুটি কবিতার পরিপ্রেক্ষিত অভিন্ন—পঞ্চাশের মন্বন্তর! দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দারুণ আঘাত সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারে এই বাংলাদেশে কী ভয়াবহ মৃত্যুর তাণ্ডব নিয়ে এসেছিল তা কালো অক্ষরে লেখা আছে ইতিহাসের পাতায়।[৭] আর আছে শিল্প সাহিত্যে। বিজন ভট্টাচার্যের নবান্নের মতো নাটক বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবিস্মরণীয় ছোটোগল্পের পাশাপাশি রচিত হল অজস্র কবিতা। বামপন্থী ছাত্রযুবরা সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেদিন 'রিলিফে'র কাজে।[৮] সক্রিয় রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণের পাশাপাশি সুভাষ লিখলেন কবিতাও, প্রতিবাদের প্রতিরোধের কবিতা, কিন্তু সেখানে, ভাষারীতিতে এক আশ্চর্য বেদনাবিস্তার, অচেনা ভারসাম্য :

"পথের দুদিকে বাসা
বেঁধেছে কঙ্কাল;
গ্রাম করে খাঁ খাঁ—
শোকাচ্ছন্ন পড়ে থাকে
ভগ্নদূত শাঁখা।" (এই আশ্বিনে : চিরকুট)

সলিল চৌধুরীর 'কোনো এক গাঁয়ের বধূর কথা' তখন কবির প্রিয় বন্ধু হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্বর্ণকণ্ঠে গোটা দেশ জুড়ে ঢেউ তুলেছে। এই প্রসঙ্গে অসামান্য কবিতা লিখছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, বিষ্ণু দে। ব্যক্তিগত নিরালার ধূসর যবনিকা দূরে ছুঁড়ে ফেলে জীবনানন্দ দাশ লিখলেন 'তিমির হননের গান'। তবু প্রখ্যাত সমালোচকের মনে হয়েছিল, এই কালবেলায় লেখা সেরা কবিতা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'স্বাগত'। তাঁর ভাষায় :

"দুর্ভিক্ষের বিষয় নিয়ে বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী কবিতা যে এটাই—একথা নিয়ে কোনো তর্কও চলে না।"[৯]

সুভাষের আরো বহু কবিতার মতো অযথা কোনো কল্পিত শত্রুকে শব্দে শব্দে তুলোধোনা করা 'স্বাগত'তে নেই, আছে এক বহুমাত্রিক শূন্যতার ল্যান্ডস্কেপ, অকস্মাৎ জীবনের থমকে দাঁড়ানো, স্তম্ভিত বেদনার ছবি এবং শেষে অসুখী, মলিন কনীনিকায় তবু রয়ে গেছে আলতো আশার আলো :

"গ্রাম উঠে গিয়েছে শহরে—
শূন্য ঘর, শূন্য গোলা
ধানবোনা জমি আছে পড়ে।
শুকানো তুলসীর মঞ্চে
নিষ্প্রদীপ অন্ধকার নামে,
আগাছায় ভরেছে উঠোন।"

এই হাহাকার-ভরা সূত্রপাতের শেষে অবশ্য তিমির বিনাশের অম্লান স্বপ্ন—

দুচোখে প্রতীক্ষা তার,

স্বপ্ন তাকে করাঘাত করে।
ওঠে ডাক শহরে শহরে
রাস্তার শ্মশান থেকে মৃতপ্রায় জনস্রোত শোনে
মাঠের ফসল দিন গোনে।"

মনে রাখা ভালো, চল্লিশের কবিরাই প্রথম, যাঁরা শুধু কাগুজে প্রতিবাদী ছিলেন না, ছিলেন সরাসরি রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। একটি বিপ্লবী রাজনৈতিক দলের সর্বক্ষণের কর্মী মিছিলের মতোই কবিতাতেও সামনের সারিতে, পরে সত্তরের দিনগুলি ছাড়া, এমনটা দ্যাখা যায়নি। কবিতা থেকে মিছিলে, অথবা, তার বিপরীতক্রমে, সৃজনশীল মানুষের চলাচল সুভাষ ও তাঁর সতীর্থদের দ্বারা প্রথম সাধিত হল। এই মিছিলপ্রেমের পুরনো প্যাশনে তারপর অগ্নিকোণের সূচনায় দ্যাখা গেল নতুন পালকের রং—মিছিলেই প্রেম! বুদ্ধদেব বসুর আক্ষেপ ছিল, এই তরুণ কবি প্রেমের কবিতা না লিখেই কবিতার অন্দরমহলে রাজত্ব করতে এসেছেন, যদিও আমাদের মনে হয়েছে পলিটিক্স যেখানে গভীর প্রেমের বিষয়, সেখানে প্রেমের ধরনটাই শুধু আলাদা, প্যাশনটা একই। বিপ্লবের চেয়ে বেশি রোমান্টিক বিষয় আর কিছু আছে কি? তবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'মিছিলের মুখ' সব আপত্তি আর আক্ষেপ নিমেষে মিটিয়ে দিল :

"মিছিলে দেখেছিলাম একটি মুখ
মুষ্টিবদ্ধ একটি শাণিত হাত
আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত।"

এবং তার কিছু পরে :

"অন্য সব মুখ যখন দুর্মূল্য প্রসাধনের প্রতিযোগিতায়
কুৎসিত বিকৃতিকে চাপার চেষ্টা করে,
পচা শবের দুর্গন্ধ ঢাকার জন্যে
গায়ে সুগন্ধি ঢালে,
তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী সেই মুখ
নিষ্কোষিত তরবারির মত
জেগে উঠে আমাকে জাগায়।"

ভালো লাগার বৈশিষ্ট্যগুলি বরাবর বড়ো ব্যক্তিগত! রীতিমতো বামপন্থী কবির ভালোবাসাও কিন্তু শেষবিচারে সাবজেক্টিভ আইডিয়ালিজমে ভেসেছে, কবির চেতনার রঙেই পান্না সবুজ অথবা চুনি হয়েছে রাঙা। নয়তো প্রসাধিতা অন্যদের থেকে মিছিলের এই দৃপ্ত মুখটিকে বেশি পছন্দসই দ্যাখানোর জন্য 'পচা শবের দুর্গন্ধ' জাতীয় প্রসঙ্গগুলি প্রতিতুলনায় আসত না কখনো। কে জানে, বস্তুবাদী বাঙালি কবির কাছে প্রেম বোধহয় ততোটা 'বস্তুবাদী' নয়। কিছুটা ছেলেমানুষী অতিকথন হয়তো তার শর্তই হবে। একই রকম উচ্ছ্বাস ছিল সুভাষের উত্তরকালের কবিতা 'সুন্দর'য়ে।

চিরকুট এবং অগ্নিকোণেও বেশ কিছু কবিতা আছে, যাকে বলা যায় রাজনীতির কবিতাভাষ্য। পদাতিকের প্রাণবন্ত সদর্থক মাত্রাগুলি বজায় রয়েছে এখানেও। কিছুটা শমিত

হলেও সমান ধারালো সেই স্যাটায়ার, যেমন ছিল পদাতিকে। গান আর শ্লোগান এই দুটি কবিতা বইয়ের বহু কবিতাতেই মিলে মিশে একাকার। উদাহরণ : 'আহ্বান' ("সীমান্তে উদ্যত খড়্গ..."), 'শত্রু' ("সূর্য অস্ত যায় না এমন রাজ্যে...") পার্টি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মাঝপথে 'পিতৃভূমি' সোভিয়েত দেশ আক্রান্ত হলে জনযুদ্ধের বিতর্কিত লাইন নেবার পর 'জনযুদ্ধের গান' ("বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ..."), 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার' ("নিষ্ঠুর কালের মুঠি—") 'স্টালিনগ্রাড' ("এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনো..."), 'জবাব চাই' ("রক্তের ধার রক্তে শুধবো কসম ভাই...") কিংবা 'স্ফুলিঙ্গ' :

"রুখবে কে আজ চলে বেপরোয়া ক্ষ্যাপা জোয়ার
বদ্ধ মুঠিতে বজ্র তৈরী, মিছিলে হাঁটি।"

কবির এই রাজনৈতিক আবেগ যে জীবন থেকে নেয়া, বোঝা যায় অমলেন্দু সেনগুপ্তের "উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব" গ্রন্থের তৎকালীন তথ্যসূত্রগুলি সামনে রাখলে। ফ্যাসিস্ট হিটলারের পরাজয় যেভাবে মিছিলনগরী কলকাতা উদ্‌যাপন করেছে, তার আলোকচিত্রতুল্য বিবরণী এখানে এইরকম :

> "রাজপথে আজ যেন লাল-এর ঢল নেমেছে। রক্তপতাকার ঢেউ তুলে কাতারে কাতারে চলেছে উদ্বেল মানুষ। তাদের মাথার উপর যদিও অগ্নিবর্ষী আকাশ আর পায়ের নীচে গলন্ত পিচের করাল উত্তাপ। এবং জ্বলন্ত রোদে সেদিন কলকাতা ঝলসে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কী আসে যায়; বার্লিনের উপর উড়ছে লাল পতাকা। ফ্যাসিস্ট ঔদ্ধত্যের প্রধান ঘাঁটি চূর্ণ। আজ উৎসবের দিন—বার্লিন বিজয় উৎসব। তাই রুদ্র বৈশাখের গলে পড়া সূর্যও তাদের উদ্দীপনার কাছে নিষ্প্রভ। সে দিনটা ছিল ৪ঠা মে, ১৯৪৫।"[১০]

ইতিহাসের এই ডকুমেন্টারি ছবিটির পাশে যদি রাখা যায়, ভিন্নতর প্রেক্ষিতে কিন্তু সমসময়ে লেখা 'ময়দানে চলো' কবিতাটিকে, তবে তার আপাত-কাঁচামি ও চিৎকারকে মিথ্যা বলা যাবে না অন্তত :

"স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! যেখানেই থাকি, ময়দানে হবো সকলে সামিল আজকে
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! একবার লাখো হাত এক হোক, দেখে নেব পশুরাজকে।"[১১]

এইভাবে যদি ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপি থেকে তুলে এনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি পড়া যায়, তবে তার পারস্পেকটিভ কবিতাবিচারের এক স্বতন্ত্র মাত্রা হয়ে উঠতে পারে। নিছক সাহিত্যিক বিচার তার একমাত্র অভ্রান্ত মাপকাঠি থাকে না তখন। যেমন পরিপ্রেক্ষিত না জানলে তাঁর 'রামরাম' কবিতার প্রতি কখনোই সুবিচার করা যাবে না। কবিতাটি যে-কোনো রাজনৈতিক কবিতার মতোই রাগে রক্তচক্ষু, উপহাসপ্রবণ, একায়তনিক :

"...রাম রাম—
একটু তেল চাই কামানের চাকায়।

দিয়ে বহাল তবিয়তে থাকলেন নিজাম

এখন বজ্জাতগুলোকে টিট করা দরকার
চাই খুব জবরদস্ত এক
বন্দুক সরকার
মন্ত্রী হোন জহ্লাদ
তারপর দেখা যাক
জমির আস্বাদ
ভোলে কি ভোলে না
অবাধ্য স্বাধীন ছোটলোক তেলেঙ্গানা।"

হ্যাঁ, শুধু কবিতার নিক্তিতে বিচার করলে 'রাম রাম' অতি পানসে লাগবে, সন্দেহ নেই। কিন্তু অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চলের কৃষকদের বর্বর নিজামের বিরুদ্ধে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে প্রায় পাঁচ বছরের সেই বীরোচিত সংগ্রামের ইতিহাস যদি মনে থাকে, স্বাধীনতাসংলগ্ন সেই শোষণের মধ্যযুগীয় অত্যাচারের কথা যদি ঘোর অকৃতজ্ঞতায় ভুলে না যাই আমরা, তবে কবির এই প্রোপাগান্ডাপ্রবণতার একটা যুৎসই মানে পাওয়া যাবে। কারণ, ইতিহাস কিন্তু ভোলে না—

> "...the biggest peasant guerrilla war so far of modern Indian history affecting at its height about 3000 villages spreadover 16,000 square miles and with a population of three million."[১১]

এ কথা সত্যি, "পালাবার পথে ধুলো-ওড়ানোর দঙ্গলে" থাকা অদীক্ষিত মানুষ এতটা ইতিহাসচেতনাসম্পন্ন হয় না। এ দুঃখের দায় একা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নয় যদিও।

পাঁচ

কবিতাযাপন ও রাজনীতির মাঝে ভারসাম্যের খেলা আজীবন বড়ো সহজ নয়, হয়তো কাম্যও নয়। বিশ্বাস বদলায়। পুরনো বিশ্বাসের গায়ে কখনো কখনো দ্যাখা যায় সংশয়ের মরচে। হৃদয়ের পুরনো খাপে জং ধরে। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে পরবর্তীকালে এ বাবদ বেশ কঠিন মূল্য চোকাতে হয়েছিল। যারা তাঁর কবিতার গায়ে রাজনীতির রংটাই শুধু দেখেছিলেন, তারা অভিমানে তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। নির্দয়ভাবে ভুল বুঝেছেন কেউ কেউ। আগে থেকে গড়ে নেওয়া নিজেদের ধারণা ও প্রত্যাশার মানদণ্ডে কবিকে মাপতে চেয়েছিলেন যারা, একদিন সম্ভবত তারাও হতাশ হয়েছেন। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখালিখিতে উৎকর্ষ কমেনি, পক্ষপাত বদলায়নি। মানুষের নানাকৌণিক জিজ্ঞাসা আর যন্ত্রণার পরতে পরতে নিজেকে নিজের শর্তে জড়িয়ে নেবার পুরনো অঙ্গীকারেও ছেদ পড়েনি কোথাও। আসলে কবি জনতার ভিড়ের মাঝেই উত্তরকালের কবিতার জন্য যেন গড়ে নিয়েছিলেন এক গভীর নির্জন পথ। তারপর নিজের মতো হেঁটে গেছেন সেই পথে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত তিনি কিন্তু এই বিশেষ অর্থেও পদাতিক থেকে গেছেন।

আসলে বদলালো কে? কবি, না তাঁর পায়ের তলার মাটি? আসলে বদলালো কী?

পুরনো বিশ্বাস? নাকি, নতুন সমাজসময়ের বেশভূষা? বদলে গেল সেই 'মিছিলের মুখ', নাকি পরিবর্তিত পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে বদলে গেল মিছিলের তাৎপর্য ও প্রাসঙ্গিকতাটাই, বেমালুম? যে নবযুগ আনবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে কবির ঝাঁপিয়ে পড়া সেই অতিদাহ্য দিনগুলিতে, আজ কেন তার শীততাপনিয়ন্ত্রিত দশা? কেন তার দীপ্তি আর দাহ এখন এত রকমারি সুখের অসুখে বদলে গেল? পদাতিক কবি, তাঁর অগ্নিবর্ণ সময়, তাঁর রাজনীতি কি এই চেয়েছিল?

এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদের আরও একবার পদাতিক-অগ্নিকোণ-চিরকুট পড়তে হবে। কেন না শেষ পর্যন্ত "Poetry is not a turning loose of emotion, but an escape from emotion...।[১৩] অথচ কবিতার পাঠক জানে, এই ইমোশন কী সংক্রামক, তাই নাছোড়বান্দা সে বলতে পারে না—"অন্তত, আজ মাড়াই না তার ছায়া।"

উল্লেখপঞ্জী

(১) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৭, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, পৃ-৩

(২) বুদ্ধদেব বসু, ১৯৫৭, কালের পুতুল, নিউ এজ (প্রথম সং), পৃ-১২১

(৩) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৭৬, কবিতার কালান্তর (সুভাষ মুখোপাধ্যায়—প্রত্যয়ী পথিক), সান্যাল প্রকাশনী (প্রথম সং), পৃ-২৩০

(৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তদেব—পৃ-৩

(৫) বিনয় ঘোষ, ১৯৯৯, মেট্রোপলিটন মন মধ্যবিত্ত বিদ্রোহ (মেট্রোপলিটন মন), ওরিয়েন্ট ল্যংম্যান (পঞ্চম মুদ্রণ), পৃ-৬৪

(৬) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব। পৃ-২৩৫

(৭) "...between one and a half to three million in Bengal in a basically man-made famine. As starvation and malnutrition led to major epidemics of malaria, cholera, and smallpox, Bengal returned mortality figures considerably higher than normal for years after 1943."

Sumit Sarkar, 1983, 'Modern India : 1885-1947', Macmillan India Ltd (1st published) Madras, page-406.

(৮) "তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ আমাদের কাছে যেন দেবতার আশীর্বাদের মতো। রিলিফের কাজের মাধ্যমে আমরা মুষড়ে পড়া কংগ্রেসী ছাত্রদেরও কাছে টানার চেষ্টা করি।"

ছাত্রনেতা কমল চ্যাটার্জীর স্মৃতিচারণ। দ্রষ্টব্য :

অমলেন্দু সেনগুপ্ত, ১৯৮৯, 'উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব', পার্ল পাবলিকেশন, পৃ-১৬

এমন প্রাকৃতিক-সামাজিক সংকটেও এই রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি বিস্ময়কর, মনে পড়ে, "দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে" (সকলের গান)।

(৯) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, তদেব, পৃ-২৩৬

(১০) অমলেন্দু সেনগুপ্ত, তদেব—পৃ-৩

(১১) এই 'স্ট্রাইক'টি ছিল সম্ভবত ডাক ও তার বিভাগের ভারতব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, ২১

জুলাই ১৯৪৬, সরকার তা বেআইনি ঘোষণা করেছিল। ২৯ জুলাই ১৯৪৬ কলকাতায় তার সমর্থনে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়, এর সঙ্গে যুক্ত হয় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিমুক্তির দাবি। Amrita Bazar Patrika লেখে : "Calcutta in the history of 200 years of British rule had the biggest general strike on Monday, imvolving at least 10.00.000 workers." দ্রষ্টব্য :

পুলক চন্দ (সম্পাদনা), 'বাবু বৃত্তান্ত ও প্রাসঙ্গিক : সমর সেন', ২০০৪, প্রাসঙ্গিক তথ্য অংশ, দে'জ পাবলিশিং (রজত জয়ন্তী বর্ষ সং), পৃ-৩৫৮

(১২) Sumit Sarkar, Ibid, page-442

(১৩) T. S. Eliot, 1961, 'Tradition and Individual talent' (Selected Essays), Faber and Faber, London, page-53.

সুভাষিত গদ্যলিপি : হাংরাস.

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

প্রথমে ছিল কবি জীবনানন্দের পরিচিত তিনটি পংক্তি—'অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে/ চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে/ ভোরের দয়েল পাখি'। তারপর দয়েল পাখি দেখবার সাধ, এবং অচিরেই সেই সাধ পূরণ : 'একটা দয়েল পাখি মানুষের অর্ধভুক্ত একটা শবদেহের ওপর বসে তার গা থেকে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছিল কৃমি। কয়েক হাত দূরে আর একটি শবদেহ। তন্ময় হয়ে তার পায়ের দিকটা ছিঁড়ে খাচ্ছিল একটিমাত্র কুকুর। আমরা খুব কাছে নাকে রুমাল দিয়ে দাঁড়িয়ে। জোরে জোরে কথা বলছি। দয়েল পাখি কিংবা কুকুরটার কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।' লেখাটা শেষ হয়েছে এইভাবে : 'বড় হৃদয়হীন একটা ব্যাপার ঘটে গেল আমার জীবনে। আমি কি আর আমার কবিতায় কোনদিন শান্তভাবে দয়েল পাখির কথা বলতে পারব?'

লেখার নাম 'এক নির্দয় দয়েল পাখি', লেখক সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং পাঠক স্নাতক শ্রেণীর এক ছাত্র। আমার দিনের চিন্তা রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল এই লেখা। এরকম আরো কিছু লেখাও ছিল—বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ দিতে সেখানে গিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল লেখাগুলো। প্রত্যেকটি লেখারই ছিল একটা উত্তেজক আকর্ষণ, কিন্তু যে বীভৎস ভালোবাসায় জড়িয়ে গিয়েছিলাম ওই লেখাটির সঙ্গে, তা ভুলবার নয়। যে বয়সে লেখাটি পড়েছিলাম, সেই বয়সের একটা বাড়তি সম্মোহনী শক্তি থাকে, ততদিনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো সুভাষ মুখোপাধ্যায় হয়ে গিয়েছেন। 'আগ্নেয়গিরি পাঠালো যে এই রাত্রি' থেকে 'পাগল বাবরালির চোখের মত আকাশ' আমাদের মুখস্থ, শুরু করেছিলাম 'প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য' দিয়ে, পৌঁছে গেছি 'ফুলগুলো সরিয়ে নাও/আমার লাগছে'-তে। আর ফুল ফুটুক না ফুটুক? সে তো একটা স্বপ্নের স্মৃতি। বন্ধুরা মিলে কতবার যে এই পংক্তিগুলো একে অন্যকে শুনিয়েছি তার শেষ নেই—

'শান-বাঁধানো ফুটপাতে
পাথরে পা ডুবিয়ে এক কাঠখোট্টা গাছ
কচি কচি পাতায় পাঁজর ফাটিয়ে
হাসছে।'

সুতরাং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা মানে একটা অভিজ্ঞতা, সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে দেখা মানে একটা রোমাঞ্চ, পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চুলের মতো গাছ—এই উপমাচিত্রের চকিত আস্বাদনে মিলে মিশে যখন আমরা রসস্থ, তখনই ওই রচনা নিয়ে এলো আর-একটা মাত্রা।

এই রচনাগুলি সংকলিত হয়েছিল 'ক্ষমা নেই' গ্রন্থে। এবং ততদিনে জেনে গিয়েছি, আরো অনেক অনেক গদ্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন। লিখেছেন হয়তো সাংবাদিক হিসাবেই,

রিপোর্তাজ হিসাবেই, যেমন লেখা 'ক্ষমা নেই'। সেগুলো ছড়িয়ে ছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়—দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিকে; তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টির বাংলা কমিটির মুখপত্র 'জনযুদ্ধে'। আর কিছু লেখা লিখেছিলেন কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত কিশোর পত্রিকা 'রং মশালে', প্রথম দিকে। পরে 'সন্দেশ' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবেও লিখেছেন কিছু লেখা।

সেই কিছু লেখার পরিমাণ যে কতো, তার একটা আভাস পাওয়া গেল বছরদশেক আগে সুবীর রায়চৌধুরী ও অমিয় দেব সম্পাদিত প্রথম খণ্ড 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ' হাতে পেয়ে। বইয়ের নাম সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজে অবশ্য রেখেছিলেন, 'বাংলা আমার বাংলা', কারণ গ্রামাঞ্চল আর শিল্পাঞ্চলে যথেচ্ছ ভ্রমণের ফলে বাংলার যে অন্তরঙ্গ পরিচয় তিনি পেয়েছেন, তারই পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন গদ্যগ্রন্থগুলিতে। আমরা দেখলাম, জীবনে কম গদ্য তিনি লেখেন নি—প্রথম খণ্ডেই আমরা পেয়ে গেলাম 'আমার বাংলা', 'যখন যেখানে', 'ডাকবাংলার ডায়েরি', 'নারদের ডায়েরি', 'ক্ষমা নেই', 'আবার ডাকবাংলার ডাকে'।

জানা গেল আরো কিছু কথা, গদ্য দিয়েই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখালেখির শুরু। গদ্য সংকলনের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন—"সাহিত্যে আমার হাতে খড়ি হয় গদ্য দিয়ে। 'ধ'রে ভদ্র' বলে বাংলায় একটা কথা আছে। অনুরাগীদের মন রাখতে গদ্য ছেড়ে যখন পদ্য ধরলাম, তখন গদ্য আমাকে ছেড়ে চলে গেল। তারপর কলম ছেড়ে আবার যখন কলম ধরলাম তখন আমি পার্টির কাগজে। সোমনাথ লাহিড়ী আমার ঘাড়ে জোয়াল দিয়ে গদ্য না লেখালে এবং লিখতে না শেখালে আমার কলম দিয়ে আবার কখনও গদ্য বার হত কিনা সন্দেহ।"

।। দুই ।।

লেখার বিষয় 'হাংরাস', সুতরাং ধান ভানার আগে শিবঠাকুরের গানের প্রয়োজন কী, এ প্রশ্ন উঠতেই পারে। উত্তর একাধিক। প্রথম কথা হল, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় যে গদ্যের জগতে অতিথি-শিল্পী নন, তার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া, এবং দ্বিতীয় কথা, 'একটা দয়েল পাখি' পড়ে ঠিক যে অনুভূতি আমার হয়েছিল, 'হাংরাস'-এর সঙ্গেও যে সে-রকমই একটা রোমাঞ্চকর অনুষঙ্গ আমার আছে, তার একটা ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। সেই কারণে অনিবার্য ব্যক্তিগত প্রসঙ্গটিকে ক্ষমা করে নিতে হবে।

অধ্যাপনার জগতে তখন পুরনো নই, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি কলেজে প্রায় বছর দুয়েকের কর্মকাণ্ড শেষ করে কলকাতার মোটামুটি অভিজাত একটি কলেজে যোগ দিয়েছি। বিশ্ববাণী প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধারের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল একটি গ্রন্থপ্রকাশ উপলক্ষে। তিনিই হঠাৎ একদিন বলেছিলেন, 'দারুণ একটা ম্যানাসক্রিপ্ট পেয়েছি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস।' উপন্যাস! সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের! হাতছাড়া কি করা যায় সেই জিনিস! দুদিন ধরে সেখানে বসেই পড়ে ফেললাম। ঠিক সেই রোমাঞ্চকর অনুভূতি, প্রথম যৌবনের দিনগুলিতে দয়েল পাখি সম্বন্ধে লেখা পড়ে যা হয়েছিল।

'হাংরাস' উপন্যাস হয়েছে কী-না, এ সংশয় স্বয়ং লেখকের মনেই ছিল, কিন্তু রোমাঞ্চিত

গদ্যলিপি যে হয়েছে, আমার ব্যক্তিগত রোমাঞ্চ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যে কথাটা আমি জোর দিয়েই বলতে চাই সেটা হল, 'হাংরাস' উপন্যাসই হয়েছে, অন্য কিছু নয়, এবং উপন্যাস যে তিনি লিখতে পারেন, পরবর্তীকালে 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' কিংবা 'ঢোলগোবিন্দ' তার প্রমাণ। অবশ্যই প্রচলিত ধারার উপন্যাস নয়, আর সেই কারণেই সংশয় একটা তাঁর মনের মধ্যে থাকতেই পারে। মূলত যাঁরা কবি, এ সংশয় তাঁদের থাকেই বোধহয়—এই সংশয় ছিল বলেই এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ জীবৎকালে তাঁর উপন্যাসসমূহের একটিও প্রকাশ করেন নি।

বিষয়ের ইঙ্গিত দেবার জন্যেই উপন্যাসের এই বিচিত্র নামকরণের রহস্য উন্মোচন করা দরকার। লেখকের কথা : 'হাংরাস নামটা অনেকের কাছেই একটু খটমটে লেগেছে। লবণ আইন ভঙ্গের সময় মেদিনীপুরের যে গ্রামবাসীরা কারাবরণ করেছিল, পরে তাদের মুখে হাঙ্গার-স্ট্রাইক কথাটা হাংরাস হিসেবে বলতে শুনেছিলাম। কথাটা তাদের কাছে থেকেই ধার করে নিয়েছি।'

উপন্যাসেও কথাটা আছে, এইভাবে—"কথাটা প্রথম শুনেছিলাম সরডিহায়। এক পাকাচুল চাষীর মুখে। বিশ সালের আন্দোলনে ও-এলাকায় তিনি ছিলেন মাহাতোদের নেতা। বিরাট দলবল নিয়ে জেলে গিয়েছিলেন। জেলে তখন চলছিল হাংরাস। 'হাংরাস'? হ্যাঁ, হাংরাস। পাশে ছিলেন সুরজিৎবাবু। আমাকে টিপে দিয়ে কানের কাছে ফিস ফিস করে বলেছিলেন, মানে হাঙ্গার-স্ট্রাইক।"

এইরকম একটি দীর্ঘ হাঙ্গার-স্ট্রাইকই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। সঠিকভাবে কোন আন্দোলন তার পরিচয় দেওয়া হয়নি, দেবার দরকারও ছিল না বোধহয়। তবে ঘটনা-বর্ণনার ডকুমেন্টেশন এবং বাস্তব খুঁটিনাটি প্রমাণ করে দেয় এ জাতীয় উপন্যাস আত্মজৈবনিক তথ্য-সংগ্রহ ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না। বস্তুত তার বাইরে যাবার মতো শৌখিন মজদুরি সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখানও নি। আবার আমি একটি আত্মচরিতমূলক কাহিনী লিখতে বসেছি, এরকম সদম্ভ ঘোষণাও তাঁর নেই। চরিত্রের নাম স্বাভাবিক কারণেই তিনি গোপন করেছেন, কথক চরিত্রের নামই করেছেন অরবিন্দ। সেটা তাঁর কর্তব্যই ছিল। আরো কিছু করেছেন, একে উপন্যাস করে তুলবার জন্যে।

যাঁরা চিনবার তাঁরা চিনবেন, যাঁরা বুঝবার তাঁরা বুঝবেন, সে দায় লেখকের নয়। উপন্যাসের প্রথম দিকেই কথক-লেখক বলেছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ের গভীরে সংস্কারের মতো জমে থাকা শ্রদ্ধার কথা। সংকল্প করেছিলেন—'রবি ঠাকুরকে আচ্ছা করে তুড়ুং ঠুকে দেব। রবি ঠাকুর বুর্জোয়া। আর বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই।' অথচ বলার সময় সব উলটে গেল। কেন এমন হয়, কার এমন হয় আমরা তো জানি। তিনি চুরানব্বই সালে হাংরাসের প্রথম দে'জ সংস্করণের ভূমিকা লিখতে গিয়েও বর্জন করতে পারেন না রবীন্দ্রনাথকে—'একটা উপন্যাস লিখব। বিশ-বাইশ বছর ধরে এটা একটা ইচ্ছা হয়ে ছিল মনের মাঝারে।' উপন্যাসের বর্ণনা আর কবিতার চিত্র কখনও অভিন্ন হয়ে যায়। উপন্যাসে লেখেন :

(ক) 'আমি তো ঠিক ওদের সঙ্গে লড়িনি, লড়েছিলাম নিজের সঙ্গে। একেবারে দাঁতে দাঁত দিয়ে। মনের জোরে পেরেছিলাম। হেরে গেলাম গায়ের জোরে।'

(খ) 'ভারী ভারী লোহার খাট ফেলে দরজার মুখটা বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর খাট টেনে টেনে সিঁড়িটা নিচে থেকে ওপর অবধি জ্যাম করে দিয়ে একতলা দোতলা খালি করে দিয়ে আমরা সবাই চলে গেলাম তিনতলায়।'

(গ) ''ওরা টিয়ার-গ্যাস ছুঁড়ছে, কমরেড। ড্রামের জল মেঝেতে ঢেলে দিন।' ...ভিজে জবজবে হয়ে আছে বারান্দা।''

(ঘ) 'হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো কট্ কট্ কট্ করে একটা আওয়াজ। সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—গুলি।'

দু-বছর আগে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'এই ভাই'-এর 'জেলখানার গল্প' কবিতার কিছু পংক্তি :

'গরম গরম গেলাস দুটো ভাঙাচোরা টেবিলে বসিয়ে
পুরনো দিনের গল্প, সেও খুব রসিয়ে রসিয়ে
বলা হল।
দাঁতে দাঁত দিয়ে সব বসে থাকা
কিছুতে না খাওয়া,
সারা সিঁড়ি ব্যারিকেড, বারান্দায় জল ঢেলে রাখা
টিয়ার-গ্যাসের জন্যে, সারারাত ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি
তবু কী আনন্দে, ভাবো
কেটেছিল জীবনের সেই দিনগুলি।'

আজকের দিনের পাঠক হাঙ্গার-স্ট্রাইক বা অনশন ধর্মঘটের ব্যাপারটা ঠিকঠাক ভাবে যে জানবেন, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা যে পাবেন, তার সুযোগ কম। 'প্রজাপতি' উপন্যাসে সমরেশ বসু সুখেনের টোকেন হাঙ্গার-স্ট্রাইকের যে বর্ণনা দিয়েছিলেন, বহুপঠিত উপন্যাসের সে বর্ণনা কারো কারো পড়া থাকতে পারে। অল্প কয়েকদিনের অনশনের অভিজ্ঞতাই সেখানে বর্ণিত হয়েছে, যদিও অনুপুঙ্খ ও বাস্তব সেই ক্ষুধার বিবরণ যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই সজীবতা লাভ করেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসে সেই প্রত্যক্ষতা যে আছেই তার সামান্য উদাহরণ—'সাধারণত গোড়ার বাহাত্তর ঘণ্টা ক্ষিধেয় ভোঁচকানি লাগে। এবার সব উল্টো। ক্ষিধে যেন দিন দিন বাড়ছে। উঠে উঠে বার বার ঢক ঢক করে জল খাচ্ছি। সেই সঙ্গে একটু করে নুন। এই করে খানিকক্ষণ ক্ষিদেটাকে চাপা দিই। তারপর আবার যে-কে সেই।'

অথবা, 'এবারের অনশনে জোলাপ নেওয়ার সময় হয়নি। ফলে, মনে মনে ভয় ছিল। মাথা ধরা, পেটের মধ্যে খিঁচুনি ধরার ভয়।'

অথবা, 'বলাইদা আমাদের পই-পই করে বলেছেন, হাঙ্গার-স্ট্রাইকের সময় কেউ যেন ভুলেও কোনোরকম খাবার দাবারের কথা না বলে। খাবারের কথা মনে হলে তক্ষুনি অন্য কথা ভাবতে হবে।'

অথচ বার বার মনে ঘুরে আসে কিন্তু ওই খাবারের কথাই। যেমন, 'পালালে অন্তত বাইরের নেতারা আপত্তি করতেন বলে মনে হয় না। মনে আছে, চোখ দেখানোর পর পুলিশের লোকেরা জেলের পয়সায় দোকানে নিয়ে গিয়ে আমাদের চা টোস্টও খাইয়েছিল।

সাবধান! ঘুরে ফিরে আবার সেই খাওয়ার কথায় চলে যাচ্ছি কিন্তু!'

অথবা—'মনে পড়ে গেল, কালীতলার সেই জঙ্গলের কথা। বছরের একটা দিন আমরা গাঁ সুদ্ধু সবাই সেখানে যেতাম বনভোজনে। সেই একটা দিন কোনো জাত মানামানি থাকত না। সবাই আমরা এক পঙ্‌ক্তিতে বসে খেতাম। বিল থেকে তুলে আনা হত পদ্মপাতা। পদ্মপাতার গন্ধটা এখনও লেগে আছে। গরম ভাত আর পাঁঠার মাংস।

নিজেকে তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে উঠে পড়লাম।'

অথবা—'পদ্মার চরে মাঝিরা নাকি এক অদ্ভুত কায়দায় রান্না করে। শঙ্কর বলল। টাটকা ইলিশ মাছ নেবে। আঁশ ছুলে নেবে। তারপর কাটবে। উঁহু, ছুরিবঁটি নয়। ধারালো বাঁশপাতা দিয়ে। তারপর লঙ্কাবাটা নুন-হলুদ দিয়ে কলপাতায় মুড়ে একটু গর্ত খুঁড়ে তার ভেতর রাখবে। ওপরে বালি চাপা দেবে। রান্না হবে রোদে তাতা বালিতে। তেল তো ঐ ইলিশের গায়েই আছে। ভাতটাও ঐ বালির আঁচেই রাঁধা হবে। ঐ ইলিশ দিয়ে ঐ ভাতের নাকি তুলনা নেই। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন।

এরপর ঘুমটা মনে হয় ভালোই হবে।'

অবশ্য এহ বাহ্য। উপন্যাসের আকর্ষণের কয়েকটি মাত্র দিক বিচ্ছিন্নভাবে বলা হল মাত্র, এবার উপন্যাস হিসাবে এটি কেন গ্রাহ্য ও মান্য, সে কথাই বলার চেষ্টা করবো।

একটানা দীর্ঘদিন অনশন ধর্মঘটের কাহিনী—লক আপ না করার জন্য প্রতিরোধ, ব্যারিকেড ও হাতে ছোঁড়া যায় এমন যাবতীয় জিনিস ছুঁড়ে পুলিশকে প্রতিহত করার চেষ্টা এবং পুলিশের টিয়ার-গ্যাস ও গুলির সামনে তা প্রায় ব্যর্থ হওয়া; দীর্ঘদিন কেটে গেলেও খাদ্য গ্রহণ না করার দৃঢ় মানসিকতা এবং পুলিশের চিকিৎসককে দিয়ে ফোর্স ফিডিং, এ সব প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে ওঠার কথা। ফলে প্রত্যেক দিনের রোজনামচা, মানে যে ভঙ্গিতে সমগ্র উপন্যাসটি রচিত, একঘেয়ে হয়ে উঠবার একটা আশঙ্কা ছিল। নতুন অনেক কিছু পাঠক জানতে পারেন, যা রাজনীতি ও কারাবাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া জানা প্রায় অসম্ভব—যেমন রান্নাবান্নার লোকেদের সঙ্গে থাকা 'ফালতু', গোপন রাজনৈতিক আলোচনার নাম 'কারখানা', জেলের প্রাত্যহিক জীবনের অনেক অনুপুঙ্খ বর্ণনা প্রভৃতি। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। একঘেয়েমি কাটাবার জন্য লেখক মাঝে মাঝেই অরবিন্দের স্বগত কথনের মধ্য দিয়েই অতীত জীবন, রাজনীতিতে মতের বিভাজন, প্রধান কমরেডদের পরিচয় ইত্যাদি সবই অনাবৃত করেছেন। তবু মনে হয় যেন এটাই যথেষ্ট ছিল না।

এবং তা মনে হয়েছে সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও। সেই কারণেই উপস্থাপন রীতি বা Mode of Representation-এর সম্ভবত প্রাথমিক পরিকল্পনা বর্জন করে তিনি দ্বিতীয় একটি রীতি গ্রহণ করেছেন। দুটি রীতিকেই বাংলাতে এখনো পর্যন্ত আত্মকথকমূলক রীতি বলা হয়, কিন্তু রীতিদুটি সম্পূর্ণ পৃথক বলে তাদের [illegible] নামে চিহ্নিত করাই সংগত এবং আমি দীর্ঘকাল

একটি স্বতন্ত্র নামের প্রস্তাব করে আসছি, তা গ্রাহ্য হবে কী-না তা সময়ই বিচার করবে। একটি রীতিতে স্বয়ং লেখক অথবা উপন্যাসের কোনো প্রধান চরিত্র উপন্যাসের আখ্যান বিবৃত করে যান। বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' বা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' এই রীতিতে রচিত। এই রীতিকে বলা হয় আত্মকথনমূলক রীতি। কিন্তু আর একটি স্বতন্ত্র উপস্থাপন রীতিও আমরা দেখে থাকি যেখানে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি উপন্যাসের অংশবিশেষ কথনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' বা বিমল করের 'অসময়'। এই রীতিকে, আমার মতে, বলা উচিত চরিত্রকথনমূলক রীতি।

'হাংরাস' উপন্যাসের সূচনা দেখলেই বোঝা যায়, কাহিনীর মূল চরিত্র অরবিন্দ অথবা স্বয়ং লেখক—যাই বলা যাক না কেন, রোজনামচার ভঙ্গিতে সমগ্র কাহিনী বর্ণনা করে যাবে। কিন্তু ছ-নম্বর আত্মকাহিনী রচনা করবার সময়ই সম্ভবত লেখকের মনে হয়েছে, এই একঘেয়ে বর্ণনা পাঠককে ক্লান্ত করতে পারে। তাই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দুজনের জবানীতে এই কাহিনী বর্ণনার সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য—একজন বুদ্ধিজীবী ভদ্রসন্তান এবং অন্যজন শ্রমজীবী নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মানুষ, লেখক বলছেন :

'বাদশার সঙ্গে আমার আরও একটা প্ল্যান হয়েছে। রোজ দুপুরে ওর সঙ্গে বসব। ও বলে যাবে ওর জীবনের কাহিনী। আমি নোট নেব। পরে যদি কখনও উপন্যাস-টুপন্যাস লিখি, কাজে লাগাব।'

পরে যদি কখনও লিখি টিখি, এসব কথার কথা মাত্র, আসলে এটাই সেই উপন্যাস যেখানে অরবিন্দ এবং বাদশার জীবনকাহিনী স্বতন্ত্রভাবে এগুচ্ছে দুজনের স্বতন্ত্র জবানীতে, যাতে দু-ভাবে এর বৈচিত্র্য সৃষ্টি হচ্ছে—দুজনের জবানীতে দু-ধরনের ভঙ্গি আমরা লাভ করছি, এবং একই সঙ্গে সমাজের সম্পূর্ণ দুটি স্তরের মানুষের জীবনাখ্যান চিত্রিত হয়ে একে অনেক বেশি আস্বাদ্য করে তুলেছে।

এরকম পরিকল্পনা বদল বাংলা সাহিত্যে কখনোই হয়নি এমন নয়। রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি শুরু হয়েছিল আত্মকথনমূলক রীতিতে, যদিও স্পষ্ট উল্লেখ ছিল না তার। কিন্তু 'আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ...' ইত্যাদি উক্তিতে সে কথা বোঝাই যায়। পরে রবীন্দ্রনাথ ফিরে এসেছেন সাবেকি উপস্থাপন রীতিতে, ইংরেজিতে যাকে বলে Third Person Novel এবং বাংলায় বলে প্রথম পুরুষের জবানীতে রচিত উপন্যাস।

দুটি ভিন্ন গোত্রের মানুষ কেমন করে রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ করেছে, রাজনৈতিক সহযোদ্ধাদের প্রতি তাদের মনোভাব কেমন, দিন বদলের স্বপ্ন তারা কেমন করে দেখছে এবং কেমন করে অনিবার্য নিপীড়নকে অক্লেশে তুচ্ছ করছে—এই নিয়েই উপন্যাস। অবশ্য তফাৎ একটা আছেই, অরবিন্দ বুদ্ধিজীবী মানুষ, কেমন করে সে রাজনীতির জগতে এসেছে, সে সব কথা খুব বেশি নেই—আছে তার চেয়েও এক সংরক্ত সংগ্রাম, যে সংগ্রাম এই রাজনীতির জগতে আসার পর তার নিজের সঙ্গেই নিজের চলছে অহরহ। মার্ক্সিস্ট হিসাবে পার্টির অনুশাসন একদিকে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত মানুষ হিসাবে তার স্বাধীন ইচ্ছা-অনিচ্ছা। ব্যক্তিগত ভালোলাগা-মন্দলাগা সে দমনই করে, কিন্তু মনে মনে যে বিদ্রোহ জেগে ওঠে—

যা কোনো দিন প্রকাশ করা হবে না হয়তো, এই সংঘশক্তি বনাম ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে অরিন্দমের স্বগত কথনে। আর বাদশার আত্মকথনে পাই, নিতান্ত অলিখিত একটি খেটে-খাওয়া পরিবারের মানুষ কেমন করে এসে পড়ল রাজনীতির জগতে, সেই বৃত্তান্ত। এই দ্বিতীয় আত্মকথন সন্তুষ্ট করবে গল্পপ্রিয় পাঠক-পাঠিকাকে, কারণ এই কথনে নাটকীয়তাও খুব বেশি। প্রথম আত্মকথনে নাটকীয়তা বিশেষ নেই, আপাতপ্রশান্ত একটি মানুষের মনে সকলের অন্তরালে যে নাটক চলে, মনস্তত্ত্ব-প্রিয় পাঠকের কাছে তা অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হতে পারে।

অবশ্য অরবিন্দের জবানীতে শুধুই যে এই অন্তর্লীন দ্বন্দ্ব আছে তা নয়, বিভিন্ন চরিত্রের গল্প সেখানে আছে—যেমন ওয়াগন-চোর আবদুল; কিংবা আছে বিভিন্ন পুরনো পড়া বা শোনা গল্পের অনুষঙ্গ ও ব্যাখ্যা, কিন্তু মূল ব্যাপার ওই মানস-সংকট।

অরিন্দমের অন্তর্লীন সংঘাতের শুরু, এই উপন্যাসে, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক তার বক্তব্য থেকে। কবি-প্রশস্তির পরই তার স্বীকারোক্তি পাই—'আমার ভয় এ নয় যে, কমরেডরা এবার আমাকে এক হাত নেবে। ভয় আমার নিজেকে নিয়ে। আমি মার্ক্সবাদ এখনও আয়ত্ত করতে পারিনি বলে। আমি এখনও পেটি বুর্জোয়া থেকে গিয়েছে বলে।'

কারণটাও সে বুঝতে পেরেছে, 'আমি বুঝতে পারছি আমার সমস্ত ভুলের গোড়ায় আমার জন্ম। আর আমার সমস্ত দুর্বলতার মূলে আমার দাদু।' অর্থাৎ heredity এবং শৈশবের environment দুটোই তাকে ওই মানসিকতায় বদ্ধ করেছে। অরবিন্দ আবারও বলেছে, 'আমাকে পেছন থেকে ধরে রেখেছে আমার দাদু, আমাকে বেঁধেছে ভালবাসার মায়াডোরে।' জন্মসূত্রে যে মানসিকতা সে পেয়েছে তার পরিচয়ও আমরা পেয়ে যাই উপন্যাসের প্রথম দিকেই—'ছেলেবেলায় ঘাসে শুয়ে আকাশটাকে নিয়ে মনে মনে আমি খেলতাম। অনেকটা সিনেমা দেখার মতো। চলন্ত ভেড়ার পাল। রাখাল। কত সব মজাদার মুখ। উদ্ভট জানোয়ার।'

রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ক মন্তব্য অরবিন্দর জবানীতে বারবারই আমার দেখি। একটা জবানী শুরু হয়েছে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের রেশ কানে ভেসে আসা নিয়ে। পার্টি করতে এলে রবীন্দ্রসংগীতও বর্জন করতে হবে কী-না, জিজ্ঞেস করলে ট্রেড ইউনিয়নের নেতা উত্তর দিয়েছিলেন, 'কেন? না গাইলে খুব কষ্ট হবে?' লেখক জানিয়েছেন—'আমার ঠিক উল্টো। বরং গাইলেই বেশি কষ্ট হবে। শুনলে আরও। বিশেষ করে যদি সেই সব গান হয় যা ছেলেবেলায় শুনেছি। বুকের মধ্যে হাঁচড় পাঁচড় করে। কেন যে কান্না পায়, কিসের এত স্মৃতি তাও ঠিক বুঝি না। শুধু মন খারাপ হয়।'

পার্টির অনুশাসনে অরবিন্দ কারাবরণ করেছে, পার্টির নির্দেশমতোই হাঙ্গার-স্ট্রাইক চলছে, কিন্তু মনের ভেতর অনুক্ষণ যে বিদ্রোহ চলছে তার পরিচয় বাইরে থেকে পাওয়া যায় না। যায় না বলেই স্বয়ং অরবিন্দকেও অবাক হয়ে ভাবতে হয়েছে মনীশের মতো কমরেড কেন পার্টি লাইন ছেড়ে দেয় অকস্মাৎ, কমলের মতো নিষ্ঠ কমরেড কেন হয় পুলিশের দালাল। নিজের সঙ্গে লড়াইয়ের তুলনামূলক একটা দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিই :

'কমরেডদের বলা যাবে না সে কথা। জেলের চেয়ে জেলের বাইরেটা যে হাজার গুণ

ভাল, এ কথা বলা যাবে না।

...এইভাবে জেলে পচে মরার কী মানে হয়? আমি যদি হাঙ্গার-স্ট্রাইক ভেঙে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাই, তাহলেই যে লড়াই ভেস্তে যাবে তা তো নয়। ...বাইরে গিয়ে পার্টিকে বলব আমি আন্ডার গ্রাউন্ডে যেতে চাই। যদি বলে ব্যারিকেড করে লড়াই করো, তাও করবো। আমি শুধু চাই এই দম-আটকানো জেলখানা থেকে বেরোতে, না খেয়ে তিলে তিলে মরবার হাত থেকে বাঁচতে।

...কমরেডরা বিশ্বাসঘাতক বলবে? বলুক না। আমি কোনো গ্রামে চলে যাব, যেখানে কেউ আমাকে চিনবে না। গ্রামে গিয়ে মাস্টারি নেব। চাষীদের মধ্যে কাজ করব। সমিতি গড়ে তুলব। তখন পার্টি বুঝবে, আমাকে ছাড়লেও আমি পার্টিকে ছাড়িনি।'

অরবিন্দর আত্মকথনে প্রেমের কথাও আছে। পার্টি মিটিঙেই একটি মেয়েকে দেখে মন টলেছিল, একেবারে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব, মেয়েটির চিঠিতে সরাসরিই তা ভেস্তে যায়, কারণ সে ভালবাসে অন্য একটি ছেলেকে। মেয়েটির নাম ছিল প্রতিমা। সেই অনুষঙ্গেই মনে পড়ে যায়—'সেও ছিল প্রতিমা! মাঝখানে হঠাৎ একটি ট্রাম এসে যাওয়ায় যাকে আমি চিরদিনের মতো হারিয়েছি।'

এটি অবশ্য অকথিত প্রেম। ক্লাসেরই ছাত্রী। গাড়ি করে আসতো। কখনো কখনো ট্রামে। ট্রামে তার পশ্চাদ্ধাবনের চেষ্টা বানচাল হয় ওই মাঝখানে আর একটি ট্রাম এসে পড়ায়, প্রেম নিবেদন আর করা হয় না। ভবিষ্যতে তা করার আগেই নাম কাটিয়ে প্রতিমা চলে যায়।

অসাধারণ এই আত্মকথনের ভঙ্গিটা ছিল, আধুনিক সমালোচনার যাকে বলা হয় চেতনা প্রবাহ রীতি, সেই ধরনের, মানে প্রয়োগটা সেই রকমের। এক-একটা প্রসঙ্গ থেকে তার অনুষঙ্গেই এসেছে ভিন্ন কোনো প্রসঙ্গ। এই মনে পড়ে যাওয়া বা association ব্যাপারটা এই উপন্যাসে এত স্বচ্ছন্দ এবং স্বতঃস্ফূর্ত যে কখনোই মনে হয় না এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে যাচ্ছি। একটা উদাহরণ দিই :

"হঠাৎ 'অলম্' কথাটা মনে পড়ল। ওতে তো প্রয়োজন অপ্রয়োজন দুটোই বোঝায়। অলংকার হল বাইরে থেকে চাপানো বাড়তি জিনিস। উপরন্তু। প্রয়োজনের অতিরিক্ত। আবার অভাব মিটিয়ে কাজে লাগে। রূপ খোলতাই করে। দোষগুলো ঢাকে।

অলংকার। আমার আম্মার কোনো অলংকার ছিল না। একটা সেলাইয়ের কল ছিল। আম্মা সেই কলটা ছোটমামার বউকে দিত। কিন্তু ছোটমামা মারা গেল।

ছোটমামা মারা গেল আম্মার কাছে। আসলে ছোটমামা মারা যায়নি। লড়াই শেষ হতেই কিভাবে কিভাবে যেন বিলেতে চলে গিয়েছিল। ওখানে মেম বিয়ে করেছে।"

উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গের অভাব নেই অরবিন্দের জবানীতে। সেখানে যেমন আছে, পকেটমার কীভাবে গলায় থলি বানিয়ে রাখে—কী কষ্টকর পদ্ধতির মাধ্যমে, তেমনি আছে ব্যক্তি এবং পদ্ধতির নতুন নতুন নামকরণের আশ্চর্য উদ্ভাবনী শক্তি। গোপন পার্টি মিটিংকে বলা হল কারখানা, সে উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, এছাড়াও আছে মার্শাল ভরোশিলভ, অনোসেনাপতি,

অনোসৈনিক। মার্শাল ভরোশিলভের রহস্যটা হল এইরকম :

'সাত নম্বরে শৈল দুজন। বড়-শৈল আর ছোট-শৈল। ছোট শৈল ছোট-শৈলই থেকে গেছে। কিন্তু কালক্রমে বড়-শৈলের নাম দাঁড়িয়ে গেছে ভরোশিলভ।'

অন্য দুটি নামের রহস্য :

"বলাইদা আমাদের পই পই করে বলেছেন, ...মনে রাখবেন কমরেড, অনশন হল লড়াই। আপনারা প্রত্যেকে হলেন সৈনিক।

আজকালকার ছেলে ছোকরারা বড়দের মান্য করতে জানে না। ...বলাইদার বক্তৃতা শুনে পেছনে বসে তারা টিপ্পনি কাটে। বলাইদাকে বলে 'অনোসেনাপতি'। অনশনের সৈনিকদের বলে 'অনোসৈনিক'।"

বাদশার জবানীতে তার যে জীবনকথা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা আদ্যন্ত কাহিনীধর্মী বলেই সেই কাহিনী উল্লেখ করার বিশেষ কোনো প্রয়োজন দেখছি না, শুধু এইটুকু বলতে পারি, নাটকীয় এই কাহিনীতে লেখক কিন্তু অত্যন্ত উদ্দেশ্য সচেতন—কী-ভাবে রাজনৈতিক চেতনা-শূন্য পরিবেশ ও বংশ থেকে একটি মেহনতী রাজনৈতিক ব্যক্তির উত্থান ঘটে, এটি তারই কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ।

ঠিক এই সামাজিক স্তর থেকে একটি অলিখিত মানুষ রাজনৈতিক আন্দোলনে সামিল হওয়ার পরও তার যে দুঃখ থেকে যায়, সেটাকে একেবারে সঠিকভাবে ধরেছেন লেখক। বাদশা বলেছে : 'আমি যাই বলি না কেন, যাই করি না কেন—লেখাপড়া করতে না পারার দুঃখটা মনের মধ্যে থেকেই গিয়েছিল। মাঝে মাঝে সেই দুঃখটা খোঁচাত।

...এই জেলখানায় এসে আমরা যে ভাই-ভাই, কমরেড কমরেড বলি এটা সত্যিই খুব ভালো লাগে। তাছাড়া দেখুন, আপনারা তো মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, অনেক কিছু পাস করেছেন, বাড়ির অবস্থা ভালো—জেলে না এলে আপনাদের এত কাছে পাওয়া কি সম্ভব হত? এটা ভেবে ভালো লাগে যে, আপনারাও চাষী মজুরদের সঙ্গে আছেন।

...কিন্তু সত্যিই কি, ইচ্ছে থাকলেও, আলাদা আলাদা ভাবে জীবন কাটিয়ে হঠাৎ এক জায়গায় এসে পড়ে সে রকম ভাই-ভাই ভাব আনা যায়? এই হাঙ্গার-স্ট্রাইক কিংবা শত্রুর সঙ্গে যেখানে সামনাসামনি লড়াই হচ্ছে—তখনকার কথা আলাদা...সেটা একটা অল্প সময়ের ব্যাপার।'

হতে পারে, কিন্তু লেখাপড়া না শিখেও প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা যে আসে, শ্রেণী-সংগ্রামের প্রকৃত রহস্য যে শ্রমিক শিখে যায়, তার প্রমাণ বাদশার এই কথাগুলো :

'কলকাঠি যারই হোক, নাড়ানাড়ি করছি তো আমরা। না কী বলেন? আমরা নাড়াচ্ছি বলেই না মালিকদের লাভ হচ্ছে। আমরা যদি হাত সরিয়ে নিই, তাহলে সব বন্ধ। মালিক তো ঠুঁটো জগন্নাথ। সুতরাং কলকাঠি সব বলতে গেলে আমাদের হাতে। কলকাঠি কার? মালিক বলছে, আমার। আমরা বলছি, যে চালায় তার। কলকাঠির মালিক আসলে আমরা। আমাদের লড়াইটা শুধু ছাঁটাই ঠেকানো, মজুরি বাড়ানো, খাটুনি কমানো—এ নিয়ে নয়; আমাদের আদত মামলা মালিকানা নিয়ে।

আমি দেখেছি কমরেড, একেবারে গোড়া ধরে টান দিতে পারলে কাজ হয়। লড়াইতে জোর বাঁধে। তা না হলে বাজার, চাহিদা, দরদাম, লাভ—এ সবের ঘাবলায় পড়ে গিয়ে লোকে ঘাবড়ে যায়।'

বাদশার বা-জানও শিক্ষিত ছিল না, মুখে বলত অন্য কথা, কিন্তু প্রাণ দিল প্রকৃত সচেতন কমরেডের মতো। সেই অসমাপ্ত আত্মোৎসর্গের কাহিনীতেই বাদশা-বৃত্তান্ত শেষ হয়েছে।

।। তিন।।

ঠিক তেমনভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষাশিল্প নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোনো আলোচনা হয়েছে কী-না মনে পড়ছে না, এটা আমার অজ্ঞতার ফলও হতে পারে, কিন্তু প্রথম জীবনে সমিল ও স-ছন্দ আবির্ভাবের পর স্বচ্ছন্দ নিপাট গদ্যে—শানবাঁধানো কাঠখোট্টা গদ্যে যে পাঁজর কাঁপানো কবিতা তিনি লিখেছেন, আমাদের ঝড়ো পাগলামির দিনে তা বিস্ময়কর হয়েই ছিল। গদ্যকবিতা কথাটা আমাদের জানা ছিল, কিন্তু সে গদ্য ব্যবহারিক ও প্রতিদিনের প্রয়োজনের ভাষার চেয়ে কোথায় যেন ছিল আলাদা। হয় ক্রিয়াপদকে সামনে টেনে এনে একটু কোমলতা সৃষ্টির চেষ্টা, অথবা শব্দের সুরভিত সজ্জায় একটা মন ভোলাবার আয়োজন, মোটের ওপর একটা অন্যরকম কিছু—এই বোধটা থেকে মুক্তি পাবার কোনো উপায় ছিল না। উপায় একেবারেই কারো কবিতায় ছিল না বলতে গিয়ে অকস্মাৎ একজন কবির উদ্যত নিঃশব্দের তর্জনী অনুভব করছি—কবি সমর সেন, কিন্তু সেখানে কবিতার চেয়ে অ-কবিতা সৃষ্টির গর্বিত ঘোষণাই যেন ছিল সোচ্চার। কাঠখোট্টা গদ্যেও কবিতা হয়, এবং কবিতাই হয়, অন্য কিছু নয়, এই রকম একটা মোহগ্রস্ত বিস্ময়ে আমাদের আপ্লুত করে রেখেছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার গদ্যভাষা।

আর-একটা বিস্ময় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তাঁর অ-কবিতার গদ্যভাষায়। একেবারে এক ভাষা, এক রকমের শব্দ ব্যবহার, এক রকম বিন্যাস এবং একই ধরনের প্রয়োগ-কৌশল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষা পড়ে যিনি অভ্যস্ত, তিনি কল্পনার চোখে দেখতে পাবেন সেই একই কলম লিখে চলেছে তাঁর রিপোর্টাজ, দিনলিপি, উপন্যাস। সেই একই মানসিকতা, একই সামর্থ্য, একই শিল্পসিদ্ধি। শব্দনির্বাচনে কোনোরকম সংস্কার নেই, লাগসই শব্দ এসে গেলে তা প্রয়োগের জন্য একবারও ভাবতে হয় না, অথচ স্বতঃস্ফূর্ত এক সারল্য সেই বর্ণনার ভাষায় এমনভাবে জড়িয়ে থাকে যে আমরা নতুন করে বুঝি, সহজ কথা সত্যিই সহজে বলা যায় না। সর্বত্র তো এতো সহজও নয়, অথচ বলা হয় এমন সহজ করে যে বোঝা যায় জাদুকরী এক নিয়ন্ত্রণশক্তি শব্দ নিয়ে যেন যথেচ্ছ খেলা করছে।

আমার কথার সমর্থনে বিশিষ্ট কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের কিছু মন্তব্য উদ্ধার করিতে পারি, তিনি লিখেছেন—"এর আগেই পদাতিক নামের কবিতার বইটিতে সুভাষের নতুন উচ্চারণভঙ্গি আর কবিদৃষ্টি চমকে দিয়েছিল। ...এর ক-বছর পরে যখন ওই সব রিপোর্টকেই ভিত্তি করে খানিকটা ব্যক্তিগত চালে লেখা সুভাষের 'আমার বাংলা' নামের বইটি বেরুল, তখন শুধু আমরা নয়, পার্টির ভেতর ও বাইরের আরও অনেক পাঠক সুভাষের গদ্যরচনারও

ভক্ত হয়ে পড়লুম। ...সারা অঙ্গে ছড়িয়ে ছিল খাঁটি বাংলা বাক্‌রীতির অজস্র নমুনা। সাধারণ মানুষের আটপৌরে ভাষাতেও যে কতখানি স্বচ্ছন্দ কবিত্বের জোর নিহিত থাকতে পারে সুভাষ তার প্রমাণ দিলেন, আর সেই সঙ্গে গড়ে তুললেন তাঁর নিজস্ব গদ্যরীতি।"

সমালোচনা কে করেছিলেন জানা নেই, কিন্তু আনন্দবাজার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রথম গদ্যগ্রন্থ সম্বন্ধে এই রকম মন্তব্যই করেছিল—'তৎসম শব্দবর্জিত, চলতি ইডিয়মে সমৃদ্ধ এমন ঝরঝরে গদ্য, বলতে দ্বিধা নেই, খুব অল্পলোকই লিখতে পারেন।'

'পরিচয়' পত্রিকার জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ সংখ্যায় কুশল লাহিড়ী সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, 'তাঁর সহজ সরল, কাব্যময় উপমা প্রয়োগের ভঙ্গি, কথকতার অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি সম্মিলিত হয়ে গদ্য রচনাকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে।' তিনি এ কথাও প্রবন্ধের প্রথম দিকে বলেছেন যে তাঁর কবিতার ভাষা এবং গদ্যরচনার ভাষার মধ্যে আশ্চর্য এক সমধর্মিতা আছে। তাঁর বক্তব্য " 'যখন যেখানে' পুস্তকের বলার ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর শেষ দিককার কবিতার ('ফুল ফুটুক' পর্যায় থেকে) আশ্চর্য মিল আছে। কবিতায় তিনি যেমন গল্প বলার ধরন গ্রহণ করেছেন, বর্তমান গদ্যগ্রন্থে তার বিশেষ ব্যত্যয় ঘটেনি। বলা যায় তাঁর গদ্যে কাব্য ও গদ্যের হর-পার্বতীর মিলন হয়েছে, কবিতায় গদ্য ও কাব্যের।'

যে সব মন্তব্য স্মরণযোগ্য মনে হওয়ায় উদ্ধার করলাম তাদের প্রত্যেকটি 'হাংরাস' সম্বন্ধে প্রযোজ্য। 'নিজস্ব গদ্যরীতি', ঠিকই বলেছিলেন মঙ্গলাচরণ। এ এমন অদ্ভুত এক-গদ্যভঙ্গি যেখানে কড়ি আর কোমল সব সমানভাবে ফোটে। দু-একটা উদাহরণ দিই :

(ক) 'খাটিয়াগুলো একে একে নামালো। তারপর তুলে নিয়ে গেল। গলা অবধি চাদরে ঢাকা। কনকের মুখটা শিউলিফুলের বোঁটার মতো হলুদ। বাতাসে টিয়ার গ্যাসের ভগ্নাবশেষ ছিল বলেই বোধহয় আমাদের চোখে জল এসে গিয়েছিল।'

(খ) "বাদশা শুয়ে শুয়ে পুরনো ব্লেড দিয়ে নখ কাটছিল। আমাকে দেখে উঠে বসল। বলল, 'শুনেছেন? আমাদের দোতলায় কাটোয়ার যে নেত্যকালী, তার কথা শুনেছেন? কাল রাত্তিরে সেপাই ডেকে'—বাদশা একটু থেমে চোখটা মটকে বলল, 'কাটোয়া।' "

(গ) "করুণাদি ছিল আমাদের পাড়ার মেয়ে। ...মেজোমামার বন্ধু হিসেবে করুণাদির সঙ্গে আমার আলাপ। ...করুণাদির সঙ্গে মেজোমামার বন্ধুত্ব এগোয়নি, মধ্যে রাজনীতি এসে যাওয়ায়। করুণাদি আর একজনকে ভালবাসল, কিন্তু কিছুদিন করুণাদিকে খেলিয়ে শেষ পর্যন্ত সে ব্যারিস্টার হতে বিলেত কেটে পড়ল। ...নার্সিংয়ের পোশাকে স্টিয়ারিঙে হাত দেওয়া করুণাদিকে কি রকম বিধবা বিধবা লাগছিল। ...নামাবর সময় জিজ্ঞেস করল—'হ্যারে, পলাশ বিয়ে করেছে?' পলাশ আমার মেজোমামা। তারপর যাব যাব করে আর যাওয়া হয়নি। একমাস পরে শুনলাম একগাদা ঘুমের ওষুধ খেয়ে করুণাদি মারা গেছে।"

সমস্ত বইটা সামনে ধরে দিলেও বুঝি আমার আশা পূর্ণ হবে না। 'হাংরাস' তার গদ্যলিপি এবং বিষয়বস্তু নিয়ে কী আশ্চর্য সৃষ্টি, সেটা বোঝাবার জন্য কেবল আরো দুটি অংশ উদ্ধার করবো, আমার নিজের মতে সবচেয়ে আলোকিত দুটি বিন্দু।

(১) 'যখন এই ডাইরি লিখছি, তখনও যে ঠিক ঝেড়ে কাশছি তা নয়। মনে মনে যা

হয়, লেখবার সময় তা হুবহু এক হয় না। শুধু যে কাটছাঁট হয় তা নয়, লিখতে গিয়ে মনের ভাব বদলে যায়।

আমি অবশ্য বিজ্ঞান পড়িনি। একজন আমাকে বলেছিল, পরমাণুর ভেতরে কী হয় তা চাক্ষুষ করা কোনোদিন নাকি সম্ভব হবে না। কেন না দেখতে গেলে আলো চাই। আর আলো ফেললেই অন্তঃকাঁপুনিতে সব সরে-নড়ে যায়।

যদি তাই হয়, তাহলে বলব মন জানার ব্যাপারেও বোধ হয় এই রকমটাই ঘটে।'

(২) 'ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না। অতীন্দ্রিয়তায়ও আমার বিশ্বাস নেই।

তাহলে এসব কেমন করে হয়? হয় কিনা জানি না, কিন্তু হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। মানুষ বাইরের প্রকৃতিকে যতটা জেনেছে তার চেয়ে ঢের কম জেনেছে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে। আমি মনে করি, মানুষের জানবার ক্ষমতা সীমাহীন। কিংবা বলা যায় মানুষ তার মনের সীমানাকে ক্রমাগত বাড়িয়ে বাড়িয়ে চলেছে। মানুষের জ্ঞানগম্যতার একটা বড় নির্ভর ইন্দ্রিয়লব্ধ অনুভূতি। সেই অনুভূতির আঁচে ধরে অদৃশ্য কালিতে লেখা অনেক গুপ্ত চিঠির মর্মোদ্ধার করা সম্ভব।

আমাদের শরীরে আর মনের অনেক খিল এখনও খোলা হয়নি। কোন খিল দিয়ে আটকে রেখেছি বেরিয়ে যাবার দরজা, কোনটাতে আটকানো বাইরে চোখ মেলার জানলা।

আমি বোধহয় নেহাত আকস্মিকভাবে তেমনি কোনো খিল খুলে জানতে পেরেছিলাম—কাল, হ্যাঁ কাল—অনশন ভাঙবার দিনটাতেই আমার জন্মদিন ছিল।'

।। চার।।

সহজ তুলনাসন্ধান বাংলা সমালোচনার অতি দীন এবং ম্লান একটা প্রবণতা। সেই দীনতা এবং ম্লানতা ক্ষমা করার আবেদন জানিয়ে বলছি, একদিক থেকে জীবনানন্দের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের একটা আশ্চর্য মিল আছে, এবং সেটা এই যে গদ্য ও পদ্যের লেখক যে একই, এই অভিন্নতার বোধ সৃষ্টি করা। হয়তো বা ভাষাভঙ্গির কথাই বলছি আমি, এমনটাও হতে পারে। যে কলমে কবিতা লেখেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই কলমেই গদ্য লেখেন, কলমটা পালটে নেন না। জীবনানন্দ দাশও ঠিক তাই। বোধের কবির এই চেতনা : 'আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে/স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে; স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,/হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়;' এবং 'কারুবাসনা' উপন্যাসের লেখকের এই উপলব্ধি—'বটের নীচে উপকথার পথিক গিয়ে দাঁড়ায়—এক মুহূর্তের ভিতরেই সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যতের প্রেম, স্বপ্ন ও সফলতার সঙ্গে নিজের সম্পর্ক খুঁজে পাই আমি, এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো-অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।' অভিন্ন কলম দিয়ে লেখা বলেই আমাদের মনে হয়, যেমনটি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের।

অথবা এও হয়তো ভুল বললাম। হয়তো ওই যাকে কুশল লাহিড়ী বলেছেন 'হর-পার্বতীর মিলন', সেটা হয়তো গদ্যলিপি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, ঔপন্যাসিক দৃষ্টি এবং মানসিকতা সম্বন্ধে ততটা নয়। জীবনানন্দের উপন্যাস উপন্যাস হিসাবে কতটা সার্থক এ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে

আসা এখনও সম্ভব হয়নি—হবেও না, যতদিন না স্পষ্ট করে বোঝা যাবে, বিত্তবাসনা এবং কারুবাসনার মধ্যে কোনোটির একচ্ছত্র দাবি উপন্যাস রচনায় থাকতে পারে কী-না। কিন্তু আমরা এটুকু জানি, এক অভিন্ন মানসিকতা থেকেই 'মহাপৃথিবী' এবং 'কারুবাসনা' লেখা হয়েছে, এবং কাব্য ও উপন্যাসের অন্তরঙ্গ পাঠে এক অভিন্ন মানুষকেই আমরা খুঁজে পাই। সে কথাটা সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে বলা চলবে না। কবিতায় স্বঘোষিত সঙ্ঘারামের প্রচারক, উপন্যাসে ব্যক্তিগত চিন্তাকেই পালন করেছেন; নিজেকে নিজে যে কথা শুনিয়েছেন নিভৃতে, হ্যাঁ, স্পষ্ট করেই বলি 'হাংরাস' উপন্যাসে, কবিতায় বলেছেন তার উল্টো কথা—'সেই কথাটাই বাধে না নিজেকে বলতে—/শুনবে যে কথা হাজার জনকে বলতে।'

অন্য গদ্য রচনার কথা বলছি না, 'হাংরাসে' অন্তত এমন অনেক স্বগতভাষণ আছে যা সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে এমনকী তাঁর অন্য লেখার থেকেও স্বতন্ত্র করেছে এবং ভবিষ্যতে যদি কেউ 'গোটা মানুষটার মানে' খুঁজে পাবার চেষ্টা করেন, তাহলেও যে-গদ্যগ্রন্থটি সবচেয়ে বেশি সাহায্য করতে পারে, আমি বিশ্বাস করি, তার নাম 'হাংরাস'।

মিথ-পুরাণ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়

শুভঙ্কর ঘোষ

সমকালের দিকে চোখ রেখে, সমকালের মধ্যে থেকে সমাজচৈতন্য ও মানবচৈতন্যের কবি কখনোই নিছক কল্পচারিতায় আস্থাশীল থাকতে পারেন না। তাঁর কাব্যবিশ্বে মানুষ-ই মুখ্য উপাদান। মানুষের সমাজের বৈষম্য-বিভেদ, শ্রেণীবিরোধ, মতাদর্শগত লড়াই, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, পীড়ন-অত্যাচার-নির্যাতন, প্রতিবাদ-প্রতিরোধ—সবই তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে। নিছক চিত্তবিনোদনের জন্য, শুদ্ধ শিল্পের কীর্তনীয়া বা কলাকৈবল্যবাদী রূপে তাঁর কবিতার কাজ নয়; তাঁর দায় জীবনের সপক্ষে। কবিতাকে যে-কোনো অস্ত্রের চেয়ে বেশি শক্তিশালী মনে করা এই ঘরানার কবির পক্ষেই সম্ভব। যেমন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি কবিতাকে অস্ত্রের মতো শক্তিশালী ভাবতে পারেননি। তখন তাঁর মনে হয়েছে, 'কবিতা একটা সেরিব্রাল প্রসেসের পার্ট মাত্র। তাতে কেবলমাত্র তাঁদের মনই আলোড়িত হয়, যাঁদের মন অলরেডি আলোড়িত হয়ে গেছে। ফলে, কেবলমাত্র কবিতা দিয়ে অস্ত্রের বিকল্প শক্তি গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এটা আমার উদ্দেশ্যের ব্যাপার।' তাঁর সমগ্র কাব্যসম্ভার মনে রেখেই বলা যায়, তিনি পরিবর্তিত হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মূল ক্ষেত্র থেকে বিচ্যুত হয়ে নয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় পদাতিক কবি। তিনি বলেন, 'পথ আমাকে ভীষণ টানে।' আর এই জীবনপথেই 'নুড়ি কুড়োনো' তাঁর অভ্যাস। নাজিম হিকমত বলেছিলেন, 'সেই শিল্পই খাঁটি শিল্প, যার দর্পণে জীবন প্রতিফলিত। তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে যা কিছু সংঘাত, সংগ্রাম, সংগ্রাম আর প্রেরণা, জয়, পরাজয় আর জীবনের ভালোবাসা, খুঁজে পাওয়া যাবে একটি মানুষের সব ক'টি দিক। সেই হচ্ছে খাঁটি শিল্প, যা জীবন সম্পর্কে মানুষকে মিথ্যে ধারণা দেয় না।' (অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)। সুভাষ যে তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে সময়ের ও রাজনীতির, রাষ্ট্রীয় বাস্তবের গতিপ্রকৃতিতে নিজেকে বারে বারে বদলেছেন, যে-কারণে তাঁকে সমালোচিত হতে হয়েছে, তবু জীবন সম্পর্কে তিনি মিথ্যা ধারণা দিতে চান না বলেই বা নিজের যাচাই করা অভিজ্ঞতাকে গোপন রেখে তথাকথিত সাধু সাজতে চান না বলেই উচ্চকিত থেকেছেন আপন অভিজ্ঞানে।

কোনো কোনো বিষয়ে, জিজ্ঞাসায়, রাজনৈতিক বোধে বা বীক্ষায়, উত্তরকালে, তাঁর উচ্চারণে আমাদের আপত্তি থাকলেও তিনি নিজ ক্ষেত্রে অস্থিরচিত্ত ছিলেন না। অস্থিরচিত্ততা আর স্ববিরোধিতা সমার্থক নয়। কোনো এক কাব্যানুরাগীকে তিনি অকপটে জানিয়েছিলেন, 'অনেক সময় শুনেছি লোকে খুব গালাগাল দেয় আমায়, আবার এক সময় গালাগাল দিত এখন তারা নতুন করে ভাবছে, এরকমও আছে। তার মানে এই নয়, আমি যা ভাবি তার সবটাই ঠিক। তবে আমার তো চিন্তা বদলাচ্ছে, এক জায়গায় তা দাঁড়িয়ে নেই। সেটা আমৃত্যু থাকবে। যেমন যেমন অবস্থা দেখব সেই সেইমত বদলাব। তবে কে কী ভাবছে তাই দিয়ে

আমি আমার ধারণাগুলোকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলব না।' (পত্রপুট ৩৩, শারদীয় ১৪০২)। এখানে নিজের দিক থেকে সুভাষ যে দৃঢ়চিত্ত ও তাঁর মতন করে আপসহীন তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে পাঠকের মান্য করায় বা না করায় তাঁর আগ্রহ নেই; পাঠক যাকে বলতে চান বিচ্যুতি, সুভাষের কাছে তা পরিবর্তন।

সুভাষ সমকাল থেকে কুড়িয়ে নিয়েছেন তাঁর বলার কথা : তাঁর কথাগ্রন্থনায় লোকজীবনের জলহাওয়া। কবিতার ভেতর দিয়েই তাঁর পৃথিবীর সঙ্গে বোঝাপড়া। সুভাষের কাব্যচর্চা সময় ও সমাজচর্চা; সভ্যতা ও মানবজীবনচর্চা; সেখানে ঐতিহ্য এসে হাত ধরে অত্যন্ত আধুনিক মাত্রাজ্ঞানে, সেখানে মিথ-পুরাণ-আদিকল্প-রূপকথা আবহমানকে মান্য করে নব রূপায়ণে বা নতুন বোধের সৃজনে কবিতা অর্থবহ হয়ে ওঠে। তাঁর কাছে মিথ-পুরাণের চর্চা ধর্মচর্চা নয়, জীবনকে নতুন করে বুঝতে শেখা, শিকড়বিচ্যুত হওয়া নয়, শিকড়লগ্ন হওয়া। মাটিলগ্ন এই যে জীবন, তার বহুমাত্রিকতাকে চিহ্নিত করতে মিথ-পুরাণের ব্যবহার কাব্যে অনিবার্যতা আদায় করে, তার গূঢ় ব্যঞ্জনা কবিতাকে মহার্ঘ করে তোলে, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও পূর্বজদের মতনই এই শিল্পঅভিজ্ঞতার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেননি।

মিথ মিথ্যা নয়, তার অন্তঃস্থিত সত্য আবিষ্কার সংবেদী কবির কাজ। পুরাণকথা নিছক গল্প নয়, তার ভেতর থেকেও খুঁজে পাওয়া যেতে পারে কোনো প্রাসঙ্গিক তাৎপর্য, আর এই তাৎপর্যের উন্মোচনও কবির দায়। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবিদের কাব্যে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের মিথপুরাণের অসামান্য ব্যবহার উত্তরকালকে যে প্রাণিত করেছে তা বলা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও কবিতায় মিথ বা লোক-পুরাণের অনায়াস প্রয়োগ তাঁর কাব্যজিজ্ঞাসার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করেছে, যা তাঁর জীবনজিজ্ঞাসাকেই ঋদ্ধ করে নতুন অর্থবোধকতায়।

মাহবুব সাদিক আধুনিক কবিদের মিথমুখী প্রবণতাকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে, 'বর্তমান সাহিত্যে শুধু সমাজসত্তার সঙ্গে অসঙ্গতি এড়াবার জন্যই মিথের ব্যবহার হয় না, পুরাণের অবিস্মরণীয় উৎস-উৎসারিত রূপক চেতনা দ্বারাই বর্তমান জটিল বিশ্বের দ্বারোদ্ঘাটন করতে চান একালের কবি। আধুনিক কবির কাছে পুরাণের তাৎপর্য তাই অপরিসীম। বর্তমান জীবন-অভিজ্ঞতা যখন একটি বিশেষ অভিজ্ঞানের জন্ম দেয় তখনই কবি মিথের কাছে প্রত্যাবর্তন করতে চান—কারণ মিথ-মানব-প্রজাতিসত্তার অভিজ্ঞানের আধার। আধুনিক মানুষের ছিন্নমূল উদ্বাস্তুসত্তা ও খণ্ডিত জীবনবোধে মিথচেতনাই সঞ্চারিত করতে পারে শাশ্বত মানবমূল্যবোধ। (কবিতায় মিথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ)। সুভাষেরও কাব্যের ক্রমবিকাশের ধারায় মিথ-পুরাণ-লোকঐতিহ্য কখনও প্রসঙ্গে কখনও অনুষঙ্গে স্থান করে নিয়েছে অনিবার্যবোধে।

তাঁর প্রথম কাব্য 'পদাতিক' (১৯৪০)-এই সুভাষ পুরাণ প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে 'সকলের গান' ও 'কানামাছির গান'-এ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থান ও স্বরূপকে চিহ্নিত করে কিছু তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন—

১. কমরেড আজ নবযুগ আনবে না?
কুয়াশাকঠিন বাসর যে সম্মুখে।
লাল উল্কিতে পরস্পরকে চেনা—
দলে টানো হতবুদ্ধি ত্রিশঙ্কুকে
কমরেড, আজ নবযুগ আনবে না।

(সকলের গান)

২. আমি ত্রিশঙ্কু, পথ খুঁজে ফিরি—
গোলোকধাঁধায় বৃথাই ঘোরা,
জানি, বাণিজ্যে লক্ষ্মী, যদিও
ছিদ্রিত থলি ও-পথে বাধা।

রামায়ণের বালকাণ্ডে বর্ণিত আছে, বিশ্বামিত্র সৃষ্ট আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে নিম্নশির ত্রিশঙ্কুও দেবতুল্য হয়ে অবস্থান করেন, তিনি গুরুঅভিশপ্ত ছিলেন, অতএব তাঁর স্বর্গারোহণ নয় ও মর্ত্যভূমিতে অবতরণও নয়, শূন্যে ঝুলে থাকাই বিধান হয়। সুভাষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে তার সুবিধাবাদ, স্বার্থ, হতবুদ্ধি-স্বভাব সত্ত্বেও নবযুগের দাবি মেনে নিয়ে সমাজপরিবর্তনের সংগ্রামে সাথে নেবার আহ্বান জানিয়েছেন; তিনি এককের নয়, সকলের গান গাইতে চেয়েছেন; 'কানামাছির গান'-এ 'আমি ত্রিশঙ্কু' কোনো ব্যক্তিগত আমি নয়, মধ্যবিত্ত শ্রেণীকেই 'আমি'র স্বরূপে দোদুল্যমান, আত্মাদরপরায়ণ রূপে উপস্থাপিত করেছে। সময়ের দাবিকে অগ্রাহ্য করতে চান না কবি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রতিবাদ, প্রতিরোধের কবি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলনের সুর তাঁর কবিতায়। এই কালে কবি মার্কসবাদ-লেনিনবাদে আস্থাশীল। শ্রেণীধারণায় তিনি ঋদ্ধ। শ্রেণীসংগ্রাম তাঁর অস্ত্র। সমাজজীবনে শত্রুমিত্র চিহ্নিত করায় তাঁর কোনো দ্বিধা-সংশয় নেই। 'পদাতিক' (১৯৪০), 'অগ্নিকোণ' (১৯৪৮) 'চিরকুট' (১৩৫৭)-এ রাজনীতিসচেতনতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটসমস্যা ও গণজীবনের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলার অঙ্গীকার লক্ষ করা গেছে। 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার' (চিরকুট) কবিতায় বাতাসে বারুদ গন্ধের মধ্যে মিউনিখ্ চুক্তির পরিণাম ও সমকাল ফুটে ওঠে, কালসর্প করাল হয়ে যায়, কবি লেখেন—

রাজায় রাজায় যুদ্ধ; (কারণ তারা তো জানতো—
আঠারো ঘা লাল বাঘ ছুঁলে!)
এদিকে বেড়েছে বৈরী কলির গোকুলে।
শকুনির নখরে নখরে
উন্মুক্ত হিংসায় লুব্ধ লালা ঝরে।

বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণে শত্রুমিত্র চিহ্নিত হওয়া, মহাভারতের 'শকুনি' নবরূপে উপস্থিত এখানে, বন্ধু বন্ধু নয়, বেড়েছে বৈরী কলির গোকুলে—কৃষ্ণকথার রেফারেন্সে আমরা জানি কংসের হন্তারক কে; পুরাণের এই গল্প আজ নব ব্যাখ্যা পায়। সভ্যতার হন্তারকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা কবির; কবি লিখছেন, 'অরণ্যপর্বত শোনে রণচণ্ডী সাঁজোয়ার নহবতে আজ/আদিম

গুহার সুর' বা 'দিকে দিকে মৃত্যুপণ অঙ্গীকারে বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত আরাবে/শকুনি চক্রের বুক কাঁপে/অচিরেই ভেঙে যাবে শত্রুর-আচ্ছন্ন দেশে কুম্ভকর্ণ ঘুম।' এখানে চণ্ডী, শকুনি, কুম্ভকর্ণ—শব্দানুষঙ্গে প্রতিরোধপরায়ণতায় পরিস্থিতির গভীরতা বুঝিয়ে দুর্জয় প্রাকার গড়ার সংকল্প। চল্লিশকোটি গণশক্তি, 'মৃতধনতান্ত্রিক কবর' কেটে দিয়ে ভাঙন ক্ষয় সর্বনাশ ও ধ্বংসের মধ্য থেকে কাঙ্ক্ষিত মুক্তির আহ্বানকে ব্যর্থ হতে দেবে না—

দুর্ভিক্ষ বেঁধেছে নীড়, এই দধীচির হাড়
ধ্বংসের বন্যাকে বাঁধবে, খুলে দেবে মুক্তির দুয়ার—
প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার।

পুরাণে দধীচির আত্মত্যাগের কাহিনিই ভিন্ন মাত্রায় ভিন্ন তাৎপর্যে সুভাষ তাঁর এ কবিতায়ই নয়, আরও নানা কবিতায় উপস্থাপন করেছেন। উপস্থাপন নয়, এ-ও এক সৃজন। শিবভক্ত দধীচি বৃত্রাসুরের আক্রমণে উৎপীড়িত ও স্বর্গচ্যুত দেবগণের কল্যাণে ও বিজয়সাধনে প্রাণবিসর্জন দেন এবং তাঁর পবিত্র অস্থি নির্মিত বজ্রের শক্তি দিয়ে ইন্দ্র নিরানব্বইবার বৃত্রদের নিহত করেন। পুরাণের এই গল্প, দধীচির এই অসামান্য আত্মদান শ্রেণীসমাজে সবহারাদের দুর্জয় সংগ্রাম, মহৎ আত্মত্যাগের সঙ্গে সামীপ্যরচনায় আধুনিক ব্যঞ্জনায় বিশিষ্ট করে তোলেন কবি। দধীচি যে সুভাষের প্রিয় চরিত্র তা তাঁর নানা কবিতার গূঢ়ার্থ থেকে অনুধাবন করা যেতে পারে। দধীচির অস্থিনির্মিত বজ্র আর লড়াকু দলিত জনসাধারণের উজ্জীবন ও জাগরণের মর্ম একীকৃত হয়ে পুরাণ হয়ে ওঠে নবীন কালের রাজনৈতিক বাস্তবতায় অর্থবহ—

১. ঝড় এসে পাতা নাড়ে
বীজে লাগে টান
উপবাসরুক্ষ হাড়ে
বজ্রপাতে কান
***
কাঁধে কাঁধে সান্নিধ্যে দাঁড়াও
হাতে হাতে বজ্র হানো
ভূকম্পিত বিস্ফোরণে চাও—
শৃঙ্খলের কলঙ্ক মোচন।

(এই আশ্বিনে, চিরকুট)

সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের পরও কবির কাজ ফুরোয় না, সংগ্রামশীল মানুষের ব্রত সম্পূর্ণ হয় না, তখন চোখেমুখে এক নতুন স্বপ্ন—

আমাদের চোখে জল ছিল;
এখন আগুন।
হাড়-বার-করা পাঁজরগুলো
এখন
স্বপ্ন তৈরির কারখানা। (আগুনের ফুল, ফুল ফুটুক)

এখানে শানবাঁধানো পাথরে আগুনের ফুল ফুটিয়ে সমাজের ক্ষেত্রস্থিত হয়ে স্বপ্নের নির্মাণে আত্মস্বার্থের বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসার অঙ্গীকার লক্ষণীয়, পৌরাণিক বজ্রের অনুষঙ্গে। এভাবেই কাল মধুমাস (১৯৬৬) কাব্যেও তিনি মহান দধীচির আত্মত্যাগের ভিন্ন ব্যঞ্জনা বোঝান—'সমস্ত শহর ক্ষুব্ধ : ফেটে পড়ছি রাগে/আমরা সবাই।/মাঝে মাঝে হাঁক উঠছে : জোরসে বলো ভাই—। বন্দে মাতরম্।/সারাটা শহর করছে থমথম।/গুপ্তকক্ষে বসে বসে নিজের অস্থিতে/বজ্র যেন বাজাচ্ছে দধীচি।' (কাল মধুমাস)। একটি অনতি-ভবিষ্যতের সদর্থক ইশারা ফুটে উঠেছে এখানে।

'যা রে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯)-য় দক্ষযজ্ঞ ও বৃত্রাসুর বধের উপাখ্যানকে একালীন জীবনের দৈনন্দিনতায় নতুন ভাবে উল্লেখের প্রয়াস থাকলেও কল্যাণব্রতী দধীচিকে দুটি ক্ষেত্রে দুটি ভূমিকায় পুরাণানুগ উপস্থাপনায় আগ্রহী হয়েছেন। শিবহীন যজ্ঞে শিবভক্ত দধীচি যেতে পারেন না—শিব নেই। ছি! ছি!/সেই দুঃখে/দক্ষযজ্ঞে/যাননি দধীচি।' আর তারপর 'বৃত্রাসুর হানা দিলে/স্বর্গচ্যুত/হল দেবতারা—/খোদ ইন্দ্র রণে ভঙ্গ দেন।' স্বর্গচ্যুত দেবতাদের স্বার্থে নিঃস্বার্থ দধীচি প্রাণ দেন এবং তাঁর অস্থি দিয়ে বৃত্রনিধনের বজ্র তৈরি হয়। এ উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বেই করেছি। সুভাষও বোঝাতে চেয়েছেন অন্যান্য কবিতায়। কিন্তু এই কবিতায় বিষয়টি মানবিক নিত্যদিনের ইঙ্গিত নিয়ে ব্যাপ্ত হয়েছে পুরাণপ্রতীতি থেকে মানবপ্রতীতিতে— যেখানে জীবনের রমণীয়তা ইতিবাচকতা ও প্রত্যয়প্রিয়তা অর্জন করে—

যাঁর জন্ম
একদম শান্তির গর্ভে
অথর্ব মুনির ঔরসে

এবং প্রেমের গর্বে
সারস্বত পুত্রের পিতা যিনি

বিনা নামে বিনা অর্থে
বিনা যশে
সে বজ্র বানিয়ে যায়
নিজের অস্থিতে

নেপথ্যে
সপ্তাহ
প্রতিদিনই।

(সপ্তাহ প্রতিদিনই)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কাব্যে পুরাকালকে, পুরাকথাকে, রামায়ণ-মহাভারতের চরিত্রসমূহকে, কুরুক্ষেত্রকে সমকালের সমাজপ্রেক্ষিতে নতুন ভাবে দেখতে চান, নতুন ব্যাখ্যা

দিতে চান। মিথ-পুরাণের পারস্পরিক সূক্ষ্ম প্রভেদ সত্ত্বেও সাধারণভাবে উভয়ের দূরত্ব যথেষ্ট নয়, সম্বন্ধও অনেকটাই। আসলে সমকালীন জীবন ও সমাজের কাঠামোয় সরাসরি কবির অন্তর্গত অভিলাষকে সুস্পষ্টতা দিতে না পারলে আশ্রয় নেন মিথ-পুরাণের। ধরা যাক, কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গ। বহুচর্চিত বহু ব্যবহৃত এই 'কুরুক্ষেত্র' এখন বিপন্ন স্বদেশের সাযুজ্যে কত চমৎকার ব্যবহৃত হতে পারে এবং তাকে কেন্দ্র করে আমাদের ভাবনায় শত্রুমিত্র, ভালোমন্দ, সত্যমিথ্যার উন্মোচন ঘটতে পারে, তার পরিচয় পাওয়া যাবে সুভাষের কবিতায়। আর 'কুরুক্ষেত্র' প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলেই ক্রমসূত্রে দুঃশাসন, কখনও-বা দুর্যোধন, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ উল্লিখিত হন। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের লড়াই, পাণ্ডবকৌরবের লড়াইকে মূলত পাপ-পুণ্যের লড়াই ধরা হয়ে থাকে। একালেও শ্রেণীর লড়াইও পাপপুণ্যের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেয়, অত্যাচারী-অত্যাচারিত, শাসক-শোষিত, সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বীর যোদ্ধা জনগণের লড়াই। 'চিরকুট'-এ তিনি লেখেন—

এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনো
বসন্ত গলিতপত্র;
বাতাস বারুদগন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুৎখচিত;
রৌদ্রালোকে লেগেছে গ্রহণ।

স্তালিনগ্রাডের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত নয়। আত্মদানের মহৎ ব্রতে রেডগার্ডবাহিনী ও বীর জনগণের দাঁতচাপা সংগ্রাম আজ ইতিহাস। এই কুরুক্ষেত্রে, 'স্তালিনগ্রাডের মাটি রক্তে তার হয়েছে উর্বর;/তাই তো নদীর স্রোতে, অগ্নিদগ্ধ মাঠে/মৃত্যুহীন জীবনের উৎকীর্ণ স্বাক্ষর।'

সোভিয়েত রাশিয়ার ক্ষেত্র থেকে কবি যখন মনোযোগী হন স্বদেশে, তখন তাঁর আক্ষেপ, অপমান ও যন্ত্রণা অনুচ্চারিত থাকে না—'দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশ,/রক্তচক্ষু রাজার শাসন—/শকুনি বিশ্বস্ত বন্ধু/মুঠোয় শিথিল সিংহাসন/সর্বাঙ্গে চিহ্নিত মৃত্যু/শবের গলিত গন্ধ ছোটে।' সে এক ক্রান্তিকাল, স্বদেশের জন্য গর্বিত, স্বদেশের জন্মবৃত্তান্ত উল্লেখে নির্দ্বিধ কবি তবু জানান, 'বিড়ম্বিত জীবনে আবার/কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে।/পালাবার নেই কোনো গোপন দুয়ার।'

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঘরে না বাইরে না' (যা রে কাগজের নৌকা) এবং 'সখা হে' (ধর্মের কল) কবিতায় কুরুক্ষেত্রের নবরূপ দিতে চেয়েছেন। আমেরিকা ও সোভিয়েতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে, নতুন বোঝাপড়া, অস্ত্রহ্রাসচুক্তির নিরিখ তাঁর অবলম্বন 'ঘরে না বাইরে না' কবিতায়, আর আন্তর্জাতিক বিশ্বের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় কবিকে ভাবিত করেছে ভিন্ন অনুভবে, ভিন্ন আর্তি-আকুতিতে, 'সখা হে' কবিতায়। প্রথম কবিতায় তিন লক্ষ অক্ষৌহিনী নারায়ণী সেনা, সংশপ্তক প্রাণ দিতে প্রস্তুত। দ্বারকায় দুর্যোধন জিভ চেটে নিচ্ছে, কেননা প্রাণে তার সুখ। অন্যদিকে কৃষ্ণ—একাকী—যুদ্ধপরাঙ্মুখ। আমেরিকা ও সোভিয়েতের অবস্থান পাশাপাশি সুচিহ্নিত। ভূ-ভারতে বোঝা যাবে অর্জুনই বা কী চাইছে। কবির কথা, নব বিশ্বের কথা, ভিন্নার্থবোধক হয়ে ওঠা কুরুক্ষেত্রের কথা—

হেঁকে আজ বলুক সবাই ঃ
মানুষ আমার ভাই।
বন্ধ করো ভ্রাতৃযুদ্ধ
যেন কেউ মানুষ মারে না—
ঘরে না বাইরে না। (ঘরে না বাইরে না)

এও এক সভ্যতার বিবেকের কথা। এখানেও যুদ্ধবিরোধী মনোভাব, যুদ্ধের বিরতির কথা। অন্যদিকে তৃতীয় পাণ্ডবের উক্তি ও উপলব্ধি, বিনম্র নিবেদন, 'সখা হে' কবিতায়—

থামাও রথ, কেশব!
দিয়েছ আমায় তত্ত্বজ্ঞান
ফুরিয়ে গেছে
দিন তার
নারকী এই কুরুক্ষেত্র ছেড়ে
চাই এবার
পায়ের নিচে মাটি।

বা,

কুরুক্ষেত্রে জন্ম নিক
সখা হে,
আজ এই পুণ্যাহে
দুঃখহরণ চপল চরণ
হৃদয় বৃন্দাবন।

বা,

সরিয়ে ফেলে পাঞ্চজন্য
ওষ্ঠে নাও বাঁশী
ফোটাও মুখে আবার ভুবন—
ভোলানো সেই হাসি
জীবন হোক ধন্য।

ঠিক কথা, এখানে দুষ্কৃতিদমনে আবির্ভূত কৃষ্ণ ও বংশীধারী প্রেমময় কৃষ্ণের—দুটি রূপের মধ্য দিয়ে ধর্মযুদ্ধের নব রূপান্তর ও প্রত্যাশার ছবি চিত্রিত হয়েছে, ফুটে উঠেছে কৃষ্ণসখার আকুলতা, কবিরও।

'ধর্মের কল' কাব্যের নামকবিতা 'ধর্মের কল'-এ কবি দুঃসময়ের কথা বলেছেন—'সময়টা সুবিধের নয়/কিছু না করে/যে পারে সেই হাতিয়ে নিচ্ছে', ঘন ঘন রংবদলের কথা বলেছেন, প্রত্যাশা জাগিয়েও তৃতীয় পাণ্ডবের নতুন সমকালীন ব্যর্থতার বাস্তবসম্মত ভূমিকা এঁকেছেন কবি—

ভো ভো পুরবাসিনীরা!
দ্বারকায় এখুনি এসে পড়বেন
মাভৈঃ! মাভৈঃ।

কে আসবে? তৃতীয় পাণ্ডব!
ধ্যুস,
উনি যে গাণ্ডীব তুলবেন, সে ক্ষ্যামতাও ওঁর আর নেই!

তৃতীয় পাণ্ডবের কথাসূত্রে মনে পড়বে সুভাষের 'পাখির চোখ' কবিতাটি। 'এই ভাই' (১৯৭১) সত্তর দশকের আত্মঘাতী ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, কমিউনিস্ট পার্টিগুলির পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব ও অস্ত্রের লড়াই, ব্যক্তিহত্যা—এক নবকুরুক্ষেত্রে ঘোষিত শ্রেণীসূত্রের বিরুদ্ধে লড়াই না করে নিজেদের মধ্যে রক্তপাত কবিকে বিষাদগ্রস্ত করে। এই সময়ের তৃতীয় পাণ্ডবের কথন বিশ্বে তীব্র যন্ত্রণা, নৈরাশ্য ও আত্মগ্লানি এবং চূড়ান্ত রাজনৈতিক লক্ষ্যভ্রষ্টতা—

আমার হাত উঠছিল না
এখন
আমি টানটান করে বাঁধছি
গাণ্ডীবের ছিলা।

সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাইবন্ধুদের মাথা;
পেছনে আততায়ী আমার ভাই।

হে সারথি
রথ এইখানে থামাও
আর
আমার এই বিষাদকে
একটু ধরো।

কুরুক্ষেত্র প্রসঙ্গে 'দুঃশাসন' যে নানা অর্থে নানা স্বরূপে ঘুরেফিরে আসে তার পরিচয় সুভাষের অনেক কবিতায় পাওয়া যাবে। তার অত্যাচার, অনৈতিকতা নির্যাতন সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের স্বভাবে খলনায়কত্বের দাবি করে, তাই তার প্রতিনিধিত্ব মহাকাব্যের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু অভিনবত্বে গড়ে ওঠা। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় জেগে ওঠা 'মেকং নদীর বানডাকা জলে/ঘুম ভেঙে ওঠা অগ্নিকোণের মানুষ'—

রক্তের পাঁকে শত্রুকে পুঁতে
অন্ধকারের বুকে হাঁটু দিয়ে দু'হাতে উপড়ে আনে
দুঃশাসনের ভিৎ। (অগ্নিকোণ)

কিংবা,

স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! ডাক-তার-ভাই! টেলিফোন বোন
ভয় নেই, পাশে আমরা।
স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! দুঃশাসনের পাঁজর খসাবো
গা থেকে খুলবো চামড়া।

(স্ট্রাইক! স্ট্রাইক! : চিরকুট)

১৯৪৬ সালের উত্তাল গণআন্দোলনের কালে, ধর্মঘট আর রক্তদানের কালে, রক্তের ধার রক্তে শুধবার অঙ্গীকারের কালে ব্রেথওয়েট আর গোয়ালিয়রের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির রাষ্ট্রশক্তির নির্মম গুলিবর্ষণের ঘটনায় গড়ে ওঠে নতুন কুরুক্ষেত্র। শাসকশ্রেণীর নির্যাতনস্পৃহার সঙ্গে মেলে না অত্যাচারিত আক্রান্ত জনচৈতন্যের দাবি। সাম্রাজ্যবাদের মৃত্যুঘণ্টা তখন বেজে উঠেছে। দুঃশাসনের পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে। কবি সেই নবভাষ্য রচনা করেন, সংবাদ দেন, যেন সংবাদ মূলত কাব্য—

দিকে দিকে আজ দুঃশাসনের
ভিৎ পড়ো-পড়ো।
যুগসন্ধির মোড়ে মোড়ে ভুখা
নাঙ্গারা জড়ো।
শানানো কাস্তে-হাতুড়ির মুখে
সোজা জিজ্ঞাসা—
দুশো বছরের রক্ত শুষেও
মেটেনি পিপাসা।

(জবাব চাই : চিরকুট)

আমরা মিথ বলি, ইতিহাস বলি, অতিকথা, কিংবদন্তী বা লোককথা, পুরাকথা যা-ই বলি, সবই পুরাণের মধ্যে লোকপুরাণের মধ্যে অন্তর্গত হয়ে আছে। রামায়ণ, মহাভারত, রূপকথা-উপকথার জগৎ, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতির ভেতর মিথপুরাণের টান নিয়ত অনুভব করা যায়। কালে কালোত্তরে তার প্রয়োগের বহুরূপত্ব ধরা পড়ে। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রেও এরকমই ঘটেছে। যেমন সুভাষের 'একটি কবিতার জন্যে' (অগ্নিকোণ) এবং 'ছেলে গেছে বনে' (ছেলে গেছে বনে) দুটি কবিতায় এই ভাবনা বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়ে।

'একটি কবিতার জন্যে' কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা লেখার প্রস্তুতির কথা বলেন, 'একটি কবিতা লেখা হবে'। মানবসমাজের অত্যাচার অবিচার দেখে প্রকৃতি ক্ষিপ্ত হয়, ক্রুদ্ধ হয়, 'আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ/রাগে রী রী করে সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে/দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধূম্র জটা/খুলে খুলে পড়ে, বজ্রের হাঁকডাকে/অরণ্যে সাড়া, শিকড়ে শিকড়ে/পতনের ভয় মাথা খুঁড়ে মরে/বিদ্যুৎ ফিরে তাকায়/সে আলোয় সারা তল্লাট জুড়ে/রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে/ভস্মলোচন।' এতদিন বৃহৎশক্তি, বড় গাছ যারা ছোট গাছকে লতাপাতার ওপর আধিপত্য কায়েম করেছিল, শোষণও করছিল, তারা আজ পতনের ভয়ে মাথা খুঁড়ে মরছে।

এতদিন যারা অন্যায় করেছে আজ তারা ভয়কাতর। এ তো ধ্বংসের বিনাশের ইঙ্গিত—রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে ঘটে যাবে ভস্মলোচনের পৌরাণিক পরিণাম। পুরাণে আছে, সহস্র বর্ষ কঠিন তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করে ভস্মলোচন এই বর লাভ করেছিলেন যে তিনি যার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন, তিনিই ভস্মীভূত হয়ে যাবেন। 'লঙ্কায় যুদ্ধের সময় ইনি যুদ্ধ করতে এলে বিভীষণের পরামর্শে রাম এঁর মুখের সামনে দর্পণ ধরেন। সেই দর্পণে নিজের চেহারা দেখে ইনি নিজেই ভস্মীভূত হয়ে মারা যান।' (পৌরাণিক অভিধান, সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত)। শ্রেণীসমাজে অত্যাচারী শোষকশ্রেণীর পরিণামও এমনই ঘটবে, এ যুগের ভস্মলোচনদের ধ্বংসও অনিবার্য—এমনই সংকেত দিতে চান কবি।

'ছেলে গেছে বনে' কবিতা রামায়ণের নতুন ব্যাখ্যায় সেকাল-একালের দশরথের ভিন্নতায়, প্রেক্ষাপটের ভিন্নতায় ভিন্নার্থবোধক হয়ে উঠেছে। সেই বসন্তের বজ্রনির্ঘোষের কালে, শ্রেণীশত্রুকে খতম করবার শপথ নিয়ে, গ্রাম থেকে শহর ঘেরাও ও সদর দপ্তরে কামান দাগো শ্লোগান নিয়ে ঘরছাড়া হয়েছিল দামাল তরুণেরা, আদর্শের উচ্চকিত উত্তালতায়, বিভ্রান্ত সময়ের আঙ্গিকে; সুভাষ বিতর্কিত হয়েছিলেন 'ছেলে গেছে বনে' লিখে। সরাসরি কথা বলতে পারতেন কবিতায়। কিন্তু পুরাণে তিনি আশ্রয় নিয়ে আধুনিকে পৌঁছুতে চেয়েছেন। একালের দশরথ অভিশাপ পান না, কোনো অন্ধমুনির অভিশাপে রামচন্দ্রকে নির্বাসনে পাঠাতে হয় না। স্ত্রীর বশীভূত নন একালের দশরথ। তবু তাঁর বেদনা। কালের করাল শাস্তি তাঁকে পেতে হচ্ছে, বহন করতে হচ্ছে বিচ্ছেদের বেদনা; কাঁধে রাইফেল নিয়ে যে ছেলের দল চলে গেল মুক্তিযুদ্ধে, ভ্রান্ত পথের প্রসঙ্গ না তুলেও বলা যায়, এই ঘটনায় কবির অন্তর্জগৎ তোলপাড় হয়েছে, রাজনৈতিক বীক্ষায় অস্থিরতা ও সংশয় এসেছে। কবি নিজের পথ খুঁজে স্থির থাকতে চান না, পদাতিকই ভাবতে পারেন নিজেকে—

জল ভরবার শব্দে বাণ ছুঁড়ে আমি নই ভুলক্রমে খুনী
আমাকে দেয়নি শাপ
শোকগ্রস্ত কোনো অন্ধমুনি
বুক খুলে দেখাই না লোক ডেকে ডেকে চোখের জলছাপ
আমি নই স্ত্রীর বশ
ইক্ষ্বাকু বংশের সেই ভগ্নস্নায়ু, দ্বিধাদীর্ণ মেনিমুখো রাজা।
মুখ বুজে সগৌরবে আমি বই কালের এ সাজা।

আমার যখন এল বাণপ্রস্থে যাওয়ার বয়স
ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।
আমি তবু পদাতিক; হাতে বাজছে রণবাদ্য দ্রিমিকি দ্রিমিকি—
কাছে এসো রত্নাকর, দূর হটো বাল্মীকি।

* * *

ফেলে রেখে আমাকে বন্ধনে
ছেলে গেছে বনে।
অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্তপাখা
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত
আমারই পতাকা।

বাল্মীকি নয়, রত্নাকরকে আহ্বান করেন কবি। বিস্ময়াপ্লুত হন এই ভেবে, তাঁরই পতাকা বহন করছে মুক্তযৌবনের প্রতীক যৌবনশক্তি।

'কাল মধুমাস' কবিতায় কবি বলেন 'দ্রোণাচার্য তুচ্ছ জ্ঞানে/নেননি ভাগ্যিস/বাল্যে বুড়ো আঙুল দক্ষিণা।' অর্জুনকে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা দিতে, মহাভারতের দ্রোণাচার্য একলব্যের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দাবি করেছিলেন, উপেক্ষিত কবি নিজেকে একালের একলব্যের সৌভাগ্যে নিষিক্ত করে বুঝেছেন, তাঁর উপেক্ষার চেয়ে অনেক বড় 'বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ' অটুট আছে, কলম তাঁর অস্ত্র, আঙুল তার সহায়, অতএব 'ভাগ্যিস' তিনি দুর্ভাগ্যের শিকার হননি।

সুভাষের কাব্যে মঙ্গলকাব্যের, বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কমলেকামিনী'র প্রত্যক্ষত বা পরোক্ষত উপস্থাপনায় অসামান্যতা দাবি করে। 'পারঘাটের ছবি' (কাল মধুমাস) 'কমলেকামিনী' (একটু পা চালিয়ে ভাই), 'অন্ধকারে' (চইচই চইচই)—এইসব কবিতায় সময়গত সমাজগত রাজনীতিগত অস্থিরতা, প্রবহমান পরিস্থিতির ইঙ্গিত, এমনকি সাংবাদিকতার প্রতি শ্লেষ। নষ্টচন্দ্র, চাঁদসদাগর ও মনসার প্রসঙ্গ এনেছেন 'যা রে কাগজের নৌকো' কবিতায়।

আমরাও এক অন্ধকার সময়, কবন্ধ সময়ে পথ হাঁটছি। সুভাষ পুরাকথার শ্রীনাম দানবের পুত্র, মুণ্ডগ্রীবাহীন কবন্ধের সঙ্গে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বর্তমান বৈষম্যপীড়িত দুঃসহ রূপের তুলনায় উদ্দীপিত হয়েছে অন্ধকারে কবিতায়। রামের হাতে নিহত হওয়ার মধ্য দিয়ে কবন্ধের যেমন মুক্তি, সমাজবিপ্লবের মধ্য দিয়ে তেমনি এই কবন্ধ সমাজের মুক্তি ঘটবে,কবির এমনই প্রত্যাশা। 'যমযমী সংবাদ' (যা রে কাগজের নৌকা) কবিতায় কবি বলেন, 'দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসে/যম আর যমী/আমি আর আমার সময়/বেলাশেষে পা ছড়িয়ে/বসে পিঠোপিঠি/আমি খেলি বাঘবন্দী।' এখানেই সেই সময়ের সঙ্গে বাঘবন্দী খেলার ঝুঁকি ও সংকট। যম আর যমীর পুরাণগত সম্পর্ক জেনেই কবি এখানে সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়েছেন শিল্পসংগত ভাবে। 'রক্তবীজ'-এর উল্লেখ করেছেন তাঁর রক্তবীজ (একটু পা চালিয়ে ভাই) কবিতায়। যেমন তাঁর 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' কবিতা।

সুভাষ রূপকথাচর্চায় জীবনচর্চার স্বাদ পান, শিকড়ের সন্ধান পান, জীবনকে, সমসময়কে নতুন ভাবে দেখতে চান পুরোনো অনুষঙ্গে। তাঁর 'ঠাকুরমার ঝুলি' (একটু পা চালিয়ে ভাই) কিংবা 'পারুল বোন' (ফুল ফুটুক) এরকমই কবিতা। কমিউনিস্ট বিপ্লবী ইলা মিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা তীব্র গণআন্দোলনে 'সাতভাই'-এর প্রসঙ্গে মনে পড়বে সাতকোটি বাঙালিকে, ইলা মিত্রর ওপর যে অত্যাচার-লাঞ্ছনা-পীড়ন হয়েছিল তার প্রতিবাদে ঐতিহাসিক গণজাগরণ ঘটেছিল, সাতভাই চম্পা ও পারুল বোনের রূপকে রূপকথা হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের কথা—

অন্ধকার পিছিয়ে যায়
দেয়াল ভাঙে বাধার
সাতটি ভাই পাহারা দেয়
পারুল, বোন আমার
দেখি তো কে তোমার পায়
বেড়ি পরায় আবার?

শুয়ে শুয়ে দিন গুনছে
পারুল বোন আমার। (পারুল বোন)

এভাবেই সুভাষ লোকপুরাণ, রূপকথা, মঙ্গলকাব্যের সীমানা বাড়িয়েছেন। তিনি এভাবেই নিজেকে বিস্তারিত করেছেন অমরুশতক, গাথাসপ্তশতী, চর্যাপদ অনুবাদে। ছড়ার মধ্য দিয়ে আত্মানুসন্ধানেও ব্রতী হয়েছেন। কেননা তাঁর ছড়া নিছক খেলা নয়।

চল্লিশের দশকের ঘটনাবহুল আর্থসামাজিক রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হয়ে মারীমন্বন্তরবন্যা পেরিয়ে, তেভাগা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বাধীনতা-উত্তরকালে সমাজবদলের ও দেশগঠনের স্বপ্ন নিয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন কবি। কিন্তু পাঁচ দশকের রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বিশ্বাস ও বিশ্বাসভঙ্গ, স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদির চাপে আপন পরিবর্তিত ভাবনায় স্থিত থাকতে ভয় পাননি। ফলে তাঁকে নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। সেখানেও সুভাষ অনমনীয়। আমরা তাঁর সব কথা মানি বা না মানি, আধুনিক বাংলা কবিতার ব্যাপ্ত ক্ষেত্রে তাঁর মতন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যকর্ম শিল্পের নিরিখে মান্য না করে উপায় নেই। নিছক বিষয়ের জন্য নয়, নতুন ব্যাখ্যা দেবার জন্য নয়, তিনি যখন মিথপুরাণ রূপকথা মঙ্গলকাব্য বা লোকঐতিহ্যের হাত ধরেন, তখন তাও এক নতুন নির্মাণ, নতুন ফর্ম হয়ে ওঠে। তাই আত্মআবিষ্কারের দুরূহ সাধনায় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষাচিন্তা

সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কথার কথা' ও 'অক্ষরে অক্ষরে' বইদুটি তাঁর ভাষাচর্চার গভীরতা ও ব্যাপ্তির প্রমাণকে ধারণ করেছে। একজন কবিকে তো সারাজীবন শব্দসন্ধান করে ফিরতে হয়, অনেক শব্দ নির্মাণ করে নিতে হয়, প্রতিটি শব্দকে যথার্থ স্থানে স্থাপন করতে হয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন স্বশিক্ষিত ও সুশিক্ষিত কবি শব্দ নিয়ে ওই কাজগুলি করতে করতে খুব স্বাভাবিকভাবেই, যুক্তিসম্মত পদ্ধতিতেই ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশ বিষয়ে উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, ধারাবাহিক চিন্তাচর্চা চালিয়েছিলেন। উক্ত বইদুটি যদিও ছোটোদের জন্যেই লেখা, কিন্তু তার মধ্যেও ধরা আছে সুভাষের ভাষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি। তিনি সবসময়েই সামাজিক ইতিহাস ও ভাষার বিকাশের ইতিহাসকে পাশাপাশি রেখে ভাষাকে বুঝতে চেয়েছেন। আবার সেইসঙ্গে ঐতিহাসিক (ডায়াক্রোনিক) ও সমকালীন (সিনক্রোনিক) বিচারকে অন্বিত করে তোলার প্রয়োজনকেও অস্বীকার করেননি।

মানুষই একমাত্র প্রাণী যে দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। হাত দুটোকে শ্রমের জন্য, সৃষ্টির জন্য মুক্ত করতে পেরেছে। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে বেঁচেবর্তে থাকার জন্য প্রকৃতিকে শুধু ব্যবহারই করে না—সেই সঙ্গে প্রকৃতির কাছ থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু আদায় করে, অর্থাৎ উৎপাদন করে। 'কাজ করবার মুরোদ একমাত্র মানুষেরই আছে। মানুষই শুধু পেরেছে বাইরের জগৎটাকে নিজের দখলে আনতে। তার জন্য হাত আর মাথার মধ্যে মিল থাকা দরকার। কিন্তু প্রকৃতির সঙ্গে একা এঁটে ওঠা কখনই সম্ভব নয়; তাই মানুষকে দল বেঁধে লড়তে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে এই দল পাকিয়ে লড়াই করার নামই হলো কাজ করা।'

'মিলে মিশে কাজ করার জন্যে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে তারই নাম সমাজ। তার জন্যে পরস্পরের মধ্যে বোঝাপড়া থাকা দরকার, মন জানাজানি হওয়া দরকার। নইলে কোনো কাজই করা যায় না।...বোঝানো আর জানানোর কাজটা সবচেয়ে ভালো হয় মুখে বললে। সমাজের কাজে লাগবে বলেই ভাষার দরকার পড়েছে। সমাজ যদি না থাকতো ভাষা থাকতো না। তেমনি ভাষা যদি না থাকতো, সমাজ গড়াই সম্ভব হতো না' (অক্ষরে অক্ষরে) মানবজীবন ও সভ্যতাকে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার সামাজিক শ্রম। সামাজিক শ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমূলক সক্রিয়তাগুলি পরস্পর-সংযুক্ত হয়ে একটি সংগঠিত অবয়ব অর্জন করে। তার ফলে আসলে মানবসমাজ নিজেই নিজেকে পুনরুৎপাদিত করে। মানুষের চৈতন্য ও শ্রম অবিচ্ছিন্ন। এই অবিচ্ছিন্নতাই বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংযোগের জালকে নির্মাণ করে, ব্যাপ্ত করে। সামাজিক শ্রমের প্রক্রিয়াকে সমন্বিত ও সংগঠিত করবার প্রয়োজনেই সামাজিক স্তরে

বিভিন্ন ধারণার বিনিময় ও বণ্টন অনিবার্য হয়ে ওঠে। মানবিক চৈতন্যের অন্যতম ধারক ভাষাই হচ্ছে সামাজিক সংযোগ-প্রক্রিয়ার প্রধান মাধ্যম। মানবিক চৈতন্যকে নির্ধারণ করে তার সামাজিক সত্তা—আর এই মানবিক চৈতন্যকে আমরা অনুভব করতে পারি, স্পর্শ করতে পারি ভাষার মাধ্যমে। এইভাবে ভাষা একই সঙ্গে হয়ে ওঠে মানবিক ও সামাজিক। ভাষা মানবচৈতন্যের সমবয়সী। ভাষা হচ্ছে সেই সক্রিয়তা ও বাস্তব সচেতনতা যা অন্য মানুষদের জন্যও অস্তিত্ববান।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলাভাষা থেকে সুপরিচিত শব্দ তুলে নিয়ে দেখান বিভিন্ন আওয়াজ নির্দিষ্ট পরম্পরায় সংলগ্ন হয়ে কীভাবে অর্থপূর্ণ শব্দ নির্মাণ করে। আবার দ্যোতিত (সিগনিফায়েড) ও দ্যোতকের (সিগনিফায়ার) সম্পর্ক বোঝাতে বাংলা ও ইংরেজিতে 'গান'-এর চমৎকার ব্যবহার করেন। পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অর্জিত বিভিন্ন অভিজ্ঞতা-সমূহের বর্গীকরণের প্রসঙ্গে লেখেন : 'বাছাই করা আর সাজানো—চেনবার আর জানবার, এই হলো উপায়।' (অক্ষরে অক্ষরে) 'মেটিরিয়ালিজম অ্যান্ড এমপিরিও-ক্রিটিসিজম'-এ লেনিন লিখেছেন : ...Engels takes the knowledge and will of man, on the one hand, and the necessity of nature, on the other, and instead of giving any definitions, simply says that the necessity of nature is primary, and human will and mind secondary. The latter must neseccarily and inevitably adapt themselves to the former...'। সুভাষ বর্গীকরণের কথা বলেই তাই বোধহয় বলে নেন : 'শুধু যদি বেছে বেছে গাছ দেখি, তাহলে বন দেখতে পাবো না; আলাদা আলাদা গাছ এক জায়গায় মেলালে তবেই বনটাকে পাওয়া যাবে।' মানুষের ইচ্ছা ও জ্ঞান প্রাথমিক হয়ে উঠলেই মন্ময় (সাবজেকটিভ) ভ্রান্তি ঘটে যাবে। গাছকেই বন মনে হবে। প্রাকৃতিক শর্ত ও চাহিদাসমূহের সঙ্গে অভিযোজিত হবার সূত্রেই যেসব অভিজ্ঞতা অর্জিত হতে থাকে, তাদের বর্গীকরণের অন্যতম পরিণতি ভাষা। আবার প্রাকৃতিক সূত্রে শব্দগুলির গ্রহণযোগ্যতাও যে সমাজের দ্বারাই নির্ধারিত হয় সে বিষয়েও সুভাষ আমাদের সচেতন করে দেন। 'শব্দগুলো এলো কোথা থেকে? একেবারে গোড়ার যুগের মানুষ হয়তো পশুপাখির আওয়াজ নকল করে শব্দ গড়েছিল।...কিন্তু এই ধরনের আওয়াজ-নকল-করা শব্দ ভাষার মধ্যে খুবই কম থাকে। বেশির ভাগ শব্দই মানুষ দরকার মতো তৈরি করে নিয়েছে। সমাজের সবাই সেই শব্দগুলোকে মেনে নিলে তবেই সেগুলো ভাষার মধ্যে জায়গা পায়।' আবার যেসব মূল ধাতুর ওপর নির্ভর করে ভাষার বনিয়াদ নির্মিত হয়ে ওঠে—তার সব কটিই কোনো-না-কোনো ক্রিয়া বোঝায়। প্রত্যেকটাই কোনো-না-কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন। যেমন 'বে' ধাতুর মানে বোনা, 'মর্' মানে পিষে ফেলা, 'বর্' মানে ঢেকে দেওয়া, 'অশ' মানে তীক্ষ্ণতা ইত্যাদি। (অক্ষরে অক্ষরে, পৃ ১৬)

সুভাষ আমাদের বিভিন্ন ভাষার মিল ও অমিল বিষয়েও সচেতন করেন। 'এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার তফাত শুধু শব্দের দিক থেকেই নয়। শব্দগুলোকে বাঁধবার নিয়মের দিক থেকেও তফাত থাকে।' তার পাশাপাশি যেসব পুরোনো ভাষা থেকে এখনকার ভাষাগুলি

সৃষ্টি হয়েছে—তাদের পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষার বংশ-পরিচয় সম্পর্কেও ধারণা দেন সুভাষ। তিনি ভাষার সঙ্গে সমাজ ও ইতিহাসের অবিচ্ছিন্নতাকে মানলেও—এই সম্পর্ককে কোনো যান্ত্রিক ছকে ফেলতে চান না। 'এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার এই মিল দেখে আঁচ করা যায়, কোনো একটা সময়ে তাদের মধ্যে যোগাযোগ ছিল।...তাই বলে কোনো একটা লক্ষণ মিলে গেলেই একথা বলা যায় না যে, দুটো ভাষার মধ্যে নিশ্চয় যোগ ছিল।' আবার এ কথাও বলেন : 'ভাষার মধ্যে অতীত ইতিহাস লুকিয়ে থাকে।...হাজার হাজার বছর আগে মানুষের জীবনের ধরনধারণ ও ধ্যানধারণা কী রকমের ছিলো, ভাষার মধ্যেই তার নজির খুঁজে পাওয়া যায়।...ভাষা যেমন সমাজকে ধরে রাখে, মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলায়—তেমনি আবার ভাষার ওপর ভর করে সমাজও এগিয়ে যায়। সমাজের ওপর ভাষা ছাপ ফেলে'। (অক্ষরে অক্ষরে) সুভাষের ভাষা-ভাবনা এভাবেই সব ধরনের যান্ত্রিকতাকে অতিক্রম করে গিয়ে—এক ধরনের দ্বান্দ্বিক চরিত্র অর্জন করে।

একজন কবির পক্ষে যা স্বাভাবিক, সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'অক্ষরে অক্ষরে' ও 'কথার কথা'-য় তা-ই করেছেন। অবশ্যই তা করেছেন এক নিজস্ব যুক্তিপরম্পরাকে অনুসরণ করতে করতে। সামাজিক উৎপাদন ও জীবনযাপনের মাধ্যমে যেমন ভাষার উৎপত্তি হয়—তেমনভাবেই মানুষ সৃষ্টি করে, শিল্প নির্মাণ করে। 'একমাত্র মানুষই শিল্পী হতে পারে।' 'মানুষ যেটা গড়ে, সেটা শুরুতেই তার মনের মধ্যে থাকে। গড়বার আগে মানুষ মনে মনে এঁচে নিতে পারে।' সমাজের ওপর যেমন ভাষার ছাপ পড়ে—তেমনভাবে শিল্পেরও ছাপ পড়ে। 'সমাজের ছাপ পড়ে শিল্প-সাহিত্যে। জলে যেমন গাছের ছায়া পড়ে, ঠিক তেমনি? না। শিল্প-সাহিত্য সমাজের অকর্মণ্য ছায়া নয়।' 'নতুন ভবিষ্যৎ, নতুন জীবন এগিয়ে আনবার কাজে সহায় হতে পারে শিল্প-সাহিত্য।' ১৯৫৪ ও ১৯৫৫-তে লেখা 'অক্ষরে অক্ষরে' ও 'কথার কথা'-য় আমরা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যে দ্বান্দ্বিক বীক্ষার সন্ধান পাই তা ধ্রুপদী মার্কসবাদের অনুসারী। ১৮৯০-এর ২১-২২ সেপ্টেম্বর তারিখে জোসেফ ব্লককে একটি চিঠিতে এঙ্গেলস লিখেছিলেন : 'According to the materialistic conception of history, the *ultimately* determining factor in history is the production and reproduction of real life. Neither Marx nor I have ever asserted more than this. Hence if somebody twists this into saying that economic factor is the *only* determining one, he transforms that proposition into a meaningless, abstract, absurd phrase.' (Marx and Engels, On Literature and Art, Progress Publishers, Moscow, 1978, p. 57, Emphasis Original) আবার ১৮৯৪-এর ৫ জানুয়ারি এঙ্গেলস লিখছেন ডাব্লু. বরজিয়াসকে 'Political, juridical, philosophical, religious, literary, artistic development is based on economic development. But all these react upon one another and also upon the economic basis. It is not that the economic situation is *cause, solely active,* while everything else is only passive effect.' (Ibid, p. 58, Emphasis Original) সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই দ্বান্দ্বিক প্রস্থানবিন্দুকে স্মরণে রেখেই ভাষার সঙ্গে সমাজের ও শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ককে স্থাপন

করতে চেয়েছেন প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তিমানুষের পারস্পরিক সম্পর্কসমূহের দ্বান্দ্বিক সমগ্রতার মধ্যে।

একইভাবে কাজের ছন্দ আর শিল্পের ছন্দের স্বাতন্ত্র্য-স্বায়ত্ত সম্পর্কে আমাদের সচেতন করেও তিনি তাদের অবিচ্ছিন্নতা বিষয়েও আমাদের জ্ঞাত করেন। আর এই অবিচ্ছিন্নতার প্রবাহকে অনুসরণ করতে করতে তিনি নাচ আর গানবাজনার উৎসসন্ধানে চলে যান। সেই সন্ধান করতে করতেই তিনি স্মরণ করেন 'সেইসব সীমাসংখ্যাহীন অক্লান্ত' মানুষদের—'যারা বাঁচার চেষ্টায় পৃথিবীকে বদলেছে'। কারণ এই বদলানোর মধ্যে দিয়েই তো সব ভাষা ও শিল্পমাধ্যম গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে, সংগঠিত অবয়ব অর্জন করে। এই বদলানোর প্রক্রিয়া যে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় এবং সেই সূত্রে যে সন্দর্ভ নির্মিত হয়ে ওঠে তার চরিত্র অবশ্যই সরল নয়। প্রথমে মৌখিক ও তারপরে লিখিত ভাষা মানুষের সামগ্রিক মানবিক ও সামাজিক সক্রিয়তা থেকে অনন্বিত ও স্বাধীনভাবে অস্তিত্ববান কিছু নয়। অন্য অনেককিছুর মতো ভাষাও হচ্ছে সামাজিক সম্পর্কসমূহের বহুমুখী নেটওয়ার্কের একটি নির্দিষ্ট দিক। মানবসমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে চলিষ্ণু সম্পর্ক বিদ্যমান তার ভিতর থেকেই বিভিন্ন চিহ্নের উৎপত্তি ঘটে। একটি নির্দিষ্ট সমাজে, সামাজিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত মানুষদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাষার ওপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। একটি সমাজে বিভিন্ন চিহ্নের রূপ কেমন হবে তার প্রধান শর্ত হচ্ছে—চিহ্নগুলির ব্যবহার-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের সামাজিক সংগঠনের চেহারা কেমন। এইভাবে সামাজিক স্তরভেদ ও নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন শর্তের মাধ্যমে ও তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিভিন্ন শর্তের মধ্যে দিয়েও মৌখিক ভাষা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠীর সামাজিক আকাঙ্ক্ষাসমূহ ও তাদের সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতাসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তাদের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বা অ্যাকসেন্টগুলি গড়ে ওঠে। এইভাবে একই শব্দের উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য সামাজিক স্তরভেদ অনুসারে রূপান্তরিত হয়ে যায়। খুব স্থূল বা প্রত্যক্ষভাবে না হলেও উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যগুলি কোনো-না-কোনো ভাবে বিভিন্ন সামাজিক স্তরকেই চিহ্নিত করে দেয়। এইভাবে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্যগুলি অনেক সময়েই একটি নির্দিষ্ট সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করতে শুরু করে।

সুভাষের এই বইদুটিতে আমরা তার ভাষাচিন্তার যে সন্ধান পাই—তা এতদূর পর্যন্ত বিস্তার না পেলেও, ১৯৫৪-৫৫ সালেই তিনি ভাষাচিন্তার যে প্রস্থানবিন্দু নির্মাণ করেছিলেন—তা থেকে আমরা অগ্রসর হতে পারি ভোলোশিনভের মতো মার্কসবাদী ভাষাতাত্ত্বিকরা যে মার্কসবাদী ঘরানা নির্মাণ করেছিলেন তার দিকে। ভোলোশিনভের মতে, 'চিহ্ন' শ্রেণী সংগ্রামের পরিসর হলেও তা থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায় না যে, বিভিন্ন শব্দ বা চিহ্ন বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর কাছে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ বহন করে আনে। আবার শব্দ ও তার অর্থকে সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সংঘাতের প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে—তাদের বিমূর্ত রূপদান-প্রচেষ্টার বিরোধী ছিলেন ভোলোশিনভ। তিনি মনে করতেন, অভিধানে আমরা একটি শব্দের যে অর্থ বা অর্থগুলি পাই তা অবশ্যই স্থির ও বিমূর্ত। কিন্তু কথ্যভাষা একই সঙ্গে অর্থ ও ভাববস্তুকে (থিম) বহন করে। একটি সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের অভিজ্ঞতাগুলিকে

পরস্পরের মধ্যে বিনিময়ের উদ্দেশ্যে যখন কথোপকথন চালায়, তখন তারা একটি নির্দিষ্ট বাচনভঙ্গী ও স্বরসংঘাত অবলম্বন করে। এই নির্দিষ্ট বাচনভঙ্গী ও স্বরসংঘাত কখনোই নির্দিষ্ট বিষয়ের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। আবার একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট কথ্যভাষার জঁ বা সংরূপ-এর মধ্যে প্রবেশ করেন, অংশগ্রহণ করেন। জঁ বা সংরূপ হচ্ছে কোনো এক ধরনের বা এক শ্রেণীর শৈল্পিক প্রচেষ্টা—যার মধ্যে নির্দিষ্ট ধরনের প্রকরণ বা আধেয় বা শৈলী বা এই ধরনের কিছু বিদ্যমান। এইসব কথ্যভাষার সংরূপগুলির আবার নিজস্ব বাচনভঙ্গী, নিয়ম, মান, শব্দসূচি, আঞ্চলিক বাচন ইত্যাদি রয়েছে। এমন কোনো মাস্টার ডিসকোর্স বা মহাসন্দর্ভ নেই যা সমস্ত ধরনের বর্ণনা ও প্রসঙ্গকে ধারণ করতে পারে। যদিও শাসকশ্রেণী তাদের অধস্তন শ্রেণীগুলির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠাকে নিশ্চিত করার কৌশল হিসেবে একটিমাত্র সন্দর্ভকেই চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সূত্রে নিপীড়িত ও শোষিত মানুষেরা তাদের একটি নিজস্ব কথ্যভাষার সংরূপ নির্মাণ করে নেয়। এই নিপীড়িত ও শোষিত মানুষরাই তো, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় 'সেইসব সীমাসংখ্যাহীন অক্লান্ত' মানুষরা—'যারা বাঁচার চেষ্টায় পৃথিবীকে বদলেছে'। তারা যে সংরূপ নির্মাণ করে নেয়—তা শাসকশ্রেণীর বিরোধী অবস্থান ও সামাজিক অভিজ্ঞতাসমূহের সূত্রে যে নতুন বাচনভঙ্গী ও স্বরসঙ্গতি নির্মাণ করে নেয়—সেগুলিকে মহাসন্দর্ভ সবসময়ে উপেক্ষা বা অস্বীকারের চেষ্টা করে। এইভাবে দেখলে বোঝা যায়, চিহ্নগুলি বিভিন্ন ধরনের পরস্পর-বিরোধী বাচনভঙ্গীর দ্বারা আকীর্ণ। কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। গভীর সামাজিক সংকটের মুহূর্তগুলিতে বা বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের সময়গুলিতে—যখন শাসকশ্রেণীর শাসনকর্মের যৌক্তিকতা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়—তখন শাসকশ্রেণীর মহাসন্দর্ভগুলিই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় এবং বিদ্রোহী মানুষেরা বিকল্প সন্দর্ভগুলির জন্য আরও বেশি পাবলিক স্পেস দাবি করতে শুরু করেন। এইভাবে সন্দর্ভের রূপান্তর প্রক্রিয়া—মানুষের সামাজিক চৈতন্য ও ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে থাকে এবং তাদের প্রভাবিত করতে থাকে।

১৯৫৪-৫৫তে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছোটোদের জন্যে লেখা দুটি বইতে তার ভাষাচিন্তার যে স্বাক্ষর রেখে গেছেন তা শেষ পর্যন্ত আর শুধুই ছোটোদের প্রয়োজন মেটাবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। তা সকলেরই চিন্তার খাদ্য সরবরাহ করে। ভাষাচর্চার বৃহত্তর জগতে প্রবেশের সিংহদ্বারকে উন্মুক্ত করে দেয়। ১৯৫৪-৫৫তেই এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করে ফেলেছিলেন তিনি। এই কাজটি করার মধ্যে দিয়ে তিনি বৃহত্তর অর্থে ইতিহাস ও মানবতার স্বার্থসাধন করেছেন।

ভাষাকে দ্বিবাচনিকতার মধ্যে স্থাপন করার চিন্তাসূত্র ও বীজ সুভাষের ভাবনার বাইরে ছিল না। তিনি নিশ্চয় জানতেন, অনুভব করতেন, বাকরীতি এমন এক সামাজিক সক্রিয়তা—যা এক প্রেক্ষাপট থেকে অন্য প্রেক্ষাপটে অনবরত স্থান পরিবর্তন করে। তার ফলে শব্দগুলি বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধগুলিকে বহন করতে করতে 'বিকেন্দ্রীকৃত' হয়ে যায়। সেই কারণেই ভাষাকে কখনও তার সামাজিক ও ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে ও সংযোগের

মৌলিক ভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বাস্তব মৌখিক সংযোগ-প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ভাষা জীবন্ত হয়ে ওঠে ও ঐতিহাসিকভাবে বিবর্তিত হয়—অন্য কোনোভাবে, অর্থাৎ বিমূর্ত ভাষাতাত্ত্বিক সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে নয় বা কথকের ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক কাঠামোর ভিতরেও নয়। শব্দ যেহেতু নির্দিষ্ট অর্থ অর্জনের উদ্দেশ্যে তার প্রেক্ষাপটের ওপর নির্ভরশীল, তার ফলে শব্দের নিজের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই অর্থের বহুত্ব অবস্থান করে। একটি শব্দ দুজন বক্তার মধ্যে কীভাবে সঞ্চালিত হচ্ছে তার ওপরেই শব্দটির অর্থ নির্ভরশীল। একটি সক্রিয় ও স্পন্দনশীল প্রক্রিয়ার ভিতর থেকেই শব্দের অর্থ উৎসারিত হতে থাকে। অন্যভাবে বলা চলে, শব্দের অর্থ শব্দটির ভিতরে অবস্থান করে না, পক্ষান্তরে তা বক্তা ও শ্রোতার পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সূত্রে নির্মিত হয়ে ওঠে। এইভাবে শব্দের অর্থকে অনুধাবন-প্রচেষ্টার চরিত্রকে দ্বিবাচনিক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। 'কবিতার বোঝাপড়া' (১৩৬৩/১৯৫৬) প্রবন্ধে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভাষার দ্বিবাচনিকতার প্রসঙ্গে চমৎকার লেখেন : 'যখন আমি নিঃশব্দে মনে মনে কথা বলি, সেই কথার নাম ভাবনা। যখন মনের কথাটা মুখ ফুটে বলি তখনই সেটা অন্যের কানে যায়।' আবার লেখার মাধ্যমে কোনো কথাকে প্রথমে 'চোখ দিয়ে ধরে তারপর কানে তুলতে হয়'। সেখানেও এক ধরনের দ্বিবাচনিকতার প্রক্রিয়া সক্রিয়। আমরা যখন আপনমনে কথা বলি, তখনও আমরা পুরোপুরি একা নই। তখন আমাদের মন একই সঙ্গে শ্রোতা ও বক্তা। আবার দুজন যখন কথা বলি, তখনও দুজনাই বলে, আবার দুজনাই শোনে। আবার যখন লিখি তখনও অন্যের সঙ্গে কথা বলি। হরফের আকারে কথা বলি। আবার কথা বলার সময়ে কখনও তাড়াতাড়ি কথা বলতে গিয়ে, কখনও কুঁড়েমির দরুন, আবার কখনও বিশেষ বিশেষ অভ্যাসের জন্য শব্দের উচ্চারণ বদলে যায়। আর এই বদলানো শব্দগুলি ভাষার মধ্যে থেকে যায়। দ্বিবাচনিকতার সূত্রে শব্দের মধ্যে এইভাবে অনবরত বদল হচ্ছে। এক যুগের কথা অন্য যুগে চেনাই যায় না। ব্যাকরণের পণ্ডিতরা হাজার চোখ রাঙিয়েও ধ্বনিবদলের ব্যাপারটা ঠেকাতে পারে না। পক্ষান্তরে সেই ভোল বদলানো অসাধু শব্দটাই আস্তে আস্তে সাধুভাষায় স্থান করে নেয়। (কথার কথা) সুভাষ 'কবিতার বোঝাপড়া' প্রবন্ধে 'বিবেক' ও 'ডায়ালগের' নৈকট্য বিষয়ে আমাদের সতেচন করেন। দ্বিবাচনিকতার সূত্র ধরে চিন্তাকে এগিয়ে নিয়ে গেলে, আটারেন্স বা উক্তি বিষয়ক ভাবনায়, সামাজিক মূল্যের সক্রিয় মাধ্যম হিসেবে ডায়ালগের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আটারেন্স বা উক্তি নির্ধারক উপাদান হয়ে ওঠে এবং ভাষাতাত্ত্বিক বাস্তবে সত্যকারের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে স্বীকৃতি পায়। সুভাষ ভাষাতত্ত্ব-অতিরিক্ত বিষয়গুলির প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্ব দেননি বলেই ভাষার দ্বিবাচনিকতা বিষয়ক উপলব্ধি তার অনুভবে, বয়ানে অনুপ্রবেশ করে যায়, কখনও উপরিতলে, কখনও বা অন্তর্লীন থেকে যায়। ভাষার দ্বিবাচনিক চরিত্র সুভাষের অনুভবের বাইরে ছিল না বলেই তিনি 'বিশুদ্ধ' ভাষা ও 'অবিশুদ্ধ' সামাজিক-ঐতিহাসিক উক্তির বিরোধিতাকে অতিক্রম করে যেতে পেরেছিলেন। নিজের ভাষা-ভাবনাকে বৃহত্তর দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন করে তুলতে পেরেছিলেন। ভাষার পরিবর্তনশীলতা ও দ্বিবাচনিকতার কারণেই ব্যাকরণ যে ভাষার পুলিশ হতে পারে

না সে বিষয়েও সুভাষ আমাদের সতর্ক করে দেন। ভাষা তৈরি হয়েছে ব্যাকরণ তৈরি হবার ঢের আগে। ব্যাকরণের কাজ হল শুধু খুঁজে বার করা কোন্ নিয়মে শব্দের চেহারাগুলো জায়গা বিশেষে বদলে যাচ্ছে। ব্যাকরণের এই সীমা বিষয়ে সচেতন থাকেন বলেই— শাসকশ্রেণীর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের পরিসীমার বাইরে, বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়া ও সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, অপ্রতিহতভাবে, যেসব বিকল্প বাচনভঙ্গি, চিহ্ন ও সন্দর্ভ নির্মিত হয়ে উঠছে, তার প্রতি সুভাষ গুরুত্ব দেন। এই বিকল্প পরিসরের মধ্যে নিপীড়িত মানুষদের অনুভূতি, আবেগ, ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও আকাঙ্ক্ষাসমূহের যে পরিচয় আমরা পাই, তাকে কীভাবে ভাষা ধারণ করে চলেছে ও বদলে যাচ্ছে, ইতিহাস ও মানবতার প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই সুভাষ তা গভীরভাবে অনুধাবন করতে চেয়েছিলেন।

ভাষা নিয়ে ভাবনা

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

শব্দ-সচেতনতা কবিদের ধর্ম। আর যত বড়ো কবি তত বেশি শব্দ-সচেতন। পদাতিকের কবি লিখেছিলেন : 'পেট জ্বলছে, খেত জ্বলছে/হুজুর জেনে রাখুন/খাজনা এবার মাপ না হলে/জ্বলে উঠবে আগুন।' এই কবির কলম থেকে বেরোয়, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক/আজ বসন্ত'। তিনিই লেখেন, 'ফুল জমে জমে পাথর'। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে কবিতা আর গদ্য মিলিয়ে প্রচুর লিখেছেন। তাঁর গদ্য রচনার মধ্যে আস্ত তিনখানা বই ভাষা নিয়ে, এছাড়া অন্য কিছু বইতেও তাঁর ভাষাভাবনা ছড়িয়ে আছে।

কবিরা শব্দ বা ভাষা নিয়ে আলোচনা করেছেন এমন নজির বাংলা সাহিত্যে বিরল নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা সব থেকে আগে মনে আসে। বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখ লিখেছেন। লিখেছেন ও লিখছেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ ঘোষ ও আরও কেউ কেউ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তরুণ বয়সেই বস্তুবাদী দর্শনে আকৃষ্ট হন। তাঁর বিচরণ ছিল সাধারণ মানুষের মাঝখানে। তখনও বাংলা ভাগ হয়নি, তিনি সংবাদ সংগ্রহ করতে দূর-দূরান্তরে চলে গেছেন। বাংলা কাগজে রিপোর্টাজ-এর সূত্রপাত তাঁরই হাত ধরে।

ভাষার উপরে লেখা তাঁর প্রথম দিককার দুটি বই-এর লক্ষ্য ছিল কিশোর বয়সের পড়ুয়ারা। জীবনের অন্তিম লগ্নে এসে তিনি লিখেছিলেন :

> লেখককে হতে হবে সৎ। নইলে পাঠক খোলা মনে তাঁকে নেবে না। শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে কিংবা আণ্ডায় গণ্ডা গুনলে পাঠকের চোখে তা ধরা পড়ে যাবে। লিখতে হবে মন খোলসা করে। আমতা আমতা না করে, চিবিয়ে চিবিয়ে না বলে সাদা কথা সিধে ভাবে বলতে হবে। ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে গিয়ে ধানাই পানাই করলে কথার দাম থাকে না।
>
> লিখতে হবে পুরোপুরি নিজের মতো করে। তাতে চটকদারি লোক-দেখানো ভাব না থাকে। লেখাটা যেন হয় মুখে কথা বলার মতো। লেখায় পরের মুখে ঝাল খাওয়া কিংবা পরের বুলি আওড়ানো একেবারেই ঠিক নয়।

এই যে-উপদেশ তিনি নবীন প্রজন্মকে দিয়েছেন সেটা আজীবন নিজে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। আপনি আচরি ধর্ম তবেই তো পরেরে শেখানো যায়। শেখানোর হক জন্মায়।

'অক্ষরে অক্ষরে' বইটি শুরু হয়েছে মানুষ কথা বলতে শেখার আগে কীভাবে ভাব বিনিময় করত তার বিবরণ দিয়ে। ভাব-ভঙ্গির কথা বলার পর কাজ আর কথার সম্পর্কটা বুঝিয়ে দিয়েছেন এইভাবে—

> বোঝানো আর জানানোর কাজটা সব থেকে ভালো হয় মুখে বললে। সমাজের কাজে লাগবে বলেই ভাষার দরকার পড়েছে। সমাজ যদি না থাকত ভাষা থাকত না। তেমনি ভাষা যদি না থাকত সমাজ গড়া সম্ভবই হত না। কাজের সঙ্গে কথা,

কথার সঙ্গে কাজ—একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যায় না। কথা ছাড়া কাজ এগোয় না; তেমনি কাজে না লাগলে কথা হয় শুধুমাত্র ফাঁকা আওয়াজ।

হরফ উদ্ভাবনের আগে কীভাবে চিহ্ন আর রেখাচিত্রের সাহায্যে নানা দেশে মনের ভাব প্রকাশ করা হত তার পরিচয় দিয়ে লিখিত ভাষা সম্বন্ধে ধারণা গড়ে দিয়েছেন। মূলত ঐতিহাসিক ভাষাতত্ত্বের ধারায় তিনি বিভিন্ন শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। যেমন, শ্রী থেকে ছিরি, ছন্দ থেকে ছাঁদ, বর্ণ থেকে বর। মৃগ শব্দের সঙ্গে মার্গ শব্দের সম্বন্ধ, হরিণ-হরিৎ উভয়ের সাজুয্য বিচার করেছেন। প্রশ্ন তুলেছেন, 'হর'ই পরে 'হল' এবং তারপরে 'কল' হয়েছে? তাই থেকেই কি দেবতাদের আর পালপার্বণের নাম হল—হর, হরি, হারীতী, হোলি, কালী?

এখানে ব্রত আর পালপার্বণের কথা বিস্তৃতভাবেই বলেছেন। লোকসংস্কৃতির এই দিকটা তুলে ধরে মানবসমাজের জীবনযাত্রার ধারাকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। আর বলেছেন যন্ত্র আর বাজনার কথা। তারে বাঁধা, চামড়ায় বাঁধা, কাঁসার যন্ত্র আর মুখের ফুঁ দিয়ে বাজাবার যন্ত্র—এই চার রকমের বাজনা। এর সবগুলো একই সময়ে বানানো যায়নি। এগুলো বানানোর আগে মানুষকে প্রকৃতির কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করতে হয়েছে। 'আর এই সমস্ত আবিষ্কারের পেছনে আছে সেই সব সীমাসংখ্যাহীন অক্লান্ত মানুষ যারা বাঁচার চেষ্টায় পৃথিবীকে বদেলেছে। তাদেরই দৌলতে আজ আমরা আনন্দে গান গাই, বাঁশি বাজাই।'

আস্তে আস্তে মানবজাতি লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখল। রচিত হল কবিতা ও গদ্য। এই লেখা ব্যাপারটা যে আদতে অনুশীলন আর পরিশীলন সাপেক্ষ সে-কথাটা বুঝিয়েছেন সুন্দরভাবে—'যখন আমরা সামনাসামনি কথা বলি, তখন অনেক সুবিধে। মুখে না বলে অনেক কথা গলার স্বরে কিংবা হাত-মুখ নেড়েও বুঝিয়ে দিই। এমনকি মুখ ফস্‌কে ভুল কথা বললেও প্রসঙ্গ বুঝে কিংবা প্রশ্ন করে ঠিক কথাটা জেনে নিতে পারি। লেখার বেলায় তো আর তা চলবে না। কাজেই লেখার মধ্যে সমস্ত আটঘাট বেঁধে দিতে হয়। পড়ে কেউ যেন পারতপক্ষে ভুল না বোঝে। শুনে সহজ মনে হয়। কিন্তু হাতে কলম নিলে দেখা যায় কাজটা শক্ত। পড়ে পড়ে আর লিখে লিখে মক্‌শো করতে হবে। তবে লেখার হাত পাকা হয়।'

পরের বই 'কথার কথা'। এটিকে 'অক্ষরে অক্ষরে'-র অনুসৃতি বলা যেতে পারে। এই বই-এর শুরুর দিকের একটু অংশ উদ্ধার করতেই হবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখার ঢং আর প্রাঞ্জলভাবে বক্তব্য উপস্থাপনার অনবদ্য দৃষ্টান্ত হিসেবে। এই অংশটির শিরোনাম দেওয়া চলে 'আমার নিজস্ব সংবাদদাতা' :

> আকাশে লাল রঙের একটা ঘুড়ি উড়ছে। পাঁচিলের এপাশে কে যেন কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেলা করছে। রান্নাঘরে উনুনে দুধ পুড়ছে। কাঠের চেয়ারটা খুব শক্ত। চায়ে চিনি হয়নি।
>
> একা এক জায়গায় বসে একসঙ্গে এতগুলো খবর আমি পেয়ে গেলাম। তার জন্যে আমাকে আদৌ দৌড়ঝাঁপ করতে হয়নি।

আমার একদল নিজস্ব সংবাদদাতা আছে। তারাই আমাকে একে একে খবরগুলো দিল। পাঁচ রকমের খবর তারাই জোগাড় করে আনে। আমি যেখানেই থাকি তারা আমাকে খবর এনে দেয়। আমাকে কখনই তারা ছেড়ে যায় না।

পাঁচ রকমের খবর জানবার জন্যে আমার পাঁচটি বিশ্বস্ত সংবাদদাতা আছে। তার মধ্যে তিনটি খুব তুখোড়; যেখানে আমার হাত যায় না, সেখানকার খবরও তারা জোগাড় করে আনতে পারে। বাকি দুটিও আমার খুব বিশ্বস্ত; তবে তাদের দৌড় বেশি নয়।

আমার এই নিজস্ব সংবাদদাতাদের নাম জানবার জন্যে নিশ্চয়ই তোমার খুব ইচ্ছে করছে। নাম বললেই তুমি তাদের চিনবে।

একটির নাম চোখ। তার কাজ হল দেখা। কোনো জিনিস আমার সামনে থাকলে বেশ খানিকটা দূর থেকে আমার চোখ তা বলে দিতে পারে।

একটির নাম কান। কোনো জিনিস আড়ালে থাকলেও আওয়াজ শুনে তার খবর পৌঁছে দেয় সে।

যার নাম নাক, সে আমাকে কোনো একটা জিনিসের গন্ধ পাইয়ে দেয়।

দূর থেকে টের পাইয়ে দেয় বলেই চোখ, কান আর নাককে আমি বলি তুখোড় সংবাদদাতা।

বাকি দুটি সংবাদদাতার একটি হল আমার গায়ের চামড়া—যার ভালো নাম ত্বক। অন্যটি হল জিভ—যার ভালো নাম রসনা। এরা আবার কোনো জিনিসের সঙ্গে নিজেরা জড়িয়ে না পড়লে আমাকে সে-জিনিসটার খবর দিতে পারে না। গায়ে লাগলে তবেই বুঝি হাওয়াটা ঠাণ্ডা, জিভে ঠেকলে তবেই বুঝি আমটা মিষ্টি।

চোখ, কান, নাক, ত্বক, জিভ—আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলেও এদের মধ্যে খুব বনিবনা আছে। চোখ যে খবরটা আনছে, বাকি সকলে তার ভাগ পেতে পারে। আবার তেমনি অন্যরা যে খবরগুলো আনছে, চোখও তার ভাগ পেতে পারে।

চোখ যদি কাউকে বন্দুক ছুড়তে দেখে, কানকে ইশারা করে দেবে—এবার কিন্তু জোর শব্দ হবে। তেমনি আবার কান যদি বাঘের ডাক শোনে, ডোরাকাটা বাঘের বিকট চেহারাটা সে ইশারায় চোখকে জানিয়ে দেবে। আমার নিজস্ব সংবাদদাতারা পাঁচটি পাঁচ রকমের হলেও, তারা একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে।

এই বই-এ আর একটু এগিয়ে গিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে সমষ্টি-মানুষ বা মানবসমাজের সম্পর্কের কথাটা বুঝিয়ে বলেছেন। আমাদের যা-কিছু চিন্তাভাবনা ও রচনা তার সবকিছুর পশ্চাতে আছে অসংখ্য অচেনা মানুষের অবদান। 'যে কাজের মানুষেরা প্রথম কথাগুলো তৈরি করেছিল, মুখে মুখে সেই কথাগুলো যারা যুগের পর যুগ বয়ে নিয়ে চলেছে, যারা আমার মুখে সেই কথাগুলো জুগিয়ে দিয়েছে—আমার বলা কিংবা লেখার পেছনে তারা সবাই ভিড় করে দাঁড়ায়। আমি যখন কিছু বলি কিংবা লিখি তখন আমি একা নই। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে আমি নিজেকে জুড়ে দিই বলেই বলা কিংবা লেখা সম্ভব

হয়। ...সমাজের মধ্যে থাকি বলেই আমরা শুধু যে একা নই তাই নয়—প্রত্যেকেই আমরা একের চেয়ে বেশি। শুধু দুটো হাত নয়, অসংখ্য হাত, শুধু দুটো চোখ নয় অসংখ্য চোখ—দেশকাল জুড়ে তোমার আমার হয়ে কাজ করছে।'

বলেছেন শব্দের সঙ্গে জীবনের যোগসূত্রের কথা। 'প্রকৃতির ভাব সবসময় এক রকমের নয়। তার নানা রকমের ভাব বোঝাবার জন্যে রকম রকম শব্দ তৈরি হয়েছে।' উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন—জমাট বাঁধা মেঘের নাম 'ঘন', আর যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে তা হল 'জলদ'। তেমনি, যে-আগুন মুচড়ে মুচড়ে ওপর দিকে ওঠে তাকে বলে 'অগ্নি', আর যা পুড়িয়ে শুদ্ধ করে তা হল 'পাবক'।

এভাবে ভাষাতত্ত্বের বিভিন্ন দিক অতি মনোগ্রাহী করে তুলে ধরেছেন। এ বই-এ ব্যাকরণের নানা সূত্র আলোচনা করেছেন খুব সহজ ভঙ্গিতে। কর্তা আর কর্ম, বচন (সংখ্যার হিসেব), লিঙ্গ (স্ত্রী-পুরুষ-জীব), কারক, পক্ষ (আমি-তুমি-সে), ভাব ও কাল, বাচ্য, অব্যয়—এসব যে কত সহজভাবে বলা যায় তার নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে পাতায় পাতায়।

বাংলায় ধ্বনি পরিবর্তনের বিশেষ রীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন। শব্দগঠনের নানা রীতি নিয়েও আলোচনা আছে। আর সবটাই হয়েছে ঘরোয়া মেজাজে। ব্যাকরণকে কূটকচালি মনে হয় না, বরং শব্দ ও ভাষার ভেতরকার রহস্যটা টেনে বার করার রোমাঞ্চ ও আনন্দের অনুভূতি জেগে ওঠে। সেটাই পাঠকের লাভ আর লেখকের জিত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, একসময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে অনুমোদিত পাঠ্যগ্রন্থের জায়গায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ওই বইদুটিই মন দিয়ে পড়তেন। শুনতে পাওয়া যায়, এ-কথাটা একবার সুকুমার সেনের কানে ওঠে। তখন তিনি বই দুখানি চেয়ে পড়ে নেন। সুকুমারবাবুর কাছ থেকে তারিফ আদায় করতে পেরেছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাজের বাংলা' বেরোয় ২০০২ সালের জানুয়ারিতে। তার আগে এটি কিস্তিতে কিস্তিতে বেরিয়েছিল একটি সাপ্তাহিক কাগজে। এই রাজ্যে সরকারি কাজে কেমন বাংলা ব্যবহৃত হওয়া উচিত তাই নিয়ে আলোচনাই এই বই-এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সরকারি দপ্তরের নথিপত্রে, বিজ্ঞাপনে, চিঠিতে ভাষা কতটা সাদামাটা করে তোলা যায় তার হদিস মিলবে এখান থেকে। পরিভাষার জন্য অসুবিধার কথা যারা তোলেন তাদের যুক্তি কত অসার তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। পোশাকি ভাষার বদলে আটপৌরে ভাষায় লিখতে পারলে সব কিছুই সহজে পরিষ্কার করে বলা যায়। এবং তা উদ্দিষ্ট মানুষজনের কাজে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। একদিকে ইংরেজির প্রতি মোহ, অন্যদিকে বাংলা নিয়ে জড়তা—প্রশাসনে মাতৃভাষা প্রয়োগে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজে নামলে কিন্তু তরতর করে বাংলায় লেখা বেরিয়ে আসবে।

কাজের বাংলা-য় প্রসঙ্গক্রমে এসে গিয়েছে ব্যাকরণের এইসব বিষয়—লিঙ্গ, বচন, সমাস, সন্ধি, পদ, ধাতু, ক্রিয়া, ক্রিয়ার বিশিষ্ট প্রয়োগ, শব্দদ্বৈত, ধ্বন্যাত্মক শব্দ। সংযোজক শব্দ হিসেবে ও-এবং-আর এই তিনটির প্রয়োগ যোগ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। একই ক্রিয়ার

বিস্তর কাজ, আর একই শব্দকে নানা কাজে লাগানো—এই দুটি বিষয়ে অনেক প্রয়োগ তুলে ধরা হয়েছে। মনে রাখতে বলেছেন, 'ওনার ওনাকে ওনাদের' না লিখে যেন লেখা হয় 'ওঁর ওঁকে ওঁদের'। 'সাথে' নয় 'সঙ্গে'। 'উৎকর্ষ সখ্য' জাতীয় শব্দে তা জুড়লে আর 'উচিত'-এ খণ্ড ত লাগালে ভুল হয়ে যাবে সে-কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন।

'সাঁট ইশারা' নামে একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাশ, হাইফেন, ফুটকি, ঊর্ধ্বকমা, দাঁড়ি, বন্ধনী এসব বিরাম চিহ্নের। আর সব শেষের অধ্যায়টি হল আধুনিক বানানের নিয়ম নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানানবিধি অনুসরণেই তাঁর সায়। এ বই-এ এক জায়গায় বলেওছেন হাতের কাছে আকাদেমির অভিধান রাখবার কথা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবিতকালের শেষ গ্রন্থ 'ফকিরের আলখাল্লা'। এটির প্রকাশকাল ২৫ বৈশাখ ১৪০৯, অর্থাৎ মে ২০০২। এ বইয়ে নানা রকম লেখার পাশাপাশি বাংলা ভাষা আর বাংলা বানানের উপর বেশ কয়েকটি লেখা আছে। ভাষা নিয়ে তাঁর উৎকণ্ঠা, আবার একই সঙ্গে তা থেকে উদ্ধারের পথনির্দেশ ফুটে উঠেছে এই পঙ্‌ক্তিগুলির মধ্যে :

> স্বাধীনতা ইস্তক আমরা শুনে আসছি বাংলা ভাষার হাতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাট তুলে দেওয়া হবে। আদ্যোপান্ত লেখাপড়া শেখানো হবে বাংলায়। আজও তা কথার কথা হয়েই থেকে গেছে। ...
>
> বিশ্বাস কিংবা সংকল্পের জোর না থাকাটাও আজকের এই অব্যবস্থচিত্ততার কারণ হতে পারে। ...সুযোগ সুবিধে সবার সমান না হওয়ায়, সংগতির জোরে একাংশ যাচ্ছে এগিয়ে আর বাকিরা হয়ে যাচ্ছে বঞ্চনার শিকার।
>
> বাংলাভাষাকে সর্বতোভাবে কাজে লাগাতে পারলে এবং মাথা উঁচু করে বেঁচেবর্তে থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে আজ আর আমাদের এভাবে কানামাছির অবস্থায় পড়তে হত না।
>
> সকলে মিলে সংকল্প নিলে এখনও হাল ফেরানো যায়। বস্তুর নাম, ক্রিয়ার নাম —এই নিয়েই তো ভাষা। দরকার জলে নামা। তাহলেই সাঁতার শেখা যায়। ঘোড়া হলে চাবুকে আটকাবে না। বাংলা ভাষার ভাঁড়ারে টান পড়লে চেয়েচিন্তে সে অভাব মোচন করব। দুনিয়াদারিতে জাত যায় না।

বাংলা লিপি নিয়ে একটা ভাবনা সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মাথায় অনেক কাল ধরেই ছিল। তিনি চেয়েছিলেন সিলেবিক বাংলা লিপিকে অ্যালফাবেটে পরিণত করতে। এই নবলিপির নামকরণ করেছিলেন 'একাক্ষরী বাংলা'। ওই নামে একটি নিবন্ধ আছে। বলেছেন—'সংস্কৃতের জন্য পুরো বর্ণমালা থাক। কিন্তু বাংলা লেখার জন্যে আমরা অনায়াসে কিছু কিছু বর্ণ ছেঁটে ফেলতে পারি। যদি বাংলা বানান যথাসম্ভব উচ্চারণ অনুযায়ী হয় তাহলে ক্ষতি কী? ঈ ঊ ঋ ক্ষ ঙ ঞ ণ য ষ : বাদ দিলে বাংলার মহাভারত খুব কি অশুদ্ধ হয়? যাঁরা বাংলা বানানকে উচ্চারণের ছাঁচে ঢালতে চান, তাঁদের পক্ষে এ-কাজ ঢের সহজ হবে হরফ বদল করলে।' তিনি চেয়েছিলেন কাজটা ধাপে ধাপে হোক। সরকারি আর বেসরকারি বৈষয়িক

কাজে এর প্রচলন শুরু করা যেতে পারে। সাইনবোর্ড, নোটিশ, টিকিট, লেবেল, বাড়ির নম্বর, রাস্তার নাম এসবে এই নতুন হরফ ব্যবহার করা যায়। টাইপরাইটার এবং সেই সঙ্গে টেলেক্স টেলিপ্রিন্টারেও সুবিধা হবে। একাক্ষরী বাংলার সপক্ষে যুক্তি সাজিয়ে এবং নমুনা দিয়ে সওয়াল করেছেন। সব শেষে ঘোষণা করেছেন : 'আমার শুধু একটাই গোঁ, অ্যালফাবেটে বাংলা লেখা হোক। একাক্ষরী বাংলা।' তবে পরের প্রবন্ধেই ('বানানের মা-বাবা') তাঁকে সংশয়বাক্য উচ্চারণ করতে হয়েছে—'আমূল বানান-সংস্কার থেকে যুক্তাক্ষর ভাঙা—বাংলা অক্ষরে কি আমাদের সইবে?'

এই প্রসঙ্গে এইটুকুই বলা চলে যে বাংলা বর্ণমালা থেকে কিছু কিছু হরফ বাদ দেওয়া, যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা এবং উচ্চারণসম্মত বানান লেখার প্রস্তাব গত এক-দেড়শো বছরে বারে বারেই উঠেছে। রোমানীকরণের কথাও। কিন্তু সকল ভাষারই নিজস্ব প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য থাকে, সেটার আমূল পরিবর্তন ঘটানো সহজ ব্যাপার নয়। তাই অনেক আলোচনা ও বিতর্ক সত্ত্বেও এসব মত গৃহীত হতে পারেনি।

বাংলা ভাষার নিজস্ব স্বভাবপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে ব্যাকরণ রচনার কাজে হাত দেওয়ার কথাও সুভাষ মুখোপাধ্যায় মনে করিয়ে দিয়েছেন। বাংলায় কোশগ্রন্থ, অভিধান এসব যেমন চাই তেমনি চাই খাঁটি বাংলার জন্য ব্যাকরণ। 'ভাষায় শব্দ বড়ো কথা নয়, বড়ো কথা হল বাক্য। ভাষাকে ভাঙতে ভাঙতে শেষ যেখানে এসে ঠেকে, সেটা শব্দ নয়—বাক্য। শব্দ নয়, বাকাই হল ভাষার একক। বাক্যের অভিপ্রায় অনুযায়ী শব্দগুলো আগে পরে হয়ে নিজেদের সাজিয়ে নেয়। শব্দগুলোকে সাজানো-গোছানোর কাজ করে ব্যাকরণ।' সংস্কৃতের সঙ্গে বাংলার নাড়ির যোগ আছে, তবু বাংলা একটা স্বতন্ত্র ভাষা। সংস্কৃত ব্যাকরণে সন্ধি সমাসের নিয়ম 'ভজকট', বাংলায় তার 'বাঁধন অনেকটা আলগা'। বাংলা ভাষারও বিস্তর নিজস্ব সন্ধিসমাস আছে। 'বাংলার একটা বড়ো মাধুর্য হল শব্দের দ্বিত্ব, যুগ্ম আর অনুকারী শব্দ।' তিনি চেয়েছিলেন কৃতবিদ্য কেউ এই ব্যাকরণ রচনার কাজে হাত লাগান। দু-একজনকে বলেও ছিলেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কচিকাঁচাদের লক্ষ করে লিখেছেন অনেক। ছড়া ছাড়াও গল্পকাহিনি। আবার শিশুশিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম পাঠ রচনায়ও হাত লাগিয়েছিলেন। এ নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে ভাবনাচিন্তা করেছেন। খসড়া রচনা করেছেন, সংশোধন করেছেন। অবশেষে যখন নিজের মনে ধরল তখন তৈরি হল চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি। সে পাণ্ডুলিপি এখন প্রকাশকের হাতে, ছেপে বের করার কাজ প্রায় শেষ। তবে রচয়িতা দেখে যেতে পারলেন না। বাঙালি শিশুর জন্য তাঁর এই উপহারটুকু রেখে বিদায় নিয়েছেন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় গোটা জীবন ধরেই বাংলা ভাষা আর তার অবয়ব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে গেছেন। তাঁর বিভিন্ন লেখায় তার নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। আলাপ-চারিতায়ও সে সব প্রসঙ্গ প্রায়ই উঠত। কবি সুভাষ, গদ্য লেখক সুভাষ ছাড়াও তাঁর এই পরিচয়টাও বড়ো পরিচয় হয়ে থাকবে।

ফকিরের আলখাল্লা
জাদুগদ্যে ভাবনার আলপনা
অভীক মজুমদার

'হোক পড়ন্ত বেলা
ভয়-তরাসে জমবে খাসা
ভালবাসায় আকুল
সর্বাঙ্গে আগুন নিয়ে খেলা।'
(আগুন নিয়ে খেলা/ধর্মের কল)

১.

'ফকিরের আলখাল্লা' আদ্যোপান্ত পড়ে ফেলার পর মন ভালো হয়ে যায়। মনে হয়, এই সেই গদ্য যার সর্বাঙ্গে, পরতে পরতে মিশে আছে কাঁচা মাটির নিজস্ব বিস্তার। এমন বাংলা এখন আর কেউ লিখতে পারে না, 'শীলন' আর 'শেবিন'-এর কৃত্রিমতায় জনবাত্ময়তা থেকে আমরা বহু দূরে, মই-এর টঙে উঠে বসে আছি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিষয় নির্বাচন এ কথাও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, লোকজীবন আর লোকভাষার ছিপে 'আধুনিক' সমস্যা-সংকটের অনেক রাঘব বোয়ালকেই অনায়াসে কব্জা করা সম্ভব। বাউল-ফকিরদের গানে যেমন, লোকায়তের বলিষ্ঠ-চেনা শব্দের খাঁচায় বিমূর্ততম জটিল দর্শনচিন্তা 'আধুনিক' পাখির বেশে সহজেই আসে-যায়! বইটির ভূমিকায় নামকরণের যে ব্যাখ্যাই লেখক দিন না কেন, পাঠক হিসেবে মনে হয়, বইয়ের নামের ফকিরি অনুষঙ্গে হয়তো লোকায়ত আধুনিক টানাপোড়েনের একটা মাত্রা রয়েছে। এ টানাপোড়েনে অবশ্য দ্বন্দ্ব নয়, সংশ্লেষই প্রধান।

নানা কারণেই 'ফকিরের আলখাল্লা' ভিন্ন এক গুরুত্ব দাবি করে। ২০০২ সলের এপ্রিলে প্রকাশিত (২৫ বৈশাখ, ১৪০৯) এই বইটি কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ গদ্যগ্রন্থ। 'জনযুদ্ধ' পত্রিকায় সোমনাথ লাহিড়ীর অভিভাবকত্বে যে সাংবাদিক গদ্য রচনার শুরু ['আমাকে হাতে ধ'রে বাংলা লিখতে শিখিয়েছিলেন লাহিড়ী। দলা পাকিয়ে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে লেখা আমার গদ্য। একটা লেখা দশবার লিখিয়ে তবে ছেড়েছেন।' —'চিঠির দর্পণে'। পৃ. ১৩৪।], 'আমার বাংলা'-য় (১৯৫১) যে গদ্যশিল্পীর গ্রন্থাকারে প্রথম যাত্রার সূচনা, ঠিক পঞ্চাশ বছর পর একান্নয় 'ফকিরের আলখাল্লা'য় তার জয়-জয়ন্তীর বৃত্ত সম্পূর্ণ হলো। এই পঞ্চাশ বছরে কত বিচিত্র বিষয়, কত বিভিন্ন ভাবনা, কত বিবিধ প্রসঙ্গ তাঁর কলমের ডগায় অভিব্যক্ত হয়েছে, কত রকমের সাহিত্যবর্গে (Genre) তাঁর অনায়াস বিচরণ ঘটেছে—কিন্তু ভরকেন্দ্র মোটের ওপর আকাশ-পাতাল বদলে যায়নি। 'ফকিরের আলখাল্লা' বইটিও সেই ভাবনা মানচিত্রেরই অংশীদার, ঐতিহ্যের ওতপ্রোতেই তার বিস্তার। সে প্রসঙ্গে বিশদে যাবার আগে, বইটিকে সরেজমিনে একবার খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া প্রয়োজন।

'আগুনের আঁচ নিভে আসছে
তাকে খুঁচিয়ে গনগনে করে তোলো।
উঁচু থেকে যদি না হয়
নিচে থেকে করো।' (মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ)

২.

বইটির প্রবন্ধসংখ্যা কুড়ি। ভূমিকায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, 'পথে পথে বাউণ্ডুলে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি। তারপর পাখির বাসায় ফিরেছি। ...কিন্তু থিতিয়ে বসা আমার কুষ্টিতে লেখেনি। ফলে, চোখ বুজে ফের বেরিয়ে পড়া। এরই ফাঁকে দায়ে প'ড়ে লেখা। এখানে এটা। ওখানে সেটা। কবে কোথায় কোন্‌টা। তাও কি ছাই জানি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছত্রাকার সব। শেষ পর্যন্ত যা পাওয়া যায় কুড়িয়ে বাড়িয়ে একসা করা। ব্যস্ত রাঁধুনির শাড়িতে হাতমোছা হলুদের দাগের মতোই এর সর্বাঙ্গে মিলবে সময়ের টিপছাপ। নানা রঙের কাপড়ের ছাঁট জোড়া দেওয়া এ যেন ফকিরের আলখাল্লা।'

নানা রঙের এই সমাহার যদি খুব কাছ থেকে দেখা যায়, তাহলে বোঝা যাবে বইটিতে প্রধানত চার ধরনের রচনা ঠাঁই পেয়েছে। প্রথমাংশে রয়েছে লেখকের স্বভাবসিদ্ধ সেই অবিস্মরণীয় আত্মজৈবনিক ঢঙে বাংলা বাঙালি আর কলকাতার পরিবর্তমান রূপরেখা। তবে, সে কেবল স্মৃতিবিস্মৃতির ব্যক্তিমুখর ঝিকিমিকি নয়, রাজনীতি-সমাজনীতি-মানুষ-জীবনের সমবেত কল্লোল সেখানে—অনুভবী মনের এক লেখক সেই কল্লোলিত বহুস্বরকে আতশকাচের নীচে রেখে তাতে ক্রমাগত মিশিয়ে চলেছেন তাঁর দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগ, প্রত্যাশা আর স্বপ্নভঙ্গের কথকতা। তাহলে কি বিষাদ আর সন্তাপই শেষ কথা বলবে? তেমন কিন্তু নয়—'কলকাতা মরেনি, হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে মড়ার ভাব করে আছে। তার এই শেয়ালফাঁকি ধরতে না পেরে যারা বলছে—নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো মরে রয়েছে, আমি তাদের কানে একটাই মন্ত্র দিতে চাই। সেটা এই : শহরটার একটু চালচুলোর ব্যবস্থা করুন।

উনুন জ্বেলে চড়ানো হোক ভাত। তারপর দাঁড়িয়ে দেখুন ফেন গালবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে।' (কলকাতার শূন্যে সৌধ।)

দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয় প্রথম পর্বের খুব স্বাভাবিক ধারাবাহিকতায় অবয়ব পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে প্রথম ধরনের গদ্যে যা ছিল উদ্দীপন বিভাবের মতো অপ্রধান অথচ গুরুত্বময় প্রেক্ষিত, দ্বিতীয় পর্বে সেই প্রসঙ্গই চলে এসেছে কেন্দ্রে। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো বাংলা ভাষার ভূত ভবিষ্যৎ। খুব যত্ন নিয়ে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রয়োগ পদ্ধতি একের পর এক প্রবন্ধে বুঝিয়ে বলতে চেয়েছেন লেখক। এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা, তাঁর পরিকল্পনা, তাঁর যুক্তি, তাঁর নিরাশা, তাঁর প্রকল্প প্রাঞ্জলভঙ্গিতে পরিবেশন করেছেন তিনি। এ পর্যায়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ লেখা—'মাথায় থাকুক বাংলা' আর 'একাক্ষরী বাংলা'। 'একাক্ষরী বাংলা' প্রবন্ধটিতে ধরে-ধরে তাঁর বহুদিনের বহুবার উচ্চারিত বাংলাভাষার সরলীকৃত ব্যবহারিক রূপায়ণকে মূর্ত অনুপুঙ্খে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ওই প্রবন্ধের শেষ পঙ্‌ক্তিতে তিনি জানিয়েছেন—'আমার শুধু একটাই গোঁ, অ্যালফাবেটে বাংলা লেখা হোক। একাক্ষরী বাংলা।'

তৃতীয় পর্বের পাঁচটি প্রবন্ধই আবর্তিত হয়েছে বাংলা সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকতাকে নিয়ে। তার মধ্যেও অবশ্য বাংলা আর বাঙালি জীবনের বিভিন্ন জরুরি প্রসঙ্গ মিলেমিশে আছে। সেখানেও রয়েছে রাজনৈতিক বা সমাজসমীক্ষকের চোখ—'আমরা সবাই কি হাত লাগাব না যাতে আমাদের দেশ মাথা উঁচু করে খোলা হাতে খোলা মনে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে? তার জন্য চাই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার সঙ্গে সাংবাদিকেরও স্বাধীনতা। সেই স্বাধীনতা স্বার্থপরের মতো একা নিজের ভালো দেখবে না। দেশের ভালোর জন্যেও গায়ের রক্ত জল করবে।' (কাগজের ইতি গজঃ)

এ বইয়ের শেষ প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল 'চন্দনকুমার ভট্টাচার্য স্মারক বক্তৃতা' হিসেবে। নাম দেওয়া হয়েছে 'কবিতার এ-ও-তা'। চতুর্থ পর্বের এ প্রবন্ধটি আমার মতে, 'কবিতার বোঝাপড়া' (১৯৯৩) গ্রন্থভুক্ত রচনাগুলির সমধর্মী। সেই কবিতা লেখা কবিতাপড়ার সংযুক্ত আত্মনৈরাত্ম্যকথন এ প্রবন্ধেও খুলে ধরেছে কবিতার নানা কঠিন জট। সেখানেও রচনার প্রধান গুণ-প্রাঞ্জলতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনবদ্য কথনরীতি চারপাশের জানা-চেনা জগৎকে আঁকড়ে ধরে ডালপালা মেলেছে আকাশের গভীর অজানায়। আবার বলতে হয়, এ যেন আধুনিক লোককথা।

চার ধরনের এই প্রবন্ধ সংকলনে নানা কারণেই মনে হয়, দ্বিতীয় পর্বটি সব থেকে গুরুত্বের। বাংলাভাষার অনন্য এক ব্যক্তিত্ব, নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষার দুর্দশামোচনে এবং ব্যবহারিকতাবর্ধনে যে কটি দিক তুলে ধরেছেন তার মাত্রা বহুস্তরিক। সমাজ এবং সমাজমানসের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক এত নিবিড়, তিনি যখন ভাষার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলেন, তার আলাদা একটা আয়তন তৈরি হয়ে যায়। অন্যদিকে, তাঁর বিনয়কথন মনে রেখেও বলা চলে, তাঁর মতো ভাষা বিশারদ, বিশেষত বাংলা বিশেষজ্ঞ এ যুগে বিরল। বহুদিন থেকে বাংলাভাষার নানা ক্রিয়াকর্ম, তার অভ্যন্তরীণ রহস্য রোমাঞ্চ, তার সমৃদ্ধ বিস্তারকে খুব সহজ মুন্‌শিয়ানায় পাঠকের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন লেখক। বাংলাভাষা-বাংলা বানানবিধি-বাংলা ভাষাচর্চা এ সব নিয়ে বিভিন্ন কোণ থেকে আলোচনা করেছেন তিনি। প্রসঙ্গত, এই বইয়ের ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি পড়তে পড়তে পাঠকের মনে পড়ে যেতে পারে তাঁর 'কথার গুণে তরি কথার দোষে মরি' (১৯৯৮) বইটির কথা। সেই বইয়ের মৌল প্রবন্ধবিন্যাস 'ফকিরের আলখাল্লা' বইয়ের সঙ্গে বহুলাংশে মিলে যায়। এ দুটি বই হয়তো নানাকারণেই মিলিয়ে পড়া দরকার। ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধগুলি দুটি বইয়ের মিলিত অবয়বে তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গিকে আরো সামগ্রিকতায় উপস্থাপিত করে। দুটি বইয়ের দুটি প্রবন্ধের নামের দিকে তাকালেই সংযোগটা বোঝা যাবে—(১) বাংলা ভাষার মা-বাপ ('কথার গুণে তরি কথার দোষে মরি') (২) বানানের মা-বাপ ('ফকিরের আলখাল্লা')। দুটিকে মিলিয়ে পড়াই কি পাঠকের পক্ষে সমীচীন নয়?

একটা আশ্চর্যের বিষয় অবশ্য এ প্রসঙ্গে আছে। ১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি এবং তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ-পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিপুল আকারে এবং আয়োজনে বাংলা ভাষার নানাদিক নিয়ে কয়েকদিনব্যাপী আলোচনাচক্রের প্রযোজনা করেন। গ্রন্থাকারে সেই

বক্তৃতাবলি পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয় (১৯৮৬) যার নাম 'প্রসঙ্গ : বাংলাভাষা'। সেখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুপস্থিতি-শুধু বিস্ময়করই নয়, প্রতিবাদযোগ্য বলেও মনে হয়। কোনো তিক্ত 'রাজনৈতিক' আলোচনায় না গিয়েও বলা চলে, এতে ক্ষতি বই লাভ হয়নি। অন্তত ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার পর এমন 'সুভাষিত রত্নকোশ' কীভাবে বা কেন উপেক্ষিত থাকে সে বিষয়ে মনে ক্ষোভ জমা হয়।

'নদী যেমন আসছি ব'লে
নাচতে নাচতে
মোহানায় ছুটে যায়
আবার বৃষ্টির জল হয়ে
চক্রাকারে ফিরে আসে উৎসে।
তেমনি কি?
কী জানি।' (আজ আছি কাল নেই)

৩.

'ফকিরের আলখাল্লা' বইটির সূচনায় প্রকাশকের বক্তব্য থেকে জানা যায় বইটি প্রথমে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল 'এই ভাষা এই দেশ' নামে। পরে 'লেখকের ইচ্ছানুযায়ী সেই নাম পরিবর্তিত' হয়। আসলে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত সাহিত্যকৃতীই আবর্তিত হয়েছে ওই ভাষা আর দেশ-এর দুই অক্ষে। ফলে এই বইটিও তাঁর সেই অক্ষরজগতেরই সম্প্রসারণ। ১৯৫১ থেকে ২০০১, দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল জুড়ে পাল্টে গেছে বিবিধ সমীকরণ, 'পরিবর্তিত পরিস্থিতি' জন্ম দিয়েছে বিভিন্ন অনুকূল-প্রতিকূল বাস্তবতা, কত হিসেবের কড়ি কত বাঘে-কুমিরে কতবার খেয়ে নিয়েছে—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মূল সাহিত্যনন্দন তার মূল ভুজ আর কোটি কিন্তু বদলায়নি। ফলে, অজস্র যাতায়াতের পথে পথে নানা পুনরাবৃত্ত প্রসঙ্গ মনোযোগী পাঠকের চোখে ধরা পড়বেই। এমনকী, একটু অন্য অর্থে এ বইয়ের নামও কি হতে পারত না 'আমার বাংলা'? আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি বলতে চাইছি বৃহত্তর প্রেক্ষিতের বিচারে গদ্যগ্রন্থগুলির মধ্যে এক অটুট সমীপতা লক্ষ করা যায়। 'ফকিরের আলখাল্লা'-র ভূমিকার সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যাক তাঁর দ্বিতীয় গদ্যগ্রন্থ 'যখন যেখানে' (১৯৬০)-র ভূমিকা, দেখা যাবে, কয়েকটি সমধর্মী এষণা (motif) বিয়াল্লিশ বছর আগে-পরে সমান দীপ্যমান। 'রংবেরঙের দুটুকরো কাপড় জোড়া দিলে হয় বাউলের আলখাল্লা। নিজেদের মধ্যে তাদের যত বৈসাদৃশ্যই থাকুক, বাউলদের জীবনই তাদের এক জায়গায় মিলিয়ে দেয়। এবইতেও যদি পায়ের ধুলোয় সেই অমিলের মিল পাওয়া যায়, তাহলেই লেখক খুশী। ...আলখাল্লার ছিটগ্রস্ততা দেখে যাঁরা ভয় পাননি, কাটা গল্পের বাজারে তাঁদের কপালে কী আছে কে জানে?'

এরকম ফিরে ফিরে দেখা অথবা কিছু কিছু স্মৃতিমেদুর প্রসঙ্গের একাধিক অবতারণা কিংবা প্রিয়জনের অমলিন অনুষঙ্গ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য রচনাগুলির মধ্যে অন্তর্লীন সংযোগ তৈরি করে। 'ফকিরের আলখাল্লা' বইটিতে যেমন অনিবার্যভাবে ঢুকে পড়েছে

বাংলাদেশের নানা প্রসঙ্গ। এ প্রবণতাও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে নতুন নয়। মাঝখানে পাহারা থাকলেও এপারে ওপারে যে একই বাংলা সে কথা তিনি ভুলতে চাননি। সেজন্যই দুপার বাংলাকে মিলিয়ে মিশিয়ে সামগ্রিকতায় বারংবার ধরতে চেয়েছেন তিনি। কেননা, 'ওপারে জনস্বার্থে ঘা লাগলে তার ল্যাঠা এপারকেও সামলাতে হয়। কাজেই বাংলাদেশের ভালোমন্দের সঙ্গে আমাদেরও ভালোমন্দ জড়িয়ে আছে।' (লঘুগুরু)

'তথাগত' নামের একটি ছোটো লেখায় সুভাষ হঠাৎ ঢাকা শহরে পৌঁছে লেখেন, 'জহিরকে কথা দিয়েছিলাম আমি ঢাকায় যাব। জহির কথা দিয়েছিল আমাকে সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব কিছু দেখাবে। আমি কথা রেখেছি। জহির রাখেনি। সেই রাগে ওদের কায়েতটুলির বাড়িতে গেলেও আমি একবারও মীরপুরের রাস্তা মাড়াইনি।' পাঠক হিসেবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় 'ক্ষমা নেই' (১৩৭৮) বইয়ের 'ভাই জাহির রায়হান' আর 'অপুতপু-কে' লেখা দুটির কথা। অথবা, এই বইয়ের 'নেতি নেতি-র ইতি' প্রবন্ধে ১৯৪৬ সালের নোয়াখালির অভিজ্ঞতা মিলে যায় অনেক পুরোনো 'নস্টালাজিয়া'-র (১৯৮৭) সঙ্গে 'চৌমুহনীতে পৌঁছে "রসময়বাবু" বলে ডেকে আড়তের ভেতর থেকে এক বাঙালি অহিন্দুকে স্বকণ্ঠে বলতে শোনা—"এখানে কোনো বাঙালি থাকে না।" আর আজ?...'

অন্যদিকে, নিজের গদ্য আর কবিতার মধ্যে ক্রমাগত তিনি ঝুলিয়ে গেছেন অজস্র ঝলমলে সাঁকো। এ বইতেও তেমন বিস্তর সেতু লক্ষ করা যাবে। একটি দুটির কথা বলি—

'এ বাসাটাতে আছি তেত্রিশ বছরের ওপর। যে ভাড়ায় আছি, তাতে এখন বস্তিতে খোলার ঘরও মিলবে না। ...এ বাড়ির মালিকানা বদলে যাওয়ার পর সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার সময় ঝাঁঝালো সুরে প্রায়ই কথাটা আমাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়। ...আরেক মুশকিল বাড়ির কুকুর বেড়ালগুলোকে নিয়ে। ওরা সবসময় তক্কে ঘুরছে, কিভাবে আমাদের ফ্যাসাদে ফেলা যায়। ...বজ্জাতের একশেষ ছিল ভোমরা। রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা বেড়াল। ...স্বভাবদোষেই শেষ পর্যন্ত সে মারা পড়ল। আমাদের সন্দেহ হয়, কেউ তাকে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল।' (তথাগত)

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়া যায়—

'পরের বাড়িতে আছি, তা প্রায়
চল্লিশ বছরের কাছাকাছি।
অবশ্য বিনা পয়সার নয়।
পুরনো ভাড়ায়।
.....
লাথিঝাঁটা আর শাপমুন্যিগুলো
দুম দুম করে
রোজ দু'বেলা সিঁড়ি দিয়ে ওঠে নামে।
.....
কিন্তু ইদানীং আমি বুঝে উঠতে পারছি না
বিরুদ্ধ পক্ষের কোনো দুঁদে উকিল

আমাদের দুটো শয়তান কুকুরকে
আর চারটে লুভিষ্টি বেড়ালকে
লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু খাওয়াচ্ছে কিনা।
নইলে—
আমার ভয় হয়,
শেষটায় ওদের জ্বালাতেই কি আমাদের
বাড়ি ছাড়তে হবে?' ('আজ আছি কাল নেই')

অথবা,

'সমস্তই ঠিক। কিন্তু তবু আজকাল খবরের কাগজ পড়ে তৃপ্তি হয় না কেন? এত ঝকঝকে ছাপা, পাতায় পাতায় ছবি। আক্কেল গুড়ুম করা এত খবর! তা সত্ত্বেও?' ('কাগজের ইতি গজঃ')

'কাগজটা হাত বাড়ালেই পাই।
একটুও ইচ্ছে করছে না—
কেননা বন্যায় ভেসে-যাওয়া
মৃত সন্তান বুকে আঁকড়ানো মৃত মায়ের
পাশেই দেখব

হয়ত

তুইথুলি মুইথুলি করছে
তিনটে ঘাটের মড়া
একজন বলে বৃষ্টি
তো একজন বলে খরা
দুজন এ ওকে টিপছে
তিন নম্বরকে সরা .....' ('একটু পা চালিয়ে, ভাই')

কোনো কোনো নিবন্ধে তো তিনি নিজেই পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়েছেন গদ্য-পদ্যের যুগলবন্দি। 'পুজোয় যাব না কোথাও' বা 'কবিতার এ-ও-তা' তাঁর ডানাদুটোকে একসঙ্গে জুড়ে নিয়েছে। শেষ নিবন্ধটিতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ রয়েছে। জীবনানন্দ সম্পর্কে বেশ বিস্তারিত সমুগ্ধ আলোচনা। বোঝা যায়, মুখুজ্যে পুনর্মূল্যায়নে কখনোই পিছ-পা নন।

আর তাঁর গদ্য। গদ্য নয় জাদুগদ্য। সহজ, প্রাণবন্ত অথচ গভীর অথচ গতিষ্মান, ওপর থেকে পাঠানো 'বাণী' নয়, শাদামাটা জীবনের প্রাত্যহিকতা থেকেই সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার তাগিদ। যে কোনো জটিল-বিস্তৃত বিষয়কেই সহজসুরে জাপ্টে ধরার দুর্দান্ত ক্ষমতা তার। সাধারণ মানুষকে চেনা ভাষাভঙ্গিতে নানা প্যাঁচানো জটের মোদ্দা নক্শাটা বোঝাবার চেষ্টা করে গেছেন তিনি। সমাধানও খুঁজতে চেয়েছেন আমাদের একজন হয়ে। জেনেবুঝেই নিজস্ব কথনভঙ্গি তৈরি করে নিয়েছেন, '...কথার মধ্যেই থাকে ভাবগত বা ধ্বনিগতভাবে গায়ে গায়ে লেগে যাওয়ার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক। এটা ভাষালক্ষ্মীরই এক উঁচুদরের

গৃহিণীপনা। এতে ভাষা আঁটো হয়ে আরো খোলতাই হয়। জোড়া-দেওয়া সংহত শব্দ হিসেবেই তো ভাষায় তার জায়গা ক'রে দেওয়া যায়।

বাংলার একটা বড়ো মাধুর্য হল শব্দের দ্বিত্ব, যুগ্ম আর অনুকারী শব্দ।

কাগুজে লেখায় অনেকেই এসবের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলেন। এমন কি বাগ্বিধি আর প্রবাদ প্রবচনের দেখা কম মেলে' (কাগজে কলমে)।

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে—

'সর্বতোভাবে বাংলা ব্যবহার ফরমান দিয়ে হবে না। বাঙালি মনের পতিতজমিকে আবাদযোগ্য করতে হবে।

গলা চড়িয়ে শক্তিক্ষয় না করে ঘাড় গুঁজে কাজ করে গেলে বাংলাবাসী সবাই আমাদের পাশে দাঁড়াবে।

আমরা চিরকেলে বাঙালি নই। অনেকেই উড়ে এসে জুড়ে বসে কালক্রমে বাঙালি। কারও মৌরসিপাট্টা বলে কিছু নেই। ভাষাকে বড়ো করতে গিয়ে মনটাকে যেন ছোট করে না ফেলি। দেখবেন, আশা আর ফুঁ আছে, দুধ আর বাটি নেই। আবার যেন এমনটা না হয়। ('কথায় আর কাজে')

দৃষ্টান্ত বহুগুণ বাড়ানো যায়। কিন্তু মূল সিদ্ধান্তটা একই থাকে। আমি বলতে চাইছি যে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন সাহিত্যবর্গে অভিব্যক্ত গ্রন্থাবলি একটাই মিছিলের চেহারা নেয়। সেই মিছিলের দাবিদাওয়া, তার শ্লোগান, তার উদ্‌বেগ তার নতুন পুরোনো মুখের আকাশের দিকে তোলা মুষ্টিবদ্ধ হাত, তার প্রত্যয় আর বিশ্বাস—মূলগতভাবে একই থাকে—তার স্মৃতি আর সত্তা অতীত-ভবিষ্যতের পরোয়া করেনি।

'সময়ের সঙ্গে আমরা সম্বন্ধ পাতাই
ছোটো, বড়ো, গোল, চৌকো নানান মাপের।
সময়টা এক নয়—
এর ওর তার।
তোমার সময় দিয়ে তাই
বৃথা চেষ্টা আমাকে মাপবার।' (কাল মধুমাস)

৪.

'ফকিরের আলখাল্লা' বইটির একটা ছোটো মুশকিল হলো প্রবন্ধের কোনোটির নীচেই লেখার সাল তারিখ বা প্রকাশসন দেওয়া নেই। লেখক তো ভূমিকায় বলেই খালাস 'এর সর্বাঙ্গে মিলবে সময়ের টিপছাপ'। কিন্তু, কোন্ সময়? আবছা একটা আন্দাজ করা যায় অনেকসময়, অনেকসময় তেমন করাও যায় না। সময়টা জানা খুব দরকার কি কিছু? একটা ছোটো প্রসঙ্গ তুলে খোলসা করে বলি—'আন্দোলন কলকাতায় একবার আরম্ভ হলে মফস্বলে ছড়াতে দেরি হবে না। যা আমাদের হাতের নাগালে আছে, তাই দিয়েই শুরু করা যাক। কলকাতা বাংলার রাজধানী। সাইনবোর্ড যদি একটিমাত্র লিপিতেই লেখা হয়, তাহলে সে লিপি হবে বাংলা। রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর সর্বাগ্রে বাংলায় হতেই হবে। ট্রামবাসের টিকিট চাই বাংলা, গাড়ির

নম্বরেও বাংলা নয় কেন? সর্বসাধারণের জন্যে সরকারি, বেসরকারি এবং পৌরসভার সমস্ত বিজ্ঞপ্তি বাংলায় দিতে হবে। একটু ভাবলে এবং একটু চোখ মেলে দেখলেই আমরা বাংলাভাষাকে জাতে তুলে তার মান ফেরাতে পারি।' ('মাথায় থাকুক বাংলা')

আজ আমার শহরে যখন এরকম একটা আন্দোলন দানা বাঁধছে, জানতে ইচ্ছে করে কতদিন আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এসব কথা লিখেছিলেন, এখনই বা তাঁর নাম ভাষাজাগরণের কর্মকাণ্ডে শোনা যায় না কেন?

এই ভাষা বিষয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সব বক্তব্য যে বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে পেরেছি তেমন নয়। অন্য ক্ষেত্রেও দু-একটি সংশয় আমার রয়েছে। তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো উপায় নেই জেনেও ছোটোমুখে বিনীত কয়েকটি প্রশ্ন তুলতে চাই—

(১) 'একাক্ষরী বাংলা' প্রবন্ধে উপস্থাপিত প্রস্তাবে আমি একমত নই। রোমান হরফে বাংলা লেখা তো কাঁটা চামচ দিয়ে ভাতখাবার শামিল। 'অক্ষরে অক্ষরে' বইতে (১৯৫৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায় তো আমাদের শিখিয়েছিলেন, একটা ভাষায় বর্ণবিন্যাসের গুরুত্ব কতটা ভাষার সঙ্গে তার বর্ণমালা ওতপ্রোত কতখানি। সেই বর্ণমালাকে ব্যবহারিকতার খাতিরে যদি অ্যালফাবেটে রূপান্তরিত করি, ভাষার একটা বড়ো অঙ্গহানি হয়ে যাবে। তারপর একটু একটু করে ভাষাটাই উবে যাবে, যেমন হয়েছে আজকের লাতিন আমেরিকায়, আফ্রিকার অনেক দেশে। তার ওপর, বাংলা বর্ণকাঠামো এবং অক্ষররীতিতে ভাষা এগোয় আনুভূমিক চলনে নয় (যেমন নাকি ইংরেজি বা ফরাসি বা রাশিয়ান বা মায় জাপানিতেও) বরং উল্লম্ব সংযোগে। ব্যবহারিকতা আর পুঁজির দাপটে, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ যদি সেই বৈশিষ্ট্যকে গিলে নেয় আফশোসের শেষ থাকবে না। মলয়ালম ভাষায় যেমন নিজস্ব সংখ্যাগণনা পদ্ধতি এবং সংখ্যা প্রতীক 'আন্তর্জাতিক' 1, 2, 3-এর দৌরাত্ম্যে সম্পূর্ণ উধাও হয়ে গেছে। বাংলাভাষার ঘুড়িকে উড়ান দিতে সুতো ছাড়তে আমার আপত্তি নেই কিন্তু সেটা করতে গিয়ে ঘুড়িটাই যেন মেঘের আড়ালে হারিয়ে না যায়।

(২) বাংলাভাষাকে সর্বস্তরে কেন্দ্রীয় গুরুত্ব বাংলায় বসে দিতেই হবে। কোনো আপত্তি ওজর, জাতীয়তা আর্ন্তজাতিকতার অজুহাত; কিছুই শুনতে আমি অন্তত রাজি নই। কিন্তু, সবসময় এ কথা মনে রাখা ভালো তাতে মাত্রা যেন বাঁধা থাকে। পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা কিন্তু খুব সুখপ্রদ নয়। বাঙালির হাতে শোষিত হচ্ছি—এমন কোনো সান্ত্বনা কি শোষিতের থাকে? 'শ্রেণী' কে সম্পূর্ণ ভুলে গেলে চলবে কি? বাঙালি পুঁজিপতি ন্যায্য বকেয়া না দিলে বাঙালি শ্রমিকনেতা কি জঙ্গি আন্দোলনের আগে দু-বার ভাববেন? ভাবাটা অভিপ্রেত? [এডওয়ার্ড সইদের দুনিয়া কাঁপানো বই 'ওরিয়েন্টালিজম' (১৯৭৯) -এও কিন্তু একই গণ্ডগোল লক্ষ করা যায়। 'শ্রেণী' নিয়ে তাঁরও বিশেষ মাথাব্যথা নেই।] গ্লসি কাগজে, রঙিন ঝলমলে 'বাংলা' কোনো দেশশুভৈষী পত্রিকা প্রতিসংখ্যায় যদি বাংলাভাষাকে ইংরেজির লেজুড় হিসেবে প্রমাণ করতে চায়, ইংরেজির তোষামোদ আর মুক্ত বাজারের নামে মার্কিনি প্রভুত্বের গুণগান গায়, ইংরেজিতে লেখা ভারতীয় সাহিত্যকে (সে এক আশ্চর্য কাকপুচ্ছধারী ময়ূর!) প্রধান এবং অমোঘ বলে প্রচার করে—শুধু বাংলা পত্রিকা বলেই তাকে প্রশ্রয় দিতে হবে? কোথাও থেকে উড়ে আসা মরাঠি বা কন্নড় ভাষায় 'নর্মদা

বাঁচাও আন্দোলন'-এর ইশ্‌তেহার হাতে তুলে নেওয়া, পড়ার চেষ্টা করা ভুল হবে শুধু বাংলা নয় বলে? আমি জানি না, আমি সত্যিই জানি না—সুভাষ মুখোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে তাঁর কাছে গিয়ে এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি শঙ্খ ঘোষের একটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করে প্রশ্ন করতাম, 'কী আমার পরিচয়, মা?' আর জিগ্যেস করতাম তাঁর ভাষাবিষয়ক লেখালেখিতে পষ্টাপষ্টি শ্রেণীর জটিলতাটা এলো না কেন? তিনিই তো এ বিষয়ে আলোচনার সেরা লোক।

(৩) বাঙালির সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, বাঙালি আর মুসলমানের হাস্যকর ভাগাভাগি এসব নিয়ে চিরকাল কষ্ট পেয়েছেন সুভাষ। এই বইতেও বারংবার সেই অপচেষ্টার দিকে আমাদের নজর ঘুরিয়ে দেবার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। খুব সংগত যুক্তিতেই তিনি লিখেছেন—'...দুর্গাপুজোর সঙ্গে বাঙালিত্বকে এক করে দেখা ঠিক নয়।' চমকপ্রদ গবেষণায় তুলে এনেছেন কবেকার 'ভ্রমর' পত্রিকায় লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের আড়ালে চলে যাওয়া প্রাসঙ্গিক লেখা। লিখেছেন শেষে, 'ভাষা এক হলেও যে-ধর্ম আমাদের দেশ ভেঙে দুখানা করেছে—তা কখনই আমাদের মিলনের সেতু হতে পারে না। ...পুজো আর প্রার্থনা—দুটোতেই রয়েছে শুধু হাত জোড় করে ভজাবার চেষ্টা। শুধু পরের কাছে মাথা নোয়ানো। বাঙালিকে যদি উঠে দাঁড়াতে হয়, মাথা উঁচু করে হাতদুটোকে কাজে লাগাতে হবে।' এসব অসামান্য কথা যিনি আমাদের শুনিয়েছেন তিনি বইতে একাধিকবার ব্যবহার করেছেন, 'ক অক্ষর গোমাংস'-এর মতো সাম্প্রদায়িক প্রবচন। কেন? ভাষাঐতিহ্যকেও কি প্রশ্ন না করে গ্রহণ করা ঠিক? নাকি, আমার খটকাতেই কোনো অসংগতি রয়েছে?

'বীজ তো নয়,
জলের মধ্যে
আমি পুঁতেছিলাম আগুন।
আগুন নয়—
রক্ত
হ্যাঁ, মনে পড়েছে—
পুঁতেছিলাম রক্তবীজ।' (রক্তবীজ)

৫.

এসব, কূটকচালি, প্রশ্ন খটকা অবশ্য শেষ পর্যন্ত তুচ্ছ কথা। সব পাঠকের সব মতামতের সঙ্গে লেখককে একমত হয়ে চলতে হবে এমন কোনো বাধ্যকতা আছে নাকি? শেষ কথাগুলো তাহলে চটপট বলে ফেলি।

বাউল ফকিরদের জোব্বাকে তাঁদের ভাষায় বলে 'সহস্রতালি'। এই বইয়ের নাম 'ফকিরের আলখাল্লা'। আবার বলি, পড়া শেষ করে কুর্ণিশের ভঙ্গিতে বলতে হয়, এ 'সহস্রতালি'-র জন্য শত-সহস্র মুগ্ধ করতালিও যথেষ্ট নয়। সেই ঋজু অথচ সংবেদনশীল মনকে পাঠকমাত্রেই ছুঁতে পারবেন বইটির মাধ্যমে, যাঁর কোনো জুড়ি নেই। যিনি চলে যাবার পর বাংলা আর কলকাতা বেশ কয়েকমাত্রা খাটো হয়ে গেছে।

এবার আমরা রাত জাগি!

জয়দেব বসু

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার মুখোমুখি আলাপ প্রায় ছিলই না। জীবনের শেষ দিকে একবার জয় গোস্বামীর সঙ্গে তাঁর বাড়ি যাওয়া ছাড়া। কিন্তু, কবি ও ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ছিল, অন্তত কুড়ি বছরের, যেটা প্রায় একলব্যের মতো। 'প্রায়', কারণ ব্যাপারটা অন্ধ নয়।

সম্পর্কটা দু-ভাগে ভাগ করা যায়। একদিকে ব্যক্তি সুভাষের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থান, যার একেবারে উল্টো মেরুতে আমি, স্বভাবতই। এ বিষয়ে আগাগোড়াই তাঁর বিরুদ্ধে আমি আমার ব্যক্তিগত ক্রিটিক রচনা করে গেছি—কখনো লেখায়, কখনো আচরণে, কখনো তীব্র তর্কে। তাঁর সঙ্গে যে আলাপ প্রায় ছিলই না, এও তো সে জন্যই।

কিন্তু, অন্য এক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন, এবং আছেন। না, কবিতার কথা বলছি না, সে তো পাঠকমাত্রই জানেন। বলছি, একদা পার্টিজান-কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কথা। পার্টির অভ্যন্তরে তাঁর বসবাস, টানাপোড়েনের ইতিহাসের কথা, শেষমেশ সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ না-করার কথা। আমি যখন লিখতে এলাম, পার্টিতে এলাম, তখন সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই প্রেতযোনিপ্রাপ্ত; কিন্তু, মানুন বা না-মানুন, এই প্রেত, অর্থাৎ 'হোলি গোস্ট'—তারও একটা অমর অস্তিত্ব আছে। আমার সম্পর্ক ছিল তার সঙ্গে, সম্পর্কটা এক অর্থে ছিল প্রতিযোগিতার।

প্রায় আঠারো বছর আগে, তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, এক বিকেলে আমার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ ধরে, প্রায় এঁড়ে তর্কো করতে-করতে, বলেছিলাম, 'যত যাই বলুন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় পার্টি ছেড়ে দিয়ে ভুল করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত লড়া উচিত ছিল ওঁর। আমার জীবনে আমি এই ভুল কখনো করব না।'

তখন বয়স কম ছিল। রাজনীতির বলয় বলতে ছাত্র-রাজনীতি, যেটা তুলনামূলকভাবে সবসময়ই কম-বেশি পরিচ্ছন্ন। উপরন্তু, শৈশব-কৈশোর কেটেছে প্রাক-দিলীপ সিংহ শান্তিনিকেতনে, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ আর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। যেখানে সবসময়ই অনেক কমলা রঙের রোদ। দেশের বাস্তবতার যোজন-যোজন দূরে যে জায়গাগুলির অবস্থান। আমার স্বভাবতই বলতে বাধেনি, 'আমি এই ভুল কখনো করব না।'

না, 'ভুল' করিনি। আজ পর্যন্ত না। তবে, আমাকেও তো একদিন মেহগনির ছায়াঘন পল্লব ছেড়ে বেরিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হল—যে রাস্তা পরিচর্যা করে (বা করে না) পুরসভা কিংবা পঞ্চায়েত। আমাকেও তো মুখোমুখি হতে হল সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অসূয়া-মাৎসর্য-ক্লিশে-মিডিওক্রিটি এবং সেন্সরশিপের। কে বলে আমি লিখি না? এই মুহূর্তে আমার কাছে রয়েছে গোটা একটা ফাইল ভর্তি লেখা—প্রতিটি সেন্সরড্। না, বামপন্থাকে একা দোষ দিয়ে কী

হবে, ডানপন্থার দ্বারাও সেন্সরড্। সেন্সরশিপের প্রতি অবৈধ আকর্ষণের প্রশ্নে, লক্ষ করেছি, ডান-বামে কোনো ভেদ নেই। বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র সেখানে গলাগলি। পরিস্থিতিটা সুখকর নয়।

এইসব সময়েই সুভাষ মুখোপাধ্যায় আমার কাজে আসতেন। বহু-বহু রাত একা-একা অন্ধকার ঘরে আমি তাঁর সেই প্রেতের সঙ্গে তর্ক করেছি, অনুসরণ করেছি, ভাবতে চেষ্টা করেছি এই অবস্থায় তিনি কী-কী করেছিলেন; শেষমেষ গোঁয়ারের মতো ভেবেছি—নাঃ, ছেড়ে দেওয়া কোনো কাজের কাজ না। শেষ পর্যন্ত লড়া উচিত।

লড়া তো অবশ্যই উচিত। মুশকিল হল, উচিত কাজ সবসময় হয় কোথায়? বিশেষত, একটা মানুষ তো শেষ পর্যন্ত একটাই মানুষ। যা হয়...সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক সংগ্রাম হলে ব্যাটনটা অন্যের হাতে এগিয়ে দেয়া যায়। তাও কি যায় সবসময়? শেষমেষ বিশিষ্ট নাগরিকদের যে আবেদনপত্রের ভিত্তিতে বেন্টিঙ্ক সতীদাহ নিষিদ্ধ করলেন, তাতে সবার সই ছিল শুধু রামমোহন রায় ছাড়া। সই চাওয়া হয়নি এমন নয়, করেননি। ওই আর কী...ক্লান্ত হয়ে গেছিলেন।

আজ বুঝি, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ক্লান্ত হয়ে গেছিলেন। তাই, যেটা আমার মতে 'ভুল', সেটাই করে বসলেন। বদলে শেষদিন পর্যন্ত সৃষ্টিশীল থাকলেন। আমি 'ভুল' করলাম না, বদলে কবিতা লেখার চেষ্টা করার ইচ্ছেটাও হারিয়ে ফেললাম। ভুল তো শোধরানো যায় না; যদি বা যায়, শুধরে 'ভুল' করা যায় না। উনি নরুণের বদলে নাক পেলেন, আমি নাকের বদলে নরুণ।

২

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আমি দ্বিতীয় ও শেষবার যাই তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে।

হাসপাতালের কেচ্ছাটা গিয়ে শুনলাম, আর, নিজে যা দেখলাম তা জীবনে ভুলব না।

যাঁদের শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, সবাই ফুটপাথে দাঁড়িয়ে। ভিতরের ঘরে টেবিল ঘিরে মমতা-সুব্রত-মদন-শোভনদেব...। বাজপেয়িকে ফোন করা হচ্ছে, কে জানে, হয়ত বা বুশকেও। বেলা বাড়তে থাকল। শ্রীমতী কোনোক্রমেই পশ্চাপসরণ করবেন না বুঝে নিয়ে ভদ্রমহিলা-ভদ্রলোকরাই গুটিগুটি হাঁটা দেওয়া শুরু করলেন। স্যরকে প্রশ্ন করলাম, 'শ্মশানে যাবেন না?' থম্ মারা মুখে বললেন, 'এতক্ষণ ভাবছিলাম...কিন্তু এখন আর ইচ্ছে করছে না।' এরকম একটা সময়ে চটি ফট্‌ফট্ করতে-করতে সপারিষদ শ্রীমতী বেরিয়ে এসে হাঁকডাক শুরু করলেন। পিছন থেকে কে যেন চেঁচালো, 'অ্যাই, বডি তোল...বডি তোল...।'

আমার মাথায় হঠাৎ রক্ত চড়ে গেল। মনে হল—এতরকম কাজে আমাদের ছেলেরা নামে...আজ নামতে পারত না? এক ঘণ্টায় জনসমুদ্র রচনা করে, ওই লোকগুলোকে কান ধরে বার করে দিতে পারত না? নিজেদের কবিকে নিজেরাই বহন করে নিয়ে যেতে-যেতে বলতে পারত না—মুখুজ্যে, তুমি ঘুমোও, এবার আমরা রাত জাগি! শেষ কয়বছরে কোন্ মিটিং-এ কী বলেছিলেন সেটাই এত বড় হয়ে গেল? সেটাই চিহ্ন হয়ে গেল গোটা জীবনটার!

তরুণ কবিরাই বা কোথায়? জড়ো হলে তাদের সংখ্যাটাও তো নেহাৎ কম নয়। শক্তি

চট্টোপাধ্যায়ের মরদেহের পাশে মন্ত্রোচ্চারণের মতো কবিতা পাঠ করছিল যারা, কোথায় তারা? সাত-এর প্রতিক্রিয়াশীলরা বাংলা কবিতার মূল ধারার রাশটা নিয়ে নেওয়ার পর থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পাঠ কি নিষিদ্ধ হয়ে গেল? এখন কি শুধুই 'চাকলা চলো' আর 'প্রেমের পদ্য' লেখো!

কিন্তু না, নিজেকে বোঝালাম—এসব হঠকারী চিন্তা, কদাচ প্রশ্রয় দেওয়া নয়। তার থেকে প্রোমোটর বন্ধুকে ফোন করা ভালো...দুপুরে পার্ক স্ট্রিটে বসা যায় কিনা।

ঠিক এই সময় গাড়ি ছাড়ল। এক জীবন্ত কবিকে [illegible]ন করা গাড়ি। সামনে ছোটো দু-তিনটে গাড়ি ভরা শবদেহ। আর কিছু না। আর কেউ না।

রবীন্দ্রনাথের পর সব থেকে বড় শোকমিছিল হতে পারত যে কবির প্রয়াণে, লক্ষ মানুষের অশ্রুতে সিক্ত পথ বেয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল যাঁকে, সংস্কারগ্রস্তের মতো যাঁর চিতাভস্ম সংরক্ষণ করার কথা ছিল আমার...ওই...ওই তিনি চলে যাচ্ছেন, শেষ যাত্রায় একটা লাল পতাকার আচ্ছাদনও যাঁর জুটল না।

রাগ নয়, হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে আমার ভয় করে উঠল। অসম্ভব ভয়!

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছোটোদের জন্য লেখা তিনটি বই

অর্জুনদেব সেনশর্মা

খুব সংগত কথায় অমিয় দেব, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহের যিনি সম্পাদক, বলেছেন বলে মনে হয়—"তাঁর গদ্যকে হয়তো কেউ-কেউ তাঁর কবিতারই সম্প্রসারণ বলবেন, যদিও তার অনেকাংশেরই এক স্বতন্ত্র পটভূমি আছে। ...যতই অজটিল হোক্ না কেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভাষা আলাদা। আর কিশোর-সাহিত্য বা তত্ত্বনিবন্ধ বা অনুবাদের হেতুই তো আলাদা—সম্প্রসারণের প্রশ্ন তাতে অবান্তর।"

সত্যিই তো, পদ্যের বিপরীতে গদ্যের একটা অসাহিত্যিক ভূমিকাও আছে। কবিতার স্বতঃস্পন্দিত বেদনের বদলে সেখানে গুরুত্ব পেতে পারে সামাজিক কার্যক্রম বা ক্রিয়া আর লেখকের চিন্তন—ব্যক্তিগত থিয়োরি। কবিতায় থিয়োরি যে থাকতে পারে না তা কখনোই নয়—কিন্তু কবিতার একটা নিজের থেকেই ভিতর থেকে হয়ে ওঠার দায় আছে। অথচ সেইসব গদ্য—যাকে 'অসাহিত্যিক' এই বর্গ নামে চিহ্নিত করেন কেউ কেউ—সেখানে লেখকের যে অতিরিক্ততর বস্তু সচেতনতার ফলে থিয়োরি এবং এ্যাকশনের সংযোগ ঘটে—কবিতার জন্ম ঠিক মনের সেই স্তর থেকে হয় না। সুভাষেরও হয়নি। এবং এই কথাও সুভাষ নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে—এমন অনেক বই-ই প্লেটোর সংলাপের মতো, পাস্কালের ধ্যানের মতো বিষয়কে—ধরে আছে—যাদের সাধারণত সাহিত্যের চালু সীমার বাহিরে রাখা হয়—কিন্তু সম্ভ্রম ও মর্যাদায়, ইন্ধনে ও উদ্দীপনে তাদের সাহিত্য পদবি দেওয়া বা না দেওয়া অবান্তর। এই বোধ লেখকের মধ্যে না জ্বলে উঠলে, প্রত্যক্ষ প্রয়োজন বা তাড়া থাকলেও যে মমতা ও নিষ্ঠা নিয়ে 'আমার বাংলা' 'অক্ষরে অক্ষরে' বা 'কথার কথা' "জানোয়ার দ্যাখো জানোয়ার" বা "এলাম আমি কোথা থেকে" বা অনুবাদ—"দেশবিদেশের রূপকথা" বা "রূপকথার ঝুড়ি" লিখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়—তা সম্ভব হত না কিছুতেই।

এইসব গদ্য সরাসরি জাগাতে চায় একটা আবেগ তার অন্বিষ্ট সামাজিক ক্রিয়ার একটা এ্যাপিল, তার জন্য সাহায্য নেয় কানের—শব্দমন্ত্রজাদু, অন্যদিকে জানিই তো আমরা বিশুদ্ধ পরিণত কবিতা ক্রমশই সরে যেতে চায় আবেগের বিপুল ভার থেকে। এমনকি কবিতায় প্রতিমা প্রয়োগের ছবি যে অনুভূতির বেদনাকে জাগাতে তৈরি হয়ে ওঠে—এই ধরনের গদ্যের মেটাফর ঠিক সেই কাজে ব্যবহৃত হয় না। বরঞ্চ শব্দমন্ত্রপ্রাণিত আবেগের পাশাপাশি যেসব ছবি সে আঁকে তার আবেদন কিন্তু সরাসরি সচেতন বুদ্ধির কাছে—যে বুদ্ধি সম্পূর্ণতা দেবে কোনো-না-কোনো ঈপ্সিতকে। তারই ফলে কখনো কখনো প্রচারধর্মী হয়ে ওঠে এইসব লেখা, ইতিহাসকে পুনর্বিন্যস্ত ছন্দে জাগ্রত করে তোলে—তার পুনর্ব্যাখ্যা করে—সেই পুনর্ব্যাখ্যার পিছনে সক্রিয় আবেগকে ধরতে গিয়ে—ইতিহাসের কোনো চূড়ান্ত বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়ায় শব্দে ও ভাষায় আবেগকে বিস্ফোরিত করে দিয়ে। লেখক এই সময় তাঁর বিষয়ের সঙ্গে ক্রমশ

আবেগ সংশ্লিষ্ট হয়ে যান—তাঁর আবেগের রুচি দিয়ে পাঠককে নিয়ন্ত্রণ করতে চান—জ্ঞাতে বা অজ্ঞায়, ফলে এক ধরনের 'স্বতঃস্ফূর্ত'তা সঞ্চারিত হয়ে যায় গদ্যস্টাইলে—নির্দিষ্ট কিছু বাচনরীতি, বিষয়বিন্যাস, ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা, ভালোমন্দের বিভাজন পুনরাবর্তিত হয়।

সুভাষের 'আমার বাংলা' তো বটেই এমনকি জীবজন্তু বা জৈববিবর্তনের উপর লেখাগুলিও এইসব লক্ষণাক্রান্ত। সুভাষের বুদ্ধি ও আবেগজাত বিবেক প্রত্যেক পঙ্‌ক্তিতেই যেন বা 'স্বতঃস্ফূর্ত' হয়ে ওঠে—বা ওই বিবেকই যেন বিষয় নির্বাচন করে দেয়, লিখিয়ে নেয়। এই ভিতরের তাগিদ বা বিবেকের সঞ্চারেই লেখাগুলি হয়ে ওঠে—তার প্রমাণ থাকে লেখকের পরিশ্রমে—এই বইগুলির কোনো কোনোটি তাই তো হয়ে ওঠে আগে ছাপা হয়ে যাওয়া লেখার কিশোরদের জন্য করা পুনর্লিখন, কোনো কোনোটি অকারণেই ন্যাশানাল লাইব্রেরির পাঠকক্ষে বসে লেখকের উপার্জনহীন পরিশ্রমের ফসল, কোনোটির পাণ্ডুলিপি তিনবার হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর আবার পরিশ্রমে তৈরি করা, কোনোটি বা বিদেশি কোনো বই পড়ে উদ্দীপ্ত হয়ে আবার পড়তে বসে তৈরি করা। আর এইসব পরিশ্রমে, জেদে, একগুঁয়েমিতে একটা মূল্যবোধকে উপস্থিত করতে চান সুভাষ মুখোপাধ্যায়—বুদ্ধির প্রমাণে আর আবেগের সাহচর্যে। বুদ্ধির বিষয়ে আর আবেগের ভাষায় তাই জন্ম নিতে থাকে সুভাষের ছোটোদের জন্য রচনা—মিশ্রিত হয়ে যায় আবেগ আর বুদ্ধির সঙ্গে বাৎসল্যের লালন, পালন। 'লালন' ও 'পালন'-এর স্নেহের সঙ্গেই অভিভাবক—লেখকের বুদ্ধিপ্রাণিত মর‍্যালকে মেশাতে গেলে অভিভাবকের লাগে ব্যক্তিগত আচরণের সততা। সেই অভিভাবকই বকুনি দিয়ে শিক্ষা দেন—যাঁর জীবনে আচরণের সেই সততা নেই। সুভাষের জীবনে সেই সততা প্রশ্নাতীত—সেই সততাতেই যত সমস্যা—আর সেই সততা দিয়ে লালন পালনের বাৎসল্য দিয়ে বুদ্ধির গোড়ায় তুলে ধরেন একটা মূল্যবোধ। সেখানে সুভাষের কোনো আড়াল নেই।

১৯৫১ সালে 'আমার বাংলা' প্রথম প্রকাশিত হয়। শিরোনামহীন প্রাক্‌কথনে লেখক জানিয়েছেন "জনযুদ্ধ" আর "স্বাধীনতা"র রিপোর্টার হিসেবে গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় এই বইয়ের অধিকাংশ লেখার মালমশলা 'যোগাড়'। জানিয়েছেন এ বইয়ে যা আছে, তার সবটাই "আমার নিজের চোখে দেখা কিম্বা নিজের কানে শোনা।"—এবং "এক বর্ণ বানানো নয়।" এই তথ্যটুকুই আপাতত আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বাকি সব তথ্যই তো সংকলন করে দেওয়া হয়েছে গদ্যসংকলনের প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে। সবই চোখে দেখা সুভাষের। চোখে তো তিনি সবই দেখেছিলেন—বাংলার সোনার ছবিও। কিন্তু চোখে যা দেখেছিলেন—তার সম্পাদনা তো সচেতন বুদ্ধি দিয়েই করেছিলেন তিনি। সেই সচেতন বুদ্ধিকে সচেতনেই জানতেন সুভাষ। তাই 'বাংলা আমার, বাংলাদেশ' এই ঢাকা-সংস্করণের প্রাক্‌কথায় লিখতে পেরেছিলেন—

> "কিন্তু মনশ্চক্ষুর ব্যাপারটা আলাদা। সেখানে চোখের পাতা মনের মধ্যে অণুক্ষণ খোলা থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এক দেশ দু'ভাগ হওয়ার নজির কম নয়। আমরা কালের হাতের পুতুল। ইতিহাসে এই ভাঙাগড়ার শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামের তে হান্-কে যখন হ্যানয়ে দেখেছিলাম, ...।

তার চোখে তখন স্মৃতি নয়। শুধু পুনরুদ্ধার নয়। ভাঙাকে জোড়া দিয়ে মরা গাঙে জীবনের জোয়ার আনার সংকল্প। স্মৃতির কাজ শুধু রোমন্থন নয়। নতুন সংকল্পগুলোকে খুঁচিয়ে গনগনে করে তোলা।"

এই 'নতুন সংকল্পগুলো'কে 'খুঁচিয়ে গনগনে করে তোলা'ই 'আমার বাংলা'র ভিতরের তাগিদ। আবেগ স্মৃতিরোমন্থন করায়—আর, বুদ্ধিজারিত আবেগ সংকল্প তৈরি করে। 'আমার বাংলা'য় লেখকের মানবিক কর্তব্যবুদ্ধির পিছনে যে আবেগ থাকে তাকে ধরে দেয়—ওই দৈনিকের গদ্য। যতই সুভাষ নিজে বলুন না কেন "সাধারণ মানুষের মুখের কথাই আমার লেখায় ব্যবহার করেছি।"—আমাদের মনে হতে থাকে যে সংগ্রামীবুদ্ধির সচেতন সম্পাদনায় 'আমার বাংলা'র টুকরো ছবিগুলো জোড়া লাগে তাকে আবেগের মেরুদণ্ড দিতে কিছুটা স্বয়ংক্রিয় হয়েই বিন্যস্ত হয় ওই মুখের কথা।

সুভাষের আবেগের মিশেলে সচেতন বুদ্ধির ওই আত্মপ্রকাশ 'আনন্দবাজার পত্রিকা' তার শ্রেণিচরিত্র নিয়ে যথার্থই ধরতে পেরেছিল। তাই ওই পত্রিকা ১৯৫১র ৮ জুলাই—লিখতে ভুল করেনি—'গল্পগুলি পড়িতে তাই মন্দ লাগে না। কিন্তু পড়িতে পড়িতে কেবলই মনে হয়, লেখকের চোখে কেবল একই ধরণের ছবি পড়িল কেন? বাংলার জীবনের রূপ কি শুধু এমনি কুশ্রীতা আর অবিচার ভরা? ইহার কি আর অন্যদিক নাই? এই অন্যদিকের কথাও না থাকাতে 'আমার বাংলা' বাঙালী ছেলেমেয়ের কাছে অসম্পূর্ণ চিত্রই উপস্থিত করিবে।'

বিপরীতে সুভাষের উদ্দেশ্য যে বিফলে যায়নি—তার প্রমাণ রয়েছে—মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিতে—"বলা বাহুল্য, আমরা যারা 'জনযুদ্ধ'-এর হদিশ রাখতুম, নিয়মিত পড়তুম যারা ওই সমস্ত রিপোর্ট, তারা অবশ্যই রীতিমতো তারিফ করতুম লেখাগুলির। আর এ তারিফ যে কতটা আন্তরিক ছিল তা বোঝা যাবে 'জনযুদ্ধ' আর 'স্বাধীনতা' দৈনিক পত্রের পরবর্তী কবি লেখক সাংবাদিকদের—ননী ভৌমিক আর গোলাম কুদ্দুস প্রমুখের লেখা রিপোর্টাজগুলি ফের একবার পড়লে, সুভাষের রিপোর্টাজ বেশ খানিক যাদের 'মডেল' হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমনকি ১৯৪৭ সালের গোড়ায় বাংলার চাষীদের তেভাগা আন্দোলনের এক-আধটুকু রিপোর্টিং-এর কাজে নেমে আমিও যথাসাধ্য অনুসরণের চেষ্টায় ছিলুম ওই মডেলের।"

যে বিবেকী প্রত্যয়বোধ সুভাষের এই জাতীয় গদ্যে প্রেমিসের মতো কাজ করে গেছে—"আমার বাংলায়" তাঁর উদাহরণ সবচেয়ে প্রবল ও স্পর্ধিত। এই স্পর্ধিত প্রেমিসকে আমরা 'আমার বাংলার' আগাগোড়া চিহ্নিত করতে পারি—

১. "আমরা এই লোকগুলোর এত কাছে থেকেও পর; শুধু জানি উত্তর দিকের আকাশটা বছরের শেষে একবার দপ্ করে জ্বলে ওঠে—দূরের আশ্চর্য মানুষগুলো তারপর কখন যে মেঘের রঙে মিলিয়ে যায় তার খবরও রাখ না।"

২. "মানুষ কতদিন এসব সহ্য করতে পারে? তাই প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। গোরাচাঁদ মাস্টার হলেন তাদের নেতা। চাক্‌লায় চাক্‌লায় বসল মিটিং, কামারশালায় তৈরি হতে লাগল

মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। শেষ পর্যন্ত জমিদারের পল্টনের হাতে প্রজাদের হার হল। কিন্তু হাতী-বেগার আর চলল না।"

৩. "অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ।"

[গারো পাহাড়ের নীচে]

৪. "বিশ্বাস করো, বানানো গল্প নয়।...

ডালুরা বলে, সেদিন আর নেই। আগে ছিল তারা অন্ধ বোকার জাত। পাহাড়ের নীচে যেদিন থেকে লাল নিশান খুঁটি গেড়েছে, সেইদিন থেকে তাদের চোখ ফুটেছে।

সে একদিন ছিল বটে। শুধু মনমোহন মহাজন আর কুটিশ্বর সাহাই নয়—ছিল জোতদার আর তালুকদারের নিরঙ্কুশ শাসন। আর সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সিংহের দাপট। সিংহ —যার ভাল নাম পশুরাজ।"

৫. "এদিকে আর একরকমের প্রথা আছে—নান্‌কার প্রথা। নান্‌কার প্রজাদের জমিতে স্বত্ব ছিল না। জমির আমকাঁঠালে তাদের অধিকার ছিল না। জমি জরিপের পর আড়াই টাকা পর্যন্ত খাজনা সাব্যস্ত হত। খাজনা দিতে না পারলে তহশীলদার প্রজাদের কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত, পিছমোড়া করে বেঁধে মারত, তারপর মালঘরে আটকে রাখত।"

"ছাতির বদলে হাতী।"

'আমার বাংলা'র প্রথম দুটি অধ্যায় থেকে ইতস্তত এই উদাহরণ তোলা গেল। এমন অজস্র কেন 'আমার বাংলা'র সারই হল সুভাষের ওই বিবেকী প্রত্যয় বুদ্ধি। ওই বুদ্ধি আর আবেগ মিশে যায় 'দীপঙ্করের দেশে'-তে মজিদের পরিণামী সংকল্পে—"মজিদকে জিজ্ঞেস করলাম, বড় হয়ে তুমি কী করবে? মজিদের চোখ হঠাৎ জ্বলে ওঠে, হাতের মুঠোটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে বলে, বড়লোকদের শেষ করব।"

এই সংকল্পের বিপরীতে যে ছবি এঁকেছেন সুভাষ তা কিন্তু খুব সচেতনেই, বেছেবুছে নেওয়া—যে ছবি থেকে ওই সংকল্প খুব সহজেই নির্গলিত হয়—"এতক্ষণ ভাল করে তাকাই নি। বসন্তে পোড়া-খাওয়া ঘা-দগদগে বীভৎস মুখ বুড়োটার। মাথার চুল সব উঠে গেছে। ফাঁকা ফাঁকা দুটো চোখ কোটরের মধ্যে ঢোকানো। ...বুড়ো আমাকে ভেবেছিল রিলিফের লোক। একটু পরে ভুল যখন তার ভেঙে গেল, তখন একটু গরম হয়েই বলল—এসেছেন কেন এই পোড়া দেশে? মানুষ মরে ফৌত হয়ে গেছে তাই দেখতে?"

["দীপঙ্করের দেশে।"]

তাই এ কথা আমরা মনে করতেই পারি ওই সংগ্রামীবুদ্ধি প্রাণিত বলেই সাংবাদিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিরপেক্ষ নন। এমনকি 'রংমশালের লেখক সুভাষও নিরপেক্ষ হতে চাননি। সংসদীয় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের রক্ষক, প্রচারক এমনকি পঞ্চমবাহিনী যে ব্রিটিশ সাংবাদিককুল নিরপেক্ষ সাংবাদিকতার পাঠ আমাদের দিয়েছিলেন সুভাষ তাঁর সচেতন বুদ্ধিতেই তাকে পরিহার করতে পেরেছিলেন। নিরপেক্ষতার ওই মুখোশ ছুঁড়ে ফেলে যে সৃষ্টি সামর্থ্য দিয়ে সম্পাদনার মুন্সিয়ানা দিয়ে নিজের বুদ্ধিতে তিনি সমসাময়িককে ঢেলে সাজালেন 'আমার বাংলা'য়—সেখানেই 'আমার বাংলা' রিপোর্টাজ হয়েও চিরকালীন

সাহিত্যেরই সামগ্রী, সাহিত্যের সৃষ্টি প্রক্রিয়াতেই সে নিষ্ণাত না হলেও। শোষিত মানুষের সপক্ষে উস্‌কে দেওয়ার বুদ্ধি দিতেই আর জ্বালিয়ে দেওয়ার উত্তেজিত প্ররোচনা দিতেই কিশোরদের জন্য তুলে আনছেন একেবারে সাময়িকতার ছবি। মুক্তিপদ রুজ, অজয় অঞ্চলের বাঁধ দেওয়া, অবাঙালি মাড়োয়ারি ঠিকেদার, ব্রজেশ্বর গড়াই, সনাতনের দাদা, কৃষ্ণদাস অগস্তি, মিলিটারির ঠিকেদার তিরিশের কংগ্রেসি বীরকন্যা, খাদমজুরদের ছবি, কাবলীওলার সুদ, সুলেমান মিঞা, ইয়াকুব, হরি চক্কোত্তি, পার্বতীয়া, রমেশ শীল, মুস্তাফা আর শেষে একেবারে অষ্টাবক্র বারো তেরো বছরের এক উলঙ্গ ছেলে—থিসিস, এ্যান্টিথিসিসের বৈপরীত্যে সজ্জিত হয়েছে 'আমার বাংলা' বইতে, যে ডায়্‌লেকটিক থেকে সুভাষ খুব সহজেই নিষ্পন্ন করেন।

"খনির মজুররা এতদিন মুখ বুঁজে সব সহ্য করে এসেছে। ওপরের দিকে অসহায়ভাবে হাত তুলে নিজেদের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়েছে। আজ আর সেদিন নেই। খনির অন্ধকারেও আলোর খবর পৌঁচচ্ছে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দল তৈরি হয়েছে খনি মজুরের। সাঁওতাল বিদ্রোহীদের রক্ত আজও শিরায় শিরায় বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে যারা, আস্তে আস্তে তারা অন্ধকারে উঠে দাঁড়াচ্ছে।"

[পাতালপুরী রাজ্যে]

এই বুদ্ধিপ্রণোদিত বিবরণের সঙ্গে যুক্ত হয় আবেগ—"বীরশা মুণ্ডার বংশধরেরা ভগীরথের মত মাটির নীচে বয়ে নিয়ে যাবে রক্ত গঙ্গাকে। পিতৃপুরুষের ক্ষুধিত আত্মাকে তৃপ্ত করবে তারা।"

[পাতালপুরীর রাজ্যে]

"যুদ্ধ আর দুর্ভিক্ষের ঘনায়মান অন্ধকারে দুটি জ্বলন্ত চোখ জেগে আসমুদ্রহিমাচল এই বাংলায় পাহারা দিচ্ছে আর মাটি থেকে দুটো হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দু-পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে সে। তোমরা হাত বাড়াও, তাকে সাহায্য করো।"

[হাত বাড়াও]

ছোটোদের জন্য, যাদের জন্যই সরাসরি এই লেখা তাদেরকে ডেকে বলছেন লেখক—"তোমরা হাত বাড়াও, তাকে সাহায্য করো।" এই ডাক যাতে উপর থেকে না হয়, অভিভাবকের উচ্চাসনের অসততা থেকে না হয়, 'এটা ভালো ওটা মন্দ' জাতীয় নিজ জীবনে অননুভূত কোনো মিথ্যা উপদেশমাত্র না হয়—তাই তো চোখে দেখা পৃথিবীর গল্প পরম মমতার সঙ্গে এক আত্মীয়তাময় লাবণ্যভরা গদ্যে তুলে আনতে থাকেন গদ্যকার। এ গদ্যে পৌরুষ তো আছেই, শক্তিও পর্যাপ্ত—কিন্তু আমাদের এও মনে হয়—ছোটোদের মনে ইন্ধন জোগাতেই যেন আবেগের গদ্যে লেখকের আপন মমতায় বোনা হয় ওই লাবণ্যের আত্মীয়তা—"প্রায় গল্প বলার ঢঙে আর আঞ্চলিক বুলির মিশেল দেওয়া একেবারে সহজ সরল ঘরোয়া মুখের ভাষায় ও ভঙ্গিতে। আর তাদের সারা অঙ্গে ছড়িয়ে ছিল খাঁটি বাংলা বাক্‌রীতির অজস্র নমুনা।"—[মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়]

'আমার বাংলা'র মধ্যে 'কলের কলকাতা' বলে একটি লেখা ছিল। কলকাতাকে খুব

ভালো করে চিনতেন বলেই কলকাতার বাহির থেকে আসা সুভাষ কলকাতার 'আজব' ছবিটা—অতটুকু একটা লেখাতেই সুন্দর পুরে দিয়েছিলেন। সেই আজব ছবিটাই বড় হয়েছে 'ইয়াসিনের কলকাতা'য়—ছোটোদের জন্য লেখা আরেকটি খুব বড় নয় এমন এক বইতে। লেখা ১৯৭৮ সালে। 'ইয়াসিনের কলকাতা'কে ছোটোদের বইয়ের বিচারে কখনো কখনো অভিনব লাগে খুব। কখনো মনে হয় তা তো নয়। ছোটোদের বইতে লেখকের মূল্যবোধ, মতামত, মেরুকরণ সক্রিয় থাকে প্রায় সব সময়েই। —এককথায় অথরিয়াল ডিস্‌কোর্স। তবে 'ইয়াসিনের কলকাতা' অসাহিত্যিক গদ্য তো নয়—কিশোর সাহিত্য। তাই যে বুদ্ধি আর আবেগ "আমার বাংলা"-কে গড়ে তোলে—সেই বুদ্ধি আর আবেগ 'ইয়াসিনের কলকাতা'য় রূপ নেয় মূল্যবোধ আর উপলবব্ধিতে—তখন তা হয়ে ওঠে ডিক্‌শান। অথরিয়াল ডিস্‌কোর্সের এই ডিক্‌শানকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে 'ইয়াসিনের কলকাতা।' উপন্যাসের পাঠক সমবয়সি সামাজিক। তার সঙ্গে তর্ক চলে, লেখকের স্বর, চরিত্রের স্বর, পাঠকের সম্ভাব্য স্বর মিশে বহুস্বরের কোলাহল তৈরি হয়, কিন্তু ছোটোদের বইতে তার সুযোগ কোথায়? লেখকের স্বরের একাধিপত্য ছোটোদের স্বর তৈরি করে দিতে চায়। এ কাজ গোপাল-রাখালের স্রষ্টা থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও করেছেন। তবে সুভাষ ছোটোদের গোপালও তৈরি করতে চাননি, রাখালও বানাতে চাননি—তার প্রেমিস আলাদা। এমনই আলাদা যে—ছোটোদের কাছে অনেক সময়েই যে নাম ব্যক্তিত্ব তৈরি করে সেই নামের অনিবার্যতাকেই তিনি ভেঙে দেন। সে ফটিকও হতে পারে, হতে পারে ঝড়ু কিংবা ইয়াসিন। ধর্মের চাদর ধরে টান দিলেন একেবারে গোড়াতেই। গ্রাম শহরের একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয় এর পরেই—তার পরেই জীবনের স্রোতকে স্বীকার করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয়—'না আর সে গ্রামে থাকার জন্য যাবে না। কেননা সত্যি বলতে কি, গ্রামের জীবনটাকে এখন তার বড্ড ভোঁদা ভোঁদা বলে মনে হয়।" ইয়াসিনের পরিণতি দেখাননি সুভাষ—কিন্তু ইয়াসিনের মধ্যে যে মেরুকরণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি তাতে বোঝা যায়—তার শ্রেণির ছেলেদের যে পরিণতি নিশ্চিতভাবে অপেক্ষমান থাকে—ইয়াসিনের ক্ষেত্রে তা হয়তো সত্য নয়। আর আমাদের বা পাঠকের এই আগাম মনে হওয়াকে নির্মাণ করে দিতেই সুভাষ শহুরে মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালি ছেলেমেয়েদের কাছে কোনোভাবেই নায়ক হওয়ার যোগ্য নয়—এমন এই চরিত্রটির মধ্যে বুনে দিতে থাকেন কিছু মূল্যবোধের বীজ—তাকে তুলে আনতে থাকেন নিশ্চিত নায়কের সামর্থ্যে—তার অভিজ্ঞতায়, তার জেদে, তার পছন্দ অপছন্দে। ক্রমশ ছোটোরা তাদের থেকে বেশ খানিকটাই আলাদা অন্য একটি ছোটো ছেলে—কিন্তু সে তো ইয়াসিন—তার হাত ধরে দেখতে থাকে কলকাতা—কলকাতার চাঁদ, চিলেকোটা, গাড়িবারান্দা, গ্যারেজ। ইয়াসিনের হাত ধরেই কলকাতার মধ্যবিত্ত শিশু পড়ুয়া জানতে পারে—সবারই বড় বাড়ি থাকে না, সবারই নানা যন্ত্র থাকে না, উপর থেকে নীচের মানুষের মাথায় পানের পিক ফেলা ভালো নয়, ইয়াসিনের মতো ছোটোলোকেদেরও ইজ্জত আছে, ইজ্জতে লাগলে খেতে না পেলে তারাও এককথায় ছেড়ে দিতে পারে কাজ, জেলের খুনির খুন করাটাই স্বভাব নাও হতে পারে কিংবা "কিসে শুধু নিজের ভালো হবে এ যারা ভাবে তাদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।"

ফুটপাথের দখল নিয়ে লড়াই, নির্দয় 'পূণ্যভিক্ষু' মানুষের দান, ছদ্ম সন্ন্যাসী, ছদ্ম গণৎকার, পুজোর ঢাকি, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, টালিগঞ্জের নায়ক, স্যুটিং ক্লাবসংস্কৃতি, ভূত ছাড়া কবর আর শ্মশান, শীতের কলকাতা, বর্ষা আর গ্রীষ্মের খুঁটিনাটি, ঠাণ্ডা রাখার কল, ফসলের বাজার, ভেজালের কারবার, চিৎপুরের যাত্রাপাড়া, কুষ্ঠরোগী কাকাবাবু, কলকাতার ফুটপথবাসী, বেদে ইরানী, সাপুড়ে, কলকাতার ভাড়াটেরা—তাদের নিয়তিময় জীবন—উন্নতি আর ধাপে ধাপে নেমে যাওয়ার সামাজিক অনিবার্যতা, কলকাতার কোণাখামচার গাছগাছালির ছবি, কাকদের ইউনিয়ন, টিয়াপাখির সঙ্গে বিড়বিড়িয়ে কথা বলা বুড়ো, মিস্ত্রি পড়ুয়া, দোকানি, ব্যাপারি, কারিগর, পুলিশের বড় সাহেবের বাঘশিকার—উনিশ আর বিশশতকের প্রথম চারটি দশক পর্যন্ত চূড়ান্ত পারিবারিক আবহাওয়ায়, মধ্যবিত্ত উচ্চমধ্যবিত্ত লেখকদের স্বপরিবেশের চার দেওয়ালে বন্দি শিশুসাহিত্যে এই অভিজ্ঞতা কোথায়? আর এই অভিজ্ঞতা তুলে আনেন সুভাষ—ছোটোদের গোটা জীবনটা দেখানোর জন্য। তাদের নিজেদের জীবন তাদের কাছে আর পুনরাবৃত্ত করেননি তিনি—তার অপ্রয়োজনেই। তাই তো ইয়াসিনের ইস্কুল আর পাগলা দাশুর ইস্কুল এক নয় মোটেই। ইয়াসিনের ইস্কুল দুষ্টুমির নয়, খেলার নয়—ইস্কুলই তো নেই কোনো—ইয়াসিনের লেখাপড়া একলব্যের জেদে।

এই কলকাতার জীবন্ত ছবিই সুভাষের কাছে মুখ্য—কলকাতার ইতিহাস একেবারে রেখাচিত্রাকারে স্থান পেয়েছে শেষে। আবার সেই ইতিহাসটুকুও জোব চার্নকের রূপকথাময় ইতিহাস নয়, সেই ইতিহাস সপ্তগ্রামের বন্দর কানা হওয়ার সঙ্গে সমাজ অর্থনীতিগত কারণে জড়িত। কলকাতার মিশ্র চরিত্র তার মানুষে, মানুষের পেশায়, রুচিতে, জীবনযাপনের 'উলিঝুলি' মলিনতায়—তা ছাপ ফেলে যায় খুব সংগতভাবেই সুভাষের লেখায়। আর এই সব কিছুর মধ্যেই আগের মতোই সুভাষ বুনে দিতে থাকেন—আরেকটা মূল্যবোধ—ঔপনিবেশিক ভিক্টোরীয় নীতিবোধ নয়—এই নীতি ও মূল্যবোধ অবশ্যই সুভাষের জীবনদর্শনের সঙ্গে সরাসরি ওতপ্রোত—

১. "ভিখিরির মত কারো কাছে হাত পাততে ইয়াসিনের ইজ্জতে লাগে। সে সময় এর ওর টুকিটাকি কাজ করে দিয়ে দু-চারটে করে পয়সা নিয়েছে। কেউ তাকে দয়া করে কিছু দিলে তার মোটেই ভালো লাগে না। হ্যাঁ তবে গতরে খেটে পয়সা নিতে তার কোনো লজ্জা নেই।"

২. "একজন বলল, "আরে ভাই, আমরা হলাম প্রদীপের পিলসুজ। আমাদের কাঁধে চড়ে ওরা পাবলিকের নজর কাড়ে আর টাকার পাহাড় বানায়। আমরা কারিগরের দল যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।"

৩. "ইয়াসিনের মনে হল সব সায়েবেরই নিশ্চয় এক রা। এরা সবাই নিশ্চয় গাড়ি চড়ে, তারপর সেই গাড়ি দুদিনের পুরনো হলেই বেচে দেয়। হোক্ না গাড়ি তাই বলে পুষতে পুষতে তার ওপর একটা মায়া পড়ে যাবে না?'

৪. "চুরির পয়সায় এরা মন্দির তোলে, পাড়ার পুজোয় মোটা টাকা চাঁদা দেয়, ইলেকশানে নিজেদের লোক দাঁড় করিয়ে টাকা দিয়ে ভোট কেনে। ইয়াসিন জানে, এরা হল শহরের পোকামাকড়।"

৫. "রাত্তিরে ফুটপাথে শুয়ে শুয়ে ইয়াসিন মাঝে মাঝে বিরাট এক মিছিলের স্বপ্ন দেখে। কলকাতার ফুটপাথ আর বস্তির-সমস্ত মানুষ চলেছে সে মিছিলে। প্রত্যেকেরই পরনে ধবধবে পোশাক। তাদের কারো মুখে কোনো আতঙ্ক নেই। প্রত্যেকের হাতে পতাকার মত উঁচু করে ধরা একটা করে অধিকারপত্র—কাজের, বাসস্থানের শিক্ষার, স্বাস্থ্যের।"

'আমার বাংলা'র সাংবাদিকের দেশকাল, "ইয়াসিনের কলকাতা"র প্রতিসরিত দেশকাল, "রূপকথার ঝুড়ি"তে (১৯৮৮) তা সম্পূর্ণই কল্পনাশ্রিত। অনেক আগে ছাপা হয়েছিল দেশবিদেশের রূপকথা। বিভিন্ন দেশের রূপকথার গল্প। সুভাষ মুখোপাধ্যায় সাধারণত সেই কাহিনিগুলিই বেছে নিতে চান—যেগুলো সাধারণে খুব বেশি পড়েননি। অনুবাদ যাতে মূলানুগ হয়—সেদিকেও তাঁর খেয়াল ছিল খুব। তবুও মূলানুগতার অভ্যাস নিয়েও তাঁর রূপকথার সংকলন তাঁর চরিত্র থেকে ভ্রষ্ট হয়নি। এক আধুনিক মানুষ, রাজনীতির মানুষ রূপকথা বলছেন—তিনি মার্কসীয় বলেই যথাসম্ভব সচেতন স্রষ্টা—তাঁর রূপকথা কিছুটা তাঁর বাণীবাহন। সেইজন্যই একেবারে 'কথা কওয়া'—এই প্রথম অধ্যায়েই বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলা দিয়ে শুরু। মোড়লের কাছে সব অপ্রাকৃত কাণ্ডকারখানাই ডাণ্ডার মার খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। —"কীসব উদ্ভুট্টে কাণ্ড।"

'কাঁকড়া দা-চাং'-এর মতো গল্পেরও ঠাঁই মেলে সেখানে—যেখানে রূপকথার মিলনান্তক পরিসমাপ্তিটাও থাকে না। 'চীনের পঞ্চপাণ্ডবে'র মতো গল্পে রূপকথার খোলসটুকু ছাড়িয়ে নিলে অপরাহত মানুষের ছবি ফুটে ওঠে। 'এক আবওয়ালা বুড়ো'র গল্পের লোভী আর নির্লোভের দ্বন্দ্ব, 'পায়ে যার জুতো নেই' গল্পে জন আর তার মালিকের তির্যকতা—তাৎপর্যপূর্ণ হয়েই ধরা দেয়। রূপকথার মধ্যে, মিথের মধ্যেও একটা নীতি ও মূল্যবোধের বীজ থাকে। কখনো কখনো সেই নীতি প্রতিক্রিয়াশীলও হয়। সুভাষ সেইসব নীতিমূলকতাকেই তুলে এনেছেন যা 'মানুষের রাজনীতি'র সঙ্গে মেলে—যেগুলি সদর্থক—যেগুলি শিশুমনে পুঁতে গেলেই মঙ্গল। সেইজন্যই মনে হয় সুভাষ এমন গল্প তুলে আনেন—"পাঁচ ভাই পাঁচ রত্ন"—যেখানে এক ভাই-ই একক্ন্যা পান না—পাঁচভাই-ই একটি করে কন্যারত্ন লাভ করেন। 'রুপোদেবতা' গল্পে তো সরাসরি শোষণের ছবি আসে, 'কুজমার কনে' গল্পে আসে শ্রেণিচরিত্রের চিহ্নিতকরণ—গল্পের একেবারে পরিণামী অংশে আর 'হোসেন চাচার নসিব' গল্পটি তো খুবই লক্ষণীয়—"এখন বুঝেছি, সংসারে আমি ছাড়াও দুঃখী লোক আছে।" এই বোধ না জন্মালে তো শ্রেণিচ্যুত সংগ্রামী সহযোদ্ধার তো জন্মই সম্ভব হত না। 'জমিদারের পেয়াদা ও যম' গল্পে দালালদের ধরিয়ে দেন সংকলক অনুবাদক কত সহজেই, আর 'এক ছারপোকা, এক মাছি', "ড্রাগনের সঙ্গে লড়াই"-এর মতো গল্পগুলিও চয়নের নির্দিষ্টতাকে অতিক্রম করে না। নির্দ্বিধায় তারা খুলে ধরে সমাজের সত্যের নানা পরত। সেইসব সত্য আর অবধারণ সুভাষের রাজনীতিকে একালের ওকালের এক কম্পিত মধ্যসেতুতে দাঁড়িয়ে অনুবাদ করে চলে।

ছোটোদের জন্য সুভাষের লেখার মধ্যে একটা স্পষ্ট মতামতগত অবধারণ আমাদের পাঠে বেরিয়ে আসছে তাহলে। শিশু সাহিত্যের বা ছোটোদের রচনার ধারায় সুভাষের অবস্থানেরও

একটা ধারাবাহিকতাগত মূল্য আছে। আমরা জানি যে অষ্টাদশ শতকের বিশের দশক থেকে ইংরেজি শিশু-সাহিত্য যখন রচিত হতে শুরু করল তখনো সেইসব বইয়ে ধর্ম ও নীতিকথার ছাপ ছিল খুবই বেশি। এমনকি ছোটোদের পত্রপত্রিকার জগতে খুবই সাড়া ফেলে ইংল্যান্ডের Religious Tract Society—যাঁরা আগে ধর্মপুস্তিকা বার করতেন। বাংলা ছোটোদের রচনা বয়সে অনেক নবীন হলেও 'স্কুল বুক সোসাইটি'র যুগে তারিণীচরণ মিত্র, রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের নীতিকথা (১৮১৮), রামকমল সেনের হিতোপদেশ (১৮২০)। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'নীতিদর্শন'-এর মতো বই দিয়েই বাংলা শিশু-সাহিত্য শুরু হয়।

তাহলে এই রকম একটা সহজ সিদ্ধান্ত এক সমাজ মনোবিজ্ঞানীর প্রশ্রয়ে আমরা করেও ফেলতে পারি—ভারতবর্ষের পুরোনো অভ্যাসে শিশুদের সঙ্গে বড়দের ব্যবহারে যে প্রশ্রয়-ঋদ্ধ ভালোবাসা ও অভিভাবকত্ব কাজ করত—যার চিরন্তর প্রতূপ্রতিমা ব্রজবালক কৃষ্ণ—তার বিপরীতে খ্রিস্টান য়ুরোপ বাঙালি ছোটোদের জন্য নিয়ে এল নীতিশিক্ষার পাঠ, কিশোর কৃষ্ণর 'গীতগোবিন্দ' ধৃত জীবনাচারের বদলে কিশোর বাঙালির জন্য এল দেশ-প্রেম, ধর্মশিক্ষা আর গোপালের "বোধোদয়", "নীতিবোধ"। ভারতীয় মূল্যবোধ ও সাবালকত্বের বিরুদ্ধে এই অন্যধরনের একটা মানদণ্ড খুব স্পষ্টভাবেই যে নির্মিত, হয়ে উঠছিল—তার প্রমাণ 'ক্যালকাটা ট্রাস্ট সোসাইটি'র 'জ্যোতিরিঙ্গণ' পত্রিকা (১৮৬৯-৭৩) এবং ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের 'বালকবন্ধু' পত্রিকা (১৮৭৮)র লেখাগুলো। এমনকি ১৮৮৩র 'সখা' পত্রিকাও যে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ থেকে রিক্ত ছিল না—তা স্পষ্টতই প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে বলা হয়—"...সখা পিতামাতার উপদেশ এবং শিক্ষকের শিক্ষা দুই-ই প্রদান করিবে।" একই রকম ভাবে 'মুকুল' পত্রিকা (১৮৯৫) প্রকাশিত হয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের নীতিবিদ্যালয়ের উদ্যোগে। আর 'মুকুলে'রই লেখক ব্রাহ্ম উপেন্দ্রকিশোর ১৯১৩-এ বার করেন সন্দেশ। —তারও উদ্দেশ্য "সকলের ভালো লাগে আর কিছু উপকার হয়।" ওই সন্দেশেরই নবপর্যায় ১৯৬১তে—সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় তার যুগ্ম সম্পাদক। 'সন্দেশে' লিখেছেন গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়—'পিকলুর সেই ছোটকা'—তাঁর এক উজ্জ্বল সন্দেশী রচনা। কবিতা ও প্রবন্ধও লিখেছিলেন সুভাষ 'সন্দেশে'। 'সন্দেশে' যখন যুক্ত হয়েছিলেন তিনি তখন বাংলা ছোটোদের সাহিত্যের উত্তরাধিকারসূত্রে চলে আসা যে সাদা-কালোর বিভাজন ও সেই বিভাজনকে চারিয়ে দেওয়ার অভ্যাস সন্দেশের মধ্যেও বর্তমান ছিল—তা সুভাষকে খুব বিরক্ত করেছিল বলে মনে হয় না। তবে এইটা মনে রাখা ভালো—স্পষ্টতই জেনে রাখা ভালো যে—শিশুদের, কিশোরদের কাছে—যে মূল্যবোধ তিনি পৌঁছে দিতে চেয়েছিলেন—তা 'গোপালে'র গতানুগতিক খাঁচায় নীরক্ত হয়ে ওঠেনি তা সংগ্রামী মানুষের বিপ্লবী প্রত্যয়ে দীপ্তপ্রাণ। উপরন্তু যা আমরা আগেই বলেছি মর‍্যালকে তিনি ছাড়তে পারেন নি ঠিকই—কিন্তু সেই মর‍্যালের বুকে প্রাণ দিয়েছে—সুভাষের জীবনেরও সততা—তাঁর ছোটোদের লেখায় সেই সততাই আমাদের ছুঁয়ে যায়। অভিভাবকের সঙ্গে মিশে ছিলেন এক সখাও।

[স্বীকৃতি : বইপত্র সবই জুগিয়েছেন প্রণব বিশ্বাস, অনুপরঞ্জন চক্রবর্তী ও সুজিৎ ঘোষ।]

‘কে শাঁখে ফুঁ দেয়—পদাতিক?’

অরুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

‘চিনে নেবে যৌবন-আত্মা—’
‘তুমি আশা, তুমিই আমার জীবন—’
তখন এইসব লাইনগুলো মনে হত যেন কোন্ গ্রহ থেকে
আসছে ভেসে, কখন সে চোখ হাত পা ছুঁয়ে যায়!

সরল সুখের আশায় মনটা টানটান থাকত
কেন জানতুম না—
এই বোঝার কোনও অঙ্কও বোধহয় হয় না—
তাই ক্যালকুলাসে স্ট্রাকচারাল জিওমেট্রিতে
এসে চেয়ে থাকত, ‘হে বিষাদ!’
ও ভালবাসা—

কলকাতা থেকে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে
কত দূরে তখন। ভাগ্যিস মনটা ছিল কাছের
টানে পড়ে। ওদিকে তো সময় বয়ে গেছে কতটাই!
পঁচাত্তর থেকে পঁচাশি, সাগরের কাছাকাছি—
খোলা হাওয়া কোথাও কোথাও বাধা পড়ে তখন—
ইস্পাতে মোড়া বহুতলে, লোহার ফ্রেমে—

বেশ কতককাল ইয়োরোপ ফেরত জাপানে সেদিন।
ব্যস্ত, স্পেস ফ্রেম স্ট্রাকচার ডিজাইন-কাজে।
রাত-দিন-কে খুঁড়তে শিখেছি; বুঝতে হচ্ছে হাড়ে পাঁজরে
ডিজাইন প্রতিযোগিতার নুনজলে খাঁড়া ঝোলা কাকে বলে!

টোকিও শহরের সুরঙ্গের হাঁ মুখ, পুরোনো সঙ্গীদের
নাম না পড়া ঘেরাটোপে; মনে কি পড়ত পোস্টকার্ডের

তলায় পুনশ্চের ডাক, কিংবা 'মনে-রেখো' পাড়েব
শাড়িতে ছড়ানো ঘরে, মা কি এখন শাঁখে ফুঁ দিয়েছে?
ঘরের প্রাঙ্গণে আবার যেন শাঁখ বেজে উঠল?—
কোথায় পড়েছি যেন? শেষ সপ্তকে? বাসায় শ্যামলীতে?
কিছু তো মনে পড়ে না! শুধু বুদবুদের মতন জ্বলতে
থাকত কিছু প্রদীপের মালা, এ-দশা না কাটলে যে
উন্নতি নেই—ইস্পাত ইঞ্জিনিয়ারিং-এ এমন
হুঁসিয়ারি যখন তখন আবেভাবে ভরপুর—
দোটানার জীবন যাঁরা দিয়েছেন, হঠাৎ ডেকে
বলতে ইচ্ছে হত কি দরকারটাই বা ছিল, কবেকার
কথা কবেই বা বলতে?
'পথের ওপর দাঁড় করাতে ঐ কথাগুলোকেই—'

ভালোছিলাম যখন ভুলেই ছিলাম, কার যে কি কবিতার স্তবক?
কবিতার শব্দের মধ্যে অতই বা প্রাণ ঝলকানো কেন?

উত্তর আধুনিক আর্কিটেকচারের রেশারেশির কোনও এক
চলতি মাসে চলতে গিয়ে ওঠার পালা যেত সাঙ্গ হয়ে

সবটাই কেমন যেন গোল বাঁধাত—জাপান, ওদিকে আমেরিকা—
টোকিও সেন্ট্রাল থেকে গুডইয়ারের পথ ডিঙিয়ে
অফিস ফেরত এগুতে এগুতে সেই কবে একুশ শতকের
বিজ্ঞাপন—দেখে হতবাক সেদিন; তখনও তো
কত বাকি, তাহলে এত তাড়া কিসের—
লেক মার্কেটের গলিতে, পিছনের অলি-গলিতে
বাঁদিকে বাঁকের দিকেই কি হাঁটছি তখন তাহলে?
আধো জেগে? অন্তঃরণের আল বেয়ে—
'...শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—
একটু পা চালিয়ে, ভাই, একটু পা চালিয়ে—'

হ্যাঁ, পা চালিয়েই হন্তদন্ত নিপন স্টিলের জেনারেল ম্যানেজার
পাঁচতলার কাজের বোর্ডের ওপর প্রায় হুমড়ি খেয়ে
আমার কাছে। তাহলে কি এবারই ভালোয় ভালোয়
ছাড়ুন শহর, দিনের আলোয়—?
না, রাতের কথা বলতে এসেছেন, কি যেন এক তাচ্ছিল্যের
কবিতার কথায় দমকা হাওয়ায় রেগে মেগে—
সত্যিই বলছি জীবনে প্রথম জাপানি প্রযুক্তি বিশারদদের
অবস্থা দেখে, মনে পড়ল 'আদার গন্ধে জল
আনে জিভে, চা-পানি—'
আমেরিকার সঙ্গে ডিজাইন পাল্লা দিতে প্রায় সবটাই করে
ফেলেছেন; কেবল বাধ সেধেছে কবিতার কটি লাইন!
হারা জেতার মাঝে কতক শব্দের পর
শব্দের কম্পাস—নাকি জোনাকি?

ব্যাপারটা কি? এতই কথা আলোচনা—
যেখানে জাপানি অফিসের সহায় সম্বল সবই তো নীরবতা

বড়ো জোর কখনও কখনও ফিসফাস্!
সমস্যা গুরুতর। গরম মেশিন-চায়ের ধোঁয়া ফুরুতে না
ফুরোতে—অভিযোগের পর অভিযোগ—
দু'টি মেগা সংস্থা, সব থেকে উঁচু থাকে, আমেরিকায়
খুব বড়ো প্লাজা ডিজাইন করছে—
আলো জ্বালা প্রকাণ্ড এক শহরে—॥
একেবারে শেষ সময়ে ক্লায়েন্ট ব্রিফিং এসেছে—
স্পেশ ফ্রেমের লোহা-কাচ বিশাল চাঁদোয়া

গোলাকৃতি আর্কিটেকচারাল হেমিস্ফিয়ারই হতে হবে---
তবে, চিনা কবির কবিতার ভাব অনুসারে—
কাশীতে দিদিমা বলত বিপদ কোনও লেপতোষক মানে না
খোকন; গুটিয়ে শোবে, দুহাত আঁকড়ে
কিন্তু আমার হাত প্রায় বুকে তখন—
এখানে এ সময়ে হাইটেক ভূতের মুখে, কবিতা?
এক নিঃশ্বাসে, না, বোধহয়, দু'নিঃশ্বাসে দু' দু'জন
বলতে লাগল দুর ছো! সঙ্গে কবিতার ফাক্স—
নাম না জানা চিনদেশের কোনো কবি, বৈরাগির লোক কবিতা—

কি কুক্ষণে কোনও একদিন টোকিও প্লাজায়, কফির টানে—
আমার সহকর্মী-স্থপতিকে কবিতার কতকটা শুনিয়েছিলাম—

সে নদীর দু দিকে দুটো মুখ...
একমুখে সে আমাকে আসছি বলে
দাঁড় করিয়ে রেখে
অন্য মুখে
ছুটতে ছুটতে বলে গেল,—কাঁধের ওপর হাত রেখে
সান্ জানতে চেয়েছিল 'আমি থেকেও নেই
না থেকেও আছি'—সত্যিই!

বিদেশের জন্য কলকাতা ছাড়ার আগে বড়মার দেওয়া
বাতাসা, আর মহাপ্রভু ওকে রক্ষা কর—
ছলাৎ করে সব যেন গেল টলে—
আমার ওপরেই দায়িত্ব সেই পড়ল

ঐ চৈনিক কবিতার ডানায় ভর দিয়ে
মেলে ধরতে হবে, হোক সে জটিলতম প্লাজা
ডিজাইন স্ট্রাকচার!
তবে কবিতাটি ছিল আনন্দেরই বড়ো,
বিমূর্ততায় মাখানো আভাসরেখায় ভরপুর—
কোনও এক লোককবির রচনা কি?
গত রাতে চাঁদের সঙ্গে
সহবাস করেছি,
মরণ আমার নেই
অন্ধকারও তাই আলো—
গ্রামের এক দুঃখী, মনভার নিয়ে শুয়েছিল
প্রায় নিশুতি রাতে, একাকীর জীবনে।
বাইরে তখন মাঠে, ক্ষেতে, চাঁদের আলো ভেসে বেড়াচ্ছে—
অভাবের জীবনে, খাটে শোয়া চাষি ভাবছিল চাঁদের কথা

অন্ধকারের ঘরে, হঠাৎ টালির চালা বেয়ে
পূর্ণিমার আলো ঠিকরে এসেছিল তার অন্দরে
বিছানায়

আসার কথা ছিল না, কিন্তু এসে পড়েছিল—
এল মাথার আকাশ ফাটা টালির ফাঁক ধরে
সহবাসের আবেশে।
এমন জীবন সে তো আশা করেনি।
দুঃখ গেল ভুলে। মরণ আর চাইবে না সে।
সব অন্ধকারই যেন এখন আলো

প্রয়োগ সফল কাজের পরে, এ-হাতে ও-হাতে ঝাঁকুনি
দিতে হাতে হাত খুব মিলেছিল।

অনেক বছর বাদে ওদেশে ঐ বড়ো কর্তাকে
জিজ্ঞেস করেছিলুম—
দায়িত্বটা চাপিয়ে ছিলেন বড়ো!
উত্তর ছিল ভারত থেকে এসেছে বাঙালি স্থপতি
বিপদে মোড়া তখন বিকেলে কাঁধ ছিল তো অফিসেই—
সব বাঙালিই নাকি কবিতা লেখে, পড়ে
বিভোর হয়ে নদীর কথাই বলে

তাও কিনা স্মৃতি থেকে
চারপাশ সমুদ্র মহাসমুদ্রে ঢাকা হলেও!—

এইট বি. বাস স্ট্যান্ডে রুটি ঘুঘনির সস্তার
ক্যান্টিনে আমরা কলেজের সাতজন—
সে এক ভীষণ সময় কলকাতার বুকে
বুলেট বারুদের দাপাদাপি দেয়ালে দেয়ালে
লেখালেখি—। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশের পর নাকি একটাই
মোক্ষম সুযোগ, বেকার বনে যাওয়া
সময়, না সময়ের ওঠা নামায় –

তর্ক উঠেছিল জেঁকে, বাস স্ট্যান্ডের লোহার রেলিঙে
ডবল হাফ চা আর ভাগাভাগি চারমিনারে—
সত্তর দশকের ছাত্র—
তুমুল তর্ক, আরও তর্ক—চায়ের দাম
নেই, এবার চাও নেই—
বিষয়
ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত—?
গায়ে হলুদ দেওয়া বিকেলে

একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা

কোকিল ডাকতে যেত
—তাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো—
তর্ক তর্কে আরও তুফানে
পক্ষে বিপক্ষের যত মাথা ছিল
হাত পায়ে তখন তড়াক লাফে বাসের দো'তলায়
রফা হল, সাতজন বটে, টিকিট কাটব দু'জনের—
চেনা সদয় কন্ডাকটারদা বলেন কিন্তু ঐ দু জনই বসতে
পারবে, আর সব দাঁড়িয়ে—
বসা পালা করে। কোথায় যে গেল সেই দাদারা—!
'যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে, যেন না ফেরে?'
শব্দে শব্দে চিৎকারে কানে ভোঁ লাগা
বাসযাত্রীদের আঃ! ধুর! পাগল নাকি?
শুনতে শুনতে
লাফিয়ে চলতে নামা গড়িয়াহাটের মোড়ে—
তারপর সোজা হাঁটা—
রাধুবাবুর চায়ের দোকান এক ঝলক দেখে
বাঁদিকে ঘুরে আবার বাঁয়ে ডানে—
তাঁর বাড়ির দরজায় গিয়ে, শব্দ
কড়ানাড়ার শব্দ—
ভেতর থেকে কবিরই কণ্ঠ—
—কে?
—আমরা
—সবাইতো আমরা ভাই,
ঝাঁকড়া চুল, কিছু লিখছিলেন—
আশ্চর্য দৃষ্টিতে, কত যে স্নেহমাখা ছিল

—কি হল?
অচেনা অজানা মুখগুলো, যেন তাঁর কত দিনের চেনা—
—ভেতরে এস
তুমুল আলোচনার দরজা দড়াম শব্দে বন্ধ হয়নি—

সে দরজা হাসতে হাসতে অনেক দিনই ডেকে নিয়ে গেছে—
সেবছরেই কি শারদ 'দেশ'-এ লিখবেন—
রাত্রে রেডিওতে যখন খবর বলে,
কানে, আঙুল দিয়ে থাকি
সকালে কাগজ এলে, ছুঁতেও ভয় করে।

লাইনবন্দী চেনা মুখগুলো একের পর এক
একের পর এক ভেসে ওঠে,
আমার পুরনো সব বন্ধুর ছেলেরা
ছিল আমার নতুন বন্ধু
সিগারেট আমিই এগিয়ে দিতাম
যাতে তারা ছলছুতোয়
আমাকে একা ফেলে
উঠে যেতে না পারে।

প্রবাসে বিদেশে স্থাপত্য-ইঞ্জিনিয়ারিং করে বহুকাল পরে ফিরে—
কলকাতার একাডেমি, নিউসাউথ গ্যালারীতে আমার

আঁকা ছবির প্রদর্শনী করছে এক সংস্থা
খুব ইচ্ছে হয়েছিল, পদাতিক যদি আসেন আলো দিতে—
চলতে চলতে এক ছবির কাছে দাঁড়িয়ে আনমনা হয়েছিলেন
ছবিটা ছিল কাশীর গঙ্গা বেয়ে এক আশ্চর্য নারী—

নদীর সখী সে, বজরায়। বেয়ে নিয়ে যায় সনাতন মাছ,
নদী টানে, সখীর প্রাণে—
আমার প্রেয়সীর হাতে ধরা ছিল দশমীর চাঁদ—
কাগজের বোর্ডে জাপানি কালিতে, জাপানে
নদীর টানে, মনকেমনের ভার নিয়ে আঁকা
সিপিয়ায় ছবি—
ছবির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এ বড়োই
প্রিয় আমার, হ্যাঁ এইখানে ফোটো তুলতে পার—
পরে দেখা হলে, বলেছেন, সেইই ছবিটা তুমিই
করেছিলে না? 'পরনে ছিল না চেলি,
গলায় দোলে নি হার!'

সেই বছরেই বোধ হয় লিখেছিলেন 'ঢোল গোবিন্দের
মনে ছিল এই'—
আর 'দেশ'-এই শারদ কবিতা!

* * * *

বিনা শাঁখে সন্ধ্যে কি হয়, পদাতিক?

নতজানু আমরা, কৃতজ্ঞতায় ছড়ানো—
বিকেলে দরজায় কড়ানাড়ার দল—
বসন্ত, ভোরের বসন্ত আজও, বন্ধু?
হাঁটুমুড়ে চেয়ে থাকি
মেঘের ফাঁকে ফাঁকে ভোরের আলোয়।
কে শাঁখে ফুঁ দেয়—পদাতিক?
পিছু ডাকে কাঁচাপাকা ফসল? তখনও এখানে!

গভীর সুরে ঢেলে সাজা
পৃথিবীর বুকের কথা কিনা
মেঘভাঙা রামধনুর রঙে রাঙা
তাইই আজও, বড়ো অমোঘ সত্য!

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ পরিচয়

‘পরিচয়’ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত : সুভাষের সম্পাদনা

শ্রীলা বসু

‘পরিচয়’ পত্রিকা প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বারো বছর পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। এই বারো বছরের শেষ তিন বছর দশম-দ্বাদশ বর্ষ, যুগ্মসম্পাদক হিসেবে হিরণকুমার সান্যালের নাম মুদ্রিত হত। এই সময়ে সুধীন্দ্রনাথ যে পত্রিকার কাজ প্রায় পুরোটাই হিরণকুমারের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন, তার নানারকম সাক্ষ্য মেলে। কিছুটা প্রাথমিক উৎসাহ হারিয়ে ফেলা, কিছুটা ব্যক্তিজীবনের সংকট—সুধীন্দ্রনাথের স্বেচ্ছাবসরের মূল কারণ। কিন্তু তবু পত্রিকার চরিত্র খুব বদলায়নি হিরণকুমারের তত্ত্বাবধানে।

পত্রিকার চরিত্রে বদল প্রাথমিকভাবে চোখে পড়ে না যখন ত্রয়োদশ বর্ষ (শ্রাবণ ১৩৫০) থেকে পত্রিকাটি হস্তান্তরিত হল তখনও। সুশোভন সরকারের মধ্যস্থতায় বামপন্থায় অনুরাগীদের প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল প্রকাশনার কাছে পত্রিকার স্বত্ব বিক্রয় করলেন সুধীন্দ্রনাথ। প্রথমে হিরণকুমার এবং তারপর হিরণকুমার-গোপাল হালদারের যুগ্ম সম্পাদনায় কিছুদিন চলে হস্তান্তরিত ‘পরিচয়’। মোটামুটিভাবে এই দুই সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথের ‘পরিচয়’-এর মননির্ভর এবং মুক্তমনস্ক ঐতিহ্য বজায় রেখেই চলছিলেন।

কিন্তু এই পরিস্থিতি বদলে গেল। ‘পরিচয়’ প্রতিষ্ঠার সময় থেকে কোনোদিনই বিশুদ্ধ সাহিত্যপত্রিকা ছিল না। তবু শিল্পসাহিত্য-সমালোচনা ‘পরিচয়’ এর অধিকারের মুখ্য অংশ জুড়ে ছিল। সুধীন্দ্রনাথ সম্পাদিত পর্বে সাহিত্যনীতি সমাজতত্ত্ব নিরপেক্ষ বিষয় ছিল। এই মাত্রায় পরিবর্তন ঘটল। শিল্প এবং রাজনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাম্যবাদী মহলের দ্বিধা, প্রশ্ন এবং পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ‘পরিচয়’-এর মনোযোগের মুখ্য কেন্দ্র হয়ে উঠল চল্লিশের দশকের মধ্যভাগে। ‘পরিচয়’-এর ফাইল কালানুক্রমিকভাবে লক্ষ করলে দেখব হিরণকুমার চলে যাওয়া এবং নীরেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পাদক হিসেবে আগমনের পর সাহিত্য সমালোচনার পন্থা দ্রুত বদলাচ্ছে ‘পরিচয়’।

আসলে ‘পরিচয়’-এর এই দিশা পরিবর্তনের বিষয়ে নীরেন্দ্রনাথ সম্পাদনা পর্ব এক বৃহত্তর জটিল ঘূর্ণাবর্তের সূচক মাত্র। ১৯৪৮-এর ২৬ মার্চ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হওয়ার পর, রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে ‘পরিচয়’ নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছে। একদিকে পরিস্থিতির বহিরঙ্গ চাপ, অন্যদিকে সাহিত্যনৈতিক প্রশ্নের নবনির্মাণ-প্রয়াসের অন্তরঙ্গ তাগিদ, দুইয়ে মিলে ’৪৮-’৫০ কালপর্বে ‘পরিচয়’-এর অস্থিরতার কাল। ওই সময়ে ঘন-ঘন সম্পাদক বদল তারই বহিঃপ্রকাশ। ’৪৮ সালে গোপাল হালদারের অপসারণ এবং ’৫২ সালে তাঁর পুনর্নিয়োগ—মাঝের চার বছরে নানা সম্পাদকদের মেলায় ‘পরিচয়’ বারে বারেই তার চরিত্র বদলেছে অতিবামপন্থী এবং মডারেটপন্থীদের মাঝে দোলাচলতায়। সুধীন্দ্রনাথ পর্বের পর ‘পরিচয়’-এর সম্পাদকীয় ইতিহাসের রূপরেখা এইরকম :

শ্রাবণ ১৩৫০—আষাঢ় ১৩৫২—হিরণকুমার সান্যাল
শ্রাবণ ১৩৫২—আষাঢ় ১৩৫৫—হিরণকুমার সান্যাল ও গোপাল হালদার
কার্তিক ১৩৫৫—আষাঢ় ১৩৫৬—গোপাল হালদার ও নীরেন্দ্রনাথ রায়
(আষাঢ় ১৩৫৬র পর কয়েকটি সংখ্যা পরিচয় বন্ধ থাকছে)
পৌষ ১৩৫৬—জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭—সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুস
(জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭র একটি সংখ্যা পরিচয় প্রকাশ হচ্ছে না)
শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫৭—ফাল্গুন ১৩৫৭—সুশীল জানা ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়
চৈত্র ১৩৫৭—অগ্রহায়ণ ১৩৫৯—সুভাষ মুখোপাধ্যায়
পৌষ ১৩৫৯—পৌষ ১৩৬৩—গোপাল হালদার ও ননী ভৌমিক
মাঘ ১৩৬৩—গোপাল হালদার ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

সুধীন্দ্রনাথের পর, হস্তান্তরিত 'পরিচয়'-এর প্রথমদিকে মতবাদের কড়াকড়ি বিশেষ ছিল না। যে অবস্থা সম্পর্কে গোপাল হালদার লিখেছিলেন 'পরিচয়-এর মত আছে কিন্তু মতবাদ নেই'।[১] 'পরিচয়'-এর ফাইলও সাক্ষ্য দেয় পত্রিকার অষ্টাদশ বর্ষের মধ্যভাগে গোপাল হালদার নীরেন্দ্রনাথের যুগ্ম সম্পাদিত পরিচয়-এ মতাদর্শের স্পষ্টতা থাকলেও, মতবাদের আগ্রাসী শাসনতর্জনী ছিল না।

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ায় সরকারের পথ থেকে যে সাহিত্যনৈতিক তর্জনী কিছুটা শিথিল হয়েছিল, মহাযুদ্ধের পর তার জের উঠল প্রবলতর হয়ে। ১৯৪৬-এর ১৪ আগস্ট সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে স্তালিনের সাহিত্যনীতি বিধৃত হল। লেনিনের আমলে ১৯২৫-এর কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবে শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে গৃহীত মুক্তমনস্ক নীতি অস্বীকার করে নির্দেশিত হল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আরোপিত ব্যাখ্যা। সোভিয়েত জনজীবনকে, যথাযোগ্য মর্যাদায় উপস্থাপিত না করবার অপরাধে পার্টির লেখকসমিতি থেকে বহিষ্কৃত হলেন আনা আখমাতোভা এবং জোশচেঙ্কা। এঁদের লেখা প্রকাশ করবার জন্য Zvezda এবং Leningrad পত্রিকাদুটির উপর নেমে এল নিষেধাজ্ঞা। কেন্দ্রীয় কমিটির এই ধরনের কিছু নিষেধাজ্ঞা শিরোধার্য করে ১৯৪৭-এ স্টালিনের শিল্পসাহিত্যনীতির মুখপাত্র লেনিনগ্রাদ কমিটির মুখ্য নেতা এ. জ্দানভ পূর্বোল্লিখিত পত্রিকাদুটির বিরুদ্ধে বিশদ প্রতিবেদন প্রকাশ করলেন। লেনিনের দৃষ্টিতে যা বিশেষ ভাবে পার্টি সাহিত্য বলে চিহ্নিত হয়েছিল তাকেই সামগ্রিকভাবে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রামাণ্য করে যান্ত্রিকভাবে শিল্পসাহিত্যের কাঙ্ক্ষিত স্বরূপ নির্ণয় করা হল। এই আরোপণে আপত্তি ছিল স্বদেশে এবং বিদেশে। বিশেষত ফ্রান্সের কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য লুই আরাগঁ এবং রজার গারোদির বিতর্কটি তো বিখ্যাত। এ সব প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে বাংলা দেশের সাম্যবাদী মহলে তথা 'পরিচয়'-এ এর প্রভাব পড়ল প্রত্যক্ষভাবে।

বাংলাদেশে জ্দানভ সাহিত্যনীতির প্রচারক রণদিভেপন্থী ভবানী সেন যখন পার্টি সদস্যদের কাছে তাঁর থিসিস শোনান, তখন সেই বৈঠকেই সমর্থন এবং অসমর্থনের দুটি শিবির বিভাজন হয়ে গেল।[২] পূর্বতন পার্টি সম্পাদক পি. সি. যোশীর আমলের খোলামেলা

পরিবেশে অভ্যস্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে রণদিভে আমলে যাঁরা যোশীআইট বলে উপেক্ষিত হলেন তাঁদের মধ্যে গোপাল হালদার একজন। গোপাল হালদার নীরেন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'পরিচয়' আষাঢ় ১৩৫৬-র পর বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে বিনা বিচারে আটক রয়েছেন গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথও স্থানান্তরে। 'পরিচয়'-এর মুদ্রক গণশক্তি প্রেস পুলিশ আটক করায় পত্রিকা প্রকাশও হয়েছে অনিয়মিত। শুধু এসব বাইরের বাধাবিঘ্ন নয়। মঙ্গলাচরণ জানাচ্ছেন—'১৯৪৮ সালে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির তৃতীয় কংগ্রেসে উগ্র বামপন্থী ও সংকীর্ণতাবাদী পার্টি নীতি গৃহীত হবার পর 'পরিচয়' পরিচালনার ক্ষেত্রে তার ধাক্কা পুরোপুরি এসে পৌঁছয় ১৯৪৯ সালের মাঝামাঝি নাগাদ। ফলে পত্রিকা পরিচালন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় ও পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ থাকে মাস ছয়েক'।[৩] পূর্ব সম্পাদকদের পরিবর্তে সরোজ দত্ত ও গোলাম কুদ্দুসকে সম্পাদক করে 'পরিচয়' আবারও প্রকাশিত হল তারপর। রণদিভে লাইনের উগ্র এই দুই সমর্থকের আমল 'পরিচয়' ইতিহাসের অতিবামপন্থী কাল হিসেবে পরিচিত। মাঘ ১৩৫৬-এ প্রকাশিত গোলাম কুদ্দুসের 'সাহিত্যে তথাকথিত তৃতীয় শিবির'-এর মতো প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধটি দেখলে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় তখনকার আক্রমণাত্মক মনোভঙ্গির। 'বুর্জোয়া শ্রেণী এবং তাদের দালালেরা' কীভাবে 'ভোল বদলে বামপন্থী পোষাক' পরে 'বুর্জোয়া বিরোধী ভূমিকার ভাণ করে' মার্কসবাদীদের প্রতি বিষোদ্গারে সংগঠিত হয়েছেন তাই কুদ্দুসের মূল আলোচ্য।

কিন্তু এই কট্টোরপন্থার বদল হল পার্টিতে। মঙ্গলাচরণের জবানিতে : অতঃপর ফের পার্টির নীতির পরিবর্তন ঘটে ও 'পরিচয়'-এর প্রকাশ বন্ধ থাকে ফের কয়েক মাস। ১৯৫০ সালের শেষার্ধে যখন নতুন করে আবার 'পরিচয়' প্রকাশিত হল তখন পত্রিকার সম্পাদনার ভার ন্যস্ত হল কথাসাহিত্যিক সুশীল জানা ও আমার উপর।'[৪] এই সম্পাদকদ্বয়ের পরিচালনায় সংকীর্ণতা অতিক্রমী মুক্তচিন্তার বাহক হিসেবে 'পরিচয়'কে গড়ে তোলবার প্রয়াসের কথা পত্রিকায় জানানো হয়। শ্রাবণ ১৩৫৭তে আলোচনা বিভাগে সম্পাদকমণ্ডলীর নির্দেশে নরহরি কবিরাজের 'পরিচয়ের পথ' নামের স্বাক্ষরবিহীন রচনায় জানানো হয় 'পরিচয়'-এর অভিপ্রেত রূপ : 'সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মুখপত্র'। মার্কসবাদকে প্রাধান্য দিলেও দৃষ্টিভঙ্গিগত ভিন্নতার ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার অঙ্গীকারও করা হয় ওই রচনায়। সুশীল জানা ও মঙ্গলাচরণ সম্পাদিত 'পরিচয়' মুক্তমনস্কতার প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন করতে পারছে না, কোনো পাঠক এমন অভিযোগ[৫] করলেও এই দুই সম্পাদক অন্তত অতিবামপন্থার কলঙ্ক মোচন করতে পেরেছিলেন।

এই সম্পাদকদের হাতে যে উদার পরিবেশ নির্মাণের সূত্রপাত তারই দায়ভার বহন করে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় চৈত্র ১৩৫৭-বৈশাখ ১৩৫৮ যুগ্ম সংখ্যা থেকে। অগ্রহায়ণ ১৩৫৯ অবধি তিনিই ছিলেন 'পরিচয়' সম্পাদক।

।। ২ ।।

ভাদ্র ১৩৫৭-র 'পরিচয়'-এ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কারারুদ্ধ হওয়া এবং তারপর পৌষ ১৩৫৭-তে তাঁর মুক্তির খবর আছে। জেল থেকে বেরিয়েই সম্পাদক করা হল তাঁকে। চৈত্র-

বৈশাখ ১৩৫৭-৫৮ যুগ্ম সংখ্যায় 'পাঠকদের প্রতি' শিরোনামে পরিচালকমণ্ডলীর তরফ থেকে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হল সম্পাদক বদলের খবর এবং আগের সম্পাদকদের সীমাবদ্ধ কিন্তু আন্তরিক প্রয়াসের কথা—'প্রায় এক বছর আগে দারুণ দুর্যোগ ও কঠিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে শ্রীযুক্ত সুশীল জানা ও শ্রীযুক্ত মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়কে 'পরিচয়' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে যোগ্যতার সঙ্গেই তাঁরা তাঁদের সে দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু বেশ কিছুদিন থেকে নানা কাজের চাপে শ্রীযুক্ত সুশীল জানার পক্ষে পরিচয় সম্পাদনায় যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। তার উপর শ্রীযুক্ত মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়ও সম্প্রতি গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ায় এখনকার মত সম্পাদক বদল করা ছাড়া আমাদের উপায় থাকল না।'

'পরিচয়'-এর সুধীন্দ্রনাথ পর্ব এবং হস্তান্তরিত পর্বের মধ্যে ভিন্নতা নির্দেশ করতে গিয়ে সুভাষ জানিয়েছিলেন 'প্রথম পর্বে 'পরিচয়' ছিল কাগজের আন্দোলন, দ্বিতীয় পর্বে 'পরিচয়' হল আন্দোলনের কাগজ।'[৬] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সুধীন্দ্রনাথ আমলের প্রথম পাঁচ বছর ত্রৈমাসিক 'পরিচয়'-এর যুগ থেকেই লেখক হিসেবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সুভাষ। তিনি নিজেই জানিয়েছেন 'এখানে' কবিতাটির প্রকাশসূত্রে 'পরিচয়' গোষ্ঠীতে তাঁর প্রবেশের কথা।[৭] তারপর সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখদের সঙ্গে 'পরিচয়'-এর আড্ডায় তাঁর পদার্পণ। যা হোক্, চল্লিশের দশকে সাম্যবাদী চেতনার জোয়ারে আন্দোলিত বাংলা দেশের পটভূমিতে 'পরিচয়' পরিচালকদের তরফ থেকে পত্রিকাটিকে আন্দোলনের কাগজ হিসেবে গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা অনিবার্য হলেও, কাজটি সহজ ছিল না। বিশেষত ওই দশকের শেষদিকে মার্কসিস্টদের সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক তছনছ হয়েছে দাঙ্গায়, দেশভাগে এবং সরকারি দমননীতিতে। 'পরিচয়'-এর পাশাপাশি অন্যান্য বামপন্থী পত্রিকা—'অরণি' 'অগ্রণী' 'মূল্যায়ন'-এর ক্ষেত্রে সেই একই সমস্যা। ওই সময়ে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হওয়ার বাস্তব সমস্যার কথা জানিয়েছেন সুভাষ 'আমি তখন বেরিয়েছি জেল থেকে। আমার ঘাড়ে এসে পড়ল (পরিচয়)। ঘাড়ে আসা মানে কাগজের টাকা ধার করা, লেখা জোগাড় করা, বিজ্ঞাপন জোগাড় করা সমস্ত ভারই আমাকে বহন করতে হত। আর তাছাড়া নিজের পয়সায় বাসভাড়া দিয়ে যাওয়া-আসা—কাজেই এই কাজের জন্যে লোক পাওয়া কঠিন হত।'[৮] 'পরিচয়'-এর ৩৭ বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে সুভাষ মুখোপাধ্যায় পত্রিকার লড়াকু চরিত্রটিকে চিনিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এইভাবে : 'সরকারি দমনপীড়নে পরিচয়-এর সম্পাদক, লেখক, শিল্পী, কর্মীরা বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হয়েছেন, মাথার ওপর গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ঝুলছে—তবু পরিচয়কে বন্ধ করা যায়নি।'[৯] পরিবেশের এই চাপের মধ্যে দিয়েই স্পষ্ট হয়ে ওঠে 'পরিচয়'-এর লক্ষ্য। সুধীন্দ্রনাথের পত্রিকার নান্দনিক উদ্দেশ্য এবং এলিয়ট ভক্ত এলিট গোষ্ঠীর এলাকা ছাড়িয়ে হস্তান্তরিত 'পরিচয়' হয়েছে ভূমিমুখিন : 'শহরে গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের একাংশ এবং যাঁরা সমাজতন্ত্রের যোদ্ধা—তাঁদের সঙ্গে পরিচয়-এর সম্পর্ক নিকটতর হল। দেশের মাটিতে শুধু পা রেখে নয়, হাত লাগিয়ে। তত্ত্বকে ফলিয়ে তুলবার প্রয়োজন দেখা দিল।'[১০]

তত্ত্বকে ফলিয়ে তোলবার ততটা নয়, ফলাও করবার প্রাথমিক প্রয়োজনের প্রত্যক্ষ তাগিদ

চল্লিশের দশকের শেষে 'পরিচয়'-এ ধরা পড়ে স্পষ্টভাবে। মার্কসবাদী মহলের নানা মহলের বাদানুবাদ[১১], সাহিত্যতাত্ত্বিক তর্কের অবতারণা[১২], নবনির্মিত চিনের বৈপ্লবিক অনুপ্রেরণা[১৩]— ইত্যাদি প্রসঙ্গেই তখন পত্রিকায় ঝোঁক পড়েছে বেশি। এসব বিষয়ের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করেও বলা যায়, ওই সময়ের পত্রিকার শাশ্বত মূল্য অন্য সময়ের তুলনায় কম। পত্রিকাটির সৃষ্টিশীল ধারাটি তখন ঈষৎ আড়ালে চলে গেছে। সব মিলিয়ে ওই সময় 'পরিচয়'-এর চরিত্রে সাংবাদিকতার একটা প্যাটার্ন লক্ষ করা যায়, যা তার আগে বা পরে কখনোই আর দেখি না।

মানববিদ্যার বিভিন্ন শাখার চর্চা পরিচয়-এর অনায়াস অধিকারের বিষয় ছিল, তা কেন্দ্রীভূত হল মূলত রাজনীতির ক্ষেত্রে। রাজনৈতিক দর্শনও ততটা নয়, যতটা রাজনৈতিক দলীয় বাদানুবাদ। প্রথমে সুশীল জানা-মঙ্গলাচরণ এবং তারপর সুভাষের সম্পাদনায় 'পরিচয়'-এর এই প্রবাহে ছেদ পড়ল।

'পরিচয়'-এর ইতিহাস বিষয়ক এ যাবৎ সবচেয়ে দীর্ঘ এবং গুরুত্বপূর্ণ রচনাটি সুভাষের প্রেরণায় লেখা শুরু হয়। 'পরিচয়ের কুড়ি বছর'-এর সূচনায় হিরণকুমার সান্যাল প্রথম সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ এবং অধুনা সম্পাদক সুভাষের মধ্যে সুদূর যুগ ব্যবধান স্বীকার করেও 'পরিচয়'-এর মূল স্রোতের অভিন্নতাকে স্মরণ করাতে চান। মাত্র দু'বছর আগের 'পরিচয়'-এ-ই একজন সম্পাদকের কলমে তীব্রভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন সুধীন্দ্রনাথ। শুধু মতবিরোধিতা নয়, অশ্রদ্ধাও ধরা পড়েছিল সেই উচ্চারণে। সুধীন্দ্রনাথ-আইয়ুব-বুদ্ধদেব সম্পর্কে সৌজন্যমূলক 'আপনি' বাচক সম্বোধনটুকু ব্যবহৃত হয়নি সেই রচনায়।[১৪] আর হিরণকুমারের রচনাটি আপাদমস্তক সুধীন্দ্রকেন্দ্রিক, কোনো কোনো অংশ সুধীন্দ্রের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের একক প্রদর্শনীও বলা চলে। রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ঊনিশ শতকের মনীষার সমস্ত অবদান শুধু নয়, সর্বতোভাবে ঐতিহ্যের ধারণাটিকেই নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন ভবানী সেনের থিসিসের সমর্থকেরা। আর সম্পাদক সুভাষ 'পরিচয়'-এর ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে ইতিহাস এবং ভবিষ্যতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সেতুবন্ধনের চেষ্টা করলেন।

চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৭-৫৮র যুগ্ম সংখ্যাটি সুভাষের সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রথম সংখ্যা। বেশ কয়েকটি ভালো প্রবন্ধ এবং সুপরিকল্পনার চিহ্ন বহনকারী এই সংখ্যাটির পিছনে সুভাষের অবদান কতটা বলা শক্ত। কারণ ফাল্গুন অবধি পত্রিকাটি পূর্ব সম্পাদকদ্বয়ের পরিচালনাধীন ছিল। কাজেই ওই যুগ্ম সংখ্যা তাঁদের পরিকল্পনাজাত এমনও হওয়া সম্ভব। তবে ওই সংখ্যাটি থেকে পত্রিকার চরিত্রে একটা বদল বেশ স্পষ্ট। আগের দুই সম্পাদকের পথনির্ণয়ের সব দ্বন্দ্ব কাটিয়ে পরিচয় যেন হঠাৎই হয়ে উঠল একটি আত্মবিশ্বাসী পূর্ণাঙ্গ সাংস্কৃতিক পত্রিকা— রাজনীতি বা সাহিত্য যুগপৎ যার সহজাত স্পন্দন। ওই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রগতি লেখক আন্দোলনের আরম্ভ', নীরেন্দ্রনাথ রায়ের 'সেক্সপীয়র প্রসঙ্গে', শম্ভু মিত্রের 'বাংলা থিয়েটার', চিন্মোহন সেহানবীশের 'শিল্প ও সাহিত্যের সমস্যা : চীনের পথ', সরোজ আচার্যর 'আদ্রেঁ জিদ' ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। সেই শুরু। তারপর সিরিয়াস পাঠকের জন্য প্রবন্ধের নানা সম্ভার এনেছে সুভাষ সম্পাদিত পৌনে দু'বছরের 'পরিচয়'।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের ধারাবাহিক রচনা 'ফ্রয়েড প্রসঙ্গে' (কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১৩৫৮) বা সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর রাধাকৃষ্ণনের দর্শন (আশ্বিন ১৩৫৮) তার মধ্যে স্মরণীয়। এ ছাড়া কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে ননী ভৌমিক, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, রমেশচন্দ্র সেন, সুলেখা সান্যাল প্রমুখদের গল্প ঘুরে ফিরে এসেছে ওই পর্বের 'পরিচয়'-এ। অযথা তালিকা দিয়ে এই রচনাকে ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই, আমরা শুধু সুভাষের প্রচেষ্টাটুকুর উল্লেখ করতে চাইছি। কিন্তু কতদূর সফল হয়েছিলেন তিনি নিজের অভিপ্রায় রূপায়ণে? জীবনের পাদপ্রান্তে এসে 'পরিচয়'-এর সেই দিনগুলিকে সফল বলে মনে করেননি তিনি। পারিপার্শ্বিকের চাপকে তাঁর প্রচেষ্টার প্রধান বাধা হিসেবে দেখেছেন তিনি।

অবশ্য বাধা ছিল প্রথম থেকেই। এবং তার প্রকোপটা প্রথমত অর্থনৈতিক। প্রথমত হস্তান্তরিত 'পরিচয়'-এর অর্থনৈতিক দায়ভার কম্যুনিস্ট পার্টি বহন করলেও, পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ার পর তা আর সম্ভব ছিল না। সেই সময়ে সম্পাদক সুভাষ একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি খুলে স্বনামে/বেনামে শেয়ার কিনে বা বিক্রি করে অবস্থা সামাল দেওয়ার বিবরণ দিয়েছেন তাঁর সঙ্গে কথোপকথনে।[১৫]

কিন্তু সুভাষের মতে আসল বাধা অন্যত্র। পার্টি নেতৃত্বের সঙ্গে মতবাদগত পার্থক্য। সুভাষ জানাচ্ছেন : 'আমি এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি পার্টির লোকেদের যে পরিচয় পার্টির মুখপত্র নয়, এর একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে এটা সর্বসাধারণের কাগজ। কাজেই সাধারণ লোক যা চায় সেই মতো কাগজটাকে করা দরকার। এই নিয়ে খুব আমার সঙ্গে লড়াই হয়েছে। যাঁরা একটু গোঁড়া ধরনের ছিলেন তাঁরা এটা পছন্দ করতেন না—আমার মতটাকে।'[১৬]

শুধু মতবিরোধ নয় 'পরিচয়'-এর সম্পাদক পদ ছাড়বার কারণ হিসেবেও সুভাষ দুষেছেন পরিবেশের এই চাপকে। অথচ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯—সুভাষ সম্পাদিত শেষ 'পরিচয়'-এর সাক্ষ্য অন্যরকম। ওই সংখ্যায় 'পাঠকের প্রতি' শিরোনামে 'সম্পাদক বদল' বলে প্রথমে 'পরিচয়'-এর 'ঘন ঘন সম্পাদক বদলানোর ব্যাপারটা' পাঠকের পক্ষে 'বিরক্তিকর জেনে' মার্জনা চেয়েছেন সুভাষ। তারপর জানিয়েছেন নিজের অপারগতার কথা : 'কলকাতার বাইরে থাকার দরুণ গত কয়েকমাস থেকে পরিচয়-এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।' সম্পাদক পদ থেকে নিজে সরে গিয়েও 'পরিচয়'কে 'বাংলা প্রগতি সাহিত্যের সব থেকে শক্তিশালী হাতিয়ার' হিসেবে গড়ে তোলবার স্বপ্ন তখনও সুভাষের চোখে। কিন্তু মৃত্যুর কয়েকমাস আগে সম্পাদনা ত্যাগের কারণ সুভাষের জবানিতে অন্যরকম : 'পরিচয়ের উপর পার্টির একটা দখল ছিল এবং পার্টি সদস্যদের বলা হত পরিচয় বিক্রি করতে এবং গ্রাহক হতে। এবং তখন খুব একটা সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক ছিল...ফলে আমাদের প্রায়ই বেগ পেতে হত...পার্টি সদস্যদের। তারা কোনোরকম অমার্কসবাদী লেখা বেরোলেই তারা এসে অভিযোগ করত তার প্রতিবাদ করত। এবং একটা ঝোঁক ছিল যাতে পার্টির লোকেদেরই লেখা ছাপা হয় পার্টির বাইরের লোকদের লেখা ছাপা হলে তারা অসন্তুষ্ট হত। ফলে যখন সম্পাদক হলাম আমি নানা ধরনের চাপ আমার ওপর আসতে লাগল। আমি তখন পরিচয়কে খানিকটা লিবারেল করার চেষ্টা করেছিলাম। তাতে পার্টির কিছু লোক খেপে গেল এবং

তারা নালিশ করে পার্টির কর্তাদের কাছে এমন অবস্থা করল যে আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।'[১৭] দুটি বক্তব্যের মধ্যে পঞ্চাশ বছরের ব্যবধান শুধু নয়, সুভাষের দলমত বিশ্বাস পরিবর্তনেরও সাক্ষ্য আছে। সুভাষের জীবনপঞ্জি অনুযায়ী ১৯৫২ সালে চটকল শ্রমিক মজুর সংগঠনের কাজে সস্ত্রীক বজবজে বসবাস শুরু করেন তিনি। 'পরিচয়' সম্পাদনা ত্যাগ করেন ওই বছরেই। ১৯৫৪ অবধি বজবজের সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। অর্থাৎ পরিচয় অগ্রহায়ণ ১৩৫৯-এর 'সম্পাদক বদল' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তি এবং সুভাষের জীবনের ঘটনাবলি একে অন্যের সমর্থক। আবার এ-ও ঠিক যে ১৯৪২ সালে কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করবার চল্লিশ বছর পরে ১৯৮২ সালে পার্টির সদস্যপদ পুনর্নবীকরণ স্থগিত রেখে, দীর্ঘদিনের সম্পর্ক চুকিয়েছিলেন তিনি। পার্টির রেজিমেন্টেশনের দায়ে ব্যক্তিগত সংকটের গোপনীয়তা রক্ষা করবার দায় থেকে মুক্ত তিনি। ১৯৫২ সালে যা বলা সহজ ছিল না, ২০০২ সালে তা আর অসম্ভব নয়।

সম্পাদক হিসেবে সুভাষের সরে যাওয়া কোনোরকম চাপের ফলে হোক বা না হোক, সংক্ষিপ্ত কালপর্বে তাঁর অভিপ্রায় তিনি সার্থক করতে পারেননি এ কথা ঠিক। কিন্তু সুভাষ সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিল যথাযথ সময়ে, যে ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রগতিশীলতার কোনো বিরোধ ছিল না। পত্রিকার পরবর্তী স্থিতাবস্থা যার বিকাশ গোপাল হালদারের হাতে, তার সূচনা সুভাষের সম্পাদনায়। বলিষ্ঠতা এবং সৃষ্টিশীলতা বজায় রেখে 'পরিচয়'কে সর্বসাধারণের এবং মুক্তমনের কাগজ হিসেবে গড়ে তোলবার যে স্বপ্ন সুভাষ দেখেছিলেন তা সফল হল গোপাল হালদার-দীপেন্দ্রনাথের 'পরিচয়'-এ।

উল্লেখপঞ্জি

১. পরিচয়-এর ৪৫ বৎসরে : গোপাল হালদার : সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত পৃ. চোদ্দ।

২. 'প্রমোদবাবু (দাশগুপ্ত) রবীন্দ্র গুপ্তের থিসিসটা আমাদের সামনে রাখলেন। ...নীরেনদা (নীরেন্দ্রনাথ রায়), আমি, মঙ্গলা (মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়) অমরদা (অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র), কেউই মেনে নিলাম না। ...ঠিক হল এর প্রতিবাদ করে 'পরিচয়'-এ আমরা সবাই লিখব।...'পরিচয়'-এ লিখলেন শীতাংশু মৈত্র, নীরেনদা। সুশীল জানা বা অনিল কাঞ্জিলাল সেল মেম্বার না হয়েও আমাদের সমর্থন করেছিলেন। গোলাম কুদ্দুস বা সরোজ দত্ত ছিলেন ভবানী সেনের সমর্থক।'—একটি সাক্ষাৎকার : নরহরি কবিরাজ, সমতট, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩ পৃ. ৩৪-৩৫।

৩. 'পরিচয়'-এ বিশ বছর : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় পরিচয় কার্তিক ১৩৮৮ পৃ. ২৮।

৪. ঐ

৫. পরিচয় ভাদ্র ১৩৫৭—গোবিন কাঁড়ার।

৬. ৩৭টি বর্ষা পেরিয়ে : সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রাবণ ১৩৭৪ পুনর্মুদ্রিত সুবর্ণজয়ন্তী জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় ১৩৬৮ পৃ. চব্বিশ (পরে শুধু রচনা শিরোনাম)।

৭. ২৪.১১.২০০২-এ সুভাষের সঙ্গে কথোপকথনে এই তথ্য দিয়েছেন তিনি। কিন্তু 'এখানে' প্রকাশিত হয়েছিল ত্রৈমাসিকে নয়, মাসিক পরিচয়-এ। পত্রিকার অষ্টম বর্ষে অগ্রহায়ণ ১৩৪৫-এ।

৮. সুভাষের সঙ্গে কথোপকথন ২৪.১১.২০০২।

৯. ৩৭টি বর্ষা পেরিয়ে : সুভাষ মুখোপাধ্যায় পৃ. তেইশ।

১০. ঐ

১১. যেমন—মার্ক্সবাদের নয়াভাষ্য—নরহরি কবিরাজ ('কবিতা', 'সাহিত্যপত্র'কে আক্রমণ সূচক) বৈশাখ ১৩৫৬।
সাহিত্যে তথাকথিত তৃতীয় শিবির—গোলাম কুদ্দুস—মাঘ ১৩৫৬।
সমকালীন সাহিত্যের পথ—সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—আশ্বিন ১৩৬৭।

১২. যেমন—সোভিয়েট সাহিত্যের মূল্য বিচার—দেবকুমার চক্রবর্তী (জ্দানভ সাহিত্য নীতির সমর্থনে লেখা) কার্তিক ১৩৫৫।
লেখকের দায়—মহেন্দ্রচন্দ্র রায় ফাল্গুন ১৩৫৫।
পার্টি সাহিত্য ও পার্টি সংগঠন—লেনিন ভাদ্র ১৩৫৭।
'পরিচয়'-এর পথ—নরহরি কবিরাজ—শ্রাবণ ১৩৫৭।
সংস্কৃতি সংবাদ—দিলীপ চৌধুরী—ভাদ্র ১৩৫৭।
সৈয়দ আবদুর রশীদ—কার্তিক ১৩৫৭।
সনৎকুমার বসু—মাঘ ১৩৫৭।
এছাড়া আলোচনার জন্য (ভবানী সেনের থিসিসের পক্ষে বিপক্ষে) বিভাগে অজস্র লেখা।

১৩. যেমন—মহাচীনের জয়যাত্রা—হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মাঘ ১৩৫৫।
মাও-এর ইয়ানেন ফোরামের বক্তৃতার অনুবাদ—জগন্নাথ চক্রবর্তী—ফাল্গুন ১৩৫৫।
মাও-এর কবিতার অনুবাদ—জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়—ফাল্গুন ১৩৫৫।

১৪. সাহিত্যে তথাকথিত তৃতীয় শিবির : গোলাম কুদ্দুস, পরিচয় মাঘ ১৩৫৬।

১৫. কথোপকথন ২৪.১১.২০০২।

১৬. ঐ

১৭. ঐ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'পরিচয়' : কালানুক্রমিক সূচি

প্রভাতকুমার দাস

বত্রিশ বছর বয়সে 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, তদানীন্তন কমিউনিস্ট পার্টির একজন সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে, পার্টিরই নির্দেশে। 'পদাতিক', 'অগ্নিকোণ' আর 'চিরকুট' তিনটি কবিতার বইয়ের সঙ্গে তখনো পর্যন্ত 'আমার বাংলা' নামে একমাত্র একটি গদ্যগ্রন্থের লেখকের তখন প্রধান পরিচয় তরুণতমদের মধ্যে অন্যতম একজন প্রগতিপন্থী কবি হিসেবেই বড়ো হয়ে উঠেছিল। ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের সংগঠন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সুভাষ, ততদিনে 'একসূত্রে' ও 'কেন লিখি' দুটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন যৌথভাবে, প্রথমটি গোলাম কুদ্দুসের এবং দ্বিতীয়টি হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে। ১৯৪৫-এর জানুয়ারিতে দুটি সংকলনই প্রকাশিত হয়েছিল, ফ্যাসিস্ট বিরোধী কবিতা সংকলনটির শিরোনাম 'একসূত্রে', আর বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের সংকলিত জবানবন্দির নাম 'কেন লিখি'। শেষোক্ত গ্রন্থটি প্রায় অর্ধশতাধিক বছর পরে লোকচক্ষুর আড়াল থেকে প্রণব বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে নতুন করে প্রকাশ করার সময় 'ভূমিকা'য় সুভাষ জানিয়েছিলেন : 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়েও আমি তখন অগ্রজ কবি বিষ্ণু দে-র সাগরেদ হয়ে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের কাজে স্বেচ্ছাসেবক। 'কেন লিখি'-র মাথা হাবলদা, আমি তার হাত পা।'

'পরিচয়'-এর একটি সংকটময় সময়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল, প্রথম প্রকাশের পর পত্রিকার বয়স পঞ্জিকার হিসেবে তখন প্রায় উনিশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সুভাষের নাম সম্পাদক হিসেবে ঘোষিত হয় ২০ বর্ষের ২ খণ্ড ৩-৪ (চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৭-৫৮) সংখ্যা থেকে— সেই সংখ্যায় 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' শীর্ষক একটি ধারাবাহিক লেখার সূচনায় 'কথকের কৈফিয়ৎ' শিরোনামে হিরণকুমার সান্যাল জানিয়েছিলেন : 'পরিচয়ের প্রথম সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বর্তমান সম্পাদক সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—এই দুজনের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান প্রায় বছর দশেক। মাঝামাঝি সময়টাতে আরো জনপাঁচেক সম্পাদকের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'পরিচয়' প্রথম সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে।

হিরণকুমার সান্যাল যেমন পত্রিকার আদিপর্বের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, যার পেছনে নিঃসন্দেহে প্রধান প্রেরণা ছিলেন সুভাষ, তেমন পরবর্তী পর্যায়ের নানা পর্বান্তরের ইতিহাস সেইভাবে কেউ একক চেষ্টায় লেখার চেষ্টা করেননি। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের 'পরিচয়ের আড্ডা' শীর্ষক গ্রন্থটি অবশ্য 'পরিচয়'-এর ইতিহাস না হলেও অনেক ঐতিহাসিক উপাদানের সংকলন হিসেবে মূল্যবান। তবে বিভিন্ন সময়ে অনেকেই পৃথকভাবে, 'পরিচয়' প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আকারেও লিখেছেন, যেগুলির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। দেবেশ

রায়ের সম্পাদনায় 'পরিচয়'-এর সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন মে-জুলাই ১৯৮১ ৯-১২ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়েছিল যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে। পরে তাঁরা একটি সুবর্ণ জয়ন্তী পরিপূরক সংখ্যাও (নভেম্বর ১৯৮১ কার্তিক ১৩৮৮) প্রকাশ করেন। প্রথমটিতে সুভাষের একটি সম্পাদকীয় পুনর্মুদ্রিত হয়, কিন্তু 'পরিচয়' সম্পাদনা সংক্রান্ত কোনো স্মৃতিকথা তখন কিংবা পরে কোথাও বিস্তারিতভাবে লেখেননি। লিখলে তাঁর সময়ের 'পরিচয়'-এর সংকট ছাড়াও আরো কয়েকটি বিষয়ে স্পষ্ট কিছু তথ্য জানার সুযোগ হত।

প্রথম পর্বে সুভাষ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন ২২ বর্ষের প্রথম খণ্ডের ৪ (কার্তিক ১৩৫৯) সংখ্যা পর্যন্ত। দ্বিতীয় পর্বে যখন সম্পাদনার দায়িত্ব নেন তখন 'পরিচয়' সাঁইত্রিশ বছরে পদার্পণ করেছে, তাঁর নিজের বয়স আটচল্লিশ। দুই পর্বের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান প্রায় পনেরো বছর। সম্পাদক, তখন সর্বভারতীয় স্তরে আকাদেমি সম্মানে পুরস্কৃত কবি, দেশে-বিদেশে তাঁর সাহিত্যখ্যাতি প্রলম্বিত, ষাটের দশকে আফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠনের কাজে একজন ব্যস্ততম মানুষ। পার্টি-বিভাজনের ফলে কমিউনিস্ট পার্টির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিও অনেকটা স্বচ্ছন্দ নয়। কিন্তু স্বল্পস্থায়ী সেই সম্পাদনার কালটিও নানা ভাবে বিড়ম্বিত হয়েছিল, যেজন্য বর্ষপূরণের পূর্বেই তাঁর দায়িত্ব প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন। যদিও দুটি পর্বই সময়ের হিসেবে সংক্ষিপ্ত, তবু সামগ্রিক বিচারে রাজনীতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দুটি পৃথক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় বলেই চিহ্নিত করা যায়।

আলোচ্য দ্বিতীয় পর্বে সম্পাদনা কর্মে সুভাষ দায়িত্ব নেওয়ার বছর চারেক আগে বঙ্গাব্দ ১৩৭০ বৈশাখে ভবানী সেন 'পরিচয়ের পৃষ্ঠপট' শীর্ষক একটি রচনায় লিখেছিলেন : '১৯৪৩ সালে 'পরিচয়'-এর নবপর্যায় শুরু হয়েছিল এমন একটি লক্ষ্য নিয়ে যা শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মনে নবযুগধর্ম সঞ্চারিত করেছিল। আজ তার জন্য আর এক নতুন ভূমিকা পালন করার ডাক এসেছে। তখনও 'পরিচয়' পার্টি-পত্রিকা ছিল না। আজও তা পার্টি পত্রিকা হবে না। প্রগতির যৌথ স্বার্থে আজ তাকে বরং আরও ব্যাপকতর রূপ নিতে হবে।' সেদিনও কমিউনিস্ট কর্মীরা 'পরিচয়'কে সমৃদ্ধশালী হতে সাহায্য করেছেন প্রগতিশিবিরের দায়িত্ব পালনের জন্য, আজও তাঁদের দায়িত্ব হল, এই নবপর্যায়ের 'পরিচয়'কে সুপ্রভাবিত করা প্রগতিশীল শিবিরের নবতম ভূমিকায় সার্থকতা লাভের জন্য।'

'পরিচয়' ১৩৭৪ পৌষ-মাঘ সংখ্যায় 'একটি সাক্ষাৎকার' শিরোনামে কয়েকজনের প্রশ্নের উত্তরে গোপাল হালদার জানিয়েছিলেন : 'পরিচয়ের সঙ্গে আমি ৪৩ সাল থেকে যুক্ত। পরিচয়ের হাত বদলের পর ৬৭ সাল পর্যন্ত অধিকাংশ সময়ে যুগ্ম সম্পাদক ছিলাম। মাঝে জেলে যাওয়ার জন্য কয়েক বছর বাদ আছে। প্রগতিশীল লেখকদের মুখপত্র হিসেবে 'পরিচয়' পত্রিকা শ্রীহিরণকুমার সান্যাল, শ্রীসুশোভন সরকার-এর উদ্যোগে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাছ থেকে কেনা হয়। আমি কলেজে সুধীন্দ্রনাথের সহপাঠী ছিলাম, কিন্তু আগের যুগের পরিচয়ের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় থাকলে তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গোপাল হালদারের সম্পাদনার সময়কাল অন্তত সুভাষের সম্পাদনার দ্বিতীয়

পর্বের সূচনা অংশে শুধু সংলগ্ন ছিল তা নয়, তিনি লেখক হিসেবেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিলেন। পঁয়তাল্লিশ বছরে পদার্পণের পূর্ববর্তী পঁচিশ বছরের স্মৃতিচারণ করে গোপাল হালদার লিখেছিলেন :'কমিউনিস্ট পার্টি 'পরিচয়'কে কমিউনিস্ট পার্টির পত্রিকা করতে চায়নি। তাদের উপদেশ বুঝেই আমরা লিখতে সাহসী হয়েছিলাম : নতুন যুগে নতুন দৃষ্টি ও নতুন যুগের নতুন সৃষ্টির পরিচয় বহন করবে 'পরিচয়', 'পরিচয়'-এর মত আছে কিন্তু মতবাদ নেই। এই নীতি বৎসর কয় পরে পালনের পক্ষে বাধা হয়, তা সত্য। দু-রকমের বাধা দেখা দিয়েছিল—(ক) পার্টির মধ্যে গোঁড়ামির প্রবলতা, (খ) পার্টির বন্ধুস্থানীয়দের মধ্যে 'পরিচয়'-এর ভূমিকা সম্বন্ধে অজ্ঞতা ও অসহিষ্ণুতা। 'পরিচয়' পার্টির কাগজ মাত্র—এই ভ্রান্ত ধারণার জন্য বন্ধুদের হাতেই সম্পাদকদের গঞ্জনা সইতে হয়েছে বেশি—পার্টি নেতৃত্বের হাতে নয়।' এই মন্তব্যের সত্যতা অনুসরণ করে বলা যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দুই পর্বের সম্পাদনা কাজে অর্থনীতি ছাড়া, রাজনীতির তদানীন্তন পরিস্থিতি অনেকাংশে একটা পরোক্ষ সংকট সৃষ্টি করেছিল। লেখা ও লেখক নির্বাচন, বিষয় নির্ধারণ—ইত্যাদি সব বিষয়েই সম্পাদক হিসেবে একেবারে স্বাধীনভাবে সব কিছু করার অধিকার পেয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে নিশ্চয় প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

'পরিচয়' নববর্ষ ১৩৫৮ চিহ্নিত সংখ্যাটির সঙ্গে ভিতরে বিলম্বিত চৈত্র মাস যুক্ত করে চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৭-৫৮ হিসেবেই উল্লিখিত হয়। পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে জানানো হয়, পূর্ববর্তী সম্পাদকদ্বয় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গুরুতরভাবে অসুস্থ, আর সুশীল জানা বেশ কিছুদিন থেকে নানা কাজের চাপে ব্যস্ত—যেজন্য সম্পাদক বদল করা ছাড়া উপায় থাকল না। সত্যজিৎ রায়ের প্রচ্ছদশোভিত এই নববর্ষ সংখ্যাটি, প্রথম দর্শনে বাইরের থেকে যেমন দৃষ্টিনন্দন হয়ে উঠেছিল, তেমন নানামুখী রচনার সম্ভারে পাঠকদের সামনে একটা নবতম আকর্ষণও গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। পর পর পাঁচমাস তিনি সত্যজিতের একই প্রচ্ছদ, আর্থিক সাশ্রয়ের লক্ষ্যে রং বদলে-বদলে ব্যবহার করলেও, শারদীয় ১৩৫৮ থেকে প্রতি সংখ্যায় বৈচিত্র্য আনতে পরবর্তী সাত মাস কখনো চিত্তপ্রসাদ কখনো দেবব্রত মুখোপাধ্যায় কখনো কামরুল হাসানের চিত্র ব্যবহার করেছেন। এমনকী ক্ষিরোদ রায় আর রণজিৎ রায়চৌধুরীর তোলা আলোকচিত্র প্রচ্ছদে ছাপিয়েছেন। ১৩৫৯ বৈশাখ সংখ্যায় আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে প্রাপ্ত মুর্শিদাবাদের বালুচর শাড়ির আলোকচিত্র দিয়ে প্রচ্ছদ করেছিলেন যেটি পরবর্তী তিনটি সংখ্যায় রং বদল করে ব্যবহার করছেন, নিশ্চয় আর্থিক কারণেই। দ্বিতীয় পর্বের শুরু হয়েছিল রঘুনাথ গোস্বামী কৃত প্রচ্ছদ দিয়ে, ভেতরের অলঙ্করণ করেছিলেন শ্যাম গুহ ও পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়। এই পর্বেই শম্ভু সাহার ছবি ছাড়াও স্কেচ মুদ্রিত হয়েছে এস পি রাও, অরূপ চৌধুরী ও শ্যামল দত্তগুপ্তর। আরো কারো কারো শিল্পকর্মও মুদ্রিত হয়েছে যা বর্তমান আলোচকের দেখার সুযোগ হয়নি।

২২ বর্ষের ১ খণ্ড ৫ (১৩৫৯ অগ্রহায়ণ) সংখ্যা থেকে সম্পাদকীয় বদল হলেও (দায়িত্ব নিয়েছিলেন গোপাল হালদার ননী ভৌমিক যুগ্মভাবে); 'পাঠকদের প্রতি' সুভাষ জানিয়েছিলেন : 'ঘন ঘন সম্পাদক বদলানোর ব্যাপারটা আপনাদের পক্ষে বিরক্তিকর জেনেও নিতান্ত বাধ্য

হয়েই এ সংখ্যা থেকে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক বদলাতে হচ্ছে। কলকাতার বাইরে থাকার দরুণ গত কয়েকমাস থেকে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক হিসেবে কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। তাই সম্পাদক বদল না ঘটিয়ে উপায় ছিল না।' আসলে 'পরিচয়'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করার অল্প ব্যবধানে তিনি সদ্য ইউরোপ প্রত্যাগত গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। এবং তারও অল্প ব্যবধানে শ্রমজীবী মানুষের সঙ্গে থেকে কাজ করার আগ্রহে স্বেচ্ছায় বজবজ অঞ্চলে চটকল মজুর সংগঠনের কাজে সস্ত্রীক ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। পার্টির কাজের বাইরে লেখালেখির যৎসামান্য রোজগারের উপরই তাঁকে নির্ভর করতে হত, সম্ভবত সে কারণেই 'পরিচয়' সম্পাদনার জন্য অধিক সময় দেওয়া তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছিল। বাধ্যত এই বিদায় গ্রহণের পরেও তিনি সম্পাদক হিসেবে 'পাঠকদের প্রতি' তাঁর কর্তব্যের কথা ব্যক্ত করে গেছেন : 'এই প্রসঙ্গে আপনাদের কাছে কয়েকটি কথা খোলাখুলি জানানো দরকার। 'পরিচয়' আর পাঁচটা পত্রিকার মতো নয়। এই পত্রিকার একটাই উদ্দেশ্য বাংলা সাহিত্যে প্রগতির আদর্শকে জয়যুক্ত করা।' এবং পরিশেষে দৃঢ় পদক্ষেপে তিনি এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে 'পরিচয়'কে বাংলা প্রগতি সাহিত্যের সব থেকে শক্তিশালী হাতিয়ার করে তোলার আহ্বান জানান সকলের কাছে।

তাঁর সম্পাদনাকালে প্রথম পর্বে 'পরিচয়' বিংশ বর্ষের শেষ তিনটি সংখ্যা, একবিংশ বর্ষে বারোটি এবং দ্বাবিংশ বর্ষে তিনটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই সংখ্যাগুলির সূচিপত্রে অনুসরণ করলে বোঝাই যায়, তাঁর একনিষ্ঠ চেষ্টা ছিল সাহিত্যের সব কটি ক্ষেত্রেই নতুন নতুন লেখকদের পাদপ্রদীপের সামনে তুলে আনতে অগ্রাধিকার দেওয়ার। আর, কবি হিসেবে নাজিম হিকমতের কবিতা অনুবাদ তাঁর নিজের সাহিত্য ভাবনাচিন্তার ক্ষেত্রে একটা বড়ো রকমের ঘটনা, যেটা এই 'পরিচয়' সম্পাদনা কালেই ঘটেছিল। তাছাড়াও উল্লেখ করতে হয় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যে বিশাল কর্মকাণ্ড সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়েছিল, বাংলার প্রগতিশীল লেখক বুদ্ধিজীবীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা বিশেষ একটা আন্দোলনে রূপান্তরিত করতেই 'পরিচয়' এই পর্বে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেয়—সেটাও নিঃসন্দেহে একটা বড়ো ঘটনা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পরে প্রথম যে সম্পাদকীয়টি লিখেছিলেন ১৩৭৪ শ্রাবণ সংখ্যায় তার শিরোনাম ছিল '৩৭টি বর্ষা পেরিয়ে'। তাতে 'পরিচয়'-এর সেকাল আর একাল—হাত বদলের আগে আর পরে—মোটামুটি এই দুটি পর্বের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন : 'দ্বিতীয় পর্বের পরিচয়-এর কাজ ছিল আরও কঠিন। মার্কসবাদ তখন আর পরিচয়-এর বহু মতের মধ্যে একটি মত নয়, মার্কসবাদ হল চালিকা শক্তি।' তিনি মন্তব্য করেছিলেন : 'সত্যি বলতে কি, প্রথম পর্বের পরিচয়-এর হালছাড়া অবস্থায় সেকালের মার্কসবাদীরা হাল না নিলে তার অকালমৃত্যু হয়ত অবধারিত ছিল।' হাতবদলের প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পরে, [illegible] এর বর্তমান সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত, অনেকটা সুভাষেরই মনোভাবের প্রতিধ্বনি করে 'পরিচয় নিয়ে দু-চার কথা' শিরোনামে একটি রচনায় লিখেছিলেন : 'যাঁরা পরিচয়-এর ধারাবাহিকতা নিবিড়ভাবে অনুসরণ করেছেন, তাঁরা

দেখেছেন পথ ও মত নিয়ে বারবার বিতর্ক হয়েছে, কখনো কখনো তা আমাদের কাগজের পাতা উপছে চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে, উত্তেজনার সঞ্চারও কম হয়নি। একদিকে উদারনৈতিকতার নামে প্রচ্ছন্ন দক্ষিণপক্ষ, অন্যদিকে বিপ্লবীয়ানার নামে হঠকারী অতিবাম-মার্গ—এই দুই বাদের মাঝখানের অসিধার-পথ দিয়ে হাঁটার কষ্টকর সাধনা চালিয়ে যেতে হয়েছে পরিচয়কে।' অমিতাভ তাঁর আলোচ্য রচনাটিতে, প্রথম প্রকাশের সাতান্ন বছর পর জানিয়েছিলেন : 'যাদের তোমরা আমরা কেউ লেখক মনে করি না, এরকম লোকজন ছাড়া বাংলা ভাষায় এমন একজনও বড়-ছোট কলমচি নেই, যিনি গত ছ-দশকে পরিচয়-এ লেখেনি। এ লেখা ভাগে ভাগে লিখতে পারতেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নীরেন্দ্রনাথ রায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, চিন্মোহন সেহানবীশ, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, ননী ভৌমিক, মণীন্দ্র রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-রা। হয়তো আরও কেউ কেউ।' 'পরিচয়'-এর পূর্বোক্ত সুবর্ণজয়ন্তী সংকলনে গোপাল হালদার, সুশোভন সরকার, হিরণকুমার সান্যাল, কুন্দভূষণ ভাদুড়ী, অন্নদাশঙ্কর রায়, পরবর্তী পরিপূরক সংখ্যায় গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের লেখা কোনোটি পুনর্মুদ্রিত কোনোটি নতুন আকারে লিখিত হয়েছে। এই গুচ্ছে, সুভাষের প্রথম পর্বের একটি সম্পাদকীয় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল—কিন্তু তাঁর সময়ের কথা তাঁকে দিয়ে লেখানোর চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা জানা নেই। বিভিন্ন জনের স্মৃতিচারণায় অনেকবারই বলা হয়েছে, 'পরিচয়'কে তার পরিচালকমণ্ডলী কোনোদিন নিছক পার্টির মুখপত্র করতে চাননি। তবু কী সব অজানা কারণে 'পরিচয়'-এর ধারাবাহিকতা থেকে সুভাষ ধীরে ধীরে দূরবর্তী হতে হতে একেবারেই সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছিলেন তা আজ কৌতূহলীরা কীভাবে জানার অবসর পাবেন? গত প্রায় দু-দশক 'পরিচয়' উপদেশকমণ্ডলীর থেকে তাঁর নাম যে শুধু বর্জিত হয়েছে তাই নয়, এমন কোনো উপলক্ষও কি তৈরি হয়নি তাঁর কোনো লেখা 'পরিচয়'-এ মুদ্রিত হবার? 'পরিচয়'-এর ইতিহাস লেখার দায় পালন করতে হলে এরকম অনেক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে নিশ্চয় ভবিষ্যৎ গবেষকদের।

পূর্বোক্ত সম্পাদকীয়তে সুভাষ, যুগবদলের সঙ্গে 'পরিচয়' কীভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিজেকে প্রস্তুত করেছিল সে সম্পর্কে জানিয়ে লিখেছিলেন : 'দ্বিতীয় যুগে পাঠক সমাজেরও বদল হয়েছিল। শহর গ্রামের শ্রমজীবী মানুষের একাংশ এবং যাঁরা সমাজতন্ত্রের যোদ্ধা—তাঁদের সঙ্গে পরিচয়-এর সম্পর্ক নিকটতর হল। দেশের মাটিতে শুধু পা রেখে নয়, হাত লাগিয়ে, তত্ত্বকে ফুলিয়ে তুলবার প্রয়োজন দেখা দিল।' সুভাষ এই কাজে নেমে 'পরিচয়'কে হাতিয়ার করে তুলতে মনোযোগী হয়ে বুঝেছিলেন : 'সে কাজ করবার মতো তৈরি পাকা হাত খুব বেশি ছিল না। তার উপযুক্ত নতুন লেখক পরিচয়কে তৈরি করে নিতে হয়েছিল। প্রথম পর্বে পরিচয় ছিল কাগজের আন্দোলন, দ্বিতীয় পর্বে পরিচয় হল আন্দোলনের কাগজ। এ পর্বেও পরিচয়কে নিজের পথ নিজেকেই তৈরি করতে হয়েছে।' সুভাষ তাই পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করে, নতুন লেখক তৈরির দুরূহ কাজের পাশে, পত্রিকাটির সবদিক থেকে, বিন্যাসে ও রচনা নির্বাচনে একটা অভিনবত্ব প্রদর্শন করে পাঠক সমাজে যাতে পত্রিকাটি

সমাদৃত হয় তার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন।

পরিচয়-এর আদর্শ অক্ষুণ রেখে 'পরিচয়'কে ব্যাপকতর পাঠক সমাজের মনের মতন করে তুলতে তিনি এই দ্বিতীয় পর্বেও বদ্ধকর ছিলেন, কিন্তু প্রথম তিনটি সংখ্যা প্রকাশ করার পর প্রতিটি যুগ্মসংখ্যা হিসেবে প্রস্তুত করেও শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কেন, সে প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিতভাবে না জানালেও, 'বিদায়ী সম্পাদক' হিসেবে ৩৭ বর্ষের শেষ সংখ্যার একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় 'পরিচয় পাঠক সমীপে'—সম্বোধনে কিছুটা অভিমানের সুরে লিখেছিলেন :

> কেন মাসে মাসে নিয়মিত পরিচয় বার করা যায়নি তার চুলচেরা বিচারে যাব না। কারো পক্ষেই সেটা প্রীতিকর হবে না। মোটকথা অবস্থাচক্রে বাধ্য হয়ে আমাকে হাল ছাড়তে হয়েছে।
>
> যে দুজন তরুণ পরিচয়-এর ভার কাঁধে নিয়ে জর্জরিত অবস্থা থেকে আমাকে ত্রাণ করলেন, তাঁদের সর্বান্তঃকরণে সাধুবাদ জানাই।
>
> নতুন পরিকল্পনায় পরিচয়কে ঢেলে সাজাতে গিয়ে যদি কারো মূল্যবোধে ঘা দিয়ে থাকি, তাহলে সেটাকে সম্পাদকের ব্যক্তিগত ত্রুটি মনে করে পরিচয়কে যেন তাঁরা যথারীতি আনুকূল্য করেন।
>
> কবি তরুণ সান্যাল এবং কথাসাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—স্ব স্ব ক্ষেত্রে দুজনেই দিকপাল। তাঁদের যোগ্য এবং যুগ্ম নায়কতায় এটা হবে পরিচয়ের দিন বদলের পালা।
>
> এ সংখ্যায় সম্পাদক হিসেবে আমার নাম থাকলেও সম্পাদনার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তাঁদেরই।
>
> পাঠকদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েও তাঁদের কাছ থেকে এ যাবৎ সম্পাদক হিসেবে যে প্রশ্রয় পেয়েছি, তার জন্যে আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। পত্রিকার স্বার্থে লেখকদেরও কম বিরক্ত করিনি। তাঁদের কাছেও ক্ষমাপ্রার্থী, অন্য যাঁরা আমাকে নানা কাজে সাহায্য করেছেন, তাঁদের সবাইকে শেষবারের মত ধন্যবাদ জানাই।

স্বাক্ষরের নীচে তারিখ উল্লিখিত হয় ১৭।৭।৬৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আলোচ্য সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল এতটা বিলম্বের পর যে অনেকেই মনে সন্দেহ করেছিলেন 'পরিচয়' আর প্রকাশিত হবে না। তবে, তিনি যে পত্রিকাটিকে সাহিত্য সংস্কৃতি মূলক একটি নিয়মিত মাসিক হিসেবে সব বয়সের পাঠকদের উপযোগী করে তুলতে একটা চেষ্টা চালিয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। পূর্ববর্তী পর্বে, হিরণকুমার সান্যাল কিংবা হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে যেমন 'পরিচয়' পত্রিকার আদিপর্বের ইতিহাস কিংবা প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ যুগের স্মৃতিকথা প্রকাশের বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, তেমন উত্তরপর্বে তিনি অন্নদাশঙ্কর রায়, সুকুমার সেন, গোপাল হালদারের মতো প্রবীণদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য বেশ কয়েকজন তরুণকে উৎসাহিত করেছিলেন। তরুণতর লেখকদের গল্প কবিতা ছাড়াও বিদেশি কবিতা অনুবাদ ছাড়াও ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের কবিতা ও গল্পের অনুবাদ প্রকাশ করতে

শুরু করেছিলেন। দেশের অর্থনীতি, সমাজনীতি পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সমীক্ষামূলক কয়েকটি নিবন্ধ প্রকাশ করে অভিনবত্ব প্রদর্শনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, চা শ্রমিকের বিবাহপ্রথা কিংবা কলকাতার গণিকাবৃত্তির বিষয়ে দুটি সাক্ষাৎকার-সমীক্ষা ভিত্তিক প্রবন্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শেষ পর্বে ছদ্মনামে মাছ ধরার বিষয়ে গদ্য লিখেছেন নিজে, তেমন পাশাপাশি শের জঙ্গের লোমহর্ষক বাঘশিকারের কাহিনী অনুবাদ করেছেন সাধারণ উৎসাহী পাঠকদের কথা ভেবেই। যদিও এইসব লেখা নির্বাচন তাঁর সম্পাদনার সম্পর্কে কোনো কোনো মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছিল বলে শোনা যায়। তাঁর শেষ সম্পাদকীয়তে তিনি যে মূল্যবোধে ঘা দেওয়ার প্রসঙ্গ এনেছিলেন অনেকটা অভিমানাহত কণ্ঠে, সে হয়ত এই বিরূপতা সহ্য করতে হয়েছিল বলেই। সাহিত্য, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র প্রভৃতি সংস্কৃতি প্রায় প্রতিটি বিষয়ে সমসাময়িক পর্যালোচনা উপস্থাপন করার জন্য পত্রিকার একটা বড়ো অংশ নিয়মিত বরাদ্দ করেছিলেন। পত্রিকার নিজস্ব বানান বিষয়ে খসড়া প্রণয়ন করে পাঠক-লেখকদের মতামতের ভিত্তিতে সর্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য একটা নীতি চালু করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু আর্থিক সংকটের কারণেই প্রধানত অনেক উদ্যোগ অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। নিজে বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা নিয়েও পত্রিকার অর্থকরী উন্নতি সাধনের পথে কোনো সুরাহা করতে পারেননি। সদস্য বা গ্রাহক বৃদ্ধির আবেদন জানিয়েও খুব একটা সার্থকতা পেয়েছিলেন এমন প্রমাণ নেই। অথচ তাঁর আমলে সামান্য মূল্যবৃদ্ধি করার প্রসঙ্গে পাঠক ও গ্রাহকদের মতামতকে কী অসাধারণ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল— যা যে কোনো পত্রিকার ইতিহাসে একটা আশ্চর্যজনক বিরল ঘটনা। তাঁর সম্পাদনার প্রথম পর্বে ২১ বর্ষ ১ খণ্ড ৬ (পৌষ ১৩৫৮) সংখ্যায় তিনি তাই আট আনার জায়গায় দশআনা বৃদ্ধি করার সময় লিখেছিলেন : 'পত্রিকাকে আরো উন্নত করার জন্য শুধু দু-চারজন নয়, সমস্ত পাঠকদের কাছ থেকেই মতামত আহ্বান করছি। প্রকাশিত লেখার সমালোচনা ছাড়াও পরিচয়ের অন্যান্য কী ধরনের লেখা প্রকাশিত হলে ভাল হয়, সে সম্পর্কেও পাঠকদের মতামত চাই।' তবু দুটি পর্বেই, তাঁর কর্মসূচি যখন ধীরে ধীরে একটা নিয়মিত প্রবর্তনার পথে সদর্থকভাবে গতিলাভ করতে চলেছে, তখনই তাঁর কার্যকালের মধ্যে অসময়ে ছেদ পড়েছে। তাঁর নিজের স্বভাবের মধ্যেই যে অস্থিরতা ছিল, হয়তো সেটাই এই বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে বড়ো কারণ হয়ে উঠেছিল, আর তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছানুযায়ী একটা পত্রিকাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করার আর্থিক সঙ্গতির অভাব। ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত থেকেই তিনি ক্রমাগত সময়ের দাবি পূরণ করে 'পরিচয়'কে যথার্থই আধুনিক করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। '৩৭টি বর্ষা পেরিয়ে' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে জানিয়েছিলেন : 'পরিচয়'-এর গৌরব শুধু তার দীর্ঘ জীবনের নয়, সময়ের সঙ্গে সমানে তাল দিয়ে চলার অফুরন্ত প্রাণশক্তিতে।' 'পরিচয়' পত্রিকার দুটি পর্বের সংকলিত সংখ্যানুক্রমিক সূচি অনুসরণ করলেই এই অভিমতের প্রমাণ পাওয়া সম্ভব।

পরিচয় : কালানুক্রমিক সূচি

১

[২০ : ২ : ৩-৪] চৈত্র-বৈশাখ ১৩৫৭-৫৮

ছবি কাঠখোদাই/ সোমনাথ হোড়; বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের আবেদন (বার্লিন বিশ্ব-কাউন্সিল সভায় গৃহীত); শেকস্‌পীয়র প্রসঙ্গে (প্র)/নীরেন্দ্রনাথ রায় ১-৩১; ছবি : দেবকুমার রায়চৌধুরী ৩১; নয়নপুরের মাটি ২ (উ)/সমরেশ বসু ৩২-৫২; নোনা লাইকাঁদি (গ)/সুজিৎকুমার চক্রবর্তী ৫৩-৬৫; শান্তির স্বপক্ষে/মনোজ বসু ৬৬; কবিতাগুচ্ছ শান্তি অমর (ক)/জগন্নাথ চক্রবর্তী ৬৭-৭০; হে তরঙ্গরাশি! সুপ্রভাত (অ. ক)/পারভেজ শহীদী (অনুবাদকের নাম নেই) ৭১-৭৫; বিচার (ক)/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬; রামমোহন (না)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৭৭-৮৭; প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ (প্র)/হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৮-৯৫; শাহানসার ন্যায় (অ. গ)/যশ্‌পাল অনুবাদ : ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য ৯৬-৯৯; শিল্প সাহিত্যের সমস্যা : চীনের পথ (প্র)/চিন্মোহন সেহানবীশ ১০০-১১৫; কান্না আর কান্না (গ)/জ্যোতি দাশগুপ্ত ১১৬-১১৯; আজকের ইওরোপের সংস্কৃতি (প্র)/নরেন্দ্র দেব ১২০-১৩০; আঁদ্রে জিদ্‌ (অ প্র)/সরোজ আচার্য ১৩১-১৩৫; ছবি : বিজন চৌধুরী ১৩৫; বাংলা থিয়েটার (প্র)/শম্ভু মিত্র ১৩৬-১৪৩; ভালবাসা (অ.গ.)/ইহাও চিং অনুবাদ : সুনীল চট্টোপাধ্যায় ১৪৪-১৫০; বুদ্ধদেব বসুর প্রতি (আ)/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৫১-১৫৪; গান : সেতু বাঁধার গান/কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী ১৫৫-১৫৯; ছবি : সোমনাথ হোড়; পাঠকদের প্রতি/সম্পাদকমণ্ডলী ১৬০।

২

২০ : ২ : ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮

ছবি : ফটো/সুনীল জানা; মস্কো থেকে চীন (ভ্র)/গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১-৬; মুক্তি আর শান্তির জন্য (অ. ক)/জিয়ানিস্‌ রিটসোস্‌ অনুবাদ : অমিতা দেবী ৭; নয়নপুরের মাটি ৪ (উ)/সমরেশ বসু ৮-১৪; কবিতাগুচ্ছ : তুমি আমার বাংলা (ক)/মৃগাঙ্ক রায় ১৫-১৭; এমনি এখানে (ক)/মণীন্দ্র রায় ১৮-২০; হায়রে ভালবাসা (ক)/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ২০-২১; মুজফ্‌ফর আহমদের প্রতি (ক)/অশোক ভট্টাচার্য ২২-২৩; ইমারত (গ)/নীহার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪-৩৩; ছবি : একটি চীনা লিথোগ্রাফ : বিশ্বশান্তি আবেদনে সই দিতে গ্রাম ভেঙে এসেছে ছেলেবুড়োর দল ৩৩; মার্কিন কার্নিভাল (অপ্র)/অমৃত রায় ৩৪-৩৬; রামমোহন (না)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৭-৪৫; শান্তির স্বপক্ষে : পশ্চিমবাংলা শান্তি-সম্মেলন (প্রতি)/রবীন্দ্র মজুমদার ৪৬-৫১; সারা ভারত শান্তি কনভেনশন (আ)/হরিদাস নন্দী ৫১-৫৪; আর না কান্না (গ)/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৫-৬০; পুস্তক পরিচয় : *নীল চোখ* : মিহির আচার্য; *ছোট বড় মাঝারি* : স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য; *আজকাল পরশুর গল্প* : মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়/কৃষ্ণ চক্রবর্তী ৬১-৬৫; ছবি : একটি চীনা লিথোগ্রাফ ৬৬; সংস্কৃতি সংবাদ : রবীন্দ্র-সুকান্ত-নজরুল/জগন্নাথ চক্রবর্তী ৬৬-৭০; বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (আ)/হিরণকুমার সান্যাল ৭০-৭২; চীনা শিল্প-

প্রদর্শনী/রবীন্দ্র মজুমদার ৭২-৭৫; ছবি : রঙীন হাতির দাঁতের নারীমূর্তি (পিকিং) ৭৩; সিল্কের সুতোয় বোনা শ্যচিত্র (হুনান) ৭৪; বঙ্গীয় শেক্‌স্‌পীয়র পরিষদ/প্রশান্তকুমার বসু ৭৫-৭৬; বিয়োগপঞ্জী : হীরাচাঁদ দুগার : সেবা মিত্র/রবীন্দ্র মজুমদার ৭৬-৭৮; চলচ্চিত্র শঙ্খবাণী (সমা)/মৃণাল সেন ৭৯-৮৩; চীনা ফিলম্ "চাঅ ই-ম্যান" (সমা)/অনিলকুমার সিংহ ৮৪-৮৫; পাঠকগোষ্ঠী : "প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রারম্ভ" সম্পর্কে/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৬-৮৮; ওই/হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৮৮-৮৯; ওই/গোপাল হালদার ৮৯-৯০; পাঠকদের প্রতি/পরিচালকমণ্ডলী ৯০।

৩

২০ : ২ : ৬ আষাঢ় ১৩৫৮

ছবি : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়; স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁ (প্র)/এল. আই. ইউয়েরোভিচ ১-৫; মস্কো থেকে চীন (ভ্র)/গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৬-১১; কবিতাগুচ্ছ : সেই তো তোমাকেই (ক)/বিষ্ণু দে ১২; মোতির ফুল (ক)/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩-১৪; মিছিল (ক)/প্রণতি ঘোষ ১৪-১৫; চেনা (ক)/সুবীর ঘোষ ১৬; নয়নপুরের মাটি ৫ (উ)/সমরেশ বসু ১৭-৩১; রুশ-ভারত সাংস্কৃতিক সেতু (অপ্র)/সুরেশচন্দ্র সেন অনুবাদ : মণীষা সেন ৩২-৪০; নবজাতক (গ)/কাশী নাগ ৪১-৫০; রামমোহন (না)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫১-৫৬; পুস্তক পরিচয় : *ছাড়পত্র* : সুকান্ত ভট্টাচার্য; *ঘুম নেই* : সুকান্ত ভট্টাচার্য; *পূর্বাভাস* : সুকান্ত ভট্টাচার্য; *বিদীর্ণ* : গোলাম কুদ্দুস; *তোমাকে* : রাম বসু; *ফুটপাতের ফুলের গন্ধ* : অসীম রায়; *একটাই যখন জীবন* : রোহীন্দ্র চক্রবর্তী; *সমকালীন বাংলা কবিতা* : সুহৃদ রুদ্র স.; *পাঞ্চালী* : সুশীল রায়; *তালেব মাস্টার* : আশরাফ সিদ্দিকী/সরোজ আচার্য ৫১-৬৩; *চরকাশেম*; *দক্ষিণের বিল*/ অমরেন্দ্র ঘোষ; *ত্রিস্রোতা* : সাবিত্রী রায়/পিনাকী ঘোষ ৬৩-৬৭; সংস্কৃতি সংবাদ : মাধ্যমিক শিক্ষা-বোর্ড ও শিক্ষা-সংস্কার (আ) সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬৮-৬৯; ভারত সরকারের ছাড়পত্র-নীতি (আ)/মনোরঞ্জন বড়াল ৭০-৭১; পশ্চিমবঙ্গ অধ্যাপক সম্মেলন/শিবপ্রসাদ সেন ৭১-৭৪; বিয়োগপঞ্জী : পাভ্‌লেনকো/সত্যজিৎ দাশ ৭৪-৭৬; চলচ্চিত্র : সোবিয়েৎ সিনেমা : পরদেশী দুলহন (সমা)/মৃণাল সেন ৭৭-৮০; পাঠকগোষ্ঠী : গদ্য কবিতা কেন? (প)/পূর্ণেন্দু বাগচী ৮১; শরৎচন্দ্র ও বিদ্যাসাগর (প)/পদ্মলোচন বসু ৮২; প্রগতি সংগীত প্রসঙ্গে (প)/ গৌর দাস ৮২-৮৩; প্রগতি-সাহিত্য কোন পথে?/আবদুল হামিদ ৮৩-৮৫; কারখানার গান (গা)/কথা ও সুর পরেশ ধর ৮৬-৮৮।

৪

২১ : ১ : ১ শ্রাবণ ১৩৫৮

পরিচয়-এর কুড়ি বছর (প্র)/হিরণকুমার সান্যাল ১-৬; "সারা সংসার হামারা হৈ" (প্র)/হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৭-১১; কথা কও (অক)/ফয়েজ আহ্‌মদ ফয়েজ্ অনুবাদ :

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১২; অগ্নি-বুদ্বুদ (ক)/বিমলচন্দ্র ঘোষ ১৩; কে বলে হায় তোর (ক)/পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী ১৩-১৪; তক্ষক (ক)/রঘুনাথ ঘোষ ১৫-১৬; এই পথ (ক)/সুশীলকুমার গুপ্ত ১৬-১৭; ধ্রুবপদ (গ)/সুবীরচন্দ্র রায় ১৮-৩৩; নয়নপুরের মাটি (৭) (উ)/সমরেশ বসু ৩৪-৪২; স্যার সৈয়দ আহ্‌মেদ খাঁ (অপ্র)/এল. আই. ইয়েরোভিচ ৪৩-৪৮; আশা (অ.গ)/অজ্ঞাতনামা অনুবাদ : শান্তা বসু ৪৯-৫৮; রামমোহন (না)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৯-৭০; শান্তির স্বপক্ষে (আ)/প্রভাবতী দেবী সরস্বতী ৭১-৭৪; 'চলো, বার্লিন চলো' (আ)/গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৪-৭৮; পুস্তক পরিচয় : বাংলা উপন্যাসে চাষীচরিত্র/*লখীন্দর দিগার*/গুণময় মান্না/অমল দাশগুপ্ত ৭৯-৮৫; বিদেশী কবিতার অনুবাদ/*মায়াকভস্কি* (কবিতা) : অনুবাদ : সতীন্দ্রনাথ মৈত্র; *গরাদভাঙা সংগ্রামী সব জাগো* : পাবলো নেরুদা অনুবাদ : শান্তা বসু/অবন্তী সান্যাল ৮৫-৮৭; সংস্কৃতি সংবাদ : বই কেনার দণ্ড; নীতিরক্ষক আরক্ষ/রবীন্দ্র মজুমদার ৮৮-৯১; পাঠকগোষ্ঠী : 'পরদেশী দুল্‌হন'-এর সমালোচনা/মনোরঞ্জন বড়াল ৯২-৯৩; লেখকের জবাব/মৃণাল সেন ৯৪; লক্ষ যোজন দূরে জন্মভূমি (গা)/(স্বরলিপি সহ)/কথা : অমরেন্দ্র মুখোপাধ্যায় সুর : সুরপতী নন্দী ৯৫-৯৭; পাকিস্তানের বন্দী সাহিত্যিকদের মুক্তির দাবিতে/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ইত্যাদি ৯৮।

৫

২১ : ১ : ২ ভাদ্র ১৩৫৮

অতিকথার কথা (প্র)/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১-১০; নয়নপুরের মাটি ৮ (উ)/সমরেশ বসু ১১-১৮; কবিতাগুচ্ছ : ভারতবর্ষ (ক)/শেখ গোমানি দেওয়ান ১৯-২১; না, আমরা মরব না (ক)/রাম বসু ২২-২৫; জীবনায়ন (গ)/সুলেখা সান্যাল ২৭-৩৫; রামমোহন (না)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৩৬-৪২; শান্তির স্বপক্ষে : যৌবনের উৎসব (প্রতি)/প্রদ্যোৎ গুহ ৪৩-৪৭; পুস্তক পরিচয় : বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান আলোচনা/*প্রাণতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব* : অধ্যাপক সন্তোষকুমার সামন্ত; *ফ্রয়েড ও বর্তমান চিন্তাধারা* : সত্যনারায়ণ লাহিড়ী/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৪৮-৫১; চলচ্চিত্র : বাংলা ফিল্‌ম '৪২ (সমা)/অমল দাশগুপ্ত ৫২-৫৩; সংস্কৃতি সংবাদ : 'প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের' কয়েকটি অনুষ্ঠান; বিদেশে বাংলার সংস্কৃতি দূত; পল্লীকবি নিবারণ পণ্ডিত (প্রতি)/চিন্মোহন সেহানবীশ ৫৪-৫৭। পাঠকগোষ্ঠী : রামমোহন ও বিদ্যাসাগর/ললিত হাজরা ৫৮; পদ্য-কবিতা আর গদ্য-কবিতা/ইন্দ্রসোম বর্মা ৫৯-৬১; গদ্যকবিতা কেন/বিমল দাশগুপ্ত ৬১-৬২; কেন গদ্যকবিতা/পীযূষকান্তি সোম ৬২-৬৩।

৬

২১ : ১ : ৩ আশ্বিন ১৩৫৮

চিত্র : ফটো : ক্ষীরোদ রায়; স্কেচ : অজয় চট্টোপাধ্যায়; সারা ভারত শান্তি-সংস্কৃতি সম্মেলন

(আ)/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, মনোজ বসু, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুকৃতি সেন, প্রবোধকুমার সান্যাল, রমেশচন্দ্র সেন ১-২; বুর্জোয়া জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় (প্র)/ই. ভি. পায়েভ্স্কায়া ৩-১৮; সমাচার-দর্পণ (ক) (খাদ্যচুক্তি; কাশ্মিরী কেল্লা; জাতীয় শিল্পোন্নয়ন; অন্ন-সমস্যা; পরীক্ষামেধ যজ্ঞ; ইউ. এল. ও; ফুরারে নবজন্ম; মার্কিনী ঘাঁটি)/ বিমলচন্দ্র ঘোষ ছবি : দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ১৯-২২; সতী (গ)/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩-২৭; সোভিয়েট লেখকদের মধ্যে (প্র)/সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ২৮-৩২; কবিতাগুচ্ছ : শিকারী পাখীর গান (অক)/মাক্সিম গর্কী অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ রায় ৩৩-৩৬; জননী জন্মভূমিশ্চ (ক)/সিদ্ধেশ্বর সেন ৩৭-৪৩; সীমান্ত-প্রহরী (ক)/হেমাঙ্গ বিশ্বাস ৪৩-৪৮; দুঃসহ ভাষা (ক)/মণীন্দ্র রায় ৪৯; মধ্যবিত্তের সঙ্কট (প্র)/বিনয় ঘোষ ৫০-৬৯; জননেতা (না)/বিজন ভট্টাচার্য ৭০-৯৫; ছবি : কাঠ খোদাই/সোমনাথ হোড় ৯৬; রাধাকৃষ্ণের দর্শন (প্র)/সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৯৭-১০৯; জুলিয়াস ফুচিকের অপ্রকাশিত চিঠি (অ)/(নাম নেই) ১১০-১১৭; খুঁজে পাওয়া (গ)/রমেশচন্দ্র সেন ১১৮-১২৫; বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার-কাল (প্র)/গোপাল হালদার ১২৬-১৩৬; আগন্তুক (গ)/ননী ভৌমিক ১৩৭-১৫৮; কবিতাগুচ্ছ : কালরাত্রি (ক)/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৯-১৬০; আমরা নতুন যৌবনের দূত (অক)/পরভেজ শহীদী অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৬০ ১৬২; ইচ্ছামতী (ক)/জগন্নাথ চক্রবর্তী ১৬৩-১৬৫; মওকা (ক)/শুদ্ধসত্ব বসু ১৬৬।

৭

২১ : ১ : ৪ কার্তিক ১৩৫৮

ছবি : ফার্নেস/দেবব্রত মুখোপাধ্যায়; পরিচয়-এর কুড়ি বছর ২ (প্র)/হিরণকুমার সান্যাল ১-৭; কবিতাগুচ্ছ : সমুদ্র (ক)/বিমলচন্দ্র ঘোষ ৮-১০; জনমদুখিনী মা (ক)/বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ১১-১২; হারমোনি (ক)/সত্যব্রত ঘোষ ১২; ধানক্ষেতের গান (ক)/নন্দদুলাল সরকার ১২-১৪; তুমি আমি (ক)/আবুল কাশেম রহিম উদ্‌দীন ১৪-১৬; নয়নপুরের মাটি ৯ (উ)/সমরেশ বসু ১৭-৩১; পল রোবসনের গান (প্র)/পরেশ ধর ৩২-৩৯; উলুখড়ের রূপকথা (গ)/সলিল চৌধুরী ৪০-৪৭; ফ্রয়েড-প্রসঙ্গে (প্র)/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৪৮-৬৫; রামমোহন (না)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৬৬-৭৩; পুস্তক পরিচয় : *মিঠেকড়া* : সুকান্ত ভট্টাচার্য (সমা)/জগন্নাথ চক্রবর্তী ৭৪-৭৭; সংস্কৃতি সংবাদ : চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল; বার্নার্ড শ' ও বিভূতিভূষণ স্মরণে; ছবি : সোভিয়েট শিল্পী এম. গেলসরার্গ অঙ্কিত/'শান্তিযেরা ঘরে ঘরে প্রাণের পরিবেশ'; ভারত-সন্ধানে মার্কিন সাংবাদিক; গ্রামোফোন রেকর্ডে শান্তির গান/রবীন্দ্র মজুমদার ৭৮-৯০।

৮

২১ : ১ : ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৫৮

ছবি : চতুর্থপক্ষ/কামরুল হাসান; প্রেমচাঁদ (১৮৮০-১৯৩৬) (প্র)/ভি. এম. বেসক্রভ্‌নি অনুবাদ : সুনীল চট্টোপাধ্যায় ১-১৪; পারবে না এদের সঙ্গে (না)/সতীনাথ ভাদুড়ী ১৫-৩১; নয়নপুরের মাটি ১২ (উ)/সমরেশ বসু ৩২-৩৫; কবিতাগুচ্ছ : কলকাতার বাঁড়ুজ্যে (অ.ক)/নাজিম হিকমত অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৩৬-৩৭; আমি দেখি (ক)/পূর্ণেন্দু পত্রী ৩৭; আটান্নর ছড়া (ক)/বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ৩৮; পরিচয়ের কুড়ি বছর (৩) (প্র)/হিরণকুমার সান্যাল ৩৯-৪৬; অমনোনীত (গ)/সমরেশ বসু ৪৭-৫৮; রামমোহন (গ)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৯-৬৩; কার্ল মার্কস (অপ্র)/নীরেন্দ্রনাথ রায় ৬৪-৬৬; পুস্তক পরিচয় : *জীববিজ্ঞানে বিপ্লব* : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/দেবকুমার বসু ৬৭-৭১; *চার পা থেকে দু'পা* : বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়/পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭১-৭২; শিখাধারা : অধ্যাপক প্রভাতকুমার দত্ত/দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ৭২-৭৫; *লাল চিঠি* : বিশ্ব বিশ্বাস; *তেরো-চোদ্দর কবিতা* : জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়; *বিদূপ ও বহ্নি* : রঘুনাথ ঘোষ/জগন্নাথ চক্রবর্তী ৭৫-৭৬; *বাঙলা বর্ষলিপি* : ১৩৫৮/র.ম. [রবীন্দ্র মজুমদার] ৭৬; সংস্কৃতি সংবাদ : তুন্‌হুয়াঙ্‌-এর ছবি; বিয়োগপঞ্জী : প্রমথেশ বড়ুয়া; নাট্য আন্দোলনের মুখপত্র (আ)/রবীন্দ্র মজুমদার ৭৭-৮৬; শান্তির স্বপক্ষে : বিশ্ব-শান্তি-সংসদের আবেদন/পশ্চিমবঙ্গ শান্তি-সংসদ কর্তৃক প্রচারিত ৮৮-৯০।

৯

২১ : ১ : ৬ পৌষ ১৩৫৮

ছবি : বুদ্ধ ও সুজাতা; অভিসার/অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১-২; আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (প্র)/অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৩-১১; পরিচয়-এর কুড়ি বছর ৪ (প্র)/হিরণকুমার সান্যাল ১২-১৬; আসন্ন সম্ভবা (অ.গ)/নব্‌তেজ অনুবাদ : ব্রজেন্দ্র ভট্টাচার্য ছবি : দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ১৭-২২; কবিতাগুচ্ছ : সিবীর-এর উদ্দেশে (অ.ক)/পুশকিন অনুবাদ নীরেন্দ্রনাথ রায় ২৩-২৪; আর যেন না দেখি (ক)/শামসুর রাহমান ২৪-২৫; জানুয়ারি, '৫২ (ক) (পাঁচ-শালা; মা, তুমি কাঁদো; বাঁয়ে চলো, বাঁয়ে)/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২৬-২৮; যমুনাবতী (ক)/শঙ্খ ঘোষ ২৯-৩০; জীবন-নৃত্য (ক)/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩১-৩২; নয়নপুরের মাটি ১৩ (উ)/সমরেশ বসু ৩৩-৩৯; ছবি : সাইবেরিয়ায় নির্বাচিত লেলিন/এ. ইয়েরেমিন ৪০; মার্কসবাদ ও মর্গানবাদ (প্র)/বিনয় ঘোষ ৪১-৫৮; পারবে না এদের সঙ্গে (না)/সতীনাথ ভাদুড়ী ৫৯-৭৩; ফ্রয়েড-প্রসঙ্গে (প্র)/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৭৪-৯৪; যাদু (গ)/অরুণ চৌধুরী ৯৫-১০৫; রামমোহন (না)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ১০৬-১১৭; পাঠকদের প্রতি (সম্পা)/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১১৮-১১৯।

১০

২১ : ২ : ১ মাঘ ১৩৫৮

পাঠকদের প্রতি/সম্পাদক; মার্কসবাদী বঙ্কিম-বিচার (প্র)/নীরেন্দ্রনাথ রায় ১-২৭; প্রেম (ক)/বিমলচন্দ্র ঘোষ ২৮-৩২; নয়নপুরের মাটি ১৪ (উ)/সমরেশ বসু ৩৩-৪১; জ্ঞান ও ব্যবহার (প্র)/নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ৪২-৪৭; রামমোহন (না)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৪৮-৫৮; পরিচয়-এর কুড়ি বছর (প্র)/হিরণকুমার সান্যাল ৫৯-৬৭; তার (গ)/সোমনাথ গুপ্ত ৬৮-৭৪; পুস্তক-পরিচয় : *Land in Bloom* : V. Safomov/পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫-৮১; চড়াই উৎরাই : নরেন্দ্রনাথ মিত্র/সুধীরচন্দ্র রায় ৮১-৮৪; মেঘবৃষ্টিঝড় : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়/জগন্নাথ চক্রবর্তী ৮৪-৮৮; ভাববাদ খণ্ডন/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ৮৮-৯০; সংস্কৃতি সংবাদ : আসন্ন শান্তি-সংস্কৃতি সম্মেলন; 'রংরুট'-এর বিদেশী তর্জমা; পূর্ববাংলার ভাষার প্রাণ/গোপাল হালদার ৯১-৯৩; পৃথ্বীরাজের নাটাবিজয়;/হেমাঙ্গ বিশ্বাস ৯৪-৯৭; শিক্ষাবোর্ড বনাম পুস্তক-প্রকাশক/সুব্রত দে ৯৭-৯৮; ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলে ধর্মঘট/বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ৯৮-১০০; 'ইউনিটি', জানুয়ারি ১৯৫২/ননী ভৌমিক ১০০; পাঠকগোষ্ঠী : দ্বান্দ্বিক ভাষা-সম্মেলন/গোপাল হালদার ১০১-১০৩।

১১

২১ : ২ : ২ ফাল্গুন ১৩৫৮

বুদ্ধিজীবী ও বিশ্বশান্তি : আরাগঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকার (সা)/রামকুমার অনুবাদ : অধীর ভট্টাচার্য ৩-৯; আমার ভারতীয় বন্ধুদের উদ্দেশে/নিকোলাই চের্কাসদ ১০-১২; কবিতাগুচ্ছ : অন্ত্যেষ্টি (ক)/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩-১৫; গুনি যুদ্ধের বীভৎস সংবাদ (অ.ক)/নেক্রামভ অনুবাদ : অমিয়কুমার চক্রবর্তী ১৫-১৬; দুটি কবিতা : কি যেন একটা কথা; সেই কথা (ক)/পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী ১৬-১৭; বন্দীশিবির থেকে লেখা (ক)/প্রশান্ত বসু ১৭১৮; ফ্রয়েড প্রসঙ্গ (প্র)/দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯-২৭; অভাবিত (গ)/বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর ২৮-৩৪; পরিচয়-এর কুড়ি বছর (প্র) হিরণকুমার সান্যাল ৩৫-৪৪; উনিশ শতকে ভারত থেকে কুলি রপ্তানি (প্র)/সুনীলকুমার সেন ৪৫-৪৮; লাইসেনকোবাদ (প্র)/জে. ডি. বার্নাল ৪৯-৫৬; পুস্তক পরিচয় : উত্তরঙ্গ : সমরেশ বসু/চিন্মোহন সেহানবীশ ৫৭-৫৯; সংস্কৃতি সংবাদ : চলচ্চিত্র উৎসবের কলকাতা/সুব্রত দে ৬০-৬১; হাংগেরীর চলচ্চিত্র-শিল্প/চিত্ত বিশ্বাস ৬১-৬৫; লেখকের ইস্কুল/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৬৫-৬৭; শান্তি-সংস্কৃতি আন্দোলনের সেরা সৈনিক/সত্যজিৎ দাশ ৬৭-৭০; পাঠকগোষ্ঠী : 'পরিচয়-এর কুড়ি বছর' প্রসঙ্গে/ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৭১-৭৩; শিক্ষা বোর্ড বনাম পুস্তক প্রকাশক/জি. সি. দাস ৭৪-৭৫; সম্পাদকীয় : বীরপ্রসবিনী বাংলা ভাষা/(নাম নেই) ৭৬-৭৮; ভারতের বন্ধুদের কাছে হাওয়ার্ড ফাস্ট-এর চিঠি/হাওয়ার্ড ফাস্ট ৭৯।

১২

২১ : ২ : ৩ চৈত্র ১৩৫৮

ভারতের শান্তি-সংগ্রামের ঐতিহ্য (প্র)/বিনয় ঘোষ ১-১১; কবিতাগুচ্ছ : প্রশ্ন (অ.ক)/নাজিম হিকমত অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১২; জীবনের গান (ক)/প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৩; শান্তির জোয়ার (ক)/মণীন্দ্র রায় ১৪-১৫; মালতীকে (ক)/সুশীলকুমার গুপ্ত ১৫; আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রেরণা (প্র)/গোপাল হালদার ১৭-২৯; 'মার্কসবাদী বঙ্কিম-বিচার' প্রসঙ্গে (আ)/অরবিন্দ পোদ্দার ৩০-৩৩; নীরেন্দ্রনাথ রায়ের প্রত্যুত্তর (আ)/নীরেন্দ্রনাথ রায় ৩৩-৩৬; আধুনিক চীনা সংস্কৃতি-আন্দোলনের দিগ্‌দর্শন/নির্মল ঘোষ ৩৭-৪৩; তুমি কোন যুদ্ধ শুরু করনি (ক)/সিদ্ধেশ্বর সেন ৪৪-৪৮; অসম্ভবের সাধনা (গ)/ননী ভৌমিক ৪৯-৬১; সমর লিপ্সুদের দর্শন (প্র)/সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ৬২-৬৯; কলকাতায় চলচ্চিত্র উৎসব (আ)/ঋত্বিককুমার ঘটক ৭০-৭৩; সোভিয়েট ছবি গ্র্যান্ড কনসার্ট (আ)/ঋত্বিককুমার ঘটক ৭৩-৭৫; 'বাইসাইক্‌ল থিপ' (আ)/ঋত্বিককুমার ঘটক ৭৫-৭৯; ওপন সিটি--রোম (আ)/মৃণাল সেন ৭৯-৮৩; বাঙালী, বাঙলার ইতিহাস ও বাঙলা সাহিত্য (অ)/রুশ থেকে ইংরাজী : সুরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ইংরেজী থেকে বাংলা : সুব্রত ঘোষ ও সুনীল লাহিড়ী ৮৪-৯১; এবারের পঁচিশে বৈশাখ জাতীয় শান্তি দিবস ৯২; নববর্ষের সম্ভাষণ/সম্পাদক মণ্ডলী ৯৩।

১৩

২১ : ২ : ৪ নববর্ষ সংখ্যা বৈশাখ ১৩৫৯

ছবি : পিকাসো; গোপাল ঘোষ; সূর্য রায়; হিরণকুমার সান্যাল (প্রতিটি পূর্ণ পৃষ্ঠা); শান্তি-সংস্কৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ (প্র)/গোপাল হালদার ১-১০; এ জ্বালা কখন জুড়োবে (ক)/অরুণ মিত্র ১১-১২; কবিকণ্ঠ (ক)/অজিত দত্ত ১২-১৩; প্রত্যক্ষ (অ.ক)/ইক্‌বাল অনুবাদ : নেয়ামাল বাসির ১৪; অগ্নি (ক)/মৃগাঙ্ক রায় ১৫-১৬; ঘরে-বাইরে (ক)/শঙ্খ ঘোষ ১৬-১৮; পারবে না (ক)/মুর্তজা বশীর ১৮-১৯; শালের মঞ্জীর (ক)/রাম বসু ১৯-২১; ছবি তাজমহল/ভি ভেরেশ্চাগিন ২২; পরিচয়-এর কুড়ি বছর (প্র)/হিরণকুমার সান্যাল ২৩-৩২; নূতন চীনের সংস্কৃতি (প্র)/নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য ৩৩-৪১; 'কল্লোল' যুগ ও অচিন্ত্যকুমার (প্র)/অচ্যুত গোস্বামী ৪২-৪৭; ভারতের জাতি-সমস্যা ও ভাষাতত্ত্বে মার্কসবাদ (প্র)/সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ৪৮-৫৫; শিক্ষা-প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণের উপন্যাস (প্র)/সুধীরচন্দ্র রায় ৫৬-৭০; মৃত্যু-প্রসঙ্গে সুকান্ত (প্র)/অরুণাচল বসু ৭১-৭৫; রাজধানীর কাহিনী (প্র)/অনামী ৭৬-৮২; হীরা (অ.গ)/ আন্নাভাও সাঠে অনুবাদ : সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩-৯৭; বৃষ্টির গান (স্বরলিপি সহ) : আয় বৃষ্টি ঝেঁপে/সলিল চৌধুরী ৯৮-১০১; সোভিয়েট চারুকলা প্রদর্শনী/অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়; যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়; অতুল বসু, প্রভাতকুমার দত্ত ১০২-১১৬; ভ্রম-শুদ্ধি/গোপাল হালদার ১১৬; এসো শান্তির জন্য (প্রতি)/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় চিত্র : দেবব্রত মুখোপাধ্যায় ১১৭-১৩১।

১৪

২১ : ২ : ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯

সম্পাদকের নিবেদন (নাম নেই); রাশিয়ান চিত্রকলা সম্বন্ধে (প্র)/ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১-৫; নজরুল (প্র)/পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ৬-১২; কবিতাগুচ্ছ : অপরাজিতা (ক)/সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩-১৫; আমার মা (ক)/সুশীলকুমার গুপ্ত ১৫-১৬; শপথ (ক)/শুদ্ধসত্ত্ব বসু ১৬; রাজধানীর কাহিনী/অনামী ১৭-২০; 'কল্লোল' যুগ ও অচিন্ত্যকুমার (প্র)/অচ্যুত গোস্বামী ২১-৩১; কামরু আর জোহরা (গ)/সোমনাথ লাহিড়ী ৩২-৫০; বাঙলায় শেকসপীয়র (প্র)/গোপাল হালদার ৫১-৬২; পুস্তক পরিচয় : *Autobiography of An Unknown Indian* : Nirod Ch. Choudhuri/সুশোভন সরকার ৬৩-৭০; *যে গল্পের শেষ নেই* : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়/শান্তিময় রায় ৭০-৭৬; *একটি রং করা মুখ* : শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়; *কনে দেখা আলো* : মনোতোষ সরকার/ননী ভৌমিক ৭৬-৭৭; *Guarantee of Peace* : Vadin Sobks/সত্যজিৎ দাশ ৭৮-৮০; *Problems of Economics March 1952*/সিতাংশু ভট্টাচার্য ৮০-৮৩; সংস্কৃতি সংবাদ : রেবতী বর্মণ : সংস্কৃতি কর্মীর জীবনস্মৃতি/ধরণী গোস্বামী ৮৪-৮৬; নিরপেক্ষ সংস্কৃতি-রক্ষক!/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ৮৬-৮৭।

১৫

২১ : ২ : ৬ আষাঢ় ১৩৫৯

ছবি : লিওনার্দো দা ভিঞ্চি : নিজের আঁকা প্রতিকৃতি/(উপরে) মাদানো চেনোয়া; (নিচে) মাদোনা লিতা/মোনা লিসা/'ম্যাডোনা অফ দি বয়স' চিত্রের একাংশ; লিওনার্দো দা ভিঞ্চি স্মরণে (প্র)/রবীন্দ্র মজুমদার ১-৮; কবিতাগুচ্ছ : তোমার জন্য (ক)/নৃপেন্দ্র সান্যাল ৯ কথা (ক)/অমিতকুমার ভট্টাচার্য ১০-১১; উত্তরের জন্য (ক)/বিতোষ আচার্য ১১-১২; প্রগতি সাহিত্যে নায়ক চরিত্রের ভূমিকা (প্র)/সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ১৩-১৯; কাজ নেই (গ)/সমরেশ বসু ২০-৩৪; পরিচয়-এর কুড়ি বছর (প্র)/হিরণকুমার সান্যাল ৩৫-৪১; সিংভূমের অভ্রখনি (প্র)/অমিত রায় ৪১-৫১; পুস্তক পরিচয় : *ধ্বন্যালোক ও লোচন* : আনন্দ বর্ধন ও অভিনব গুপ্ত (মূল ও সটীক অনুবাদের লেখক শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য); *বলাকা—কাব্যপ্রবাহ* : শ্রীক্ষিতিমোহন সেন; *কবিগুরু* : শ্রীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়; *সাহিত্য-প্রবাহ* : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়; *শিলালিপি* : ডা. শশিভূষণ দাশগুপ্ত; *লাল মাটি* : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়/গোপাল হালদার ৫২-৬০; *যুগের আলো* (মার্কসবাদের গোড়ার কথা) : অনল রায়/নিখিল চক্রবর্তী ৬১-৬৩; *কবি-কথা* : শ্রীসুধীরচন্দ্র কর; *শান্তিনিকেতন আশ্রম* : শ্রীঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়; *The Popular Aspect of Soviet Art* : A. I. Zamoshkin/রবীন্দ্র মজুমদার ৬৩-৬৬; শান্তির স্বপক্ষে : এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের শান্তি-সম্মেলন (প্রতি)/হরিদাস নন্দী ৬৭-৬৯।

১৬

২২ : ১ : ১ শ্রাবণ ১৩৫৯

মহাজনী সভ্যতা (অ.প্র)/প্রেমচন্দ্ অনুবাদ : অনু সেন ১-৯; কবিতাগুচ্ছ : মানুষ যে বাঁচে বারবার (ক)/পূর্ণেন্দুশেখর পত্রী ১০-১১; সেতু (ক)/প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ১১-১২; কথা বলা (ক)/তরুণ সান্যাল ১২; পাভলভীয় প্রত্যয় ও চিকিৎসাবিদ্যা (প্র)/ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১২-২১; নোঙর (গ)/বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ২২-২৮; দেখা (গ)/আবদুল হামিদ ২৯-৩৩; রামমোহন রায় ও তাঁর ধর্মমত (আ)/জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ৩৪-৫০; শান্তির স্বপক্ষে : জলন্ধরে সারা-ভারত শান্তিসম্মেলন (প্রতি)/হরিদাস নন্দী ৫১-৫৩; পুস্তক পরিচয় : *অন্যপথ* : মণীন্দ্র রায়/গোপাল হালদার ৫৪-৫৭; *Selected Poems—Nazim Hikmat; নাজিম হিকমতের কবিতা* : অনুবাদক সুভাষ মুখোপাধ্যায়/মৃগাঙ্ক রায় ৫৭-৬১; *সংক্রান্তি* : মিহির আচার্য; *না* : সত্য গুপ্ত/ননী ভৌমিক ৬২-৬৫; *বিপ্লবের ডাক* : সুশীল জানা/নরহরি কবিরাজ ৬৫; সংস্কৃতি সংবাদ : 'বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ'; বিয়োগপঞ্জী : বসিদো জাহান; চেকোশ্লোভাকিয়ায় বাংলা সাহিত্যের সমাদর/রবীন্দ্র মজুমদার ৬৬-৬৯।

১৭

২২ : ১ : ২-৩ ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৯

ছবি : কোরিয়া শিল্পী : এন ঝুকফ্; আন্তর্জাতিক শান্তি-সংগীত/অনুবাদ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়; এশিয়ার শান্তি-মহাসম্মেলন ৭১-৭২; ভারত-চীন—দক্ষিণপূর্ব এশিয়া : সাংস্কৃতিক বিনিময় ও বাণিজ্যধারা (প্র)/সুনীল সেন ৭৩-৮৩; মধ্যযুগ ও ভারতীয় বাণিজ্য (প্র)/বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ৮৪-৮৭; সংস্কৃতি ও মার্কিনী রাহু (প্র)/চিন্মোহন সেহানবীশ ৮৮-১০২; জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে শিল্প : চীনের কাঠখোদাই (ছবি : ওয়াং শি; শান ইন-চিআও; হান শাওই; কু ইউআন; ইয়েন হান; হুয়াঙ উঙ্-সান) (প্র)/১০৩-১১৮; বিদেশী কবিতা : সীদিয়ান (অ.ক)/আলেক্জান্দ্র ব্লক অনুবাদ : নীরেন্দ্রনাথ রায় ১১৮-১২২; প্রবেশদ্বার (অ.ক)/ই. এম. তুর্গেনিভ অনুবাদ : অমিয়কুমার চক্রবর্তী ১২৩-১২৪; ছবি : কয়লা নেওয়া/লাঙ্ ইউঙ্-তাই ১২৫; শিল্পী (গ)/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৭-১৩৪; শেফালী (গ)/নরেন্দ্রনাথ মিত্র ১৩৫-১৪৭; সিঁদুরে মেঘ (গ)/সুলেখা সান্যাল ১৪৮-১৫৯; জানোয়ার (গ)/সুশীল জানা ১৬০-১৬৮; ছবি : গোপাল ঘোষ ১৬৯; ভোরের স্বপ্ন (ক)/মণীন্দ্র রায় ১৭১; রাতের পর দিন (ক)/অরুণ মিত্র ১৭১-১৭২; কালের রাখাল শিশু : ২১ ডিসেম্বর (ক)/বিষ্ণু দে ১৭২-১৭৪; রৌদ্র-পারাবত (ক)/বিমলচন্দ্র ঘোষ ১৭৪-১৭৮; স্বদেশ (ক)/জগন্নাথ চক্রবর্তী ১৭৮-১৮০; ভুলো না (ক)/রাম বসু ১৮০; শস্যের জন্য (ক)/মৃগাঙ্ক রায় ১৮১; সুন্দরবন (ক) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮১-১৮২; নদীর মতো (ক)/বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত ১৮২-১৮৩; পৃথিবীর জন্য (ক)/শঙ্খ ঘোষ ১৮৩-১৮৪; বান (ক)/অজিত দত্ত; কোন ভাষায় কথা বলবে (ক)/সিদ্ধেশ্বর সেন ১৮৪-১৮৫; সালেমনের মা (ক)/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৮৫-১৮৬;

আমার ভালবাসা (ক)/মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬-১৮৭; ছবি : গোপাল ঘোষ ১৮৮; জেড. কে ১৮৯; দীনবন্ধু মিত্র, বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও বাঙালী সমাজ (প্র)/বিনয় ঘোষ ১৯০-২০৫; ভারতীয় ভাষা-সমস্যায় মার্কসবাদের প্রয়োগ (প্র)/সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ২০৬-২১৪; মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড ও স্কুলবোর্ড (প্র)/সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ২১৫-২২৩।

১৮

২২ : ১ : ৪ কার্তিক ১৩৫৯

ছবি : ইস্পাত গলানোর ফার্নেস। ও আঙ্‌রুইন ফাঙ্; মা/সোমনাথ হোড়; এশিয়ার শান্তি-সম্মেলন (প্রতি)/নাম নেই ২২৫-২৩৩; পিকিঙ-এর চিঠি (প)/মনোজ বসু ২৩৪; ভিকতর হুগো (প্র)/অনুবাদ সত্যজিৎ দাশ ২৩৫-২৪৪; ছবি : ত্রোইকা/ডি. পেরফ ২৪৪; দেশান্তর (ক)/অমূল্যভূষণ পাল ২৪৫-২৪৬; পদক্ষেপ (ক)/নীরেন্দ্র গুপ্ত ২৪৭; অসমাপ্ত (ক)/কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ২৪৮; পরিচয়-এর কুড়ি বছর (প্র)/হিরণকুমার সান্যাল ২৪৯-২৫৫; পরামর্শ (অ.গ)/বোরিস পলেভয় অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত ২৫৬-২৬৩; বঙ্কিম-সাহিত্যের ইঙ্গিত (আ)/সুধীর চাকী ২৬৪-২৭৫; পুস্তক পরিচয় : *সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ* : রেবতী বর্মণ/শান্তিময় রায় ২৭৬-২৮০; *বিজ্ঞান-বিচিত্রা* : দেবীদাস মজুমদার ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় স./পিনাকীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮১-২৮৫; *The Road to Life* : A. S. Makarenko/সুধীরচন্দ্র রায় ২৮৫-২৮৮; সংস্কৃতি-সংবাদ : জলন্ধর শান্তি সম্মেলন (প্রতি)/দ্বিজেন্দ্র নন্দী ২৮৯-২৯১; গৌহাটি বাঙালী ছাত্র সম্মিলন : রজত জয়ন্তী অধিবেশন (প্রতি)/অসীম সোম ২৯১-২৯২; প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ; সোবিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ঊনবিংশ কংগ্রেস (প্রতি)/ননী ভৌমিক ২৯৩-২৯৬; বিয়োগপঞ্জী : মোহিতলাল মজুমদার ও ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়/গোপাল হালদার ২৯৬-২৯৮; ভারদবিদ্ বারান্ নিকফ্/মহাদেব প্রসাদ সাহা ২৯৮-৩০২; সম্পাদকীয় : পূর্বপাকিস্তানে 'পরিচয়' নিষিদ্ধ; পাক ভারত সাংস্কৃতিক বিনিময় ও মৈত্রী/নাম নেই ৩০২-৩০৪।

১৯

৩৭ : ১ আগস্ট [১৯]'৬৭/শ্রাবণ [১৩]'৭৪

নিজেই অবাক হয় (ক)/বিষ্ণু দে; ৩৭টি বর্ষা পেরিয়ে (স)/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২-৪; যুদ্ধ হোক, যুদ্ধ হোক (ক)/মণীশ ঘটক ৫; নিজের সঙ্গে আলাপ (প্র)/দেবেশ রায় ৬-৯; পরভেজ শাহীদীর কবিতা/উর্দু থেকে অনুবাদ : জ্যোতিভূষণ চাকী (অগ্নিরেখা/সাপের গর্ত/ব্যঙ্ক/পিয়াসী স্বপ্ন/কথার শহর) ১০-১৬; শিল্প বিরোধের একদিন ঘেরাও (প্র)/সুমুখ উপাধ্যায় ১৭-৩১; ফুলগুলি (ক)/তরুণ সান্যাল ৩২-৩৩; বিধুশেখর মন্ত্রী হলেন (গ)/সমর রায়চৌধুরী ৩৪-৩৭; খড়্গ (ক)/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩৮; কি হয় (ক)/বিপ্লব মল্লী ৩৯; পোকা (গ)/

আশুতোষ সরকার ৪০-৫১; ফুলঝুরি, তোমার নাম (ক)/শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৫২; চিঠি (ক)/রবীন সুর; ছিপে মাছ ধরা (র)/সত্য চক্রবর্তী [সুভাষ মুখোপাধ্যায়] ৫৪-৬১; পপলাবাবু (গ)/পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬২-৭২; ডোরাকাটার অভিসারে (অ.গ)/শের জঙ্গ অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭৩-৯৪; পরিকল্পনার সলিল সমাধি (প্র)/কল্যাণ দত্ত ৯৫-১০১; নিবেদন (ক)/সুধেন্দু মল্লিক ১০২; প্রতিধ্বনি (পত্রিকা প্রসঙ্গ)/প্রদ্যোৎ গুহ ১০৩-১০৭; নাট্য সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি (আ)/গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১০৮-১১১; পেশাদারির গড্ডালিকায় (সমা)/অশোক মুখোপাধ্যায় ১১১-১১৩; সংগীতের স্বীকৃতি (আ)/সুভাষ সেন ১১৪-১১৬; আশমান জমিন (সমা)/পরমভট্টারক লাহিড়ী ১১৭-১১৯; গণতান্ত্রিক জার্মানি থেকে (সমা) Kunwar Mohammad Ashraf : An Indian Scholar and Revolutionary, Ed by Horst Krugar/সুনীল সেন ১২০-১২১; পাঠকগোষ্ঠী (নাউ সম্পাদক প্রসঙ্গে)/অমল দাশগুপ্ত ১২৩; ওই/সুমন বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৪-১২৫; ওই ('পরিবর্জনে নয়, পরিগ্রহণে')/সুতপা ভট্টাচার্য ১২৫-১২৬; বানান : পরিচয়/স.প. ১২৭-১২৮।

২০

৩৭ : ২ সেপ্টেম্বর [১৯]৬৭/ভাদ্র [১৩]৭৪

মানুষ, বর্ষধারা, জীবন (সম্পা)/[সুভাষ মুখোপাধ্যায়] ১২৯-১৩১; একটি সাক্ষাৎকার অন্নদাশঙ্কর রায় (সা)/অপ্রতিম বসু [পার্থ বসু] ১৩২-১৩৩; কার জন্যে লেখা/পাঠকে লেখকে/কাব্যনাট্যে মেলবন্ধন/সাহিত্যপাঠ/লেখক ও ইডিওলজি/সাহিত্যিক ও নাগরিক/ভিয়েতনাম প্রসঙ্গে/উপন্যাস/১৩৪-১৪১; ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র (র)/অসীম রায় ১৪২-১৪৩; প্রজাপতির নির্বন্ধ (চা শ্রমিকের বিবাহ প্রথা বিষয়ক সমীক্ষা) (প্র)/দীনেশ রায় ১৪৫-১৫১; মানুষের একটাই রাস্তা (ক)/দিলীপ সেন ১৫২-১৫৩; ভারশূন্যতায় (গ)/অমিয়কুমার সরকার ১৫৪-১৬২; বিপ্লবী খোকার প্রতি (ক)/সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ১৬৩-১৬৪; পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টনের সমস্যা (প্র)/পতঞ্জলি রায় ১৬৫-১৭২; দুঃখজয়ের গান (ক)/সমীর চৌধুরী ১৭৩; চালচালানীর কড়চা (গ)/নীলকান্ত বসু ১৭৪-১৮০; দুটি কবিতা (ক)/অমিয় ধর ১৮১; যযাতি (উ)/দেবেশ রায় ১৮২-১৯০; আমার বুকের মধ্যে/বিনোদ বেরা ১৯১; ডোরাকাটার অভিসারে (অ.গ)/শের জঙ্গ অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯২-২১১; ছেলেটার জন্যে (ক)/প্রফুল্লকুমার দত্ত ২১২; কয়েকটি ওড়িয়া আধুনিক কবিতা (অ.ক)/কিরণময় রাহা (বর্গী : সচি রাউতরায়; হেমন্ত : ভানুজী রাও; অন্বেষণ : গুরুপ্রসাদ মহান্তি; লণ্ঠন : রমাকান্ত রথ; বাসের আয়নায় সূর্যাস্ত : সতীকান্ত মহাপাত্র ২১৩-২১৯; প্রতিধ্বনি (পত্রিকা প্রসঙ্গ)/প্রদ্যোৎ গুহ ২২০-২২২; "নো"; স্বপ্নমঙ্গল কথা (আ)/পরমভট্টারক লাহিড়ী ২২৩-২২৯; পুস্তক পরিচয় *The World Revolutionary Movement of the Working Class* (সমা)/ভবানী সেন ২৩০-২৩৪; *এখানে আমি* : পুষ্কর দাশগুপ্ত (সমা)/অমলেন্দু চক্রবর্তী ২৩৪-২৩৫; পাঠকগোষ্ঠী পত্রিকা পরিচালনায় সাধারণ নীতি/শিপ্রা সরকার ২৩৬-২৩৮;

'পরিবর্জনে নয়, পরিগ্রহণে'/অরুণ সেন ২৩৮-২৪১; বানান বিষয়ে/দেবেশ রায় ২৪১-২৪২; জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে/মন্দিরা ঘোষ ২৪২-২৪৩।

২১

৩৭ : ৩ অক্টোবর [১৯]৬৭/আশ্বিন [১৩]৭৪

ছবি : কাঠখোদাই/শম্ভু সাহা (১); মুখোশ/এম. পি. রাও (২); শিল্পী/অরূপ চৌধুরী (৩); লিনোকাট/শ্যামল দত্তগুপ্ত (৫); ঘেরাও ও ধরাও (গ)/গোপাল হালদার ২৪৫-২৮৫; ম্যাডোনা (গ)/মহাশ্বেতা দেবী ২৮৬-২৯৮; প্রেমকাহিনী (গ)/শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৯-৩১১; প্রাণনাথের সন্তাপ ও শান্তি (গ)/যশোদাজীবন ভট্টাচার্য ৩১২-৩৩৮; না-হওয়া গল্প (গ) অমল দাশগুপ্ত ৩৩৯-৩৪৫; একটি ধর্ষণের মামলা (গ)/মিহির সেন ৩৪৬-৩৬৫; রাজিন্দর (গ)/যুবনাশ্ব ৩৬৬-৩৭৩; একালের বিকাল (গ)/আশুতোষ সরকার ৩৭৬-৩৮৮; ধর্না (গ)/দেবেশ রায় ৩৮৯-৪০৮; কাফের (গ)/অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৯-৪২১; স্বদেশরঞ্জন (গ)/অজিত মুখোপাধ্যায় ৪২২-৪৪০; পরকলা (গ)/সুরজিৎ বসু ৪৪১-৪৪৫; সীমালেখা (গ)/প্রিয়তোষ মুখোপাধ্যায় ৪৪৬-৪৫৮; শিকার (অ.গ)/ভগবতীচরণ পানিগ্রাহী অনুবাদ : রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ৪৫৯-৪৬২; হাতি আর পোকা (গ)/গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৬৩-৪৭০; হাতচুরি (অ.গ)/কৃষণ চন্দর অনুবাদ : জ্যোতিভূষণ চাকী ৪৭১-৪৭৭; একটি কালো মেয়ের কথা (অ.গ)/অমৃত রায় অনুবাদ : সুবোধ চৌধুরী ৪৭৮-৪৮৭; হওয়া না-হওয়া (গ)/দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৮৮-৫০৮;

২২

৩৭ : ৪/৫ নভেম্বর-ডিসেম্বর [১৯]৬৭/কার্তিক-অগ্রহায়ণ [১৩]৭৪

কাশ-কানি (ক)/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫০৯; অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বছর (প্র)/সরোজ আচার্য ৫১০-৫২৩; নতুন দিনের পুরনো কথা (প্র)/গোপাল হালদার ৫২৪-৫৪০; সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ প্রসঙ্গে (প্র)/চিন্মোহন সেহানবীশ ৫৪১-৫৪৭; বৃষ্টির ভিতরে (ক)/আনন্দ বাগচী ৫৪৮; অঙ্কন শিক্ষা/ব্রিজ আঁকা (ক)/মোহিত চট্টোপাধ্যায়; শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্কট (প্র)/শচীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫০-৫৬৬; দেরি নেই (ক)/গোবিন্দ চক্রবর্তী ৫৬৭; দুটি কবিতা (সমীক্ষা; অন্বেষণ) (ক)/বিনয় চক্রবর্তী ৫৬৮; শকুনির ছবি (গ)/অজয় গুপ্ত ৫৬৯-৫৭৫; ভূমিকম্পের সময় (ক)/জগন্নাথ চক্রবর্তী ৫৭৬-৫৭৭; একটি সাক্ষাৎকার ডক্টর সুকুমার সেন (সা)/কার্তিক লাহিড়ী ৫৭৮-৫৮৩; বাড়িঘর সংক্রান্ত (ক)/বাসুদেব দেব ৫৮৪; আমরা দুদিকে যাব (ক)/বিজয় পাল ৫৮৫; অনিদ্রা (গ)/বৈতালিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৮৬-৫৯৯; বৃষ্টিতে (ক)/মানস রায়চৌধুরী ৬০০; ঝড়ের দিনে (ক)/রমা অধিকারী ৬০১-৬০২; যযাতি (উ)/দেবেশ রায় ৬০৩-৬০৭; সত্যজিৎ রায়ের "চিড়িয়াখানা" (সমা)/সুমিত মিত্র ৬০৮-৬১১; "শেক্সপীয়রওয়ালা" প্রসঙ্গে (সমা)/নির্মাল্য বসু ৬১২-৬১৪; পাঠকগোষ্ঠী :

জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গে/প্রবীরকুমার দত্ত ৬১৫-৬১৬; বানান বিষয়ে/জ্যোতিভূষণ চাকী ৬১৬-৬১৭; পুস্তক পরিচয় : *রুশ বিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন* : গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সমা)/সুকুমার মিত্র ৬১৮-৬১৯; *অজ্ঞাতবাসের দিনগুলি* : চিন্ময় গুহঠাকুরতা; *বিষুব রৌদ্রের ডালপালা* : তুলসী মুখোপাধ্যায়; *লাগ ভেল্‌কি লাগ* : অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়/অমিতাভ দাশগুপ্ত ৬২০-৬২২; গণতন্ত্রের স্বপক্ষে ৬২৩-৬২৪; সম্পাদকীয়'র পরিবর্তে ৬২৫-৬২৬।

২৩

৩৭ : ৬/৭ জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি [১৯]৬৮/পৌষ-মাঘ [১৩]৭৪

কে আছো (ক)/অমিয় ধর ৬২৭; যখন রাস্তাই একমাত্র রাস্তা (প্র)/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৬২৮-৬৩৭; কান পেতে শোনো (ক)/মণীশ ঘটক ৬৩৮; আদিগন্ত বিশাল পৃথিবী (ক)/যতীন্দ্রনাথ পাল ৬৩৯; মারাঠী কবি কেশবসুতের কবিতা (অ.ক) : বন্ধুর ঘর/ক্ষিতীশ রায় ৬৪০-৬৪২; টোটেম থেকে প্রতীক (প্র)/দিবাকর রায় ৬৪৩-৬৫০; পদসঞ্চার (ক)/অশোক ভট্টাচার্য ৬৫১; ভাসান (গ)/নবারুণ ভট্টাচার্য ৬৫২-৬৫৬; ধোঁয়া ধুলো নক্ষত্র (র)/অসীম রায় ৬৫৭-৬৫৯; ঠিক বাঙলারই (ক)/যশোদাজীবন ভট্টাচার্য ৬৬০; কেরানি বধূ (ক)/অরবিন্দ ভট্টাচার্য ৬৬১; যযাতি (উ)/দেবেশ রায় ৬৬২-৬৬৬; একটি সাক্ষাৎকার : গোপাল হালদার (সা)/চিত্ত ঘোষ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর রায়চৌধুরী ৬৬৭-৬৭৫; প্রত্নের গভীর থেকে (ক) অমিতাভ দাশগুপ্ত ৬৭৬; ডোরাকাটার অভিসারে/শের জঙ্গ অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৬৭৭-৬৮৩; মদন বাঘার মা ও শকুনি (গ)/নীরদ ভট্টাচার্য ৬৮৪-৬৯২; কলকাতার গণিকাবৃত্তি প্রসঙ্গে (প্র)/দীপা সর্বাধিকারী ৬৯৩-৭০৫; স্বপ্নপুঞ্জ আমার (ক)/সুমিত চক্রবর্তী ৭০৬; দুটি কবিতা : স্তপতি; অয়ি ভুবনমনোমোহিনী মা (ক)/সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত ৭০৭; পুস্তক পরিচয় : 'মরা গাঙে বান' পর্ব *The Extremist Challenge*, Amales Tripathi/সুনীল সেন ৭০৮-৭১২; ভারতীয় লেখক পরিচিতি *Raja Rammohan Roy* : Saumendranath Tagore; *Ilango Adigol* : M. Varadrajan; *Lakshminath Bezbaroa* : Hem Barua, *Keshavsut* : Prabhakar Machwe/লোকেন্দ্রনাথ উপাধ্যায় ৭১২-৭১৩; চলচ্চিত্র দেশে বিদেশে (আ)/মৃণাল সেন ৭১৪-৭১৫; মানব মনের নাটক (*সম্রাট ও অপারেশন ফাউস্টাস*/ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (সমা)/কপিল ভট্টাচার্য ৭১৬-৭১৮; পুরনো যুগের কবিতা (*আকাশ-প্রদীপ*/সুখরঞ্জন রায়) (সমা)/অশোক দাশগুপ্ত ৭১৮; অকৃত্রিম কবিস্বভাব (*সাতমহাল*/সুনীলচন্দ্র সরকার) ৭১৯-৭২১; কয়েকটি কবিতার বই (সমা) (*জলবায়ু*/রত্নেশ্বর হাজরা; *নিজের মুখোমুখি*/গণেশ বসু; *নিজের সঙ্গে সংলাপ*/সরোজলাল বন্দ্যোপাধ্যায়; *রক্তাক্ত বেদীর পাশে*/কালীকৃষ্ণ গুহ; *মনের মধ্যে বুকের মধ্যে*/অধীর সরকার)/অশ্রুকুমার সিকদার ৭২২-৭২৭; কলকাতার উৎসবে দেখা কয়েকটি ফরাসি চলচ্চিত্র (আ) (ও আজা বালথাজার; দি স্যুটর; পিয়েরো, দি ফুলিশ; এ টাইম টু লাভ; লাইফ অ্যাট এ ক্যাস্‌ল্)/সমীর রায় ৭২৮-৭৩৭; না দিলে [প্রসঙ্গ কাজী নজরুল ইসলামের বাসভবন নির্মাণ]/৩৭৮।

২৪

৩৭ : ৮/৯ মার্চ [১৯]৬৮/ফাল্গুন [১৩]'৭৪

ম্যাকসিম্ গর্কি (প্র)/গোপাল হালদার ৭৩৯-৭৪৮; যা জানবার (অ.ক)/আলেকজান্ডার ৎভারদভস্কি অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭৪৯; পূর্ব পাকিস্তানের কবিতা : রক্তের ইতিহাস (ক)/জাহিরুল হক ৭৫০; একুশে ফেব্রুয়ারি (ক)/সালাহউদ্দিন মোহাম্মদ অনুবাদ : ফজল সাহাবুদ্দিন ৭৫১-৭৫২; আমার নগর (ক)/বুলাৎ ওকুদজাভা অনুবাদ : তরুণ সান্যাল ৭৫৩; বানভাসি; রাজা/বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৭৫৪; আয়না (গ)/সুভাষ সেন ৭৫৫-৭৫৯; শঙ্খ ঘোষের কবিতা (প্র)/হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৬০-৭৬৭; নীলকণ্ঠ পাখির পালক (গ)/আশিস সেনগুপ্ত ৭৬৮-৭৭৬; এক অবজ্ঞাত অভিযাত্রীর কাহিনী (প্র)/সুনীল মুন্সী ৭৭৭-৭৮৩; অসম্পূর্ণ (গ)/সময় রায়চৌধুরী ৭৮৪-৭৯৪; ডোরাকাটার অভিসারে (অ.গ)/শের জঙ্গ অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৭৯৪-৮০৩; যযাতি (উ)/দেবেশ রায় ৮০৪-৮২৪; তুমি আমার তুমি আমার (ক)/শক্তি চট্টোপাধ্যায় ৮২৫; দিবা স্বপ্নবিলাসীর খেদ (ক) ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় ৮২৬; বাঁচা-কাহিনী (ক) মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৮২৭-৮২৮; হাওয়া বদল (ক)/জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় ৮২৯; এই ছায়া (ক)/রত্নেশ্বর হাজরা ৮৩০; বিদেশে (ক)/মালিনী ভট্টাচার্য ৮৩১-৮৩২; বোন-কে (ক)/সুতপা ভট্টাচার্য ৮৩৩; সরিয়ে নিও না (ক)/সমীর চৌধুরী ৮৩৪; কলিকাতায় গণিকাবৃত্তি প্রসঙ্গে (প্র)/দীপা সর্বাধিকারী ৮৩৫-৮৪৩; চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড (সমা)/নাট্যসমালোচক ৮৪৪-৮৪৭; পুস্তক পরিচয় : চীন কোন পথে *Whither China* : R. Palme Dutt/পঞ্চানন সাহা ৮৪৮-৮৫২।

২৫

৩৭ : ১০/১১/(১২) মে-জুন-জুলাই [১৯]৬৮/বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় [১৩]৭৫

ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে (ক)/বিষ্ণু দে ৮৫৩; গর্কি : জীবন-সাহিত্য (১৮৬৮-১৯৩৬) (প্র)/গোপাল হালদার ৮৫৪-৮৬৮; মার্কস এবং সাহিত্য (অপ্র)/জুয়েরগেন কুজঝিন্স্কি অনুবাদ : বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য ৮৬৯-৮৭৪; মার্কসের চোখে ভারতীয় ইতিহাস/সুশোভন সরকার ৮৭৫-৮৯২; মার্কসবাদ ও বিজ্ঞান (প্র)/শঙ্কর চক্রবর্তী ৮৯৩-৮৯৯; এই আকাঙ্ক্ষার দেশে (ক)/রাম বসু ৯০০-৯০১; ইতিহাসের মূর্তি (ক)/শিবশম্ভু পাল ৯০২; হঠাৎ ঘনিয়ে তোলো তোলপাড়—উচ্চণ্ড অসুখ (ক)/অমিতাভ দাশগুপ্ত ৯০৩; হে পূষণ (ক)/অমিয় ধর ৯০৪; ভয় (ক)/তরুণ সেন ৯০৫; বুড়ো হাক (অগ)/নাম কাও অনুবাদ : অবন্তীকুমার সান্যাল ৯০৬-৯১৬; কুস্তি (গ)/বিজনকুমার ঘোষ ৯১৭-৯২৭; বাংলা ভাষায় কার্ল মার্কস (প্র)/চিন্মোহন সেহানবীশ ৯২৮-৯৩৪; স্মৃতিকথায় মার্কস ও এঙ্গেলস (প্র)/অমল দাশগুপ্ত ৯৩৫-৯৪২; ডোরাকাটার অভিসারে (অগ)/শের জঙ্গ অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৯৪৩-৯৪৭; পুস্তক পরিচয় : *কলিযুগের গল্প*/সোমনাথ লাহিড়ী (সমা)/নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ৯৪৮-৯৪৯; বিবিধ প্রসঙ্গ : এঁদের ভুলবেন না (আ)/প্রমথ ভৌমিক ৯৫০-৯৫১; জাতীয় সংহতি ও বৃহৎ

সংবাদপত্রের প্রতিক্রিয়া (আ)/শান্তিময় রায় ৯৫২-৯৫৩; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কস-চর্চা (প্রতি)/রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ৯৫৩-৯৫৫; মার্কস ক্লাব; মার্কস-স্মারক-আলোচনা (প্রতি)/শুভব্রত রায় ৯৫৫-৯৫৬; যুব উৎসব থেকে (প্রতি)/সৌমেন নাগ ৯৫৬-৯৬২; ফরাসী দেশে 'বিপ্লব' এবং ইতালি (আ)/জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ৯৬২-৯৭১; বিয়োগপঞ্জী : বড়ে গোলাম আলি ও পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ/দিলীপ বসু ৯৭২-৯৭৪; হার্বার্ট রীড/রবীন্দ্র মজুমদার ৯৭৪-৯৭৭; শরৎচন্দ্র পণ্ডিত/অবিনাশ বসু ৯৭৭; কবি পরভেজ শাহীদী/চিন্মোহন সেহানবীশ ৯৭৭-৯৭৮; রেভারেন্ড মার্টিন লুথার কিং ও রবার্ট কেনেডি ৯৭৮-৯৮০; পাঠকগোষ্ঠী (চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড) (আ) পুনপুন মুখোপাধ্যায় ৯৮১-৯৮২; পরিচয় পাঠক সমীপে (সম্পা)/সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৯৮৩।

আলোচ্য সূচিতে প্রতিটি রচনার শিরোনামের সঙ্গে তার বিষয় বিভাগটি সংক্ষেপে আদ্যক্ষরে এবং তারপর লেখকের নাম ও পৃষ্ঠাঙ্ক উল্লেখ করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত শব্দগুলির পূর্ণরূপ যেমন : ক = কবিতা, প্র = প্রবন্ধ, না = নাটক, উ = উপন্যাস, ভ্র = ভ্রমণ, আ = আলোচনা, অ = অনুবাদ, অ. ক = অনুবাদ কবিতা, অ. প্র = অনুবাদ প্রবন্ধ, অ. গ = অনুবাদ গল্প, প্রতি = প্রতিবেদন, সমা = সমালোচনা, প = পত্র, গা = গান, স = সম্পাদকীয়, র = রম্যরচনা।

পুরোনো পরিচয় থেকে : সৃষ্টি : প্রসঙ্গ

বাবর আলির চোখের মত

বজবজ থানার দক্ষিণের এক গাঁয়ের শেখ বাবর আলি মণ্ডল হঠাৎ বদলে গিয়ে আমার কবিতার একটি উপমার ভিতসুদ্ধ এভাবে নাড়িয়ে দেবে আগে ভাবতে পারিনি।

কবিতাটা বেরিয়েছিল 'পরিচয়'-এর এক পুজো সংখ্যায়। নাম ছিল 'সালেমনের মা'। তাতে আমি পাগল বাবর আলির চোখের সঙ্গে এলোমেলো আকাশের তুলনা করেছিলাম।

পাগল বাবর আলি। কিন্তু এখন আর সে পাগল নয়। মাস দুই আগে কী করে জানি না হঠাৎ তার মাথার অসুখ ভাল হয়ে গেছে। কদিন আগে সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই সে আমাদের ব্যঞ্জনহেড়িয়া গাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল। তার একমাত্র মেয়ে সালেমনকে দেখতে। পাগল হবার পর আরও দু-পাঁচবার এ গাঁয়ে সে এসেছে। প্রথম প্রথম বাপের কাছে ঘেঁষতে চাইত না সালেমন। খুব ভয়-ভয় করত। বাবর আলির কাঠি-কাঠি আঙুলের লম্বা লম্বা নখ দেখে তার মনে হত কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই বুঝি চোখ গেলে দেবে। তারপর আস্তে আস্তে সালেমনের ভয় ভেঙে গেল। সে দেখল তার একরাশ চুলের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নখগুলো ডুবিয়ে রাখা ছাড়া বাবর আলি আর কোন যন্ত্রণা তাকে দেয় না। এমনকি অনেকদিন না দেখলে বাবর আলির জন্যে তার মাঝে মাঝে কষ্টও হত।

একটা জিনিস শুধু সালেমনের সহ্য হত না কোনদিন—বাবর আলি একদিনও তার দিকে চোখ তুলে তাকায় না কেন?

এবার ভাল হয়ে এসে এই প্রথম বাবর আলি তার মেয়েটার দিকে তাকাল। প্রথমে সালেমনের চোখ, তারপর সারা মুখ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। যেন এই প্রথম সালেমনের সঙ্গে তার দেখা। কেউ একটা ঈদেও এ-পর্যন্ত আদর করে নতুন জামা দেয়নি সালেমনকে। বাপের হাতে তারই জন্যে আনা রংচঙে জামাটা দেখেও কিন্তু সালেমনের হাত বাড়িয়ে দেবার এতটুকু ইচ্ছে হল না। কাঠ হয়ে সে দাঁড়িয়ে থাকল।

সেও বাবর আলিকে ঠিক চিনতে পারছে না। বাবর আলি চুল আঁচড়েছে বলে নয়, টায়ারের তৈরি জুতো পায়ে গলিয়েছে বলে নয়—আসলে চোখের চাউনিটা বদলে গিয়ে গোটা মানুষটাই একদম বদলে গেছে। লণ্ঠনের চিমনির মধ্যে যেমন আগুন স্থির হয়ে থাকে, তেমনি স্থির হয়ে আছে বাবর আলির চোখের দুটো তারা।

সালেমনের মুখের প্রত্যেকটা ভাঁজে বাবর আলি খুঁজছিল দশ বছর আগে হারানো অন্য একটা মুখ। সে-মুখ সালেমনের মা গোলসানের।

বাবর আলির মাথা খারাপ হবার পর সালেমনকে কোলে নিয়ে পুরো একটা বছর অপেক্ষা করেছিল গোলসান। কিন্তু পরের বছরেও চালের দর পড়বার যখন কোন লক্ষণই আর দেখা গেল না, কারো কাছে হাত পাতবারও উপায় থাকল না—তখন এক রেস্তওলা আধবুড়োর গলায় গোলসানকে ঝুলে পড়তে হল। মার সেই নতুন সংসারে সালেমনের জায়গা

হয়নি। কিন্তু তাতেও আপশোস ছিল না সালেমনের—যদি না দু-বছর যেতে না যেতে দেখত মার কোলে তার জায়গা জুড়ে বসেছে গোল গোল হাত নিয়ে ফুটফুটে একটা ছেলে। মার নতুন ময়না। নানীর কাছে আরও একবার তার মা এসেছিল কলকাতার চাটিবাটি উঠিয়ে নতুন স্বামীপুত্র নিয়ে বরাবরের মত পাকিস্তানে চলে যাবার আগে।

গাঁয়ে কিছুটা জমি বাবর আলির ছিল নিজের, কিছুটা ভাগে। মাথা ভাল হয়ে যাবার পরই প্রথম সে খোঁজ নিয়েছিল বউ নয়, জমিটুকুর। জমিটা তার পাগল অবস্থায় বেহাত করে নিয়েছে তার এক চাচাতো ভাই। প্রথমটা বাবর আলি মাথা গরম করে একটু চেঁচামেচি করেছিল, কিন্তু রেজিস্ট্রি আপিলের দলিলে নিজের হাতের টিপসই দেখার পর থেকে ও-সম্বন্ধে আর একটি কথাও সে বলেনি।

ঠিক কী জন্যে, তা সালেমন বলতে পারে না—তবে বাবর আলির চোখের স্থির দৃষ্টিটা তার ভাল লাগেনি। বাবর আলির চোখের দিকে আগে আগে যখনই সে তাকিয়েছে, কোনদিন তার অস্বস্তি হয়নি। যেমন গাছের পাতার দিকে, জলের দিকে, আকাশের দিকে সে তাকাত, তেমনি অনায়াসে বাবর আলির চোখের দিকে সে তাকাতে পারত। এবারও ঠিক সেইভাবে তাকাতে গিয়ে সালেমন হঠাৎ খুব বিব্রত হয়ে পড়ল—বাবর আলি চোখ তুলে তাকিয়ে তাকে দেখছে।

বাপের দেওয়া তালপাতার ভেঁপুটাতে ফুঁ দিতে হঠাৎ একট ঝুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে সালেমন তক্ষুনি একছুটে চলে যেতে পেরেছিল সাঁকোর ধারে রাস্তায় কুচো কুচো পোড়া কয়লা কুড়োতে—কেননা ঠিক সেই সময় মিউনিসিপ্যালিটির ঘ্যাঁষ-ফেলার গাড়িটা গাঁয়ে ঢুকতেই পাড়া জুড়ে একসঙ্গে অনেকগুলো কচি গলার হল্লা শোনা গিয়েছিল।

বাবর আলির চোখদুটো পাথরের হলে ওভাবে ছুটে পালাতে হত না সালেমনকে। বাবর আলির অতলস্পর্শ স্থির চোখে দশ বছর পর হারিয়ে-পাওয়া এক পৃথিবী তার সমস্ত কন্টকিত স্মৃতি, বিপর্যস্ত বাসনা, উদ্বিগ্ন স্বপ্ন নিয়ে ভিড় করে ঝুঁকে দেখছিল। ছোট্ট ছেলে ডুবজলে যেতে যেমন ভয় পায়, তেমনি ভয় পেয়েছিল সালেমন।

বাবর আলি গাঁয়ে ফেরার পর শেষ যে খবর পেয়েছি, তা এই—ভাঙা ঠক্‌ঠকি তাঁতটাকে সারিয়ে-সুরিয়ে গামছা বুনে পেট চালাবার চেষ্টায় আছে বাবর আলি। সুখ আর দুঃখ, আনন্দ আর বেদনার মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড ফারাক আছে—বাবর আলির চোখে ক্রমেই তা ধরা পড়ছে। আর যতই সে বুঝতে পারছে, ততই একটা নিদারুণ রাগে তার হাতের মাংসপেশীগুলো ফুলে উঠছে। কবে কী কারণে তার মাথায় খুন চাপবে কিচ্ছু বলা যায় না। লোকে তাই তটস্থ হয়ে আছে।

সে যাই হোক, 'সালেমনের মা' কবিতাটা আমাকে বদলাতেই হবে। একটা সামান্য উপমা আমাকে এমন ফ্যাসাদে ফেলবে কে জানত?

আজ আমি ভাবছি, শুধু 'সালেমনের মা' নয়, শুধু দুটো একটা উপমা নয়—আগাগোড়া অনেক কবিতাই আমাকে বদলাতে হবে।

চড়িয়ালের যে-রাস্তাটাকে আমি এতদিন দুশ্চিন্তায় কপাল কুঁচকে থাকতে দেখেছি, আজ তাকে দেখে মনে হয় হাত মুঠো করে সে যেন কী একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।

আমাদের পাড়ায় যে লোকটা এক বছর আগে মাঝরাত্তিরে বাঁশবনে গলায় দড়ি দিতে গিয়ে বৌয়ের কান্না শুনে ফিরে এসেছিল, আমি জানি সে এখন ভাবছে তার ঘ্যান্-ঘ্যান্-করা রুগ্ন ছোট মেয়েটাকে এবার পুজোর সময় ডুরে-পাড় একটা শাড়ি কিনে দেবার জন্যে চটকলের মজুর হিসেবে বোনাস্ পাওয়া তার একান্ত দরকার।

ছুটির পর বজবজ মিলের বড় গেটে বোনাসের দরখাস্তে প্রথম দিন নিচু হয়ে সই নিতে নিতে হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম একজনের আঙুল দেখে। একেবারে কাগজের মত সাদা। মুখের দিকে তাকালাম ঠিক তেমনি সাদা। শরীরের কোথাও একবিন্দু রক্তের একটু আভাস পর্যন্ত নেই। কাঁপা কাঁপা অক্ষরে সই দিয়ে ছেঁড়া ছাতা বগলে করে টলতে টলতে লোকটা বাড়ি পৌঁচেছিল কিনা আমি জানি না। তারপর আর কোনদিন গেটে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। রাস্তার মধ্যে সেদিন নিশ্চয় কোন অঘটন হয়নি। হলে কানে আসত। শেষবারের মত মুখ থুবড়ে পড়বার আগে এখনও নিশ্চয় কিছুদিন সে ছেঁড়া ক্যানভাসের জুতোটা পায়ে দিয়ে টলতে টলতে আসবে, টলতে টলতে যাবে। লোকটার কথা মনে হলেই বরফের মত তার ঠাণ্ডা আঙুলগুলো আজও ছ্যাঁত করে এসে আমার হাতে লাগে।

আমার কবিতাগুলো যে বদলানো দরকার সেদিনও বুঝিনি। বুঝলাম পনেরো তারিখ সকালে।

ভোর ছটা থেকে অ্যাল্‌বিয়ন-লোথিয়ানের প্রকাণ্ড বন্ধ গেট্‌টার সামনে আমরা প্রশ্নচিহ্নের মত দাঁড়িয়ে। টিপ্ টিপ্ করে লোক এসে জমা হচ্ছে আর ভাবছে ঢুকবে কি ঢুকবে না। গেট ফাঁক করে চোখ নিচু করে ঢুকে যাচ্ছে দশ জনে একজন। বাকি সবাই ভোঁ বাজার জন্যে অপেক্ষা করছে। সবাই ঢুকলে তবে ঢুকবে। মনের উত্তেজনা চাপা দেবার জন্যে সবাই একটু পর পরই জায়গা বদলাচ্ছে। ফলে সেই ক্রমবর্ধমান জনতাকে একটা চলমান স্রোতের মত দেখাচ্ছে। ইস্কুলের হরতালী মেয়েরা এসে লাইন দিল গেটের সামনে। মজুরদের একটা দল ছিট্‌কে ঢুকে গেল ভেতরে। খোঁচা খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন মজুর গেটের কাছে গিয়ে কী ভেবে হঠাৎ দুপা পিছিয়ে এসে হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল—চলো ভাই, ফিরে চলো। সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা হাত শূন্যে ছুঁড়ে কয়েকজন তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল কেউ যাবে না, কেউ যাবে না। এমন সময় ভোঁ বাজার সঙ্গে সঙ্গে হাট হয়ে গেট খুলে গেল। তারপর নিঃশব্দ একটা মুহূর্ত, বিরাট জনস্রোত একবার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পিছিয়ে গেল। খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা অচেনা সেই লোকটা ভিড়ের মধ্যে হাত তুলে নাচতে নাচতে চেঁচিয়ে উঠল—ফিরে চলো, ফিরে চলো।

কাজে-না-যাওয়া লোকগুলো কোথায় সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সাড়ে সাতটায় যে-মিছিলটা কেঠোপুলের দিক দিয়ে ঘুরে বজবজ মিলের দুটো গেটে ভাগ হয়ে গিয়েছিল, তার মধ্যে সেই খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা লোকটা ছিল।

অনেকদিন পর দুপুরবেলায় তাকে একদিন দেখলাম চড়িয়াল বাজারে। লাইনছুটি পেয়েছে

সে। দোকান থেকে নারকোলের দড়ি কিনছে ঘরের চাল বাঁধার জন্যে। ঘোরতর সংসারী লোক। হরতালের দিন সকালে আগুনের শিখার মত তার যে-মূর্তি দেখেছিলাম লোকটার আটপৌরে চেহারার সঙ্গে তার কোন মিল নেই। তার চোখদুটো নিকোনো মাটির দাওয়ার মত শান্ত। বোনাসের কথাটা বলতেই মুখটা ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ একবার বিদ্যুৎ খেলে গেল তার চোখে। তারপর যখন আবার ফিরে তাকাল, দেখলাম নিকোনো মাটির দাওয়ার মত তার চোখদুটো শান্ত।

সেদিনকার সেই সাড়ে সাতটার মিছিলে খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা লোকটা ছিল না বটে, কিন্তু বাওয়ালির রাস্তাটা পেরিয়ে মিছিলে এসে জুটে গেল আরও কিছু লোক। তার মধ্যে ছিল বাঁ-হাতের কব্জি-ভাঙা সেই লোকটা—বাজারে চায়ের দোকানে যে-লোকটা একহাতে চা দেয়। পঁচিশ বছর আগেও বজবজ মিলে কাজ করত সে। মেশিনে হাত জড়িয়ে গিয়ে কব্জির হাড়টা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ভেঙে যাবার পর থেকে আর সে চটকলের কেউ নয়, কিন্তু চটকলে কিছু একটা হলেই সে উস্‌খুস্‌ করে। তখন নাকি ক্ষতি-পূরণের আইন ছিল না। নইলে আজকালকার দিন হলে কোর্টকাছারি করে বাঁ-হাতের ভাঙা-কব্জির জোরে সে সাহেবদের হাত মুচড়ে অন্তত কিছু টাকা আদায় করে ছাড়ত। মিছিলে দাঁড়িয়েই তার মনে পড়ে যায় সে যুগটার কথা, যে-যুগে মিছিল-টিছিল ছিল না। কিন্তু লোকের রাগ ছিল। সেই লাইন-সাহেবটার কী যেন ভালো নাম? সেই বেঁটেখাটো হারামজাদা সাহেবটা, যে একজন ছোকরা পিনবয়কে লাথি মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছিল আর উঠতে বসতে বাপ-মা তুলে কুৎসিত গাল দিত! একদিন পেছন থেকে সাহেবের মাথায় আচমকা চটের বস্তা গলিয়ে দিয়ে মুখ বেঁধে তারপর নলী দিয়ে সবাই মিলে কী মার কী মার। তারপর আর সেই লাইন-সাহেবকে বজবজ মিলে কেউ দেখেনি। বড়সাহেব নাকি পরের জাহাজেই তাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল।

চায়ের দোকানের সেই লোকটা মিছিলের লোকগুলোর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে ভাবে—তার না হয় একটা হাত নেই, কিন্তু দুটো হাত থেকেও চটকলের লোকগুলো আজকাল সাহেবদের পিটিয়ে লাশ করে না কেন?

কিন্তু ন তারিখের মিছিলের কাছে পনেরো তারিখের মিছিলটা এতটুকু হয়ে গেল। উত্তর আর দক্ষিণ থেকে হাতে হাতে লাল কাগজের নিশান উড়িয়ে আসছিল চিত্রিগঞ্জ আর বিড়লাপুরের যে দুটো বিরাট মিছিল, তাদের দুটো মুখ যখন একই সঙ্গে কয়লা সড়কের মোড়ে এসে পৌঁছুল তখন তার পাশের মাঠটায় তিল ধারণের জায়গা নেই। সারাদিন বৃষ্টির পরও আকাশ ঝাম্‌রে আছে, তবু লোকের কামাই নেই।

সকালে বিড়লাপুরে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে শুনে এসেছিলাম সকালের শিপ্টের একদল মজুর কারখানার মালিকের সঙ্গে ভগবান ও আল্লারূপী ঈশ্বরকে পৃথক পৃথক ভাবে জড়িয়ে মুখে-আনা যায় না এমন খিস্তি করছে। বিকেলে কয়েক ঘণ্টার জন্যে বৃষ্টি ছেড়ে যাবার পর আমার জানতে ইচ্ছে করছিল সেই লোকগুলো জিভ কেটেছে কিনা।

এত লোক নিয়ে ঐটুকু জায়গায় সুস্থিরভাবে সেদিন সভা হতে পারেনি, কিন্তু যাবার

আগে বোনাসের ব্যাজ-আঁটা বুক টান করে হাত তুলে সবাই জানিয়ে দিয়ে গেল—হাত পেতে নয়, হাত মুচড়ে নেবার জন্যে তারা তৈরি।

একটা গোটা তল্লাট ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়াচ্ছে চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তার পুরো ছবিটা আমার কাছে এখনও স্পষ্ট নয়।

চটকলের গেট থেকে বেরিয়েই যে-লোকগুলোকে এতদিন হাঁফধরা গলায় বলতে শুনেছি—শালারা আর বাঁচতে দেবে না—তারাই আজকাল গলায় ঝাঁঝ দিয়ে বলছে—দাও শালাদের ঠাণ্ডা করে।

হপ্তাবাজারে মিটিং হয় টিফিনের সময়। লালঝাণ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে লোকে হাঁ করে শোনে তাদের সেই নেতার বক্তৃতা, ক-বছর আগে ছাঁটাই হয়ে জেলে যাবার আগে পর্যন্ত যে তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে বজবজ মিলে তাঁত চালিয়েছে আর এখন যে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে মন্ত্রীদের মুখের ওপর ধুড়ধুড়ি ধুইয়ে দিতে একটু ভয় পায় না।

তারা শোনে লালঝাণ্ডার সেই রোগা টিংটিঙে নেতার কথা, ভদ্দরলোকের ছেলে হয়েও যে মজুরদের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শোনে আর তারা অবাক হয়, হাড়-বার-করা ঐটুকু বুকের মধ্যে ফুস্‌ফুস্‌টায় এত জোরও আছে?

হপ্তাবাজারে মিটিং চলতে চলতে বুড়ো হারানদা আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে বলেন, এবার জম্‌বে।

বেশ বুঝতে পারছি ভালো করে জমে ওঠার আগেই আমার কবিতাগুলো বদলে ফেলা দরকার।

বজবজের মাথায় যে-আকাশটাকে দেখছি তার সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে হঠাৎ কেন যেন বাবর আলির চোখের কথাই ফের মনে পড়ল। পাগল বাবর আলি নয়। যে-বাবর আলি ঠকঠকি তাঁতের সামনে বসে সারা রাত জেগে জীবনের সঙ্গে শেষবারের মত বোঝাপড়া করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, একমাত্র তার চোখের সঙ্গেই এই গন্‌গনে আকাশটার তুলনা করে চলে।

সেই আকাশের নিচে লড়াই এবার জমবে।

২৩ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৬০

একুশের সুরে বাঁধা

১৯৫২।

'২১ শে ফেব্রুয়ারি।

সারা শহরটা থমথমে। দোকানপাট কিছু খোলা কিছু বন্ধ। ছাত্ররা জড়ো হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে। রাস্তায় পুলিশ ট্রাকভর্তি। রোদ তেতে উঠেছে মাথার ওপরে। কপালের দুধারে রগ করছে দপ্‌দপ্‌। মুখগুলো সবাইর উত্তেজনায় চকচকে। চোয়ালগুলো শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখেমুখে ঠিকরে পড়েছে প্রশ্নের চিহ্ন। সবাই জানতে চায় কী হবে, কী হবে এখন।

একশো চুয়াল্লিশ ধারা সরকার জারি করছে। এখন মিছিল করা মানেই একশো চুয়াল্লিশ ভাঙা। তাতে আমাদের লাভ হবে না, গণ্ডগোলের সম্ভাবনাই বেশি—

সবাই খেপে উঠেছে শুনে।

বিশ্বাসঘাতক! আমরা ফিরব না। ...

... মিছিলের একপাশে দাঁড়িয়ে ভেবেছি কী করব। আমিও কি এ মিছিলে শরিক হব? যদি কিছু হয়? ... কী করে কখন চিন্তার সমাধান করে টিয়ারগ্যাস থেকে বাঁচবার জন্যে আর সবার সঙ্গে পুকুর থেকে রুমাল ভিজিয়েছি টের পাইনি। যখন টের পেলাম, দেখি গেটের সামনে পুলিশ-ব্যারিকেড ভাঙার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছি আর অন্যের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আওয়াজ তুলছি : রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—

... শুরু হল টিয়ারগ্যাস ছোঁড়ার পালা। লং রেঞ্জ। শুধু রাস্তা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও।

দৌড়ল বাচ্চা, বুড়ো সবাই। কাশল সমানে খক খক খক। চোখ বেয়ে নেমে আসছে পানি।...

পানি। কারবালার ময়দান হয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতর। সবাই ছুটেছে পুকুরের দিকে। একটু পানি এক টুক্‌রো উজ্জ্বল হীরের চেয়েও দামী। ...

... পানি। আহত ছাত্রটির গলা ঠেলে অতি কষ্টে বেরিয়ে আসে একটি শব্দ। কিছুক্ষণ আগে যে রুমালগুলো ভিজিয়েছিলাম প্রত্যেকেই তার মুখে নিংড়ে দিই। ...আমার বাড়িতে খবর দেবেন। নাম আবুল বরকত, ঠিকানা বিষ্ণুপ্রিয় ভবন, পল্টন লাইন। ...'

(একটি বেওয়ারিশ ডায়েরী : মূর্তজা বশীর)

'আবুল বরকত, সালাম, রফিকউদ্দিন, জব্বার
কী আশ্চর্য, কী বিষণ্ন নাম! একসার জ্বলন্ত নাম। ...
আর আমরা সেই শহীদদের জন্যে
তাঁদের প্রিয় মুখের ভাষা বাংলার জন্যে
এক চাপ পাথরের মত এক হয়ে গেছি। ...
এখানে আমরা পৃথিবীর শেষ দ্বৈরথে দাঁড়িয়ে,

দেশ আমার, স্তব্ধ অথবা কলকণ্ঠ এই দ্বন্দ্বের সীমান্তে এসে
মায়ের স্নেহের পক্ষ থেকে কোটি কণ্ঠ চৌচির করে দিয়েছি :
এবার আমরা তোমার। ...
আজ তো জানতে এতটুকু বাকি নেই মাগো,
তুমি কী চাও, তুমি কী চাও, তুমি কী চাও।'

(হাসান হাফিজুর রহমান)

'ইমাম সাহেব মোনাজাত করলেন : "হে আল্লাহ, আমাদের অতিপ্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চির শান্তি পায়। আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার দেওয়া এই দুনিয়ার বুক থেকে। এইসব ফেরাউনদের খেয়ালখুশিতে যেন আমাদের মানুষ সন্তান-সন্ততিদের আর জান বলি দিতে না হয়। হে আল্লাহ, তুমি আমাদের মত শোকসন্তপ্ত উৎপীড়িতদের মোনাজাত কবুল করো।" '

(একুশের ঘটনাপঞ্জী : কবিরউদ্দিন আহমদ)

'পাঁচটি আঙুল আস্তে আস্তে গুটিয়ে এল। পাঁচ আঙুলে মিলে একটা মুঠোর জন্ম হল।

নির্ঘুম শহরের প্রতিটি রোড-স্ট্রীট-লেন-বাইলেনের জনতা সমুদ্রের বুক থেকে কুয়াশার মত পাকিয়ে পাকিয়ে অগণন মুঠো আকাশের বুকে উঠে গেল।

নিষ্কম্প্র সব হাত।' (রক্তাক্ত স্বাক্ষর : সালেহ্ আহ্মদ)

১৯৫৪।

২৩শে এপ্রিল ঢাকা শহরে পৌঁছুতেই দুবছর আগে উত্তোলিত সেই অসংখ্য হাত বিজয়গর্বে আমাদের জড়িয়ে ধরল। বাংলা ভাষার মুখ যারা উজ্জ্বল করেছে, তাদের মুখের দিকে তাকালাম। ইঁটের শহীদস্তম্ভ জালিমের দল ভূলুণ্ঠিত করলেও প্রস্তর-কঠিন সংকল্পে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রক্তমাংসের জীবন্ত একেকটি মিনার। একুশের সুরে বাঁধা প্রত্যেকটি হৃদয়। আর সেই হৃদয়ের তরঙ্গে তরঙ্গে কটা দিন আমরা শুধু ভাসলাম।

ভাসতে ভাসতে দেখা। তিন বেলা অবিরাম সম্মেলনের মাঝখানে সময় চুরি করে আলগোছে দেখা। যেদিকে তাকাই কচি মুখ, মুখের অরণ্য। পথ রোধ করে তারা দাঁড়ায়। অটোগ্রাফ বাজারে অটোগ্রাফের খাতা নিঃশেষ হয়ে গেছে। তারপর শুধু সাদা কাগজে সই। অভ্যর্থনা। যেতেই হবে নইলে নিরাশ হবে সবাই। খেতেই হবে। যদি গলায় আঙুল পুরে দিতে হয়, তবুও। ভালবাসার যে কী অত্যাচার হতে পারে, কদিনে তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছি।

তারই মধ্যে একটি ছোট মেয়ে বায়না ধরে তার সঙ্গে বাড়ি যেতে হবে। অসুবিধের কথা বলতে গিয়ে দেখা গেল চোখ তার জলে ভরে উঠেছে। সময় আমাদের হাতে নয়। তার সঙ্গে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যাব না বলা মানে রাস্তার মধ্যেই তাকে কাঁদানো। নিরুপায় হয়েই তাকে ঠকাতে হল। তার কান্না চোখের সামনে দেখতে হয়নি, তবু তাকে কাঁদিয়েছি।

সারাক্ষণ আলাপ। মনে রাখা যায় না এত নাম। একই নামের একাধিক মানুষ। কতদিন পর কত চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন। তারা সব কেমন আছে? কারো সঙ্গে আলাপ কলকাতার ছাপাখানায়, কেউ কাজ করত কাগজে, কেউ বা সঙ্গে পড়ত।

তারই মধ্যে উঠে আসে এক নতুন পরিচয়। 'এই তো সবে ছাড়া পেয়েছেন জেল থেকে।' যারা জেলে গেছে তাদের খাতিরই আলাদা। আর খাতির পায় যাদের নামে পরোয়ানা ছিল, কিন্তু যারা ধরা পড়েনি তারা।

ভাষা-আন্দোলনে ধরা পড়ে জেল থেকে ফিরে এসে ঢাকার এক কুট্টি তার মহল্লার মানুষদের বলেছিল : বাইরে কি আর ভাল মানুষ আছে? ভাল মানুষ দেখতে চাও তো জেলে যাও। কথাটা মুখে মুখে সারা শহরে সেই থেকে চালু হয়ে গেছে।

যারা দুদিন আগেও লীগ-সরকারের ধামা ধরে বেড়াত, আরবী হরফে বাংলা লেখার জন্যে গলাবাজি করত, তারা রাতারাতি বেজায় বদলে গেছে। যারা আগে চোখ না রাঙিয়ে কথা বলত না, এখন তারা ভারি অমায়িক। সারাক্ষণ প্রমাণ করতে ব্যস্ত লীগের রাজত্বে তারা নাকি টুঁ শব্দটি করতে পারেনি। দেখলাম লোকে তাদের ভোলেনি। মুখের ওপর তাদের অপমান করতে ছাড়ে না। মান্যগণ্য লোক তারা। ফলে সামনাসামনি আমরা কখনও কখনও অস্বস্তি বোধ করেছি। ছাত্ররা বলেছে : না, জানেন না আপনারা—কীভাবে আমরা এক বছর মুখ বুঁজে সব সহ্য করেছি। আজও সহ্য করতে বলেন?

দিন বদলেছে। রাস্তার মোড়ে এপার-ওপার লাইটপোস্টের সঙ্গে টাঙানো প্রকাণ্ড কাগজের নৌকো। জলে বৃষ্টিতে ছিঁড়ে গেছে। কিন্তু নির্বাচনের স্মৃতি বহন করে এখনও কঞ্চির কাঠামোটা টিকে আছে।

নৌকো। লীগবিরোধী যুক্তফ্রন্টের প্রতীক। নৌকো নিয়ে গ্রামে গ্রামে তৈরি হয়েছে অসংখ্য গান। বিড়ির দোকানে ছবি টাঙানো নৌকোর। রাস্তায় রাস্তায় দেয়ালে দেয়ালে অনভ্যস্ত হাতে আঁকা নৌকোর ছবি।

নির্বাচনের গল্প আজও লোকের মুখে মুখে। সে এক দৃশ্য। বাড়ির কেউ কখনও যা দেখেনি—মুসলমান মেয়েরা রাস্তার মোড়ে মোড়ে কোমর বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে যুক্তফ্রন্টের প্রচারে। একেকটি পরিবার ভোটের বাক্সে ভাগ হয়ে গেছে। কর্তা লীগের সমর্থক, গিন্নি যুক্তফ্রন্টের। ঘরে ঘরে বাপে ছেলেয় তুমুল তর্ক। সবাই অনুযোগ করে বলে : কেন এলেন না তখন?

তারপর মধুর স্টলে বসে চায়ের কাপে রসালো গল্প ফজলুল হকের নির্বাচনী প্রচার নিয়ে। এক এলাকায় যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী নেহাত ছোকরা-বয়সী। সেখানকার এক গ্রামের সভায় চাষীরা আপত্তি জানাল—অতটুকু ছেলে মন্ত্রী হয়ে কী করবে? হক সাহেব তৎক্ষণাৎ এই বলে তাদের শান্ত করলেন : আমরা ঝানু লোকেরা নৌকার হাল ধরব, দাঁড় টানব। কিন্তু বড় দরিয়ায় নৌকো চালাতে চালাতে যখন আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব, তখন তো একটু তামুক না হলে চলবে না। সবাই যদি তখন আমরা হাল ধরতে আর দাঁড় টানতে ব্যস্ত থাকি—তামুক সাজবে কে? তামুক সাজার জন্যে তাই আমাদের একজন ছোকরা লাগবে।

এমনি সব অনেক গল্প।

যার সঙ্গেই কথা বলা যায় শুধু এক কথা—পুরনো হাল আর কেউ বরদাস্ত করবে না। লীগ সরকারকে যেমন করে তারা উল্টে দিয়েছে, যদি কেউ বেইমানি করে তেমনি করে তাদেরও তারা উল্টে দেবে।

রাস্তাঘাটে বোরখা ছাড়াই মেয়েরা অবাধে বার হয়। আগে এ অবস্থা ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের মেয়েরা গোড়ায় পথ দেখালেও আসলে গণ-আন্দোলনের জোয়ারেই শ্বাসরোধী পর্দা ভেসে গেছে। অবশ্য মেয়েদের এই স্বাধীনতা আজও গ্রামাঞ্চলে, এমনকি সমস্ত শহরেও স্বীকৃত নয়। কিন্তু অন্ধকার পিছু হটতে যে শুরু করেছে, তাতে সন্দেহ নেই।

শহরে যানবাহনের যে অবস্থা, তাতে মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েদের পক্ষে বাইরে বেরনো কম কষ্টকর নয়। রমনা বাদ দিলে আর সমস্ত অঞ্চলেরই রাস্তা ছোট ছোট। বাস চলে একটিমাত্র রাস্তায়। হয় পায়ে হাঁটতে হবে, নইলে সাইকেল-রিক্সা। একে ভিড়ে ঠাসা রাস্তা, তার ওপর গাড়ির ভয়ে পদে পদে প্রাণ হাতে করে হাঁটতে হয়। রিক্সার যা ভাড়া, তাতে সত্যিই নেহাত দায়ে না পড়লে বাড়ির বার হওয়া মুস্কিল।

এ ক-বছরে গলিঘুঁজির মধ্যেও সিনেমা কম হয়নি। কিন্তু দেখতে হলে দেখতে হয় বাজে হিন্দী ছবি। লোকে বাংলা ছবি চায় কিন্তু পায় না। কালেভদ্রে বাংলা ছবি হলে, তা সে বস্তাপচা পুরনো ছবি হলেও, লোকে ভিড় করে দেখতে যায়।

শুধু ছবি নয়, বাংলা বইয়ের ব্যাপারেও এক জিনিস। দোকানে যান, বাংলা বই খুবই কম পাবেন। কলকাতা এত কাছে তবু বই আসে না। বই আনার অনেক বাধানিষেধ। কিন্তু অবাধে আসছে উলঙ্গ মেয়েদের ছবিওয়ালা নৃশংস রোমহর্ষক মার্কিনী বই।

বাংলা বইয়ের যে কী চাহিদা, আমাদের মধ্যে কয়েকজন দর্শনা থেকে ট্রেনে করে আসতে আসতে তা বিলক্ষণ টের পেয়েছেন। তাঁদের কাছে বেশ কিছু বই ছিল সম্মেলনে প্রদর্শনীর জন্যে। স্টেশনে স্টেশনে আর স্টিমারে লোকে তাঁদের ছেঁকে ধরেছে—বইগুলো বিক্রি করুন। যা দাম তার চেয়ে বেশি দামে কিনতেও তারা রাজী।

প্রদর্শনীতে যাঁদের বই ছিল, একটা কপির জন্যেই অসংখ্য লোক নগদ টাকা হাতে গুঁজে দিতে চেষ্টা করেছেন। এত চাহিদা অথচ পূর্ব-পাকিস্তানে দরকারমত বই ছাপা হতে পারছে না। কাগজ খুবই দুষ্প্রাপ্য। যাও বা পাওয়া যায়, যে দামে কিনে যে দামে ছাপাতে হয় তাতে খদ্দেরদের পক্ষে সে দামে কেনা সম্ভব নয়।

বাংলা বই যে এমন আকাঙ্ক্ষার জিনিস হতে পারে—পূর্ব-পাকিস্তানে না গেলে সত্যিই বোঝা মুস্কিল।

রাস্তায় যতটুকু ঘুরেছি, একটা জিনিস দেখে একটু অবাক না হয়ে পারিনি। অধিকাংশ দোকানেরই সাইনবোর্ড বাংলায়। কলকাতার সঙ্গে বেশ তফাত। শুধু বাংলাভাষা নয়, বাংলা হরফটাও যে কীভাবে পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ বুক দিয়ে রক্ষা করছে—তা চোখে না পড়ে পারে না।

অনেকেই আমাদের জিজ্ঞেস করেছে : আচ্ছা, আপনাদের ওপর হিন্দীর অত্যাচার চলে না?—জবাব হয়ত একটা দিয়েছি, কিন্তু মনে মনে কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করেছি।

ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আরও একটা দুর্বলতা ধরা পড়ল। বাংলাভাষায়

লেখালেখি করলেও অনেক বেশি ইংরেজি শব্দ কথাবার্তায় আমরা ব্যবহার করি। ষোল আনা বাংলা বলার দিকে এমনকি ইংরেজি-পড়া ছাত্রদেরও প্রবল ঝোঁক চোখে না পড়ে পারে না। সাধারণ লোকের মধ্যে এমনকি কাজকর্মের চিঠিপত্রও বাংলায় লেখারই রেওয়াজ বেশি।

পূর্ব-পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনের সারিতে বরাবর থেকেছে ছাত্ররা। ছাত্রদের অধিকাংশই এসেছে গ্রাম থেকে। ছুটি হলে গ্রামেই ফিরে যায়। অধিকাংশই কৃষকের বাড়ির ছেলে। তাই গ্রামের সঙ্গে নাড়ীর যোগ। লীগবিরোধী মনোভাব এত ব্যাপক হওয়ার পেছনে, নির্বাচনে লীগের পরাজয়ের পেছনে ছাত্রদের দান অসাধারণ।

প্রতিক্রিয়ার শিবির তা বোঝে। মার্কিন প্রচার-দপ্তর তাই ছাত্রদের বিপথে টেনে নিয়ে যাবার জন্যে দুহাতে টাকা ঢালছে। গ্রন্থাগার খুলে বিনামূল্যে তারা পাঠ্য বই ধার দিচ্ছে, ইউনিয়ন নির্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল ছাত্রদের দেদার টাকা জোগাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে মার্কিনী প্রভাব এমনভাবে উচ্চমহলে কাজ করছে যে, কুখ্যাত সোভিয়েট-বিদ্বেষী বই 'অ্যানিম্যাল ফার্ম' তারা ইন্টারমিডিয়েটে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করাতে পেরেছে।

কোন কোন গ্রন্থ-প্রকাশককেও মার্কিনপক্ষ এইভাবে হাত করছে। কাগজ যেহেতু দুষ্প্রাপ্য, সেইজন্যে তারা যোগাচ্ছে বিনামূল্যে কাগজ। শর্ত এই যে, তাদের নির্বাচিত বই বাংলা করে বার করতে হবে। সম্প্রতি একটি প্রকাশকের সঙ্গে একটি গল্পগ্রন্থের ব্যাপারে চুক্তি হয়েছে। মার্কিনপক্ষ প্রথমে তাদের কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষী বই গছাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু প্রকাশক প্রতিষ্ঠানটি লোকভয়ে তাতে রাজী হয়নি।

মার্কিন টাকা ছড়ানোর গল্প যে-কোন কাগজের অফিসে কিংবা লেখকদের আড্ডায় বসলে শুনতে পাবেন। অখণ্ড বাংলার একজন গদিচ্যুত নামকরা নেতা মার্কিন টাকায় রাজনৈতিক পার্টি খুলেছেন এবং নির্বাচনে শোচনীয়ভাবে হেরে গেছেন—প্রকাশ্যেই তাঁর সম্বন্ধে লোকে বলাবলি করে।

মার্কিনবিরোধী মনোভাব বিশেষ করে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক। তাছাড়া আইনসভার অধিকাংশ সদস্যই তো যুক্তভাবে পাক-মার্কিন চুক্তির বিরুদ্ধে সই দিয়েছেন।

সম্মেলনের ফাঁকে ফাঁকে ঢাকা শহরের মানুষের সঙ্গে যেটুকু কথা বলেছি, তাতে মনে হয়েছে—নিজের দেশের প্রতি ভালবাসায় আর আত্মবিশ্বাসে সেখানকার সাধারণ মানুষ আজ মাথা তুলে দাঁড়াতে আরম্ভ করেছে। পুরনো শৃঙ্খল তারা ছিঁড়বে, নতুন করে আর শিকল পরতে চায় না।

ভাষার প্রতি ভালবাসার ভেতর দিয়ে সাড়ে চার কোটি মানুষ আজ বাধামুক্ত নতুন জীবন প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে।

যে বর্ধমান রাজপ্রাসাদ নুরুল আমীনের বাসস্থান ছিল, সে প্রাসাদ আজ জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত। সে বাড়িতে বাংলাভাষার আকাদেমি হবে। সম্মেলনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা এই বাড়িতেই হয়েছিল। নুরুল আমীন কীভাবে দেশের মানুষের খুনে হাত রক্তাক্ত করেছে, প্রদর্শনী উপলক্ষে এই বাড়িতেই তার সচিত্র প্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছিল।

ভাগ্যের খুবই সামান্য, একটু নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র।

২৩ বর্ষ ৫ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

লাল-মাটি

'মালপত্তর সব সাবধান। চোর এই কামরাতেই আছে।'—পোস্টাপিসে দশটা-পাঁচটা কলম পিষে, দু-জায়গায় ছেলে পড়িয়ে, বৈঠকখানার বাজারে বাস্তুপুজোর বাজার সেরে স্টেশনে পা দিতেই শেষ লোকাল ছেড়ে যাওয়ায় সাতাশ-আটাশ বছরের যে ছোকরাটি অগত্যা আমাদের ট্রেনে উঠে পড়ে ঘুমে ঢুলছিল, চেকারবাবুর গলা শুনে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'অন্যমনস্ক হয়েছেন কি ঐ-য্-যাঃ হয়ে যাবে'—চেকারের বক্তৃতা শুনে সবাই একটু সামলে-সুমলে বসল। ওপরের বাঙ্কে এক মোটা ভদ্রলোক তুড়ি দিয়ে সশব্দে হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'এর নাম গয়া প্যাসেঞ্জার।'

ট্রেনে ভিড় ছিল না। বেঞ্চির ওপর জুতোসুদ্ধ পা তুলে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাত্তিরে মাঝরাস্তার কোনো স্টেশনে লোকজনের ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি কামরার মধ্যে গিজগিজ করছে লোক।

ট্রেনটা নড়ে উঠতেই দরজা খুলে ভেতরে লাফ দিয়ে পড়ল এক বৈরাগী। বয়স বেশি নয়। কুচকুচে কালো দড়িপাকানো চেহারা। মুখের মধ্যে চকচক ঝকঝক করছে এক জোড়া চোখ আর দু পাটি দাঁত। কিছুক্ষণ ধরে সমানে সে গজগজ করতে লাগল। আজকালকার ভদ্রলোকেদেরও বলিহারি। এতক্ষণ সে পাশের কামরাতেই ছিল, সঙ্গে টিকিট না থাকায় চেকার ডেকে প্যাসেঞ্জাররা তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে তাকে ষোলআনা পয়সা খামোখা দণ্ড দিতে হল। এ অন্যায় ধর্মে সইবে না, কিছুতেই নয়। লোকগুলো ওলাউঠো হয়ে মরবে।

চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল। হঠাৎ একতারার আওয়াজ শুনে তাকালাম। বৈরাগীর চোখদুটো বন্ধ। ভয় দেখাবার আঙুলটা দিয়ে তারের ওপর সে এখন মিষ্টি সুর তুলছে আর সেইসঙ্গে তন্ময় হয়ে গাইছে—

হরি, তোমায় ডাকিবার
আমার সময় কই?
কোথা কে দিবানিশি
আমি থাকি দিবানিশি কাজে মত্ত
আমি তোমার তত্ত্ব ভুলে রই।

হরি, সকালবেলায় মন করিলাম
জপিব এখন,
গোপাল এসে কোলে বসে
জুড়িল ক্রন্দন। ...

দুপুরবেলায় স্নান করে যখন

উঠিলাম ডাঙায়
নাগরীগণ কলসী কাঁখে
সম্মুখে দাঁড়ায়।
দেখে ঐ রূপের বর্ণ
হয়ে জ্ঞানশূন্য
আপনা আপনি ভুলে রই।

সন্ধ্যাবেলা আচমন করে
গিন্নি এসে গর্জন করে ...
ক্রমে ক্রমে রাত্রি হল
দ্বিতীয় প্রহর।
ক্ষুধার চোটে অঙ্গে ধরে কাঁপুনি—
বলে লক্ষ্মীকান্ত, চাল বাড়ন্ত
কে আনিবে তুমি বই। ...

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বোলপুরে যখন নামলাম, তখনও বেশ অন্ধকার। স্টেশনের হাতায় পোঁ পোঁ শব্দে হর্ন বাজাতে বাজাতে কণ্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে : জয়দেব-কেঁদুলি। জয়দেব-কেঁদুলি।

চায়ের লোভ ছাড়তে না পেরে প্রথম বাসটা ছেড়ে দিতে হল। দ্বিতীয় বাস ছাড়ল কড়া লিকারে দুধ পড়বার মত করে যখন রাত ফরসা হল। বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। জয়দেব অবধি এমনিতে বাস চলে না। মেলা বলেই চলছে।

সুপুর, রায়পুর পেরোতে দুধারে খোয়াই আর তালডাঙা। রামনগরের পর চৌপাহাড়ি জঙ্গল। অফুরন্ত শালের বন। জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট গ্রাম বল্লা। বন শেষ হলে সুখবাজার। তারপর এক দমে ইলামবাজারে এসে বাস একটু দাঁড়াল। বড় বড় বাড়ি। পুরনো মন্দির। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। ডানদিকে ঘুরে গেছে রাস্তা। বাস চলতে লাগল। পায়ের, হরিষা, সুনমুড়ি ছাড়িয়ে উত্তরকোণা। সর্ষেক্ষেতে সবুজ হয়ে আছে মাঠ। বাস এবার বাঁ দিকে বাঁক নিল। মাঠরাস্তায় ধুলো ওড়াতে ওড়াতে খানিক পরে এসে থামল টীকরবেতায়।

নদীর ওপারের গ্রাম বেতা। এপারে টীকরবেতা। টীকর মানে উঁচু। কেঁদুলির সঙ্গে এ গ্রামের শুধু গোটা কয়েক মাঠের ফারাক।

আমার তেমন মোটঘাটের বালাই নেই। কিন্তু আমার বন্ধুটির আধমণী সুটকেস আর হোল্ডঅল। দুজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যেতে হল। আমাদের কপাল ভাল, যে বাড়িটা চাইছিলাম সেটা হাতের কাছেই পেয়ে যাওয়া গেল। কড়া নাড়তেই বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন। আমাদের দিকে একটু অবাক হয়েই তাকালেন—'আপনারা?'

মনে মনে দমে গেলেও খানিকটা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতা থেকে।' যে অনুপস্থিত বন্ধুটির পরিচয়ের সূত্র ধরে আমাদের আসা, তাঁর নাম করে বললাম, 'চিঠি পাননি?'

'কই, না তো।'

শুনে আরও মিইয়ে গেলাম।

অবশ্য আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি ছিল না; প্রথমে এল হাতমুখ ধোওয়ার জল, তারপর লোভনীয় চা-জলখাবার। কিন্তু আমাদের তখন হে-ধরণী-দ্বিধা-হও গোছের অবস্থা। ভাবছি একটা ছুতো করে দুপুরের আগেই অন্য কোথাও সরে পড়তে হবে। শুধু আধমণী সুটকেস আর ঢাউস হোল্ড্অলটার দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময় ডাকঘরের পিওন এসে বাড়ির কর্তাকে চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটাতে চোখ বুলিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'দেখুন কাণ্ড, কবেকার লেখা চিঠি কবে এসে পৌঁছুল।' শুনেই বুঝলাম সেই চিঠি, যার অভাবে আমরা এতক্ষণ মরমে মরে ছিলাম।

সুতরাং খোশমেজাজে বেরিয়ে পড়া গেল মেলা দেখতে।

মাঠের আলরাস্তা ধরে গেলে কেঁদুলি মোটেই দূর নয়। কামারপাড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা গিয়ে পড়েছে মাঠে। হাতুড়ির ঠুক-ঠাক আর হাপরের কাঁপা-কাঁপা আওয়াজে গমগম করছে গোটা পাড়া। ঘরে ডাঁই হয়ে আছে বাসন। দাওয়ায় মহাজনের লোক ব'সে।

আলরাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় বাঁ দিকে খানিকটা দূরে সদর রাস্তা বরাবর সার দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি, মধ্যে বাস-লরি আর তিন চাকার টেম্পো। দুপাশে খেজুর গাছগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে ধুলো খাচ্ছে।

সামনে আধডজন ধানকাটা মাঠ। তারপরই অনেকখানি জায়গা নিয়ে সিনেমার তাঁবু। জেনারেটরের শব্দে মাত হয়ে আছে সারা তল্লাট। লাউডস্পীকারে চলছে অবিরাম হিন্দী গান। কাঁটাতারের বেড়ার ধারে একজন দাঁতন করছিলেন। বেড়ার এধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো চারটে কথা হল।

ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানি ওঁদের। বর্ষার কয়েকটা দিনই যা বসে থাকতে হয়। বছরের বাকি সময়টা মফস্বলে সিনেমা দেখিয়ে বেড়ান। হিন্দী নাচগানের ছবি হলে তো কথাই নেই। বাংলা ছবিও চলে। তবে সুচিত্রা-উত্তমের বই হওয়া চাই।

'তবে আর বলছি কী? গ্রাম কি আর সে গ্রাম আছে, মশাই!'

যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একটা পোস্টারে এক রংদার মেয়ে বুক চিতিয়ে আড়নয়নে চেয়ে হাসছিল। তাকিয়ে দেখি বেড়াটার গায়ে লোক ভেঙে পড়েছে।

দু-পা এগোতেই একেবারে মেলার আওতার মধ্যে এসে গেলাম। দোকানপাট উপ্‌ছে এসে পড়েছে মাঠে। স্তূপাকার হয়ে আছে দরজা-জানলার পাল্লা, গরুর গাড়ির চাকা, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, পাতকুয়োর পাটা।

রাস্তার দুপাশে সারি সারি দোকান। এক জায়গায় সাইকেল-রিক্সায় বসে কোনো এক বিড়ি কোম্পানির লোক মাইকে জোর বক্তৃতা দিচ্ছে। তার পাশে পর পর দুটো হোটেল। উনুনে চায়ের জল ফুটছে। তার ঠিক পরেই টিম টিম করছে একটা হুঁকোর দোকান। হুঁকোর খোল আসে কোচিন থেকে। আগে ছিল জমজমাট ব্যবসা। এখন গ্রামদেশে বিড়িটাই বেশি চলছে। বাইরে চলতে ফিরতে হুঁকো নিয়ে বড় ভজোকটো!

মোহন্ত বাবাজীর কাছ থেকে মেলার ডাক হয়েছে এবার হাজার তিনেক টাকায়। দোকান করতে গৈলে হাত হিসেবে ভাড়া। জায়গা বিশেষে তিন টাকা থেকে আট আনা হাত।

সংখ্যায় কাপড়ের দোকানই বেশি। খদ্দের বলতে বেশির ভাগই গাঁয়ের চাষী। এখন তারা ভালমন্দ বাছাই করতে, দরদস্তুর করতে শিখেছে। বলে, 'অমুক ধরনের শাড়ি।' ছাপা শাড়ির খুব চাহিদা। আগেকার দিনে? যা দেওয়া যেত তাই নিত। সাঁওতালরা আগে কিনত নিরেস ধরনের ছাপা রুমাল। এখন কেনে ভাল ক্যালিকো।

মনিহারি দোকানগুলোতে সাবান-পাউডার-পমেটম থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের শৌখিন জিনিস। দেখে বোঝা যায় গ্রামের গায়ে শহরের হাওয়া লাগছে। খেলনার দোকানে যত খেলনা সবই প্লাস্টিকের—কাঠের নয়, টিনের নয়, মাটিরও নয়।

অ্যালুমিনিয়ামের দোকান দেখে মনে হল, লোকের কাছে এখন অ্যালুমিনিয়মের বাসনপত্রের চাহিদাই বেশি। এ চাহিদা সাধ করে নয়, দায়ে পড়ে। কাঁসাপিতলের দাম যা! অবশ্য সুবিধেও আছে। খোয়া যাওয়ার ভয় কম।

মেলায় দোকান দেখতে হয় মিঠাইয়ের। থরে থরে ছাদ পর্যন্ত উঁচু করে সাজানো। রঙেরও বা কত বাহার। শ-তিনেক দোকান। গড়ে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার বিক্রি। রসটুকুও ফেলা যায় না। তাই দিয়ে বোঁদে আর জিলিপি হয়।

নদীর ধারের রাস্তা জুড়ে কাতারে কাতারে বসে আছে কুষ্ঠরোগী। ভন ভন করছে মাছি। দেখে গায়ের ভেতর কেমন করে ওঠে। আরও একটু এগিয়ে গোটা দুই বইয়ের স্টল। বটতলার বই। লক্ষ্মীচরিত্র। প্রেমের গোপনপত্র। রোগা হইবার সহজ উপায়। ভৈরবীতন্ত্র। যাদুবিদ্যা। লতাপাতার গুণ। সেইসঙ্গে কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত। আরও কত কী। যারা বই কিনবে তাদের এর ভেতর থেকেই পছন্দ করতে হবে। কেননা সব দোকানেই এই এক বই। কেন তারা শুধু বটতলার বইই রাখে? বটতলার বইওয়ালারা ওদের মোটা কমিশন দেয় যে।

পেন্ট-করা সিনের সামনে কালো কাপড়ে ক্যামেরা ঢাকা দেওয়া ফটোর দোকান। এসেছে চিৎপুর থেকে। মেলায় মেলায় ছবি তুলে বেড়ানোই এদের কাজ। রোজগার? তা রোজগার না হবে তো আসবে কেন? আজকাল তো মরলে ফটো, বিয়ে হলে ফটো, বিয়োলে ফটো, কাল রাত্তিতেই তো এক গাঁ থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। টাকাও পেয়েছে ভাল।

তার পাশেই একজন পয়সা নিয়ে ম্যাজিক শেখাচ্ছে। তার পাশে কাটামুণ্ডু। মৃত্যুকূপ। বিদ্যুৎকন্যা। আজব চিড়িয়াখানা।

চব্বিশ পরগণা থেকে এসেছে মাছ-ধরা জাল। নদীয়া থেকে আড়ি বা ধান মাপার ধামা। বর্ধমান, বৌবাজার, চালভাজা, খাঁপুর থেকে মাটির জিনিস।

মেলার শেষ প্রান্তে গিয়ে চক্ষু স্থির। গোটা পঞ্চাশেক কলার দোকান। জীবনে একসঙ্গে এত কলা কখনও দেখিনি। কলা নিয়ে এসেছে সতেরোটা ট্রাক। চন্দননগর থেকে, ব্যাণ্ডেল থেকে, কাটোয়া থেকে। একেক ট্রাকে গড়ে চারশো কাঁদি। একেক কাঁদিতে তিন পণ। বলতে গেলে এ মেলায় প্রায় সাড়ে ষোল লক্ষ কলা বিকোবে। খবরের মত খবর বৈকি। আগে এ অঞ্চলে কলা হত না; এখন বাজার আছে দেখে চাষীরা করছে।

পৌষ-সংক্রান্তির দিন আজ। গেরস্থরা লক্ষ্মীপুজো, পিঠেপরব নিয়ে ব্যস্ত। সাঁওতালদের বাঁধ্না পরব, পয়লা মাঘ ডোমহাড়িদের এখ্যানপুজো। মেলা কাল থেকে জমবে। লোকে জিনিস কিনবে ভাঙার মুখে। এখন দাম বেশির ভয়।

দুপুরটা গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে চা খেতে খেতে টীকরবেতায় আড্ডা বেশ জমল। পাড়ার এক বৃদ্ধ জয়দেবের মেলার গল্প বলছিলেন।

আগে দু-তিনটে জেলার বিত্তবানেরা মিলে কেঁদুলিতে মচ্ছব করতেন। আখড়াও ছিল শতখানেকের ওপর। এখন বিশ পঁচিশটায় এসে ঠেকেছে। নতুন আখড়া বলতে শিরসা-র পশুপতি নায়কের। তিন দিন ধরে খাওয়ানো, দিনে দুশো লোক খায়। দিনে একবার খাওয়া। সব আখড়া মিলে পাঁচ সাত হাজার লোক খায়। এর খরচ ওঠে কিছুটা জমিদারের দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে, কিছুটা বারোয়ারি চাঁদা থেকে, কিছুটা গুরুর দৌলতে।

বৈষ্ণবদের মেলা তিন দিন। কিন্তু বছর চল্লিশ আগে একমাস ধরে বাজার থাকত। তখনকার দিনে বাজারে প্রধানত বিক্রি হত মশলাপতি, তামাক, কাপড়; মনিহারি জিনিস আর চাষের যন্ত্রপাতি। এখন আর তামাক আসে না।

সে সময়কার জিনিসের দাম?

এখন শুনলে হাসি পাবে। দশ টাকায় সম্বৎসরের তামাক, মশলাপাতি কেনা যেত। টাকায় জিরে পাওয়া যেত আট সের, গোলমরিচ ছ সের, সুপুরিও ছ সের। একটা লাঙল চার আনা। জোয়াল ছ-আনা। তৈরি দরজা-জানালা তখন আসত না।

আমোদপ্রমোদ বলতে ছিল বৈঠকী গান। আসরে বসে কালোয়াতী গান গাওয়া ভাগ্যের কথা ছিল। আর হত বাউল গান। পরে বৈঠকী গান উঠে যায়। সে সময়ে আসত কীর্তনীয়াদের দলের মূল গায়েনরা।

মেলায় ডিম মাংস বিক্রি হত না। এখন ব্যবসাটাই প্রধান হওয়ায় বৈষ্ণবেরা আড়ালে পড়ে গেছে। বৃন্দাবনী ছাপের কাপড় আসত জয়পুর, বৃন্দাবন থেকে। এখন সে সব বন্ধ। কাপড় আসে এখন হাওড়ার হাট থেকে।

তেপাতি (তিন তাস), তেসুটি, ছক—এই নিয়ে সেখানে জুয়ো খেলা হত খুব। এখন উঠে গেছে।

জয়দেবের মেলার সময় দেওয়ানী আদালত বন্ধ থাকত। নানা জেলা থেকে বাবাজী মাতাজীরা আসত। দূরদূরান্তর থেকে আসত যাত্রীর দল।

আর শুনলাম খোটরে-বাবার গল্প। শ্মশানের বটগাছের কোটরে থাকত; সেই থেকে নাম হয়ে গেছে খোটরে-বাবা। অন্য জেলার লোক; মন্বন্তরের বছরে এ গাঁয়ে এসে প্রথম যখন আস্তানা গাড়ে, তখন তার ছোকরা বয়েস। কোটরে থাকতে থাকতে ভোলা ডোম তাকে একটা তালপাতার কুঁড়ে তৈরি করে দেয়। মেলায় যাত্রীরা এসে তাকে খাবারদাবার পয়সা দিত। তার কোনো জাতবিচার ছিল না। একবার হল কী, খোটরে-বাবার জড়িবড়িতে মোহন্তের অম্লশূল সেরে গেল। খুশি হয়ে মোহন্ত তাকে সোনার তাগা গড়িয়ে দিলেন। আর সেইসঙ্গে শ্মশানে তৈরি হয়ে গেল খোটরে-বাবার আশ্রম। এখন তার বিস্তর বিষয়সম্পত্তি। ফি বছর চব্বিশ প্রহর হরিনামসঙ্কীর্তন করে। চাষীরা সেই উপলক্ষে ঢেলে টাকা দেয়। সেই টাকায়

আজ তার বিঘে চল্লিশ জমি। এখন সে ঘোর বাবু। সেবাদাসী আছে।

আখড়ায় আখড়ায় এখন পাল্লা চলেছে কে বেশি চেলাচামুণ্ডা পাকড়াতে পারে!

রাত্তিরে মেলায় গিয়ে তা বিলক্ষণ টের পেলাম। বছর কয়েক হল এক বাবাজী রীতিমতভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। মাথার ওপর বাহারে চাঁদোয়া। রঙীন তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাবাজী ব'সে। পরনে তাঁর দামী সিল্কের গেরুয়া। বেশ গোলগাল চেহারা। চতুর্দিকে টাঙানো তাঁর ফটো। বেশির ভাগ ফটোই তাঁর সমাধি অবস্থায় তোলা। সেই সঙ্গে বিলি হচ্ছে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল। টেবিলের ওপর বিক্রির বই রয়েছে—বাবাজী কথামৃত। লাউডস্পীকারে কীর্তন হচ্ছে। ওপাশে পর্দাঘেরা জায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াই। স্তূপাকারে কুটনো কোটা। উনুনগুলোও যেন রাবণের চিতা। মাঝবয়সী হালফ্যাশনের কিছু মহিলা ঘোরাঘুরি করছেন। বাবাজী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখেশুনে সবদিক বজায় রেখে আসছেন। চারিদিক আলোয় আলো হয়ে আছে।

এদিক ওদিক ছোটবড় আরও অনেক আখড়া। যার যেমন ট্যাঁকের জোর তার তেমন জৌলুশ। কোথাও গান হচ্ছে লাউডস্পীকারে, কোথাও খালি গলায়। কোথাও ডে-লাইট, কোথাও হারিকেন।

বাউল এসেছে হাজারের ওপর। নানা জেলার নানা জায়গায় তাদের আখড়া। কাজ বলতে শুধু ভগবানের নাম।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফ্রয়েড-পড়া হেলথ্ সেন্টারের এক ডাক্তার। বিন্দুসাধনের সঙ্গে গাঁজার এবং আখড়ার সঙ্গে ভক্তদের সম্পর্ক নিয়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছিলেন। হঠাৎ দেখলাম বোষ্টম-বোষ্টমীদের দঙ্গলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আমার এক পরিচিত ছোকরা। 'কখন এলে'—শুনে সে কেমন যেন থতমত খেয়ে তাকাল। অন্যমনস্ক থাকায় আমাকে চিনতে তার এক মুহূর্ত লাগল। তারপর একটু রহস্যের মত করে আমাকে একপাশে 'শুনুন' বলে ডেকে নিয়ে গেল।

বলল : বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমার এক কাকা নতুন বিয়ে করেছিল। কাকিমা লেখাপড়াও একটু আধটু জানতেন। সেই সময় গ্রামে এক সাধু এসে গাছতলায় আস্তানা গেড়েছিল। একদিন দেখা গেল গাছতলা খালি। সাধু চলে গেছে। এদিকে কাকিমাকেও পাওয়া গেল না। সেই থেকে কাকিমা নিরুদ্দেশ। আজ এই একটু আগে হঠাৎ কাকিমাকে দেখলাম। গলায় কণ্ঠী, কপালে রসকলি। আমি এগিয়ে যেতেই ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেলেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

কথাটা শেষ করেই কাউকে বোধহয় দেখে হন্তদন্ত হয়ে সে এগিয়ে গেল। ফ্রয়েডপড়া ডাক্তার ভদ্রলোকের কাছে ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেলাম।

পেছন থেকে কে একজন হঠাৎ আমার কনুই ধরে ফেলল। মুখ ঘুরিয়ে দেখি একজন চেনা লোক। নিচু গলায় বলল, গান শুনবেন? সেরা বাউলদের গান।

এক কথায় রাজী হয়ে আমরা তার পেছন পেছন চললাম। রাস্তাটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার। খানিকটা এগিয়ে একটা পাঁচিল। পাঁচিলের মাঝখান দিয়ে দরজা। ভেতরে ঢুকে মনে হল কোনো আশ্রম! উঠোনের একপাশে একটা শান-বাঁধানো বেদী। টিম টিম করছে

একটা দুটো হারিকেন। মধ্যিখানে আগুন। চারিদিকে কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একতারা বাজছিল। উঠোনে জুতো খুলে রেখে আগুনের কাছে উঠে বসলাম। বেশ শীত। রাতও হয়েছে মন্দ নয়।

আগুনটাকে প্রায় কোলের মধ্যে নিয়ে বোম হয়ে বসেছিল এক বুড়ো থুত্থুরে বাউল। হাতে তার ন্যাকড়া জড়ানো একটা কল্কে। কাঁপা কাঁপা হাতে চিমটে দিয়ে কল্কেতে আগুন চড়িয়ে সামনেই একজনের হাতে দিল। একতারাটা নিয়ে এতক্ষণ সে শুধু টুং-টাং করছিল। স্বর আসছিল না।

পেছন থেকে কে একজন খুরিতে করে চা এগিয়ে দিল। শীতের মুখে গরম চা বেশ জমল! খুরিটা নামিয়ে রাখতে কানে এল এবার গবগবিয়ে একতারা বাজছে। বাউল এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। গানও শুরু হয়ে গেল :

ওগো নাগরি,
জাত গেল পেট ভরল না গো
গাগরী। ...
গোসাঁই কবির চাঁদে কয় :
মোদের নাইক লাজ ভয়,
সবাই মিলে বল
মোদের গৌরহরির জয়।

আসর দেখতে দেখতে জমে উঠল। টিমটিমে আলোয় ভাল করে কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না। ছায়াগুলো মাঝে মাঝে নড়ে নড়ে উঠে কেমন একটা রহস্যের জাল বুনে চলেছে। গান একজন শেষ করে তো আরেকজন ধরে :

মানুষে কী আছে,
মানুষ আসতেছে আর যাইতেছে।
মানুষে কী আছে।
আমার আমায় রেখে আসছে মানুষ,
ভবের হাটে মানুষ বসে তার কাছে।
মানুষে কী আছে।
হৃদয় মাঝে কল আছে।
নিচে কলের যোগ আছে,
চারিদিকে চার ডাল আছে—
মানুষ পাতায় নড়তেছে।
...মানুষে কী আছে!

উঠে আসব আসব করছি। দরজা ঠেলে কে একজন ঢুকতেই আসরটা কলবলিয়ে উঠল। তার হাতেও একতারা। মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। পৈঁঠের ওপর ঝুলি রেখে বসতেই

কল্কেটা এগিয়ে গেল। তারপর কষে কয়েকটা টান। ঠিকরানো আলোয় লোকটার মুখের ওপরদিকটা বারকয়েক ঝিলিক দিয়ে উঠল। কোথায় যেন দেখেছি দেখেছি মনে হল।

একতারায় একটা চেনা সুর বেজে উঠল। তারপরই শুরু হল গান :

হরি তোমায় ডাকিবার
আমার সময় হল কই ...

গলাটা খুবই চেনা। সঙ্গে সঙ্গে গয়া প্যাসেঞ্জারের কথা মনে পড়ে গেল। সেই বিনা-টিকিটের যাত্রী বাউল—পাশের কামরার ভদ্রলোকদের যে শাপমুন্যি দিয়েছিল।

আধো-আলো আধো-অন্ধকারে লোকটা সুরের এমন এক মায়াজাল বিছিয়ে দিল যে, কিছুতেই উঠে আসতে পারলাম না।

বাইরে বেরিয়ে বাউলদের ভিড় ঠেলে আসতে আসতে একজন বলল, 'ঐ দেখুন, এক বোষ্টম বোধহয় এক বোষ্টমীকে ভাংচি দিচ্ছে!'

মেলায় নাকি আকছার হয়।

তার বোধহয়টা মেলার ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে বন্ধু ফিরল কলকাতায়। আমি চললাম মল্লারপুর। সেখান থেকে হাঁটাপথে যাব নিমপাহাড়ি।

মল্লারপুরের এক বাড়িতে স্নানখাওয়া সেরে, বেলাবেলি রওনা হওয়া গেল। শুনেছিলাম ঝুমুরের দল আছে এখানে। খোঁজ নিলে মন্দ হত না। কিন্তু কথাটা তুলতেই গাঁয়ের লোকেরা এমনভাবে মুখ বিষ করে তাকাল যে, ও নিয়ে আর এগোবার সাহস হল না। স্পষ্টই বুঝলাম গাঁয়ের লোক ওদের পাড়ায় যাওয়াকে ভাল চোখে দেখে না। ওদের নাকি সব নোংরা ব্যাপার-স্যাপার।

রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে যেদিকেই তাকাই, সেইদিকেই দেখি দীঘি। আর সব দীঘিই তালদীঘি। এই একটা গাঁয়েই নাকি শ-দুই দীঘি! চোখে যা দেখলাম শুনে খুব অবিশ্বাস হল না। গরুর গাড়ির চাকা-বসা লম্বা রাস্তা। অনেক দূরে আকাশের গায়ে মেঘ-মেঘ পাহাড়। রাজমহল।

ক্রোশখানেক যাওয়ার পর গাড়ির রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিল। বাঁদিকে ঘাগার বন। বনের পায়ে-চলা রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। কথায় বলে নদীর কুল আর শালের মূল—যেমন গরম তেমনি ঠাণ্ডা। লাল কাঁকর-মেশানো অদ্ভুত মাটি। জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়ে আছে ঝামা-পাথর। পায়ের দিকে না তাকিয়ে চললে হোঁচট খাওয়ার ভয়। বনের ভেতর এঁকে বেঁকে গেছে রাস্তা।

যেতে যেতে গাছ দেখি আর নাম জিগ্যেস করি। পাতা দেখেই বুঝতে পারি কোন্‌টা শাল আর কোন্‌টা সেগুন। মহুয়াও পারি। আম জাম কাঁঠালের তো কথাই নেই! কিন্তু পিয়াল গাছ আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ল না। জেওলা আর চাকলতাও নয়। ধোয়া আর মুরগা তো নয়ই। মুরগা গাছের ভাল কাঠ হয়। আর আছে গাব, করমচা, বৈঁচি, বনফুল, বকুল, অনন্তমূল, শতমূলী, হরিতকী আমলকী, বহেড়া। ঘাগার বনে পাওয়া যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড

খাম আলু—একেকটার আধমণ, তিরিশ সের ওজন।

খরগোশ আর বেজী ছাড়া কোনো জন্তু চোখে পড়ল না। শুনলাম বনে সাপ তো আছেই, বাঘ আর শুয়োরও আছে। খরগোশকে এখানকার লোকে বলে 'শশ'; নখীর চেয়ে খুরীর মাংসে স্বাদ বেশি।

পাখির মধ্যে এ বনে পাওয়া যায় ময়না, টিয়া, ট্যাঁশকোনা, শালিখ, কোকিল, কাকাতুয়া, চোখ-গেল, বউ-কথা-কও। শিকারের পাখির মধ্যে তিতির, গেরুল, ডাহুক, ঘুঘু। গেরুল পাখিকে মুরগাভিও বলে।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ মালুম হচ্ছিল ক্রমশ উঁচুর দিকে উঠছি। খানিকটা খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আবার হয় গাছের জটলা, নয় কাঁটাবন। কাঁটা একবার কাপড়ে বিঁধলে ছাড়ানো মুস্কিল।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সামনে এঁকে বেঁকে গেছে একটা খাল। খাল পেরোবার সাঁকোয় পৌঁছুতে আরও বেশ খানিকটা হাঁটতে হল। পশ্চিমে সূর্যের বেশ চোখ-ঢুলুঢুলু অবস্থা।

খাড়া রাস্তায় বেশ খানিকটা উঠতে হল। উঠেই নিমপাহাড়ি। সামনে কয়েকটা টোপাকুলের গাছ। তার আড়ালে টুর্কুদার বাড়ি। তেষ্টাও পেয়েছিল খুব। কিন্তু সব উৎসাহ জল হয়ে গেল যখন শুনলাম টুর্কুদা বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গেছে পরব করতে। বউ থাকবে। টুর্কুদা রাত্তিরে ফিরবে খাওয়াদাওয়া সেরে।

নিমপাহাড়ির টুকরো টুকরো কিছু খবর পরে টুর্কুদার কাছে পেলাম। টুর্কুদারা অনেক পুরুষ ধরে এখানে। এ গাঁয়ে আগে দুশো আড়াইশো ঘর লোকের বাস ছিল। টুর্কুদার ছেলেবেলাতেই তো এ গাঁয়ে একশো ঘর লোক ছিল। এখন পঁচিশ ঘর লোকে এসে ঠেকেছে। এ গাঁয়ে হাঁসদা, টুডু আর বেসরাদের বাস। মুরমু, মারডি, কিস্কু, হেমব্রম, সোরেন, চঁড়েরা থাকে অন্য অন্য গাঁয়ে। টুর্কুদার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে; টুর্কুদার বউ গীতার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। টুর্কুদার শ্বশুরদের পারিশ হল মারডি।

টুর্কুদার কর্তাবাবা শালকুর ছিল তিন কুড়ি বিঘে জমি। তার সাত বেটা, দুই মেয়ে। খরার বছরে পাঁচ মণ ধান কর্জ করেছিল বলে আট দশ বিঘে জমি মহাজনের পেটে চলে যায়। এ গাঁ ছেড়ে যারা আসামের চা-বাগানে কিংবা বর্ধমানে পালিয়ে গেছে, তারা সবাই গেছে অজন্মায় জমিহারা হয়ে। টুর্কুদারা পাঁচ ভাই : রেঙা, মোড়ল, টুর্কু, রাকদা, লুসু। শুধু সেজো আর ছোটই এখন বেঁচে। পাঁচ ভাইয়ের ছিল পাঁচ বিঘে পৈতৃক জমি। এখানে জমি বলতে সবই প্রায় ডাঙা জমি। বৃষ্টি হলে তবে ফসল হয়। ভাল বৃষ্টি হলে বিঘেতে পাঁচ ছ-মণ হবে। জষ্ঠি মাসে বুনলে ভাদ্দরে ওঠে কদু ঘাস। বিঘেয় এক মণ। কদুতে চাল হয় মণে তিরিশ সের।

পাশেই কলাইপাহাড়ি জঙ্গল। জঙ্গলটা আগে ছিল মোহন্ত ভগবানদাসের। জমিদারি উচ্ছেদের পর এখন সরকারী বন। এই বনের কিছু কিছু জমিতে সাঁওতালরা আগে মকাই চাষ করত। জমিদার তার ভাগ নিত। বন সরকারী হওয়ার পর সাঁওতালদের চাষ বেবাক বন্ধ।

এ জমিতে ভাল হয় বরবটি-কলাই। ভাল করে সার দিলে বিঘেতে চার-পাঁচ মণও হতে

পারে। সয়াবিনের চাষও হতে পারে। এ জমিতে আর ভাল হয় কাঁঠাল গাছ। আশেপাশে পতিত জমিও কিছু আছে যেখানে চাষ হতে পারে। কিন্তু সেচের সমস্যাই আসল।

এদিকে ক্যানেলটা যেভাবে কাটা হয়েছে, তাতে ডাঙা জমির জল ডামড়ার মাঠে যেতে পারছে না। ক্যানেলের বাঁধে সে জল আটকে যাচ্ছে। আগে বনের পাতা-ধোয়া জল জমিতে সারের কাজ করত। এখন ডামডার মাঠে ক্যানেলের জল না নিলে চলে না। সে জলে আগেকার মত ফসল হচ্ছে না। আবার ক্যানেলের জলও ফি বছর পাওয়া যায় না।

এ অঞ্চলে কাঁদরের জল আসে পাহাড়ের ঝরণা থেকে। দু-দোণ, তিন দোণ জল। বারো মাসই কিছু না কিছু থাকে। বাঁধ দিয়ে জল জমিয়ে রাখলে এ অঞ্চলের চেহারা বদলে যায়। চার-পাঁচটা বাঁধ হলেই হয়। নিজেরা চাঁদা তুলে করবে সে উপায় নেই। খাজনাই দিয়ে উঠতে পারে না, চাঁদা দেবে কোত্থেকে? তবে তারা গতরে খেটে দিতে রাজী।

টুর্কুদারা বাড়িতে কেউ নেই দেখে, দূর থেকে মাদলের শব্দ শুনে ঝোলাঝুলি রেখে আমরা গেলাম নামালের দিকে গ্রাম দেখতে।

সূর্য ডুবে গেলেও বাইরে তখনও আলো। দূরে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে একটানা রাজমহল পাহাড়। জায়গায় জায়গায় তার একেকটা করে নাম। কোথাও বলে শালবনী, কোথাও মনসা, কোথাও বেনাগুড়িয়া, কোথাও বাঁশপাহাড়ি, কোথাও কাঠপাহাড়ি, কোথাও বলে কাঁড়াকাটা।

সবচেয়ে উঁচুতে নিমপাহাড়ি গ্রাম। তার আশেপাশে ছড়ানো রায়পুর, পলাশবনী, ধরমপুর, হুচুকপাড়া, উলপাহাড়ি, বড়জোল, গড়িয়া, আগুইয়া, হামিরপুর, ডামড়া। রায়পুরে বেশির ভাগ জোলার বাস; ডামড়ায় তেলী আর ঘোষ—আর আছে বাউড়ি, লেট, বাগ্দী, শুঁড়ী, ব্রাহ্মণ, বেণে, নাপিত।

ধরমপুর যেতে বেশ খানিকটা নামতে হয়। রাস্তার দুপাশে মজার মজার পাথর। দেখে মনে হয় কাঠের টুকরো, হাতে নিলে দেখা যাবে পাথর হয়ে গেছে।

উপরপাড়া আর নামালপাড়া মিলিয়ে ধরমপুরে একশো ঘর লোক। পুরোপুরি সাঁওতালদেরই গ্রাম। উপরপাড়ায় গরিব কিষাণ, মাহিন্দার আর ভাগচাষীরা থাকে; এদের বলে রাঙাই হড়। আর নামালপাড়ায় থাকে কিষণ হড়—তাদের ঘর-গৃহস্থি আছে।

মাদলের আওয়াজ হচ্ছে নামালপাড়ায়। আমরা সেইদিকেই ছুটলাম। কাল এ গাঁয়ের বন-ঝাড়ার দিন। সবাই তাই নেচে গেয়ে তৈরি হচ্ছে। বাঁধ্না পরবের শেষ হয় বন-ঝাড়া দিয়ে। গাঁ-সুদ্ধ লোক জঙ্গলে শিকারে যায়—তারই নাম বন-ঝাড়া।

বনে সারা দিন চুঁড়েও একটা দুটো খরগোশের বেশি কিছু মিলবে না। গোটা গাঁয়ের তাতে কী হবে? একেক দিন একেক গাঁয়ের বন-ঝাড়বার পালা। তাও আগেকার সেই জঙ্গল আর সেই জঙ্গলে আগের মত শিকার থাকলে কথা ছিল। সারাদিন বন ঠেঙিয়ে সন্ধ্যেবেলা যার যার বাড়ির শুয়োর-মুরগি মেরে পরবের ভোজের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু শিকার না মিলুক, বন-ঝাড়ার দিন আরও নানা মজা হয়—জোড়ায় জোড়ায় শিকার যতটা নয়, শিকারের ভান করে তার চেয়ে বেশি মজা মেলে। এই রং-তামাসায় ঘর বাঁধেও, আবার ঘর ভাঙেও।

চাল কুট্‌তে কুট্‌তে এসব কথা বলছিল গাঁয়ের এক বুড়ি। বুড়িকে বললাম, গান শোনাও।

প্রথমে গাঁইগুঁই করল, তারপর কাঁসার বাটিতে গরম চা এগিয়ে দিয়ে একটার পর একটা গান শোনাল। সোজা বাংলায় গানগুলো এই :

অনেক কুটুম এসেছে
ছোট ছোট মুরগি আর শুয়োর
আমি ভাগ করতে পারব না, বাবা—
তুমিই কুলিয়ে দাও, বাবা।
এতদিন বাঁধ্না কোথায় ছিলি?
পৌষ মাসের
কুড়ি দিন পুরতেই
আমি আস্তে আস্তে চলে এলাম।

যেমন যেমন
পৌষ মাস ফুরোচ্ছে
আমিও তেমনি
এগিয়ে এগিয়ে আসছি।

আজ তো স্নান হল
দলমাদল পুকুরে;
ঘরে কাল শুয়োর-মুরগির পুজো হবে।

ঘর তো বড় বটে,
লোক মেলাই।
জলকলসি তো নেই,
লোক মেলাই।
কলসি কী হবে?
ঘরে তো আছে পাঁচ ঘড়া
ঘড়া দিয়ে পুকুর থেকে জল আনো।

নামালপাড়া থেকে যখন উঠলাম, সঙ্গের হারিকেনটা জ্বালতে হল।

৩২বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৬৯
[সুবচনী নামে প্রকাশিত]

এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

সুন্দরবনে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। ফিরলাম কোলাঘাট থেকে। শুনলে লোকে হাসবে।

যখন মোমিনপুরের মোড়ে বাস ধরব বলে দাঁড়ালাম তখন গরমের ঠিকদুপুর। গলা পিচের ওপর ঠিক্‌রে পড়ছে রোদ। চোখ চাওয়া যাচ্ছে না। মোমিনপুরের আকাশকেও বলিহারি। আকাশ তো নয়, যেন আদেখলের ঘটি। ৬৬নং বাসটাও এল রোদ্দুরে বেজায় মাথা গরম করে। যাবে ডায়মণ্ডহারবার। সেখান থেকে বাস বদ্‌লে কাকদ্বীপ।

বাসের যাত্রীদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এ রোদ্দুরে সবাই বেরিয়েছে নেহাৎ দায়ে পড়ে। কেউ রুগীর জন্যে ওষুধ কিনতে, কেউ সওদা করতে, কেউ মামলা লড়তে শহরে এসেছিল। গাঁয়ের তালেবর লোকগুলোকে দেখলেই চেনা যায়। দশ আঙুলে আংটি, কিন্তু কাপড়টা ঠিক হাঁটুর ওপর তোলা। যেসব গঞ্জ-মত জায়গায় বাস বেশিক্ষণ থামে, সেখানে ডাব নিয়ে দরাদরি করবে, তারপর গজর গজর করতে করতে ডিবে থেকে বিড়ি বার করে উল্টোমুখে বারকয়েক ফুঁকে তারপর পাঁচসিকের লাইটার জ্বেলে ধরাবে।

একটা লোক আমার ঠিক পাশেই সিটের ওপর পা উঠিয়ে বসে ছিল। খানিকক্ষণ পর আর থাকতে না পেরে একটু রুক্ষভাবেই বললাম পা-টা নামিয়ে নিতে। লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে পা-টা নামিয়ে আধ-তোলা করে থাকল! প্রথমটা বুঝিনি, খালি পা মেঝেয় ছোঁয়াতেই তার পা তোলার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঝেটা তেতে আগুন হয়ে আছে। আর যাকে আমি পা নামাতে বলেছিলাম, আমার পাশের সেই লোকটির পায়ে জুতো নেই।

বেলাবেলি কাকদ্বীপে পৌঁছুব বলেই এমন ঠিকদুপুরে বাড়ি থেকে বেরুনো। বেলাবেলি কাকদ্বীপে পৌঁছুনো। আশ্চর্য! বছর পনেরো আগেও কথাটা কেউ ভাবতেই পারত না। কাকদ্বীপ তখন ছিল অনেক দূরের রাস্তা। নৌকোয় করে ছাড়া যাওয়াই যেত না। আসতে যেতে জোয়ার-ভাঁটার জন্যে বসে থাকতে হত। শহরে বন্দরে রাতটুকু অপেক্ষা করতে গিয়ে কত যে সব বিশ্রী বিশ্রী রোগ হত। খালের ওপর পুল আর সটান পাকা রাস্তা হওয়া অবধি কাকদ্বীপ তো এখন কলকাতার কোলের কাছে চলে এসেছে। ঘড়ি ঘড়ি বাস। এখন হুস্ করে গিয়ে হুস্ করে চলে আসা যায়।

আমতলা ছাড়াবার পর পেছনের একটা বাস হুস্ করে এগিয়ে যেতে একটা কাণ্ডই শুরু হয়ে গেল। রাস্তা এমন কিছু চওড়া নয়। পাশে হয় বড় বড় গাছের গুঁড়ি, নয় খাদ। আমাদের বাসের ড্রাইভারের মাথায় তখন রোখ চেপে গেছে সামনের বাসটাকে পেছনে ফেলতে হবে। বাসের অমন স্পীড জন্মে দেখিনি। রীতিমত ভয় করতে লাগল। সামনের বাসটা রাস্তা আটকে আটকে চলেছে। একটা গরুর গাড়ি সামনে পড়ায় আগের বাসটা যখন একটু থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন আমাদের বাসটা পাশের গড়ান জমিতে কাত হয়ে কীভাবে যে এগিয়ে গেল সে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। ড্রাইভারের ওপর কী রাগ যে হচ্ছিল বলবার নয়। এতগুলো

মানুষের (বিশেষ করে আমার) জীবন নিয়ে এমন ছেলেখেলা করবার কী অধিকার আছে তার? আগের বাসটাকে পিছিয়ে পড়ে যেতে দেখে খানিক পরে আবার ভালও লাগল। মোট কথা, প্রাণ হাতে করে শেষ পর্যন্ত সুভালাভালি ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে গেলাম।

কাকদ্বীপের বাস ছাড়তে তখনও খানিকটা দেরি ছিল। সেই ফাঁকে গঙ্গার ধারটা ঘুরে এলাম।

গঙ্গা না বলে হুগলী বললেই ঠিক বলা হয়। নাম যাই হোক, নদী এখানে প্রকাণ্ড চওড়া। মাঝগাঙের নৌকোগুলো এইটুকু এইটুকু দেখাচ্ছিল। পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে খুব হাসি পাচ্ছিল। ছেলেবেলার কতকগুলো ধারণা থাকে, বড় হয়েও মন থেকে কিছুতে যেতে চায় না। ডায়মণ্ডহারবারে সমুদ্র আছে, এ কথাটা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। বন্ধুবান্ধবেরা গাড়ি নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে যেত ফুর্তি করতে, বোধহয় তাদেরই কাছ থেকে শুনে থাকব।

খুব ছেলেবেলায় আমাদের লালবাজারের বাসার সামনে থাকত আমার এক ইস্কুলের বন্ধু। জাতে সুবর্ণবণিক। তাদের ছিল লোহালক্কড়ের বেশ ঢালাও ব্যবসা। গরমের সময় দু-চারদিন তাদের গাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় ময়দানে হাওয়া খেতে গিয়েছি। তাদের মুখ থেকে শুনতাম ময়দানে হাওয়া আসে ডায়মণ্ডহারবার থেকে। ময়দানে তখন ফেরি করে তপ্‌সে মাছ বিক্রি হত। শুনতাম তপ্‌সে মাছ নাকি মাছের রাজা। সাহেবসুবোরা খায়। এই তপসে মাছও নাকি ডায়মণ্ডহারবারের সমুদ্র থেকে আসে। আর যুদ্ধের সময় জাপানী গুপ্তচররা বঙ্গোপসাগর থেকে তো সটান ডায়মণ্ডহারবারেই নেমেছিল। আসলে মানচিত্রে যাই থাক, মনে মনে আমরা বরাবরই সমুদ্রকে ডায়মণ্ডহারবারের কোলে বসিয়ে এসেছি।

এককালে বাইরের জাহাজগুলো আসতে যেতে ডায়মণ্ডহারবারেই নঙ্গর ফেলত। সে আজ দেড়শো বছরেরও আগের কথা। আসতে মাল খালাস আর যেতে মাল তোলার কাজ প্রধানত এখানেই হত। তখন এখানে ছিল সারবন্দী মালগুদাম। গ্রামে খাবারদাবার জিনিসপত্র মিলত। পাশেই ছিল সাহেবসুবোদের কবরখানা। ডায়মণ্ডহারবার ছিল তখন খুব এক রংদার ফুর্তির জায়গা। দমদম নিয়ে পুরনো সেই একটা গান আছে না :

দেখো মেরি জান
কোম্পানি নিশান।
বিবি গিয়া দমদমা
উড়ি হ্যায় নিশান।
বড়া সাহেব, ছোটা সাহেব,
বাঁকা কাপ্তান,
দেখো মেরি জান,
লিয়া হ্যায় নিশান।

এ গান সে সময়ে ডায়মণ্ডহারবার সম্পর্কেও খাটত।

জলপথে ডায়মণ্ডহারবার উনপঞ্চাশ মাইল হলেও, গাড়ির রাস্তায় বত্রিশ আর ট্রেনে

আটত্রিশ মাইল। এককালে যে ডায়মণ্ডহারবারের নাম ছিল হাজিপুর, সে কথাটা লোকে এখন ভুলেই গেছে।

ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে কাকদ্বীপের বাস ছাড়ল। পুলটা পার হতেই দেখলাম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে লোকে কী সব দেখছে। 'এইখেনে, হ্যাঁ, এইখেনে'—কে একজন আঙুল দিয়ে দেখাল। পরে শুনলাম আগের দিন একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা লরি খালে পড়ে গিয়েছিল। জল থেকে লাশ তোলা হয়েছে আজ সকালে।

বেশ কিছুক্ষণ সারা বাস থমথম করতে লাগল।

বাইরে পড়ন্ত রোদে খাঁ খাঁ করছে মাঠ। মাঝে মাঝে বেড়া-দেওয়া উঁচু উঁচু ডাঙা জমি। বেড়ার গায়ে ঘুর ঘুর করছে ছাগল। এক জায়গায় মাঠের মধ্যিখানে একটা নিঃসঙ্গ শকুন।

এ রাস্তায় আগেও একবার এসেছিলাম। বাস তখনও চলতে আরম্ভ করেনি। তখন এ রাস্তায় যানবাহন বলতে ছিল একমাত্র ট্যাক্সি। শুধু ট্যাক্সি বললে ঠিক বলা হয় না, বলা উচিত বিশ্বম্ভর ট্যাক্সি। যেখানে গায়ে গা দিয়ে ছ-জনের বসবার জায়গা হয়, সেখানে যে কেমন করে ভেতর-বাইরে তিরিশ চল্লিশটা লোক এঁটে গেল—না দেখলে বিশ্বাস হত না।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটার কথা মনে আছে। সারা রাস্তা তার সঙ্গে কত কী সুখদুঃখের গল্প করতে করতে গিয়েছিলাম। লোকটা ছিল নেপালী। কিন্তু দ'খ্‌নো ভাষা বেশ রপ্ত করে ফেলেছিল। স্বভাবটা ভারি মিষ্টি। গালের ওপর প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ। যুদ্ধের সময় মিলিটারিতে ট্রাক চালাত। কোহিমার কাছে এক পাহাড়ে বাঁক নিতে গিয়ে খাদে পড়ে যায়। কী করে যে বেঁচে গিয়েছিল সেটাই আশ্চর্য। মিলিটারি থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পেটের ধান্ধায় অনেক জায়গায় ঘুরছে। বছর দুই দেশে যায়নি। ছোট মেয়েটার জন্যে মন কেমন করে। বাস হওয়ার পর থেকে এ রাস্তায় ট্যাক্সির আর কদর নেই। আবার কোথায় গেল সেই লোকটা?

মুকুন্দপুর, কাঁটিবেড়ে, মশামারি, কুল্‌পি, ট্যাংরার চড়া, করঞ্জলি পেরিয়ে সন্ধ্যে হব-হব সময়ে কাকদ্বীপে পৌঁছুলাম। সামনে নামখানার বাস দাঁড়িয়ে। বনবিভাগের আপিস নামখানায়। যেতে কতক্ষণ লাগে, কত ভাড়া, সব জেনে নিলাম।

বাসস্টপ থেকে ডায়নামোর ভটর ভটর আওয়াজ শুনছিলাম। বুঝলাম এ আওয়াজ বরাবর গেলেই কৃষক সম্মেলনের মণ্ডপ পেয়ে যাব। ক-দিন ওখানেই আস্তানা গাড়া যাবে। তারপর ঠিক করা যাবে কোথায় যাব।

সম্মেলনে বিস্তর চেনা লোক মিলে গেল। সব জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছে। আমার মত রবাহূতের সংখ্যাও বড় কম নয়। যাদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবেছিলাম তাদের সকলের সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল। সভা, মিছিল, সম্মেলনে যাওয়ার মধ্যেও একটা নেশা আছে। না যেতে পারলে মন খুঁতখুঁত করে। অথচ বক্তৃতা হলে যে মন দিয়ে শুনি, তা মোটেই নয়। আসলে নেশা। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া। একসঙ্গে বসে চা খাওয়া। দুনিয়ার হালচাল নিয়ে কথার তুবড়ি ছোটানো। খুব তেমন কাজের কাজ কিছু হয় না। কিন্তু মন বেশ হালকা হয়।

কাকদ্বীপে এই আমার প্রথম রাত কাটানো। হাটতলার কাছে একটা ছিটেবেড়ার ঘরে আমরা শোবার জায়গা পেয়েছিলাম। আলো ছিল না। মাটির মেঝেতে ঢালাও মাদুর। ঝোলাটাকে বালিশ করে শুলাম। শুয়ে শুয়ে অনেক রাত্তির পর্যন্ত গল্প। বেশির ভাগই চেনা মানুষদের খোঁজখবর নেওয়া। অমুক এখন কী করছে? সে কি! দালাল হয়ে গেছে? ভাবাই যায় না। মুখে কী গরম গরম কথা বলত। শুনলে ভারি মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ জীবনে এমন তো আকছার ঘটছে। খুব ভাল ছিল, এমনও কেউ কেউ ছিটকে গেছে। দূরের স্বপ্নটা হঠাৎ মুছে গিয়ে আপাতত সুখে থাকার চিন্তাটা নাকের ডগায় চলে আসে। তারা গরম গরম হাতে কিছু পেলেও, হারায় তার চেয়ে ঢের বেশি। নইলে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না কেন? দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পালায় কেন?

সকালে সম্মেলনে বসে নানা জেলার অবস্থা শুনলাম। চাষীর হাত থেকে অচাষীর হাতে জমি চলে যাচ্ছে। বেনামে জমি রেখে সিলিংকে কলা দেখানো হচ্ছে। নালিশ কবেও সুবিচার নেই। এ অবস্থা বেশিদিন চললে লোকে মরিয়া হয়ে উঠবে। সমস্যা যেমন জটিল, লড়াইও তেমনি জটিল। সোজা রাস্তায় হবার নয়। সমিতিতে সবাইকে জড়ো করতে না পারলে এর বিহিত হওয়াও শক্ত।

ফ্রেজারগঞ্জের একজনের সঙ্গে চায়ের দোকানে দেখা।

যাকে আমরা ফ্রেজারগঞ্জ বলি, তার স্থানীয় নাম নারায়ণতলা। ফ্রেজারগঞ্জের গায়েই বঙ্গোপসাগর। জায়গাটা সম্বন্ধে আগে থেকেই আমার খবর নেওয়া ছিল। দেড়শো বছর আগে বাংলার ছোটলাট সার এণ্ডরু ফ্রেজার এই জায়গাটা খুব পছন্দ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল এখানে একটা স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলবার। লোকে এসে এখানে যাতে বসবাস করতে পারে, তার জন্যে মাটি ফেলা আর জঙ্গল কাটার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া রাস্তাঘাট আর বাঁধও তৈরি করা হয়েছিল। নারায়ণতলা জায়গাটা সত্যিই খুব ভাল ছিল। দক্ষিণে ধু-ধু করছে বালিয়াড়ি, তারপর সমুদ্র। উত্তরে আর পশ্চিমে পাত্তিবুনিয়া খাল। পুবে সত্তরমুখী নদী আর পুকুরবেড়িয়া খাল। দুই বালির পাহাড়ের মাঝখানে মিষ্টিজলের প্রকাণ্ড ঝিল। কিন্তু ফ্রেজারসাহেবের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না। বহু টাকা ঢালবার পর বোঝা গেল খরচে পোষাবে না। জঙ্গল পরিষ্কার আর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে এই সময় কিছু বাড়ির ভিত পাওয়া গিয়েছিল, ভিতগুলোর কাছেই ছিল তেঁতুল আর মনসা গাছ। তাছাড়া এ জায়গার দক্ষিণপুবে পাওয়া গিয়েছিল চারটে ইটখোলার চিহ্ন আর কিছু ছড়ানো ইঁট। আগে কোনো এক সময়ে এখানে যে লোকালয় ছিল তাতে সন্দেহ থাকেনি।

সুতরাং ও অঞ্চলে অনেকদিন থেকেই আমার ঘোরবার সাধ। কিন্তু ফ্রেজারগঞ্জের লোকটি বললে, 'সুন্দরবনে এখন যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। খালবিল সব এখন শুক্‌নো। কোথাও ঘুরতে পারবেন না। সুন্দরবনে ঘোরবার সময় হল বর্ষা। নৌকোয় করে তখন যেখানে খুশি যত দূরে খুশি যেতে পারবেন।'

শুনে খুব দমে গেলাম। আসবার সময় সবাইকেই বলে এসেছি সুন্দরবনে যাচ্ছি। সুন্দরবন যাওয়া মানেই তো প্রায় ডোরাকাটা বাঘের সামনে পড়া। ফিরে গিয়ে জায়গাবিশেষে খানিকটা

বানিয়ে না বললেও তো মান থাকবে না। কাজেই সুন্দরবনের একটা মোটামুটি চেহারা পাঁচমুখে জেনে নিতে হল।

যা শুনলাম তাতে সুন্দরবন খুব একটা সুন্দর জায়গা বলে বোধ হল না। আসলে ভাটির দেশ। চারিদিকে শুধু সরুমোটা নদী, খাল, খাঁড়ি, জলা আর চড়া। কোনো চরে শুধুই জলকাদা, ছোট ছোট গাছ-আগাছার জঙ্গল। উত্তরের যেসব চরে বাঁধ আছে, সেখান ভাল ধান হয়। সুন্দরবনের বন বলতে একটানা ছোট গাছের জঙ্গল। বড় গাছ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ ফুটের চেয়ে লম্বা গাছ খুব কমই আছে। আগে যদি কোথাও বন হাসিল করা হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে দেখা যাবে এখন খুব ভাল বড় গাছ হয়েছে। জঙ্গল ঘন আর মাটি নোনা বলেই সুন্দরবনে গাছ ছোট। আগেকার হাসিল করা জায়গায় আগাছা কম, বেতবন আর কাঁটাঝোপই বেশি। বর্ষার সময়েই যা গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। নদীর ধারে ধারে এক রকমের হলুদ ফুলের বিচিত্র গাছ হয়, যার ফুলগুলো ঝড়ে পড়ে গেলে রং হয় লাল। জোয়ারের জলে এই লাল লাল ফুল যখন ভেসে যায়, তখন তার ওপর রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখায়! আর আছে ঢোলা পাতাওয়ালা গোলপাতার গাছ। নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে হয় সবুজ কেয়াগাছের ঝাড়। পাতাগুলো জলে নুয়ে পড়ে।

যেখানে কাকদ্বীপের বাসস্ট্যাণ্ড, তার পাশেই খালপুলের নিচে সারি সারি নৌকো বাঁধা রয়েছে কদিন থেকেই দেখছি। নৌকোর ওপর লাল রঙের নিশান দেখেই বোঝা যায় তারা সম্মেলনের লোক নিয়ে এসেছে। ওদের খাওয়া-থাকা সবই নৌকোয়।

সম্মেলন ভাঙবার দিন হঠাৎ একটা প্রস্তাব এসে গেল : 'যাবেন আমাদের সঙ্গে নৌকোয় মেদিনীপুর?'

আমি তো তক্ষুনি রাজী। ঠিক হল, রাত দশটায় আমি যেন খাওয়া-দাওয়া সেরে সটান নদীর ঘাটে চলে যাই। জোয়ারের মুখে হল্‌দিয়ার নৌকো ছাড়বে।

আমরা সবাই ঠিক সময়েই পারঘাটার মুখে এসে জড়ো হয়েছিলাম। খানিক পরে 'এসো গো' বলে খালের মুখে হাঁক শোনা গেল। অন্য সকলের দেখাদেখি আমিও ছুটলাম। খানিকটা যাওয়ার পরই জুতো খুলতে হল। বেজায় কাদা। নৌকোর কাছে হাঁটুজল। অত কাণ্ডকারখানা করে যাওয়ার পর শুনলাম নৌকো ছাড়তে এখনও ঢের দেরি। সামনে একজনের হাতে হারিকেন। সামনে সমস্তই ছায়া ছায়া। অনেকক্ষণ কাদাজলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কে একজন বলল, 'এসব জলে বড় কাঙট, ডাঙায় ওঠো হে, হ্যাঁ—।'

নৌকো ছাড়ার ব্যাপারটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না। ঘাটে চাঁদের আলো ছাড়া কোনো আলো নেই। দলের একজনই আমার চেনা। তাকেও ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেললাম। একজন যেন মনে হল আমাদেরই দলের। তাদের সঙ্গে যেখানে এসে উঠলাম তার পাশেই লঞ্চ-স্টিমারের জেটি। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। আঁশটে গন্ধে বেশ বুঝলাম এটা মাছ-ওঠার ঘাট। আবছা অন্ধকারে মাছের খালি চুপড়িগুলো এতক্ষণে ঠাহর করতে পারলাম। যে দলটাকে ছেড়ে এসেছিলাম, ফিরে গিয়ে তাদের পাশেই একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম। তারপর সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি

না। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখি বারান্দায় আমি একা। দলের সবাই উঠে চলে গিয়েছে। ভারি রাগ হল। আমি তো এখানেই ছিলাম, ডাকল না কেন? উঠে এখন যাবই বা কোথায়? রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দিই। তারপর সকালে উঠে বাড়িরে ছেলে বাড়ি।

রাত তিনটে সাড়ে তিনটের সময় হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

'হল্‌দিয়া যাবে গো, হল্‌দিয়া।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলাম। আমি তো হল্‌দিয়াতেই যাব। আর এক মিনিটও দেরি করা নয়। জুতোজোড়া হাতে নিয়েই খালমুখে ছুট লাগালাম। কাদার ভেতর দিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে নৌকোর কাছে গেলাম। নৌকোর মাথার ওপর থেকে একজনের গলা পেলাম। 'আসুন, আসুন —খপ করে আসুন। ছিলেন কোতায় এতবেলা? আমি তো ভাবতে ছিলাম আর এলেনই না।' দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। চোখে ভাল করে ঠাহর হচ্ছিল না। ওঠবার পর বুঝলাম নৌকোটা প্রায় দোতলা সমান উঁচু।

নৌকো যখন ছাড়ল, তখনও অন্ধকার। ঘাটের যে আলোগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম, আস্তে আস্তে সেগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল। একটা বন্ধ ভাব। হাওয়ায় রীতিমত শীত-শীত করছে। ডানদিকের আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া আলো। এবার আমরা উত্তরমুখো চলেছি। আরো খানিকক্ষণ পর আলো যখন আরও স্পষ্ট হল, তখন চেয়ে দেখলাম কোনো দিকে কোথাও মাটির কোনো চিহ্ন নেই। জলের এত বড় ঢেউ জন্মে দেখিনি।

কোথায় এসে পড়লাম? এ নদী, না সমুদ্র? নদীতে কখনও এত উঁচু ঢেউ হয়? এতক্ষণে পুরো নৌকোটা নজরে পড়ল। একে বলে বোটনৌকো। এ নৌকোয় করে লোকে সাগরে যায়। পালে পুরো হাওয়া লাগছে। নৌকো চলেছে সাঁই সাঁই বেগে। একটা ধার একেবারে কাত হয়ে গেছে। আমরা সেই দিকটায় বসে। ঢেউয়ের ফেনাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে গায়ে এসে লাগছে। জলে গড়িয়ে পড়ার ভয়ে মাঝে মাঝে উঠে বসতে হচ্ছিল। নৌকোর মাঝখানটায় হঠাৎ একটা খোদল চোখে পড়ল। উঁকি দিয়ে দেখলাম সরু একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। একজন লোক ওপর থেকে উঠে সেই সিঁড়ি দিয়ে খোলের মধ্যে নেমে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম খোলের মধ্যে যে একজন বমি করছে। নৌকোর দুলুনিতে যাদের গা পাকিয়ে ওঠে, শুনলাম তারা খোলের মধ্যে বসে যায়।

ঢেউয়ের ছিটে আর ঝিরঝিরে হাওয়া খেতে খেতে নৌকোর টঙে বসে যেতে আমার বেশ ভাল লাগছিল। ভয়টাও আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে চলেছে কমবয়সী একটা ছেলে। বছর বাইশ বয়স। মেছেদায় পানের বরজ আছে। নিজে হাতে চাষ করে। এটা ওটা তাকে জিগ্যেস করছিলাম।

আছিপুর জানেন তো? গঙ্গা যেখান থেকে বাঁক নিয়েছে। দামোদর আর রূপনারায়ণের জল পড়ে হুগলী পুবে আট মাইল বেঁকে গেছে। ডায়মণ্ডহারবারের পর থেকে হুগলী আবার দক্ষিণবাহিনী। সাগরে পড়বার আগে মোহানাটা প্রায় ষোল মাইল চওড়া। এই মুখকে লোকে বলে বুঢ়া মন্ত্রেশ্বর। সাগরে পড়বার আগে হুগলী দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এরই জোড়ের মুখে সাগরদ্বীপ। সাগরদ্বীপের পুবে যেটা গেছে সেইটাই বারতলার মোহানা। লোকে বলে

মুড়িগঙ্গা। নানা খাঁড়ির জল নিয়ে এই ধারাটা ধোবলাটের পুবে সমুদ্রে পড়ে।

সাগরদ্বীপের কথা বলতে বলতে ছেলেটা মজনতালি সঈফের গল্প বলল। মজনতালি সঈফ গঙ্গাসাগরের এক পীর। একদিন নাপিতের কাছে খেউরি করতে করতে পীর হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। নাপিত তো ক্ষুর হাতে নিয়েই বসে আছে। বেশ খানিকক্ষণ পরে পীর এসে হাজির হল। গা দিয়ে তার দর দর করে ঘাম ঝরছে। নাপিত জিগ্যেস করল, হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেলে কোথায়? পীর বলল, চড়ায় আটকে গিয়েছিল জাহাজ; খালাসীরা তাই ডেকেছিল। কী আর করি, টানতে টানতে জাহাজটাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম। নাপিত কিন্তু পীরের কথা বিশ্বাস করেনি। ফলে, তার কী শাস্তি হল জানেন? সেইদিনই সে আর তার বাড়ির সবাই শিঙে ফুঁকল।

বলে ছেলেটা হো হো করে অবিশ্বাসীর হাসি হাসতে লাগল।

কিন্তু তার পরের প্রশ্নটা শুনে আমি থ হয়ে গেলাম।

'পাতালে এক ঋতু পড়েছেন আপনি?' পড়িনি শুনে খুব অবাক হল। বলল, লেখক দীপকবাবু আমাদের ওদিকে এসেছিলেন একবার একটা মিটিঙে। আমার সঙ্গে খুব তর্ক হয়েছিল।

খানিকক্ষণ কথা বলেই বুঝলাম হালের কোনো উপন্যাসই তার না-পড়া নয়।

মাঝে মাঝে একেকটা চর যায় আর ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, বুঝলেন এটা ঘোড়ামারার চর, এটা লোহাচর। কোনো কোনো চরে নাকি পোস্টাপিস আছে, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে, তাও ওর মুখ থেকেই শুনলাম।

যেতে যেতে আকাশে রোদ বেশ ভালভাবেই উঠে গেল। কিন্তু জলো হাওয়া থাকায় একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। সামনে একঘেয়ে জল নেই আর। দু-পা গেলেই একটা করে চর। জেমস-অ্যাণ্ড-মেরী চড়ার নাম শোনেননি? বহুকাল আগে সেই চড়ায় আট্‌কে একটা জাহাজ ডুবেছিল। জাহাজটার নাম ছিল রয়াল জেমস্ অ্যাণ্ড মেরী।

ডেকে দেখাল বাঁদিকে হল্‌দি এসে হুগলীতে পড়েছে। রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। দেখতে দেখতে হল্‌দিয়া এসে গেল। নতুন বন্দর হচ্ছে হল্‌দিয়ায়। চারদিকে তার তোড়জোড়ের চিহ্ন। নদীর বেশ খানিকটা ভেতরে জেটি। জলের ওপর বড় বড় বয়া ভাসছে।

ডাঙায় নেমে অনেকের সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি হল।

বাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তা। আমরা যাব রানীচক। সন্দিয়ার চক হয়ে দক্ষিণ রানীচকে যখন পৌঁছুলাম, তখন বেশ বেলা হয়েছে। এ গাঁয়ে থাকে পতিতদার এক মামাতো ভাই। ভুবন জানা। চায়ের জন্যে তখন মরে যাচ্ছি। ভুবন জানার মা কিন্তু নাছোড়বান্দা। দুধচিঁড়ে খাইয়ে ছাড়লেন।

গাঁয়ে যার সঙ্গেই কথা বলি এক কথা। হল্‌দিয়ার বন্দর হবে। আস্তে আস্তে রাস্তায় যতটা চোখ পড়ল, মনে হল এদিককার বসতি খুব ঘন। দক্ষিণ রানীচকে দুশো ঘর লোকের বাস। পাঁচমিশেলী গ্রাম। পাঁচভাগের একভাগ মুসলমান। পঞ্চাশ ঘর ধোপা। একঘরই শুধু কাপড় কাচে। বাকি সবাই ঘরগেরস্তি করে। জাতব্যবসার পুরনো পরিচয়টাও যেন আর তারা দিতে চায় না। নিজেদের তন্তুবায় বলে। বলে, শুক্‌নি তাঁতী।

ব্রাহ্মণ আছে তিন ঘর। চাষবাস করেই খায়। তবে একটু নল্‌চে আড়াল করার ব্যাপার আছে। তাই জমিতে লাঙল দেওয়ার কাজটা অন্যদের দিয়ে করিয়ে নেয়। বাকি সবই—ধান রোয়া, ধান কাটা—নিজেরাই করে। তাছাড়া গ্রামে পুজো-পার্বণ বিয়ে-শ্রাদ্ধে টাকাটা সিকেটা মেলে।

দু-ঘর নাপিত আছে, তাদের উপজীবিকা চাষবাস।

গ্রামের আর যারা, তারা সবাই মাহিষ্য। কৈবর্ত কথাটা অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। এদিকের গোটা তল্লাটই মাহিষ্যপ্রধান। চাষবাসই তাদের জাতের জীবিকা।

জীবিকা হলে হবে কী, গ্রামের প্রায় অর্ধেকই জমিহীন ক্ষেতমজুর। তাদের বেশিরভাগই ভাগচাষী।

ঘর পিছু একশো পঁচিশ থেকে একশো ত্রিশ একর জমি আছে, এমন জোতদার গ্রামে তিন ঘর। গ্রামে আর আছে দু-ঘর রায়ত চাষী। তাদের দু-এক একর করে নিজস্ব জমি আছে। অভাব-অভিযোগ থাকলেও তারা চাষ করে না। দায়ে অদায়ে ধারদেনা হায়হাবালত করে চালায়। ভাগচাষীদের মধ্যে বারো আনা অংশের কিছুটা রায়ত-জমি, কিছুটা ভাগচাষ। অন্যদের ছিটেফোঁটাও জমি নেই। মুসলমান পাড়ার দশ আনা লোক দিনমজুরি ক্ষেতমজুরি করে পেট চালায়। কয়েকজনের সঙ্গে আলাপ হল। নামগুলো এখনও মনে আছে—শেখ তালেব, শেখ দেবু, শেখ কানাই, শেষ এক্তার, শেখ রাখাল।

বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম রানীচক থেকে। রাতটুকু রত্নার চকে থেকে সকাল বেলায় রওনা দেব। রত্নার চকে পৌঁছে দিতে সঙ্গে এল গুণধর। মাঝখানে অনেকগুলো গ্রাম। সাউতান চক, হাতিবেড়ে, চক তাড়ুয়ান, বিশ্বনাথ দত্তের চক। তারপর রত্নার চক। কমখানি রাস্তা নয়। গোটা তল্লাটের ওপরই উচ্ছেদের খাঁড়া ঝুলছে।

মন্বন্তরের বছরগুলোতে এ অঞ্চলে কিছুটা কিছুটা ঘুরেছিলাম। সে আমলে হিন্দু চাষীর বড়িতে মুরগি পুষতে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। এবার দেখলাম ঘরে ঘরে মুরগির চাষ। কেউ কেউ আছে ডিম খায়, মাংস খায় না। কারো কারো দুটোই চলে। রাস্তায় কোনো চায়ের দোকান দেখলাম না। মুদির দোকান ময়রার দোকানও চোখে পড়ল না।

বেশ কিছু বাড়ির দেখলাম জীর্ণদশা। গুণধর বলল লোকে এখন আর বাড়িঘর সারাচ্ছে না। উঠেই যখন যেতে হবে তখন আর ডোবা-পুকুর সংস্কার করিয়ে, ঘরবাড়ি সারিয়ে কী লাভ? ফলে, ঘরামিরা ঠায় ব'সে। কেউ আর উলু কাটছে না। খড়েরও দাম পড়ে গেছে। সূতাহাটা থানার আটষট্টিটা মৌজা জুড়ে এখন একটা থমথমে ভাব। জমির ভালোমন্দ হিসেবে জমির দাম এখানে চার পাঁচশো টাকা থেকে হাজার দেড় হাজার টাকা বিঘে। সে দর আর থাকছে না। হু হু করে পড়ে যাচ্ছে।

কেউ কেউ এই মওকায় জলের দরে জমি কেনবার মতলব ভাঁজছে। সরকার যে দরে জমি নেবে সে দরটা অবশ্য সুবিধের নয়। তিন বছরে শোধ করার শর্তে বিঘে পিছু তিনশো টাকা। যাদের জমি আছে, তারা সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। উঠে তো যেতেই হবে। কিন্তু যাবে কোথায়? ও দামে এখন জমিই বা পাবে কোথায়? তার ওপর মানুষের

ভিটে বলে কথা। বাপদাদার স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই ভিটেমাটিতে। কেউ কেউ গ্রামের মায়া কাটিয়ে ভাল জমিজায়গা দেখে আগেভাগে কোথাও উঠে যাচ্ছে। এর পরে সে-সব জায়গায় জমির দর আরও বেড়ে যাবে। যারা থেকে যাচ্ছে, তারা উপায় নেই বলেই থাকছে। নতুন জায়গায় গিয়েই কি শান্তি আছে? জমি হলেই তো হয় না। এ জমির সঙ্গে কতদিনের চেনা-জানা খিদমত-খাতির। এইটুকু বয়েস থেকে। নতুন জমির ভাবগতিক বুঝতে, তার সঙ্গে ভাব করতেই তো ঢের দিন যাবে। পাড়াপড়শী সবই হবে নতুন। এ তো উঠে যাওয়া নয়, একেবারে যাকে বলে জলে-পড়া।

এ অঞ্চলের ছেলের বাপদের হয়েছে আরেক মুস্কিল। বিয়ের বাজারে ছেলের দর সাংঘাতিক পড়ে গেছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে যারা মেয়ের বিয়ের দেনা শুধবে ভেবেছিল, তাদের এখন মহা অশান্তি। তার ওপর উঠন্ত সংসারে মেয়ে দিতেও মেয়ের বাপেরা এখন কিন্তু-কিন্তু করছে।

কথা বলতে বলতে যখন রত্নার চকে এসে পৌঁছলাম, বাড়িতে বাড়িতে তখন সন্ধ্যে জ্বলে গেছে। সটান উঠলাম শ্রীহরি দিন্দার বাড়ি। উঠোনে আমকাঁঠালের গাছ। মাচার ওপর লতানো লাউগাছ। তুলসীতলায় পিদিম জ্বলছে।

রত্নার চক গ্রাম খুব বড় নয়। মোট বিয়াল্লিশ ঘর লোক। দু-পাঁচ ঘর ক্ষেতমজুর; থাকার মধ্যে শুধু বাস্তু। একঘর রায়তচাষী, তাদের বিঘে চল্লিশ জমি। বাকি সবাই ভাগচাষী। পীতাম্বর চকের বেরা আর পাড়ুইদের জমি তারা ভাগে করে। ছ-সাত ঘর বাগ্দী, এক ঘর বামুন, দু-ঘর করণ; বাকি সবাই মাহিষ্য।

এদিককার গাঁয়ের অবস্থা আগে যা ছিল, এখন তার চেয়ে ভাল। আগে যাদের বছরে ন-মাস উপোস করতে হত, এখন তারা বছরে ন-মাস দু-মুঠো খেতে পায়। আগে বেশির ভাগ বাড়িতেই চৈত্র বৈশাখেই খোরাকি ফুরিয়ে যেত। তখন তারা দাদন আনতে যেত বেরাদের বাড়িতে। বেরারাও সেই মওকায় তাদের বেগার খাটিয়ে নিত—ঘাস নিড়ানো, জ্বালানির কাঠ চেলা করার কাজ করিয়ে নিত। এক বারে দাদন দিত না। দেদার ঘেরাত।

বছর পনেরো ষোল আগে বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা তুলে ধর্মগোলা করা হয়। ধর্মগোলায় জমার পরিমাণ এখন বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিনশো মণ। ফলে, আজ আর কাউকে মহাজনের বাড়িতে দাদন নিতে যেতে হয় না।

ধর্মগোলা থেকে ধান নেবার সাধারণ নিয়ম হল, এক মণ ধান নিলে এক মণ দশ সের ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে ফসল ভাল না হলে সুদ মাপ হয়ে যাবে। কিন্তু আসলটা শুধতেই হবে। তা ছাড়া ধর্মগোলার হাতে আছে নগদ এক হাজার টাকা। মাসে টাকায় এক পয়সা সুদে এই টাকা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলি হয়। টাকাটা ওঠে ওইভাবে : ছেলের বিয়ে হলে ন-টাকা, অর মেয়ের বিয়ে হলে এক টাকা গ্রামকে মান্য দিতে হয়—তাকে বলে 'বাপ' দেওয়া। বাইরের বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষকেই এ টাকা দিতে হয়। তা ছাড়া গ্রামে যে বিচার-আচার হয়, তাতে যে জরিমানার টাকা ওঠে, তাও এই ধর্মগোলার তহবিলেই জমা পড়ে। ধর্মগোলা এ-দিগরে শুধু এই গাঁয়েই আছে।

শ্রীহরির বয়স বেশি নয়। বছর পঁয়ত্রিশ হবে। চোখেমুখে বেশ একটা তাজা ভাব। বাপ-মা মারা গেছে ছেলেবেলায়। তিন ভাইয়ের মধ্যে সেই শুধু এখন বেঁচে। শ্রীহরি মেজো। দাদার তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড়দার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে বিধবা বৌদি আছেন তাঁর এক মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। ছোট ভাইটা বছর চারেক আগে কলেরায় মারা যায়। ছোট ভাইবৌ আছে বাপের বাড়ির সংসারে। দুই ছেলে, এক মেয়ে আর বউ—এই নিয়ে এখন শ্রীহরির সংসার। নিজের আছে তিন বিঘে আর ভাগে বিঘে চারেক জমি। তাইতে কোনরকমে বছরের খোরাক হয়ে যায়। দুটো আছে হালগরু, দুটো গাইগরু আর দুটো বাছুর।

বাড়িতে লোক এসেছে শুনে পাশের বাড়ি থেকে এলেন শ্রীহরির জেঠিমা প্রভাবতী দিন্দা। বিধবা মানুষ। বয়স কম। মেয়েদের নিয়ে সমিতি করেছেন। ঐসব নিয়েই থাকেন। লেখাপড়া জানেন না বলে খুব দুঃখ। পড়বেন বলে একবার বইও কিনেছিলেন। পড়ানো দূরে থাক, সবাই এমন ঠাট্টা শুরু করে দিল যে বইখাতা কুলুঙ্গিতেই তোলা থাকল। রাত্তিরে দল বেঁধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্প হল। গ্রামের লেখাপড়া নিয়ে।

রানীচক গাঁয়ে এবার এই প্রথম কৃষকের ঘরের চারজন ছেলে বি-এ পাশ করেছে। গোটা থানায় আগে হাইস্কুল ছিল দুটি। একটা এখান থেকে বারো মাইল দূরে, আরেকটা আট মাইল দূরে। পঞ্চাশ একান্ন সাল পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা। এখন সেখানে পাঁচটা হাইস্কুল। সবচেয়ে কাছেরটা দু মাইল দূরে—ভবানীপুর গ্রামে। থানায় জুনিয়র হাইস্কুল তিনটি। সবে দু-এক বছর হল হয়েছে। কাছেরটা মাইলখানেকের মধ্যে। সবচেয়ে দূরেরটা এখান থেকে দশ মাইল। এই ইউনিয়নে ইউ-পি স্কুল চারটি। এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কেউ না কেউ ইস্কুলে পড়ে। এ পর্যন্ত এ গাঁয়ের মোটে একটি ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সে এখন মহিষাদল কলেজে পড়েছে। বড় ভাই লেখাপড়া করেনি, চাষের কাজ করে। নিজেদের বিঘে তিনেক জমি, ভাগে নিয়েছে বিঘে পাঁচেক।

এ অঞ্চলে মেয়েদের স্কুল হয়েছিল পীতাম্বর চকে যুদ্ধের গোড়ার দিকে। ইউ-পি স্কুল। একশো দেড়শো মেয়ে পড়ত। তিনজন মাস্টারনী, একজন মাস্টার। গিরীশ জোতদার ছিলেন সেক্রেটারি। তিনি ইংরিজি জানতেন না। স্কুলের তবু পাকা বাড়ি হয়েছিল। কিন্তু সেক্রেটারি হওয়া নিয়ে এমন গোলমাল লাগল যে শেষ পর্যন্ত স্কুলই উঠে গেল। ইস্কুলের অমন সুন্দর পাকা বাড়িটা মাটির সঙ্গে মিশে গেল। এখন মেয়েদের ইস্কুল থানায় তিনটি। তার মধ্যে দুটি হাইস্কুল আর একটি মাইনর। হাইস্কুল এখান থেকে আট মাইল আর মাইনর স্কুল তিন মাইল দূরে। এ গাঁয়ের মোটে একজন মেয়ে সোলাট গ্রামের মাইনর স্কুলে পড়ে। মেয়েটি বোর্ডিঙে থাকে। থাকা আর পড়ার কোনো খরচ নেই। খাওয়া বাবদ লাগে মাসে আধ মণ চাল আর পাঁচটা করে টাকা।

সকালে উঠে মনটা খারাপ হয়ে গেল। এমন একটা আত্মীসূয় গ্রাম আর কদিন পর বাংলা দেশ থেকে মুছে যাবে। ধর্মগোলাটা ভেঙে যাবে। মানুষগুলো এখানে সেখানে ছিটকে যাবে। শ্রীহরির সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, সে তেমন ঘাবড়ায়নি। বলল, দেখুন এই উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বুড়োদের সঙ্গে আমাদের একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না। বুড়োরা

চাইছে অন্য কোথাও জমিজায়গা আর পারলে মোটা রকমের খেসারত। আমরা চাইছি বন্দরে চাকরিবাকরি নিয়ে কিংবা স্বাধীন কোনো ব্যবসা ফেঁদে এখানেই থাকতে। আর কিছু না হোক, লরি চালানোটাও তো জোয়ান ছেলেরা শিখে নিতে পারবে।

তখন আমার বেরিয়ে পড়বার সময় হয়ে গেছে। জেঠিমাকে ডেকে বিদায় নিলাম। জেঠিমা বললেন, 'এখন তো আমরা পাখির মত খাঁচার কাটি গুনছি। একটু সোয়াস্তি হলে আবার এস।'

আসব বলে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে শ্রীহরির কথাটা কিন্তু আমাকে সারা রাস্তা ভাবাল। রাস্তায় পড়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজে ঘাড় তুললাম। দেখি গাছের ডালে একটা মাছরাঙা। তারপরই কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল।

নতুন রাস্তা হচ্ছে। আর কিছুদিন পরে এসব জায়গা গমগম করবে। শীতের ক-টা মাস এখনই তো বাস চলে। রাস্তা হচ্ছে বলে এখন বাস বন্ধ। অনেকখানি রাস্তা এখন আমাকে হেঁটে যেতে হবে। ডায়মণ্ডহারবারের এপারে কোঁকড়াহাটি। তার আগে চৈতন্যপুর। সেখানে তমলুকের বাস মিলবে।

পড়িয়ার চক থেকে ফরেস্ট শুরু। ঝাউবনে ঝিরঝির করছে বাতাস। এ বনে ভাল কাঠ হয়। গাছ থাকায় নদীও পাড় ভাঙতে পারে না। তমলুক মহকুমায় বনবিভাগের ছ-টা আপিস। তার একটা বালুঘাটার বাজারে।

দোকানে বেঞ্চিতে বসে একটু চা খেয়ে নিলাম। রাস্তার ধুলো তখনই তেতে উঠেছে। চর বাজিতপুরে এসে আর হাঁটা সম্ভব হল না। পকেটের অবস্থা সুবিধের নয়। খানিকটা বেপরোয়া হয়েই শেষ পথটুকু সাইকেল-রিক্সা নিতে হল। তারপর চৈতন্যপুর থেকে বাস।

ঠিকানাটা আগেই নেওয়া ছিল। মেছেদায় এসে নৌকোয়-আলাপ-হওয়া ছেলেটার বাড়ি খুঁজে বার করতে বেশি বেগ পেতে হল না। পানের বরজ থেকে ডেকে আনা হল। চা জলখাবার না খাইয়ে কিছুতে ছাড়ল না। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এলাম। সাহিত্য নিয়ে নানান কথা হল। বলল এখনও লেখবার কথা কিছু ভাবেনি। তবে কোনদিন হয়ত লিখতেও পারে।

স্টেশনের কাছেই পানের বাজার। গড়ে পাঁচশো টুকরি পান মেছেদা থেকে রেলে দৈনিক চালান যায়। বেশির ভাগ যায় বাংলার বাইরে। বাকিটা কলকাতায়। মুখে মুখে হিসেব করে দেখলাম রোজ প্রায় লাখ চল্লিশেক পানপাতা এখান থেকে যায়। এ অঞ্চলে পান চাষের বয়স বেশি নয়।

পান চাষ এ তল্লাটে প্রথম আরম্ভ হয়েছিল চার নম্বর ইউনিয়নের চাটরা বল্লুক গ্রামে। সে আজ প্রায় একশো বছর আগে। শুধু পান চাষ করে এমন লোক কমই আছে। ধান-পান দুটোরই চাষ করে বেশির ভাগ লোক। তবে পানই হল প্রধান অর্থকরী ফসল। ঘন বসতি, জমি কম এবং পান বেচে বেশি টাকা পাওয়া যায়—তার জন্যেই পান চাষের দিকে এদিককার লোকের এত নজর।

বাংলাদেশে মিঠে পান একমাত্র এখানেই হয়। মিঠে পান আবার বেলেমাটি ছাড়া হয়

না। চাষে ডবলেরও বেশি খরচ। সারও দিতে হয় প্রচুর। অঘ্রান থেকে জষ্টি পর্যন্ত বিক্রি হয় গোড়া পান। বছরে প্রধান বিক্রি এই পান। তাছাড়াও বারো মাসই কিছু না কিছু পান কাটা আর বিক্রি হয়। পান বিক্রি হয় গোছ, শ' আর হাজার হিসেবে। পঞ্চাশটা পান নিয়ে হয় এক গোছ।

এখানকার চাষীরা পাইকারদের কাছে সেরা মিঠে পান বেচে তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা হাজার। সে পান যায় বিকানীর, জয়পুর, যোধপুর, নাগপুর, বোম্বাই, দিল্লী, আগ্রা, মুসৌরি। নিরেস পান বিক্রি হয় পনেরো টাকা হাজার। দর পড়ে গেলে কখনও কখনও সেরা পানও ঐ দরে বেচতে হয়। পানের টুকরি পিছু পাইকাররা পায় দু-টাকা করে। গাছের মূল থেকে যেটা বেরোয়, সেটা খাড় পান—ভাল পান। আর ভাল পানের গোড়া থেকে ফ্যাকড়া বেরিয়ে সরু বোঁটায় এক সঙ্গে তিনটে থেকে ছটা যে পান ধরে, তাকে বলে পালা পান। পালা পান হল নিরেস পান।

মিঠে পান ছাড়াও এ অঞ্চলে বাংলা পান আর সাঁচি পান হয়। মিঠে পানের গাছ দশ থেকে পনেরো বছর থাকে। পাঁচশো সারি গাছের ভাল বরজ করতে জায়গা লাগে পাঁচ কাঠা। তা থেকে রোজগার হয় দেড়-দু হাজার টাকা। খরচ পড়বে হাজার টাকার মত। এ হল যখন বাজারদর ভাল থাকে তখনকার হিসেব।

চাষীরা বলে, বরজ মানে রোজ-রোজ যেতে হবে। বেশি গরম বেশি ঠাণ্ডা—এর কোনটাই পানগাছের সয় না। তাছাড়া বরজে পোকা লাগে, পানের রোগ হয়—পান চাষে ঝকমারিও অনেক।

একটা রোগ আছে। তার নাম চিংলা। পানের গায়ে বসন্তের দাগের মত হয়। সে পান এখানে চার আনা শ'। চিংলা থেকে হয় আভারি। পানের লতা পচে যায়। গাছের এক জায়গায় পচ ধরে, পরে গোটা গাছটাই মরে যায়। ঝল্‌সা রোগে পানের রং পোড়া হয়ে যায়। আবহাওয়া বদলে গেলেই এ রোগ সেরে যায়। অতিরিক্ত রোগে পারেন হয় তসর্‌যা—পান হয়ে যায় তসরের মত। পাতাগুলো হয় পাঁশুটে লাল। এ রোগে গাছও যায়, পানও যায়। ফোস্কা ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলো ফেলে দিতে হয়। সবচেয়ে মুস্কিল হল, পানের রোগব্যাধি সম্বন্ধে চাষীদের যেটুকু আছে তা হাতুড়ে বিদ্যে। সরকারী কৃষিবিভাগের আছে অনেক ভাল গবেষণার জ্ঞান। কিন্তু দুটোর মধ্যে লেনদেন কম।

ঠিক হল, ছেলেটি সন্ধ্যেবেলা আমাকে কোলাঘাটে পৌঁছে দিয়ে আসবে। রাতটা ওখানে কাটিয়ে ভোরবেলার ট্রেনে আমি কলকাতায় পাড়ি দেব।

রূপনারায়ণের ব্রিজ হচ্ছে। দীঘায় যাবার রাস্তাও তৈরি। তাছাড়া সোজা বোম্বাই পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে। শুধু ব্রিজটার অপেক্ষা। সেই দিনটার জন্যে কোলাঘাটা ও অপেক্ষা করে আছে। এখন তো কোলাঘাট বলতে দেনান গ্রাম থেকে পাইকপাড়ি পর্যন্ত মাইল দুয়েক নদীর ধারের জায়গা।

আগে নাম শুনে ভাবতাম কোলাঘাট না জানি কী বড় জায়গা। সিনেমা মোটে একটা। শহরের লোক বলতে ব্যবসাদার আর ডেলি-প্যাসেঞ্জার। মোটরগাড়ি নেই। শুধু বড় বড়

বাড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদে বাহার নেই। শৌখিন স্থায়ী নাট্য সম্প্রদায় নেই। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে যাত্রা, কবিগান, পুতুলনাচের দল আসে। কলেজে-পড়া ছেলেরা চায়ের দোকানে বসে তর্ক করে গলা ফাটায় না। পাবলিক লাইব্রেরি আছে। পড়ুয়া ষাট-সত্তর। রাজনৈতিক সভা হলে তেমন লোক হয় না। বড়লোক যথেষ্ট। তাদের লাখ লাখ টাকার কারবার। ইউনিয়ন বোর্ডের কলকাঠি নাড়া পর্যন্ত তাদের পাবলিক অ্যাকটিভিটির দৌড়। কিন্তু ব্যস, ঐ পর্যন্ত।

একেবারে নেহাতই কাঠ, পাট, কয়লা, ধানচাল আমদানি রপ্তানির জায়গা। তবে ব্রিজটা একবার হয়ে গেলে কী হবে এখনও বলা যাচ্ছে না। এখানে কাঠের আট দশজন বড় বড় আড়তদার। কাঠ আসে কটক নাগপুর শিলিগুড়ি থেকে। যায় হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর। কড়িবরগার জন্যে শাল, চাকুন্দা, লোহাশাল, কটকী শাল, পিয়া শাল; খুঁটির জন্যে বাতিকাঠ। আসবাবের জন্যে সেগুন, সিসু।

ময়না, দাসপুর, আরও নানা জায়গা থেকে আসে পাট। পাটের আড়তদারি মারোয়াড়ীদের একচেটে। কয়লার আড়তদাররা স্থানীয় বাঙালী। ধানচালে বাঙালীও আছে, মায়োয়াড়ীও আছে। মাছের কারবার মরশুম-নির্ভর। আড়ত একটাই।

ছেলেটি কার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে গেল বোধহয় জানত না। ভাগে রুগী দেখার এক ঘরে রাত্তিরে আমার থাকার জায়গা হল। সারাদিন স্নান হয়নি। সামনে এক সিনেমা হাউসে গিয়ে অন্ধকারে টিউবওয়েলের জলে আরাম করে স্নান সেরে নিলাম। পকেটে পয়সা নেই। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। চা দিয়ে ক্ষিধেটাকে একবেলার মত মেরে নেওয়া গেল।

এতক্ষণ চেয়ারেই বসে ছিলাম। এবার শোবার জায়গাটার দিকে তাকালাম। রবার ক্লথ-পাতা রুগী দেখার বিছানা। তার ওপর নিচেয় রক্তমোছা তুলো। শোবার চিন্তা মাথায় উঠে গেল। ঠিক করলাম চেয়ারে বসেই যতটুকু পারব ঘুমিয়ে নেব। রাত এগারোটা নাগাদ সেই ভদ্রলোক এসে হাজির। দেখতে এসেছেন আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। বিনয়ে আমি তাঁর ওপর দিয়ে গেলাম।

কিন্তু ঠিক যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। এটা ওটা কথার পর হঠাৎ পকেট থেকে তিনি কাগজের একটা তাড়া বার করলেন। আমাকে তিনি তাঁর কবিতাগুলো শোনাবেন। আমি একবার মেঝের দিকে, একবার কড়িকাঠের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

ভদ্রলোক কবিতা শোনালেন বটে, কিন্তু সে রাতে তাঁর আর বাড়ি ফেরা হল না। যখন তাঁর খুব হাই উঠতে লাগল, তখন আমরা গেলাম তাঁর চেনা এক গেঁজেলদের আড্ডায়। সেখান রাত তিনটেয় চা পাওয়া গেল। তারপর আমরা দুজনেই দুজনকে বললাম—রাত্তিরটা খুব ভাল কাটল।

বলে ভোরে একেবারে ফার্স্ট ট্রেনেই পড়ি-মরি করে সটান কলকাতা।

৩২বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৯
[সুবচনী নামে প্রকাশিত]

ফুলের লোক্যালে ফেরা

লোকটাকে এবছরও শেয়ালদার রথের মেলায় খুঁজে পেলাম না। এইবার নিয়ে কিন্তু চার বার হল। বলেছিল, 'ভাল গাছ রেখে দেব, আসবেন। আসবেন কিন্তু—'

প্রথম বছর নাম মনে ছিল। দ্বিতীয় তৃতীয় বছরে মুখ মনে ছিল। এবছর নাম কিংবা মুখ কিছুই মনে পড়ল না।

তবু রথের মেলায় গাছপট্টিতে ঘুরলাম। আমি ভুলে গেলেও তার তো আমাকে মনে থাকতে পারে?

ছাই! মাঝের থেকে নতুন জুতো পরে হাঁটতে গিয়ে পায়ে ফোস্কা পড়িয়ে ফেললাম। লোকটিকে খুঁজে বার করে খুব যে ফায়দা হবে, তাও নয়। বাড়িতে তো আমার নিতান্ত হাতে মাটি করার জমি। টবে ফুলগাছ লাগাব এমন ফুলবাবুও আমি নই। কাজেই লোকটার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই বা কী!

তবু মধ্যে মধ্যে মনে হয় চলে গেলেই তো হয়। হাওড়া থেকে সুনীলকে পাকড়ানো। ব্যস, তারপর বাগনান। ঠিক চার বছর আগে যেভাবে গিয়েছিলাম।

ট্রেন থেকে তো নামলাম। এবার স্টেশন থেকেও নামতে হবে। খাড়া সিঁড়ি। খলবল খলবল করে নেমে গেছে সোজা রাস্তায়। ডাইনে তাকান। আজ্ঞে হ্যাঁ,—সাইকেল, টায়ার, স্পোক, চেন, সিট, বেল, হ্যাণ্ডেলের এক অফুরন্ত দুর্ভেগ্য জঙ্গলই বটে। ট্রেনে করে অফিস-ফেরতা বাবুরা ফিরবেন, তার পরই সব ভোঁ ভোঁ। তখন ওখানে ছুঁচোর ডন দেওয়া ছাড়া ফেরতা বাবুরা ফিরবেন, তার পরই সব ভোঁ ভোঁ। তখন ওখানে ছুঁচোর ডন দেওয়া ছাড়া আর কিছু দেখবার থাকবে না।

বাজারে অমল গাঙ্গুলীকে কি পাওয়া যাবে? তাহলে এক আঁচড়ে বাগনান থানার ছবিটা একবার হালফিল এঁকে নেওয়া যেত। তাঁর তো সবই নখাগ্রে।

আটটি ইউনিয়ন নিয়ে বাগনান থানার চৌষট্টি বর্গ মাইল আয়তন। পুবে দামোদর, পশ্চিমে রূপনারায়ণ। এ ছবিটা বদলাবার নয়। লোকসংখ্যা নিশ্চয় এখন এক লক্ষ তিরিশ হাজারের বেশি। মাটির ওপর জনসংখ্যার চাপ তাহলে আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। মোট জমির যে অর্ধাংশ বসতভূমি, আর বাকি অর্ধাংশের যে দশ শতাংশ জমি জলাভূমি—এ চার বছরে তার কোনো হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না। জলা বলতে মনে পড়ে গেল তারাপদ সাঁতরার কাছে শোনা সেই ছড়াটা :

বাগনানের জলার ধারে
মাগশয়নী কাছে
যদিও বা শোয়
ফিকির ফিকির হাসে।

বাগনানের মাঠে ধান না হওয়ার বর্ণনা। যারা পাটের দড়ি বুনত আর চট তৈরি করত, সেই কপালীদের কাছ থেকে ছড়াটা পাওয়া।

মোট লোকের অর্ধেক কৃষিজীবী হলেও এ থানায় মোট জমির অর্ধাংশেরও ঢের কম জমিতে চাষ হতে পারে। চাষ হয় প্রধানত ধান; তারপর পান, পাট, আলু আর অন্যান্য রবিফসল। পঁচিশ বছর আগেও এ অঞ্চলে বিঘায় গড়ে ধান হত দশ মণ—এখন চার মণে এসে ঠেকেছে। বড় বড় দুটো নদীই মজে যাওয়ায় সেচ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার দাখিল। তার ওপর হয় অনাবৃষ্টি, নয় বন্যা। ধানের ফলন যেমন কমেছে, তেমনি মাথাপিছু জমির পরিমাণও কমে গেছে। কাজেই কম জমিতে লোক এখন পান চাষের দিকে ঝুঁকছে। চার বছর আগেও দেখা গেছে, এ থানায় মোট দু হাজার পান-বরজ এবং প্রতি তেরো জনে একজন লোকের নির্ভর পান-বরজ।

সেবার বৈদ্যনাথপুরে আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম ষোল আনাই পান চাষ। বাঁটুল, মাশুমা, লুঠিয়া, পালোড়া, বীরকুল, খানজাদাপুরে ধানজমি নামমাত্র। সাঁচি কম, বাংলা পানই বেশি। দামোদর আর রূপানারায়ণের চরে পাট চাষ ছিল তিন চার হাজার কৃষক-পরিবারের নির্ভর। ফড়েদের হাতে পড়ে পাটচাষীরা এখন নিঃস্ব।

চাষীবাসী বাদ দিয়ে শতকরা যে-পঞ্চাশজন বাকি থাকছে, তাদের মধ্যে বিশজন গ্রামে মজুর খাটে, দশজন কলকারখানার মজুর, দশজন অফিসের কেরানি, স্কুলের মাষ্টার, ছোট দোকানদার আর বাকি দশজন কামার, কুমোর, জেলে, শঙ্খকার, চিরুনিকার, চর্মকার—এইসব।

মনে আছে, বাজার পেরোতে গিয়ে দেখেছিলাম : সারি সারি মাইক্রোফোন, রেডিওর গমগমে আর সেই দু চারটে ফটো তোলার ঝকমকানো দোকান। বাজী রেখে বলতে পারি, এ চার বছরে এ লাইনের দোকান বেড়েছে বই কমেনি। মন্তর পড়তে পুরুতেরও এখন মাইকের দরকার হয়। নইলে মন্তরের জোর বাড়বে কেন? এখন আর শুধু বিয়ের সম্বন্ধে কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, চাকরির দরখাস্তেও তো ফটোর দরকার।

তেমাথাটা আছে নিশ্চয়। বলা যায় না, এ চার বছরে চৌমাথাও তো হয়ে যেতে পারে। তা হলেও ডানদিকেও এগিয়ে যেখানে তেরাত্তির ছিলাম সেই দোতলা মাটির বাড়িটা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। বলা যায় না, মাটির বাড়ি ভেঙে দালানকোঠা হওয়াই তো নিয়ম। তাছাড়া ও রাস্তার এখন পায়া বেজায় ভারী। রূপানারায়ণে গাড়ি যাবার ব্রিজ হয়ে গেলে এটাই হবে জাতীয় সড়ক। তখন ও রাস্তার খাতিরই আলাদা। ও রাস্তার দুপাশে জমির দাম এখন নিশ্চয় আরও বেড়েছে।

রূপনারায়ণ আর দামোদরকে যোগ করছে ছ-মাইল লম্বা মেদিনীপুর ক্যানেল। এপারে আঁটুল, ওপারে বাঁটুল। চারশো ঘর লোকের মধ্যে ঘর চল্লিশ শাঁখারী। তাঁদের কো-অপারেটিভের বয়স তখন তিন বছর। সেক্রেটারি রাধারমণ দাস। কো-অপারেটিভ এখন নিশ্চয় সাত বছরের হল। দশ টাকা শেয়ারে তখন একশো সাত জন সভ্য।

শাঁখ থেকে শাঁখা হয় ধাপে ধাপে। প্রথমে হয় শাঁখ ভাঙা, ফোঁড়া, মালোই করা, মালোই ঘষা, শাঁখ চেরা। তারপর হয় সারাই—ভেতর ঘষা, ওপর ঘষা, নক্সা। তারপর পালিশ,

তারপর মেরামত, তারপর সুতো বাঁধানো বা পেয়ার বাঁধা। ঘষামাজার কাজটা করে মেয়েরা।

শাঁখ আসে মাদ্রাজ আর সিংহল থেকে। কো-অপারেটিভ হওয়ার আগে সেই শাঁখ কিনতে হত কলকাতার ব্যাপারীদের কাছ থেকে। ওরা যখন রদ্দি মাল দিতে শুরু করল, তখন সরকারের চেষ্টায় মাদ্রাজ থেকে সরাসরি মাল আনবার ব্যবস্থা হল। দু-এক খেপ দিব্যি ভাল মাল কম দরে পাওয়া গেল। কলকাতার বাজারে যা দাম, সে তুলনায় দেড়শো শাঁখে কমসে কম একশো টাকা বাঁচল। হলে হবে কী, সরকারী চাকুরেরা জানে না কোন্ মাল কোন্ দামে কিনতে হয়। তাঁরা ক্রমেই নিরেস মাল দিতে থাকায় ষোলটা সমিতিই সরকারের কাছ থেকে মাল কেনা বন্ধ করে দিল। সরকারী গুদামে পচতে থাকল ষোল লক্ষ টাকার মাল।

কলকাতার দালালদের ব্যবসা আবার ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে জমজমাট হল। গোড়ায় গোড়ায় তারা কম দাম নিল, জিনিসও ভাল দিল। তারপর থেকে আবার যে-কে সেই। জিনিস চলনসই, দাম বেশি। টিউটিকোরিনকে শাঁখারীরা বলে তিতকুরি। যে তিতকুরির মাল সরকারের কাছ থেকে ২৬০ টাকায় মিলছিল, দালালদের কাছ থেকে তা কিনতে হচ্ছে ৩৩০ টাকায়। এই মালে শাঁখা হবে ৪২৫ টাকা দামের। উদ্বৃত্তের প্রায় সবটাই চলে যাবে মজুরি দিতে। একটা কারখানায় দশ জনে মাসে গড়ে ছ বস্তা শাঁখা তৈরি করতে পারে। যুদ্ধের আগে শাঁখার জোড়া ছিল ছ আনা; এখন দু টাকা। আসলে আড়াই টাকা হল তবে পড়তায় পোষায়। কিন্তু দাম বাড়ালে লোকেও আর কিনবে না।

এখন গেলে পদে পদে দিগভ্রম হবে। আচ্ছা, দেউলগ্রাম দক্ষিণে নয়? গদি, কল্যাণপুর, মানকুড়—ঐ রাস্তাতেই তো!

দেউলগ্রামে গেলে হয়ত পাব কুশধ্বজ চন্দ্রকে। যারা মোষের শিঙের চিরুনি বিক্রি করে, এ চার বছরে তাদের হাল আর কতটা বদলাবে? শিঙের চিরুনির চাহিদা এখনও বেশ ভাল। চলছে বটে প্লাস্টিকের চিরুনি। তবে শিঙের চিরুনির কদর তাতে কমেনি। তবে দামটা বাড়তে পারছে না প্লাস্টিকের চিরুনিরই জন্যে।

শিঙের চিরুনি বলতে, নানান ডিজাইনের খোঁপা-চিরুনি, তুতকুম-চিরুনি, পকেট-চিরুনি—এসব তো আছেই, তাছাড়া তৈরি হয় ক্ষুরের হ্যাণ্ডেল, ছুরির বাঁট।

এ কাজ করে এ গ্রামের প্রায় তিরিশ ঘর লোক। এ শিল্প শুধু দেউলগ্রামে। আমতার কাছে থলেরসপুরেও দু-এক ঘরে কিছুটা হত।

কুশধ্বজেরা জাতে সূত্রধর। কোনো কোনো পরিবারে এখনও চিরুনি তৈরির সঙ্গে কাঠের কাজ আর প্রতিমা গড়ার কাজ হয়। কুশধ্বজেরা চিরুনি তৈরি করে আসছে পাঁচ-সাত পুরুষ ধরে।

মোষের শিং আসে কলকাতার মীর্জাপুর, মেছোবাজার, কলুটোলার হামিদ সাহেব রশিদ সাহেবের গোলা থেকে।

ফাটাফুটো, রদ্দি শিঙের মণ চব্বিশ টাকা। শিঙের আগাল যে নিরেট অংশটা দিয়ে ক্ষুরের হ্যাণ্ডেল কিংবা ছুরির বাঁট তৈরি হয়, তার দাম তিরিশ থেকে চল্লিশ। ভাল ভাল বড় চিরুনি তৈরি করবার শিং পঞ্চাশ টাকা মণ।

গ্রামে মহাজন চারজন। তার মধ্যে দুজন করে নিছক কেনাবেচার কাজ—তারা বানানো-তৈরির মধ্যে নেই। মহাজন শিং এনে কারিগরকে দেয় বত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ টাকা মণ দরে। সেই শিঙের চিরুনি তৈরি করে কারিগর মজুরি পায় বিশ থেকে তিরিশ টাকা। ছাঁটগুলো পায় কারিগর। এক মণ সিং থেকে মোটা কুচো হয় পঁচিশ সের আর গুঁড়ো কুচো পাঁচ সের। চাষীর কাছে সার হিসেবে দশ-বারো টাকা মণে মোটা কুচো আর পনেরো-বিশ টাকা মণে ছোট কুচো বিক্রি হয়। দুই মহাজনের কারখানায় দু টাকা রোজে যারা মজুরি করে, তারা কিন্তু কুচোকাচাগুলো পায় না।

এক মণ শিঙের চিরুনি তৈরি করতে একজন লোকের চোদ্দ-পনেরো দিন লাগে। মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে খাটতে হয় সকাল ছ-টা থেকে রাত ন-টা। কলকাতায় মাল বেচে মহাজনদের মণপিছু লাভ থাকে কমসে কম দশ থেকে পনেরো টাকা। বাগড়ি-মার্কেট, তামাপট্টি, মালাপট্টি, খ্যাংরাপট্টির সামনের মাঠ—এই সব হল তাদের বেচবার জায়গা।

যারা ছিল স্বাধীন শিল্পী, এখন তারা ক্রমেই মহাজনদের কারখানার মজুর হচ্ছে। কেউ কেউ বাড়ি বসে কাজ করলেও মজুরি নিচ্ছে মহাজনের কাছ থেকে।

কুশধ্বজেরা দেখেছিলাম তখনও মহাজনদের জালে জড়িয়ে পড়েনি। বাপ-বেটায় মিলে মাসে মণ দুই শিঙের চিরুনি তৈরি করে নিজেরাই কলকাতার মনিহারি-পট্টিতে বেচে আসত। এখনও কি তাই করে?

শাওড়া, মুগকল্যাণ আর খাজুরনান—এই তিন গ্রাম যেখানে এসে মিশেছে, তারই মোড়ের ওপর রাস্তার পশ্চিমে গ্রামসেবা সঙ্ঘ। চণ্ডীবাবু নিশ্চয় আছেন?

তাঁরই মুখে শুনেছিলাম সেবাসঙ্ঘ পত্তনের গল্প। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ও তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। সাতচল্লিশ সালে বাগনান থানার ইউনিয়ন জ্যাকটি নামিয়ে জাতীয় পতাকা তোলবার সময় যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আজও তা বুকের মধ্যে খচ খচ করে। কী ভাবা গিয়েছিল তখন আর পরে কী হল! ক্ষমতা হাতে পেলে কি তবে এই রকমটাই হয়? কাজেই কংগ্রেস ছেড়ে প্রজাপার্টি। কিছুদিন ভূদান। তারপর সব ছেড়ে গঠনমূলক কাজ।

ঊনপঞ্চাশ সালে চণ্ডীবাবু এ জায়াগাটা বেছে নিয়েছিলেন সবচেয়ে ওঁছা বলে। এখানে দুটো পাড়া—গুনীনপাড়া আর ফকিরপাড়া। এরা না-হিন্দু, না-মুসলমান। মেয়েরা চুড়ি বিক্রি করে, ছেলেরা সাপ ধরে। এরা যা ক্ষতি করত তা নিজেদের—পরের ক্ষতি পারতপক্ষে এরা করত না। মদ চোলাই করত, তে-তাস জুয়ো খেলত আর ছিল মেয়ে আমদানি করার ব্যবসা।

এখন এ দু-পাড়া পুরোপুরি শ্রমজীবী। মেয়েরা এখনও চুড়ির ব্যবসা করে। সেই সঙ্গে ঢেঁকিতে ধান ভাঙে, চরকায় সুতো কাটে। ছেলেরা দু-চারজন এখনও সাপ ধরে। তবে বেশির ভাগই হয় রিক্সা চালায়, নয় জনমজুরি করে, নয় ছোট ছোট দোকান করে।

প্রথমে এখানে কাজ শুরু হয় কস্তুরবা গ্রামসেবিকার ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুজন মহিলাকর্মী নিয়ে। গুনীনপাড়া আর ফকিরপাড়ায় খোলা হল বালবাড়ি। আড়াই বছর থেকে আট বছরের মধ্যে

যাদের বয়েস, তাদের বালবাড়িতে এনে নিয়মানুবর্তিতা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখানো আর দৈহিক শ্রমের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা হল। বালবাড়িতে ক্লাস টু অব্দি পড়ানো হয়। সেই সঙ্গে নাচ-গান-খেলা। এ দুই পাড়ায় পনেরো বছরের কম যাদের বয়েস, এখন আর তাদের মধ্যে কেউ নিরক্ষর নেই।

বালবাড়ি চালাবার খরচের তেরো আনা অংশ আসত কস্তুরবা ফাণ্ড থেকে। গোড়ায় গোড়ায় বছরে বারোটা করে তিন দিনের শিবির হত। তাতে হাওড়া জেলার নানা এলাকা থেকে যুবকেরা আসত। একেক বারে গড়ে তিরিশজন করে। শিবিরের কর্মসূচী ছিল : পুকুরের পানা তোলা, রাস্তা তৈরি, আগাছা পরিষ্কার, কম্পোস্ট সার তৈরি, পাঠচক্র, আলোচনা বৈঠক, সুতো-কাটা, প্রার্থনা। দুঃস্থদের ওষুধপত্র, রোগীর সেবা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আর বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষার ভাঁড় বসানো—এ সবের ব্যবস্থা হল।

কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল, সমাজসেবাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে গেলে হয় চাষবাস, নয় কুটির-শিল্পের আশ্রয় নিতে হবে। সুতারং জন তিরিশ কর্মীকে কয়েক খেপে পাঠানো হল ওয়ার্ধা, নাসিক, বেলগাঁওয়ে তেলসাবান তৈরি, কাঠের কাজ, চামড়া, তাঁত, মৃৎশিল্প, মৌমাছি-পালন শিখতে। ধাত্রীবিদ্যা শিখতে পাঠানো হল এলাহাবাদে।

সেবাসঙ্ঘে এখন সতেরো জন ট্রেনড কর্মী। ঘানি দিয়ে শুরু হয়ে এখন মাটির কাজ, সাবান তৈরি, তাঁত, মৌমাছি-পালন, হাঁসমুরগির চাষ। সমাজসেবার কাজ বলতে বালবাড়ি ছাড়াও আছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, সপ্তাহে দুদিন মেয়েদের দর্জির কাজ শেখানো, পঞ্চাশ জন দুঃস্থকে গুঁড়ো দুধ বিলি। তাছাড়া আছে দাতব্য চিকিৎসালয়—অর্থাভাবে সেখানে শুধু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ব্যবস্থা। আর দুজন ধাত্রী নিয়ে মাতৃমঙ্গল।

জাপানী প্রথায় চাষ শেখাবারও একটা ব্যবস্থা আছে। বিঘায় খরচ বাড়ে চল্লিশ টাকা, কিন্তু লাভও তেমনি বাড়ে বিঘায় পঞ্চাশ টাকা। ফসল আড়াই গুণ পর্যন্ত বাড়তে দেখা গেছে। কিন্তু হলে হবে কী, যে-চাষী জমি চাষ করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই জমিটা তার নয়। যে-জমিতে সে সার দিচ্ছে, সে জমি পরের বছরও তার থাকবে কিনা ঠিক নেই। তাছাড়া এত কিছু করে ফসল যেমন বাড়বে, তেমনি কিছু না করে সে ফসলে মালিকের ভাগটাও তো সেই হারে বেড়ে যাবে?

রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে চোখে পড়েছিল—দুপাশের বাড়িগুলোর উঠোনে কী রকম রংবেরঙের বিলিতি আর দো-আঁশলা মুরগির ছড়াছড়ি।

একা গেলে দেউলটি মহাশ্মশানের রাস্তাটা এখন আর খুঁজে পাব না। সেই যে, যেখানে মুলো-কালী আর তাল-কালীর ভারি মেলা হয়। আর ভল্টাসের সেই রোগা টিংটিঙে প্রাক্তন কেরানিটি? কাঠের কাজ ছিল যাঁর বংশগত পেশা? আশ্রম খুলে এখন যাঁর দিব্যি শাঁসে জলে চেহারা হয়েছে।

পানিত্রাসের শরৎ স্মৃতি-সংগ্রহশালায় দেখেছিলাম শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত ওভারকোট, ছাইদানি, লেখবার ডেস্ক, চটিজুতো, পাণ্ডুলিপি আর অপ্রকাশিত বহু চিঠিপত্র। গুপ্তযুগের পাথরে খোদাই সূর্য-মূর্তির ভগ্নাংশ, পাল আর সেন যুগের বিষ্ণুমূর্তি, কালো পাথরের বিষ্ণুপট্ট,

জৈনমূর্তি, চামুণ্ডামূর্তি। প্রাচীন মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য আর বিভিন্ন যুগের কত মুদ্রা। তালপাতা আর তুলোট কাগজে লেখা তিনশো সাড়ে-তিনশো বছর আগেকার পুঁথিপত্র, মূল্যবান পুরনো দলিল-দস্তাবেজ। নানা জেলা থেকে আনা হাতে-টেপা পুতুল, রং-করা পুতুল, নক্সীকাঁথা, মাটির ঘোড়া, পট, নক্সা-করা কাঠের কাজ। কত কী!

সাত কাঠা জমির ওপর মিউজিয়ম গড়ার স্বপ্ন কতদূর সফল হল?

যে-লোকটাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে, তাকে আমি পাব ভুরবেড়িয়ায়। ভুরবেড়িয়া, না ভুলবেড়িয়া? লোকে দু-রকমই বলে। যে নামই হোক, বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে একদিন হয়ত দেখলেন নাম হয়ে গেছে ফুলবেনিয়া।

এ গ্রামে ফুলের চাষ হচ্ছে হালে। দশ-এগারো বছর আগেও এ গাঁয়ে ফুলের চাষ করত মোটে দু-তিন ঘর। গ্রামে ছেচল্লিশ ঘর লোক। বলতে গেলে ষোল আনাই এখন ফুলচাষী। ধানচাষ সামান্য। এ গাঁয়ের প্রায় বারো আনা লোককে চাল কিনে খেতে হয়।

ফুলের চাষে অনেক হ্যাপা। মাটি কোপানো। সার দেওয়া। কলম বাঁধা। নিড়ানো। জল দেওয়া। গাছ হাপর দেওয়া, অর্থাৎ ডাল থেকে কেটে মাটিতে পোঁতা। চারানো। রোজ গড়ে পাঁচটা করে জন লাগে। কোপানো আর সার দেওয়ার কাজে রোজ দু টাকা। কলম বাঁধতে পাঁচ টাকা। হাপর দিতে তিন টাকা। অন্যান্য টুকিটাকি কাজে দু-টাকা।

বাজারে বিক্রির জন্যে গাছ বয়ে নিয়ে যাবার একটা খরচা আছে। তাকে বলে বউরি খরচা। ঝুড়ি পিছু এক টাকা। তা বাদে আছে পার্সেল খরচা।

চার বিঘে জমিতে বছরে বীজ কিনতে হয় তিন-চারশো টাকার। সবচেয়ে বেশি দাম পামগাছের বীজের। পিচাড়িয়া দশ টাকা হাজার, অ্যারিকা আট টাকা হাজার।

দাম পাওয়া যায় চারা বিক্রিতেই সবচেয়ে বেশি। এক ধরনের বিলিতি গোপাল আছে, একটা চারারই দাম তিরিশ টাকা। তাছাড়া ফুল বিক্রি আছে। সবচেয়ে বেশি কাটে গোলাপ।

কোলাঘাট থেকে ভোরবেলায় ছাড়ে 'ফুলের লোক্যাল'। রোজ যায় প্রায় তিনশো ফুলওয়ালা।

বলাই মান্নার বাগানটা আরেকবার দেখে আসতে হবে। ও অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ফুলচাষী বলাই মান্নার বয়স এখন বোধ হয় চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন হল?

ওর বাগানে ফলের চাষও কিছু হয়। আম, কালোজাম, গোলাপ-জাম, লিচু, সবেদা, জামরুল, পেয়ারা, কাগজী লেবু, বাতাবী লেবু, কমলা, ন্যাসপাতি, ডালিম, বেদানা। কলমের চারা বিক্রি হয়। সবচেয়ে দাম বেশি আমের চারার। একেকটি তিন টাকা।

আসল বাগান ফুলের। কত সব রকমারি ফুল। আর তাদের কত আহা-মরি সব বাহারী আহ্লাদী পেল্লাদী নাম।

বিলিতি গাছ : ট্যালিসম্যান। ভট্‌চায্যি হোয়াইট। স্নো হোয়াইট। ঈজি হিল। ফর্টিনাইনা। গোলডেন ফেয়ারি। লেডী হ্যারিংটন। পলিরন। গ্লোরিয়া ডি ডচার। আমেরিকান বিউটি। ইণ্ডিপেণ্ডেস পীস। বার্সিলোনা। সুলতান। আলেকজাণ্ডার বার্নেস। ইটয়েল ডি নিয়ন। ইটয়েল

ডি ফ্রান্স। কালো গোলাপ নিগ্রেডি। নাইট। এলিট। পিকচার। ব্ল্যাক প্রিন্স।

আছে বস্‌রাইল, দো-রঙা, চাইনিজ গোলাপ। বেল, রাইবেল, মোতিয়া বেল, মডরু বেল, খ'য়ে বেল, জাপানী রাইবেল। যুঁই, ডবল আর সিঙ্গেল যুঁই, চামেলী, জাপানী আর দেশী জেসেমিন, লতানো টিকোমা জেসমিন, স্বর্ণ যুঁই, স্বর্ণ চামেলী। ডবল আর সিঙ্গেল জাপানী গন্ধরাজ। ডবল আর সিঙ্গেল টগর। কামিনী। লাল আর সাদা করবী, কাশীর করবী, কপিলাক্ষ করবী। বোগেনভেলিয়া। রিডাই, জার, বিউটি, ইণ্ডিয়ান প্রিন্স, টর্টিলাস, মহারাজা অব মহীশূর, ভিক্টোরিয়া পাতাবাহার। রজনীগন্ধা। কাঞ্চন। শিউলি। লাল আর সাদা স্থলপদ্ম। ম্যাগ্নোলিয়া। গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। ডালিয়া।

চন্দ্রমল্লিকা। স্বর্ণ চাঁপা, জহুরী চাঁপা। হাসনুহানা। পঞ্চমুখী, সপ্তমুখী, অরোরা জবা।

আছে তেজপাতা, দারুচিনি, পাম, ঝাউ। আর রকমারি ফুলের রকমারি নাম : নেতাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিধান রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ।

ফুলচাষী যে-দামে যে-ফুল বেচছে, আপনি তার দশ বারো গুণ বেশি দামে সেই ফুল কিনছেন। হেঁয়ালির মতো শোনালেও কথাটা সত্যি। কেননা সটান চাষীর হাত থেকে তো আর আপনার হাতে যাচ্ছে না। চাষী আট আনা শ-য় চালানদারকে বেচছে। চালানদার সে-জিনিস পাইকারকে বেচছে দু টাকা শ-য়। পাইকার সে-ফুল দোকানদারকে তিন-চার টাকা শ-য় বেচছে। দোকান থেকে আপনি পাচ্ছেন পাঁচ-ছ টাকা শয়। তিন ধাপে দশ গুণ। চাষ থেকে দোকান—সবটাই যদি সমবায়ের হত? তাহলে ফুলের দরও কমত—আরও বেশি লোকের কাছে ফুলের আদরও বেড়ে যেত। এই মাঝের ধাপগুলো কমিয়ে আনতে পারলে চাষীরও কিছু বেশি থাকত আর আপনারও কিছু কম পড়ত।

এই দেখুন, এতক্ষণে লোকটাকে মনে পড়েছে। দাওয়ার ওপর বসে কথা হচ্ছিল। সামনের একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল গাঁক গাঁক করে রেডিওর আওয়াজ। মুড়ি, তেলেভাজা আর গরম চা এল। ঢ্যাঙা মত সেই লোকটা। মনে পড়ছে। মুখ মনে পড়ছে। ভুরবেড়িয়ায় গেলেই চিনতে পারব। দাওয়াটার ওপর আবার গিয়ে বসলে নামটাও হয়ত মনে পড়ে যাবে।

চলে গেলেই তো হয়। হাওড়া থেকে কেন? এবার অছিপুরে গঙ্গা পেরিয়ে উলুবেড়িয়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠব।

ফিরব ভোরবেলাকার ফুলের লোক্যালে।

আর তা যদি করি, তাহলে আসছে বার এখানে রথের মেলায় আস্ত একটা ভাল ফুলের গাছও আমার কপালে নাচছে।

৩৪বর্ষ ৩য় সংখ্যা আশ্বিন ১৩৭১
[সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রিপোর্টাজ শিরোনামে মুদ্রিত]

গ্রামের নাম নিমতিতা

হাওড়া থেকে ট্রেনে পুরো একবেলার পথ। স্টেশন আগে ছিল ধুলিয়ান। নদীতে ভেঙে যাওয়ায় এখন নিমতিতা।

ট্রেন এসে থামল শেষ রাতে। প্ল্যাটফর্মে টিমটিমে বাতি। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। বেরোবার দরজা থেকে নিচে নেমে গেছে সিঁড়ি। নামতে নামতে বুঝলাম নিচের জমি থেকে স্টেশন অনেকখানি উঁচুতে।

যেন পা তুলে আছে। বর্ষার জলের ভয়ে কি?

গাঢ় নীল-গোলা জলের মত অন্ধকার। একটু দূরে দৈত্যকায় কয়েকটি গাছ। তাদের হাঁটুর কাছে ছেঁড়া-খোড়া আকাশ। মহাজনদের আড়তের মত দেখতে টিনের বড় বড় চালাগুলোর মাথার ওপর দিয়ে আবছা নজরে পড়ে।

কাছেই কয়েকটা টাঙা দাঁড়িয়ে। সঙ্গে হারিকেনের আলো। ঝোলানো আলোয় তলাকার মাটিটাই শুধু যা দেখা যাচ্ছে। কয়লার গুঁড়োমাখা খড়কুটো আর শুক্‌নো পাতার মধ্যে পাটকাটিগুলো গোরা পল্টনদের মত ঠিকরে আছে। ঘোড়াগুলো ঘুমচোখে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মাঝে মাঝে পা বদলাচ্ছে। তখন একটু-করে ঠুনঠুন আওয়াজ। ধুলিয়ানে লোক নিয়ে যাবে যে স্টেশন-ওয়াগন, সেটা ছাড়তে এখন ঢের দেরি। সকাল হোক, প্যাসেঞ্জার আসুক। তারপর ছাড়বে। তাই তার তেমন হাঁকডাক নেই।

টাঙা দেখে আমার খুব ছেলেবেলাকার পুরনো একটা ছবি হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

কলকাতা থেকে চাটিবাটি উঠিয়ে আমরা এসে নেমেছিলাম সান্তাহার স্টেশনে। তখন সবে রাত পুইয়ে সকাল হচ্ছে। ব্লটিং পেপারে কালি শুষে নিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনিভাবে। দূরে মাথার অনেকখানি ওপরে ওভারব্রিজটা, কী আশ্চর্য, কিছুই না ধরে কেমন করে যে ঝুলছিল। আমি আর দাদা আনন্দে হাত ধরাধরি করে আগে আগে চলছিলাম। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল টমটম। ঠিক টাঙারই মত। এক-ঘোড়ায় টানা দু-চাকার গাড়ি। হাসিখুশিতে এক্কার ছবি দেখেছিলাম তার ঢের ঢের পরে।

টাঙায় উঠে পেছনের সিটে বসে পুরনো কথাগুলো মনে করতে বেশ লাগছিল।

র পর কয়েকটা টাঙা। আউটডোরে ছবি তুলতে চলেছে দলবল। আমি অবশ্য রেয়োভাট। দলের কেউ না হয়েও ভিড়ে পড়েছি দলে। সরেজমিনে না দেখলেও নিমতিতা আমার একেবারে অদেখা নয়। দেখেছি 'জলসাগরে' আর 'দেবী'তে। দেখার চেয়েও বেশি শোনা। 'পদ্মানদীর মাঝি'র প্রসঙ্গে শুনেছিলাম ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পদ্মা দেখবার এই নাকি একমাত্র জায়গা। কাজেই সে লোভ অনেকদিন থেকেই আমার মনে মনে ছিল।

বসেছিলাম পেছনের সিটে। গাড়োয়ানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। মাঠঘাট পেরিয়ে আস্তে আস্তে লোকালয় পাওয়া গেল। পিচের রাস্তা ছেড়ে খোয়া-বাঁধানো সড়ক। দু-পাশে বৃষ্টির জলনিকাশী খানাখন্দ। মধ্যে মধ্যে কালভার্ট।

যেদিকেই তাকাই, সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা উত্তর-বাংলা উত্তর-বাংলা গন্ধ।

টাঙায় পেছনের সিটে বসা মানেই উল্টোমুখো হয়ে বসা। তার ওপর, পা রাখার জায়গাটা রাস্তার সঙ্গে প্রায় ঠেকে গিয়ে কেমন একটা আধ-দাঁড়ানো গোছের ভাব হয়। আর দু-পাশের দৃশ্যগুলোও আসে হঠাৎ আচমকাভাবে। আগে থেকে একটুও জানান না দিয়ে। সামনে যারা বসে আছে তাদের ওপর রাগ হয়। ওরা যেন একলষেঁড়ের মত আগেভাগে সব দেখে নিয়ে পেছনের লোকেদের জন্যে টিপে টিপে একটু একটু করে ছাড়ছে। নতুন জিনিস একটার বেশি একসঙ্গে কিছুতেই দেখাবে না।

গাড়ির গতি কমবার ধরনে বোঝা গেল এবার আমরা এসে পড়েছি। রাস্তা ছেড়ে উঁচু-নীচু অ-সমান জমি। আবছা আলোয় একটা-দুটো স্তম্ভ। এখানে এই প্রথম এলেও কেমন যেন সব চেনা-চেনা। নিজেকে জাতিস্মরের মত মনে হয়। বাড়ির দোরগোড়ায় টাঙা এসে থামল। রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি। গলির দু-পাশে একতলার পৈঁঠে। বাইরের অন্ধকারটা আলোর খোঁচাখুঁচিতে উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙলেও বাড়ির ভেতরের অন্ধকার তখনও দিব্যি মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। লণ্ঠনের একটা আলোকে তৎক্ষণাৎ পা টিপে টিপে নিচে নেমে আসতে দেখা গেল।

গায়ের ঠাণ্ডা সিরসিরে হাওয়া লাগতেই পেছন ফিরে তাকালাম। সামনে হাঁ হাঁ করছে আকাশ। আমরা কি তবে নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছি? ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। সামনে উঠোনের মাঝখানে একটা শান-বাঁধানো চত্বর। পাশেই নড়ে চড়ে পাহারা দিচ্ছে এক বন্দুকধারী সেপাই। দোতলায় উঠতে উঠতে শুনলাম এ-বাড়ির একতলায় সীমান্ত-পুলিশের ফাঁড়ি।

এককালে এ-বাড়ির কী জাঁক ছিল, ভেতরে এলে বোঝা যায়। দোতলায় ভেতরে বাইরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দা। স্বচ্ছন্দে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। বাঁদিকে হলঘর। রং-করা দেয়াল। দেয়ালে ইলেকট্রিকের লাইন। যখন এ গাঁয়ে বিজলী আসেনি, তখনই নিজেদের ডায়নামো চালিয়ে এ বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো জ্বালানো হত। ডায়নামোটা এখন অচল হয়ে পড়ে আছে। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে। এখন আর ডায়নামো সারিয়েই বা কী হবে? ইলেকট্রিকেরও আগে ছিল বেলোয়ারি কাঁচের ঝাড়লণ্ঠনের যুগ। হলঘরটা তখন ছিল সত্যিকারের জলসাঘর। ও-ঘরে কী ফুর্তির ফোয়ারাই না বয়ে গেছে একদিন!

গরম চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে পুবের বারান্দায় এসে যখন দাঁড়ালাম আকাশ যেন ডিমের কুসুমের মত ফেটানো। সামনে গঙ্গা। একটু বাঁদিকে চরের গা ঘেঁষে গেছে পদ্মা। পদ্মা পার হয়ে দিগন্তের পায়ের কাছে সবুজ নরুণপাড় বনরেখা। কাছে চরের গায়ে কাঁচা রোদ পড়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে কাশফুল। রোদ ওঠবার আগেই সবাই নুরপুরের বাগানে চলে গেল ছবি তুলতে। আকাশটাকে মুখে করে আমি একা। রাস্তা জেনে নিয়েছি। বেলা হোক। তারপর নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে যাব।

খানিক পরেই এসে গেলেন রাধানাথবাবু। রাধানাথ চৌধুরী। এঁদেরই বাড়ি। রায়েরা শুধু বনেদি জমিদার নন, পড়াশুনো-করা রুচিবান মানুষ। এ অঞ্চল নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গল্প হল।

রায়বাড়ির একতলায় সরকারী সেট্‌ল্‌মেন্ট ক্যাম্প। ফরাক্কা আর শামসেরগঞ্জ—এই দুই থানা নিয়ে কাজ। ফরাক্কায় চার-চারটে ইউনিয়ন : অর্জুনপুর, বেনিয়াগ্রাম, ফরাক্কা আর শ্রীমন্তপুর। সব মিলিয়ে বাহাত্তরটি মৌজা। আর শামসেরগঞ্জ থানায় ইউনিয়ন তিনটি : নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, ভাসাইপাইকর। মোট পঞ্চাশটি মৌজা।

ওপরদিকে পশ্চিম দিনাজপুর অবধি ধরলে মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের বেশ একটা আজব-প্রাণী আজব-প্রাণী চেহারা হয়। এই আজব-প্রাণীর গলাটাই হল শামসেরগঞ্জ। বাংলার এই সরু গলাটা বিহারের গায়ে প্রায় লেপটে আছে। হাটেবাজারে আর সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনে তার ছাপ মেলে।

আগে বড় অর্থে গণ্ডগ্রাম বলতে যা বোঝাত নিমতিতা তাই। তিনটি উদ্বাস্তু কলোনি নিয়ে গ্রামে মোট হাজার পাঁচেক লোক। এলাকা আগে আরও অনেক বড় ছিল। পাকিস্তান হয়ে এ গ্রামের পাঁচ-ছ হাজার বিঘে জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আরেক শত্তুর নদী।

উনিশশো একচল্লিশের ভাঙনের পর থেকে এ পর্যন্ত দু-আড়াই হাজার বিঘে জমি গেছে নদীর পেটে। জোত খুইয়ে পাঁচ-ছশো চাষী পরিবারকে জাতও খোয়াতে হল। এরা এখন কেউ মোট বয়, কেউ বাগান নিড়োয়, কেউ ঘরামির কাজ করে, কেউ গাড়ি চালায়, কেউ আনাজপাতি বেচে। তবে এদের মধ্যে পনেরো আনা লোকই এখন বিড়ি বাঁধে।

চাষীদের মধ্যে এখানে মোটামুটি তিন জাত। মুসলমান, মাহিষ্য আর ধানুক। মুসলমান চাষীরা বেশির ভাগ থাকে বাগড়ী এলাকায়। নদীর ধারে ধারে। মেটাল এলাকায় থাকে মোটামুটি মাহিষ্য আর ধানুক। ধানুকরা এসেছে বিহার থেকে। রাঢ় এলাকায় হিন্দু-মুসলমান দুয়েরই বাস। আরেকটা জাত আছে, তাদের বলে 'চাঁই'। তারা সাধারণত তরিতরকারির আবাদ করে।

বিশ পঁচিশ বছর আগেও এ অঞ্চলে ছিল লাক্ষার ফলাও ব্যবসা। লাক্ষাকে চলতি কথায় বলে 'লাহা'। সব পরিবারই তখন কিছু না কিছু লাহার চাষ করত। এ অঞ্চলে লাহার চাষ হয় কুলগাছে আর বিহারে হয় পলাশ গাছে। লাহার বিছনকে বলে 'তুড়ি'। কুলগাছে তুড়ি দিয়ে একহাত করে ডাল বেঁধে দেওয়া হয়; তারপর সেই গাছে পোকার দল ছড়িয়ে পড়ে লাহা তৈরি করে।

লাক্ষার গাছগুলো এখন নদীর পেটে। তাছাড়া লাক্ষার বিছনও এখন যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি দুর্মূল্য। লাক্ষার ব্যবসাতে এখনও লেগে আছে শতকরা চার কি পাঁচজন। লড়াইয়ের আগে তুড়ির যা বাণ্ডিল ছিল, এখন তার দাম হয়েছে তিন থেকে পাঁচগুণ। লাক্ষার দাম কমেছে সেখানে টাকায় আট আনা থেকে বারো আনা। আগে প্রচুর লাক্ষা যেত ইংলণ্ড, আমেরিকায়। জার্মানিতে কৃত্রিম রজন তৈরি হওয়ার পর থেকে লাক্ষার বাজার গেছে।

অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি, এই দু-কারণেই ধানের চাষ এদিকে আগের চেয়ে কমে গেছে। বন্যায় কম নষ্ট হয় বলে পাটের চাষটাই বেড়েছে। ক-বছর পাটের দরও পাওয়া গেছে ভাল। কালীগঞ্জ, ঔরঙ্গাবাদ, নিমতিতায় স্থানীয় লোকের আড়তই আছে দেড়শো। তাছাড়া বাইরের সুরজমল, জৈন, মঙ্গলবাবু, জে. সি. মুখুজ্যে—এদেরও আছে শতখানেক আড়ত। পাটের কেন্দ্র হিসেবে নিমতিতার স্থান ধুলিয়ানের ঠিক পরেই। নৌকো, ট্রাক আর ট্রেনে বছরে আট

দশ লক্ষ মণ পাট এখান থেকে চালান যায়। রাজমহল বা কাছাকাছি আরও নানা এলাকার পাট নিমতিতা হয়েই যায়। চাষীর হাত থেকে কমপক্ষে চার হাত ঘুরে পাট যায় চটকলে। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো যেতে ফারাক হয় পাঁচ-সাত টাকার।

রাধানাথবাবুর দুই ছেলে সৌম্যেন আর খোকন। ওদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। ঠিক হল নূরপুরে যাওয়ার পথে গাড়ুলিপাড়াটা একবার ঘুরে যাওয়া যাবে। গাড়ুলি নামটা আগে কখনও শুনিনি। শুনলাম নিচু জাত; কম্বল বানানো পেশা। বোকা লোককে আমরা গাড়ল বলি কেন? গাড়ল মানে কী?

খোকন তক্ষুনি একটা অভিধান এনে হাজির করল। 'গাড়ল'। গাড়ল মানে ভেড়া। যারা গাড়ল পোষে তারাই গাড়ুলি। এরা এক-ধরনের আদিবাসী। বিহার থেকে বাংলায় এসেছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে ভাঙা হিন্দীতে।

রাস্তার ওপারে নদীর ধারে ছোট পাড়া। আট-দশ ঘর গাড়ুলির বাস। মাইল তিনেক দূরে আলমশাহী, বাসুদেবপুর, মজিলপুর—পাশাপাশি তিনটি গাঁয়ে থাকে আশি-নব্বই ঘর গাড়ুলি। জঙ্গীপুর মহকুমার বাইরেও মুর্শিদাবাদ জেলার আরও নানা জায়গায় এদের বাস আছে। তাছাড়া বিহারের গাড়ুলিদের সঙ্গেও এদের বিয়ে-থা হয়।

গাড়ুলিপাড়ায় ঘর বলতে সবই খড়ের চালা। মহেন্দ্র ঘোষের দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ এ কথা সে কথা হল। তারপর দুলু ঘোষের সঙ্গে পাড়াটা একবার টহল দেওয়া গেল।

এ পাড়ায় জমি কারো নেই বললেই চলে। সামান্য একটু বাস্তু আর দু-এক বিঘে চাষের। থাকবার মধ্যে সব বাড়িতেই কম্বল বোনার একটা করে মান্ধাতার আমলের সাদাসিধে যন্ত্র।

বাংলা-বিহারের অনেক জেলাতেই চাষীরা বাড়িতে ভেড়া পোষে। ভেড়ার মাংস কিংবা ভেড়ার লোমের চেয়েও তাদের কাছে বেশি কদর ভেড়ার নাদির। কেননা ভেড়ার নাদির ভাল সার হয়। বাংলা-বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে গাড়ুলিদের ভেড়ার লোম যোগাড় করতে হয়। বছরে বেরোতে হয় তিনবার। কেননা ভেড়ার লোম কামানোর তিনটে সময় : মাঘ-ফাল্গুন, জষ্টি-আষাঢ়, আশ্বিন-কার্তিক। বছরের অর্ধেক সময় তাদের এ গ্রামে সে গ্রামে বেদের টোল ফেলে ফেলে ঘুরতে হয়।

লোমের জন্যে গেরস্থকে ভেড়াপিছু দিতে হয় এক আনা দু-আনা। লোম কামাতে লাগে একটা হেঁসোর মত যন্ত্র কিংবা কাঁচি। একেকটা বস্তায় দুশো ভেড়ার লোম হয়। পঁচিশ-তিরিশ সের তার ওজন। পাঁচ-ছটা কম্বল হবে তাতে। জঙ্গীপুরে আছে ভেড়ার লোমের মহাজন। তাদের কাছ থেকে কিনতে গেলে দর পড়ে মণকরা নিরেস তিরিশ টাকা। তাও কশাইখানার চুনমেশানো লোম। কারণ, মরা ভেড়ার চামড়া থেকে ওরা লোম তোলে চুন লাগিয়ে। মহাজনেরা যে সরেস লোম বেচে তার দর আশি থেকে একশো টাকা।

লোম আনবার পর থাকে ধোয়াবাছার কাজ। রংওয়ারি বেছে বেছে লোমগুলোকে আলাদা করতে হবে। নলের ঝুড়িতে লোম নিয়ে গঙ্গায় চুবিয়ে ধুতে হবে। ধোয়ার পর শুকোনোর পালা। তারপর তুলো ধোনার মত করে চরকায় সুতো কাটতে হবে। সুতো কাটার পর তানা হাঁটি করে ঝাঁপে বুনতে হবে। তাও সবটা একবারে নয়। আলাদা আলাদা চারটে ফালি বুনে সেগুলোকে সেলাই করে জুড়ে দু-পাশে ঝালর লাগিয়ে তারপর জমাট করতে হবে।

আটপৌরে একেকটা কম্বল বেচে দশ-বারো টাকার বেশি পাওয়া যায় না। পাঁচ ফালি জোড়া-দেওয়া একেকটা অর্ডারি ভাল কম্বল বেচলে পাওয়া যায় গোটা তিরিশেক টাকা। তেমন অর্ডার দু-চারখানার বেশি মেলে না। বছরে একবার মালদহের রামকেলির মেলাতেই যা কম্বল বিক্রি হয়। আর হয় পাইকাররা বাড়িতে এসে কিনলে। চারজন খাটবার লোক থাকলে কম্বল হয় দু-দিনে একটা। বোনার যন্ত্র সাত টাকা, চরকা সাত টাকা আর কাঁচির দাম পড়ে বাইশ থেকে পঁচিশ টাকার মত।

এ পাড়ায় মাঝবয়সীরা লেখাপড়া বড় একটা জানে না। কিন্তু সবাই প্রায় তাদের ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে দিয়েছে। এ পাড়ার একটি মেয়ে বছর আট-দশ আগে, আর একটি ছেলে বছর পাঁচ-ছয় আগে ম্যাট্রিক দিয়েছিল। পাশ করতে পারেনি। পরীক্ষা দেবার বছর দুই পরে মেয়েটি মারা যায়।

শুনে সৌম্যেন বলল, 'জানেন, আমাদের বাড়িতে মেথরের কাজ করে যে নগেন জমাদার, নিজে নিজে বাড়িতে সে বাংলা লেখাপড়া শিখেছে। আর নগেনের বড় মেয়ে ভারতী পড়ছে হাইস্কুলে।'

নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে অনেকখানি রাস্তা ভেঙে যখন আমরা আমবাগানে এলাম, তখন ছবি তোলার কাজ পুরোদমে চলেছে। ট্রলির পর ক্যামেরা বসানো। আমের ডালে দোলনা বাঁধা। রীণা তার ওপর বসে। শাড়ি পরে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে।

দুশো গজ দূরে দাঁড়ালেও সত্যজিৎকে চোখে না পড়ে পারে না। যা ঢ্যাঙা! তাছাড়া চোখেমুখে তখন তার অন্য ভাব। দেখে মনে হবে কিছুতে ভর করেছে। মাঝে মাঝে উঠছে আর পড়ছে একটা হাত।

গোটা দলটা কেউ চালাচ্ছে, না আপনি চলছে বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই।

দোলনায় মৃন্ময়ী দুলছে। আস্তে। ডাঙায় ওপরে ওপরে। তারপর জোরে। ডাঙা ছেড়ে আকাশ। পেছনে শুধু আকাশ।

চোখের ওপর এখনও যেন সব ভাসছে।

চায়ের বিরতি শেষ হতে না হতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। মাঝ-দরিয়ার নৌকোগুলো তরতরিয়ে ডাঙায় ভিড়ছে। পড়ে রইল চা। রায়ের ক্যামেরা তখন মেঘ ধরতে ব্যস্ত। মেঘের গায়ে চমকে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। যে যেখানে ছিল নদীর পাড়ে ভেঙে পড়েছে। অনেক দূরে আকাশের গায় কী যেন চিক চিক করছে। পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল : 'বৃষ্টি'!

তখন পালে বাঘ পড়ার মত এক দৃশ্য। যারা ছবি তোলা দেখবার জন্যে সকাল থেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেই হুড়মুড় করে সব হাওয়া।

নদীর পাড়ে কিন্তু অন্য দৃশ্য। ক্যামেরা গুটিয়ে সকলের আগে যাদের পালাবার কথা, সেই গোটা দলটা দেখি আনন্দে নাচছে। সেপ্টেম্বর মাস। এমন পাগলের মত মেঘ যে এমন লণ্ডভণ্ড বাধিয়ে দেবে কে ভেবেছিল। অথচ ওরা যে মনে মনে এতক্ষণ এটাই চাইছিল

বুঝিনি। বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটাগুলো গায়ে যেন নখের আঁচড় দিচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠছে মেঘ। দমকা হাওয়ায় টলে টলে উঠছে গাছ। মাঝে মাঝে হাওয়া যখন দম নিচ্ছে, ক্যামেরা চলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

একে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবৃষ্টি, তার ওপর অনবরত জল লেগে লেগে চশমার কাঁচও ঝাপসা। হঠাৎ একটা রণধ্বনির মত শুনলাম। দীর্ঘকায় একটা লোক তীববেগে সামনের দিকে ছুটে গেল। নদীর ধার বারবর পায়ে-চলা রাস্তা ধরে। সাংঘাতিক পিছল হয়ে আছে এঁটেল মাটি। দলের পেছনে পেছনে আমিও ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে দুমদাম করে একেকজন পড়ছি। রায় পড়ে যেতেই পূর্ণেন্দু ক্যামেরা তুলে নিয়ে ছুটল। পূর্ণেন্দু পড়ে যেতে সত্যজিৎ। সত্যজিৎকেও পড়তে হল।

বর্ষার সে ছবি পরে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের ডকুমেন্টারিতে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। গলা বুঁজে এসেছিল দেখতে দেখতে। শুধু ভঙ্গি দিয়ে ভোলানো নয়, সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে কীভাবে ঢেলে দিতে হয়—সত্যজিৎ রায়ের ছবি তোলা আর সত্যজিৎ রায়ের সেই তোলা ছবি দেখা, দুটো মিলিয়ে আমার কাছে স্পষ্ট হল।

পরদিন সকালে শুটিং নেই। শৈলেনবাবু এসে বললেন, 'চলুন, তাঁতীপাড়াটা ঘুরে আসি।' শৈলেনবাবুর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনা, সেটা ফেরার সময় টের পেলাম।

তাঁতীপাড়ায় যেতে পথে পড়ল ঔরঙ্গাবাদের বাজার। বাজারটার খুব জাঁকজমক। রাত্তিরে গেলে দেখা যায় ফ্লুরেসেন্ট আলোর বাহার। এ জায়গাটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে দেশভাগের পর। রাতবিরেতে নদীতে মাল পারাপারের ব্যবসা ছিল। আয়ুব খাঁর আমল থেকে সে কারবারে বড় রকমের ঘা পড়েছে বলে শোনা যায়। অনেকে ধরা পড়েছে, সীমান্ত পুলিশের গুলি খেয়েও অনেকে মরেছে। নিমতিতায় সিনেমা বলতে এ-দিগরে এক ঔরঙ্গাবাদে। দেয়ালে দেয়ালে হিন্দী ছবির রঙিন পোস্টার। ঘিঞ্জি গলির মধ্যেও গায়ে গায়ে দোকান। দু-পাশে বিড়ির বড় বড় ফ্যাক্টরি। একটা সাইনবোর্ড দেখে বেশ মজা লাগল। অমুকচন্দ্র অমুক। বড় বড় অক্ষরে নামের নিচে লেখা শুধুমাত্র—'বিলেত-ফেরত'।

ঠক-ঠকাস ঠক-ঠকাস। তাঁতীপাড়ায় সে এসে পড়েছি, আওয়াজ শুনেই তা মালুম হয়। ঔরঙ্গাবাদে তাঁত আছে শ-তিনেক। দেড়শো দুশো ঘর তাঁতী। এ ছাড়া আড়াইশো তিনশো তাঁত আছে মোমিনদের। আবার কোনো কোনো মহজনেরও তাঁত আছে। সেসব তাঁতে যারা কাজ করে তারা তাঁতী হয়েও আসলে মজুর। তাঁত খুইয়ে দোকান করছে, চাকরি করছে, জমিতে খাটাখাটুনি করছে—তেমন লোকও এ পাড়ায় যথেষ্ট মিলবে।

হরেন দাসের দাওয়ায় বসে সব শুনছিলাম।

সুতো কিনতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে। বত্রিশ আর চল্লিশ নম্বরের সুতোরই কাজ বেশি হয়। বত্রিশ নম্বর আর চল্লিশ নম্বরের সুতোর পাঁচ-সেরী বাণ্ডিল হরেদরে একই পড়ে। চাল পেষো, তাতে তুঁত মেশাও, জ্বাল দিয়ে আঠা করো—তাতেই তো গলে যাবে পাঁচ সিকে পয়সা। চল্লিশ নম্বরে ভাতের ফ্যান হলেই চলে যায়।

সুতো হলেই শুধু হল না। সুতো রং করিয়ে আনতে হবে রংগোলা থেকে। তারপর জলকাচা করে রঙিন সুতোয় আঠা মাখানো। ববিনে সুতো জড়ানো। তারপর বাগানে নিয়ে

গিয়ে সুতো খুলে তানা দেয়া। চার মোড় পাড় জুড়লে তবে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের বারো জোড়া কাপড় হয় এক বাণ্ডিল সুতোয়। এক বাণ্ডিল সুতো জড়াতে লাগে আশিটা ববিন। বাগানে শানার রীডের দুটো করে সুতো প্রতি খাঁজে পরানো হয়। তারপর সেই সুতো লরোদে জড়িয়ে বাগান থেকে বাড়িতে আনা। বাড়িতে এনে একজোড়া ব-র ভেতর দিয়ে গলিয়ে তাঁতে যখন লাগানো হল, একমাত্র তখনই বোনার কাজ শুরু হতে পারবে।

আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে বাগানের কাজ আর ফিট করার কাজ মিলিয়ে তিন দিনেই হয়ে যায়। নইলে বর্ষার সময় কখনও এক সপ্তাহও লেগে যায়। দিনে কাপড় হয় গড়ে দেড়-দুখানা; খুব বেশি হলে তিনখানা। দশহাতি কাপড় মাসে বিশ জোড়ার বেশি হয় না। মাসে কমপক্ষে ছ-দিন বাগানে কাজ, বাইশ দিন তাঁতে। দৈনিক আট ঘণ্টা খাটুনি। মাসান্তে মজুরি গড়ে পঞ্চাশ টাকা। সাজসরঞ্জামের পেছনেও মাসে চার-পাঁচ টাকা খরচ হয়। সে সব খরচ তাঁতীকেই দিতে হয়। নতুন একটা তাঁতী তৈরি করতে গড়পড়তা একশো টাকা খরচ।

নিজের তাঁতে যারা পরের মজুর এ হল তাদের কথা।

পুজোয় নবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত তাঁত চালানো, সুতো কাপড় কেনাবেচা একেবারে বন্ধ থাকবে। এখন তাই হাত চালিয়ে কাজ হচ্ছে। একাদশীর দিন প্রত্যেকটি তাঁতে হবে তাঁতপুজো। সেদিন তাঁতের গায়ে তেলসিঁদুর দিয়ে পুরুত ডেকে বিশ্বকর্মা পুজোর মত সকাল দশটার মধ্যে ষোড়শোপচারে পুজো হবে। দুপুরে ভাত খাবে না কেউ। নিরামিষ লুচি-তরকারি খাবে।

তাঁতীপাড়া থেকে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল। হাটবার বলে সেদিন ভাল মাছ মিলেছিল। অনিলবাবু এমন ভাব করলেন যেন তাঁরই হাতযশ। আমি রোয়োভাট। আমি ওসব সার্তেও নেই, পাঁচেও নেই। কিন্তু খাওয়ার পর তিন তাসে দেখলাম আমার কপাল রীণার মার ঠিক পরেই।

কাজেই বিকেলে ভারী ট্যাঁক নিয়ে গেলাম নিমতিতার হাটে। রায়-বাড়ির ঠিক পাশেই নিমতলা। হাট বসে হপ্তায় দুদিন। মঙ্গলবার আর শুক্রবার। হাটে অন্য যা সব থাকার তা তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বেশি করে চোখে পড়ল, তা হল প্রচুর সংখ্যায় দেশী ঘোড়া। সওদাপত্র ঘোড়ার পিঠে আসে, ঘোড়ার পিঠে যায়। আশপাশের জেলা থেকে ধানও আসে ঘোড়ায়। ঘোড়া রাখলে গরুর গাড়ির চেয়ে খরচ কম হয়। বলদ তো আর একজোড়ার কমে হবে না। একজোড়া বলদের দাম ফেলেছেড়ে তিনশো টাকা। গাড়ি বানাতে চাকা ছাড়াও বাঁশটাশ লাগবে। দুটো চাকার দামই তো পড়ে যাবে ষাট থেকে একশো টাকা। সব মিলিয়ে শ-চারেক টাকার ধাক্কা। তাছাড়া গরুর খড় কিনতেই তো ফতুর হয়ে যেতে হয়। পাওয়াও শক্ত। সে তুলনায় ঘোড়ার দানাপানি যোগাড় করা ঢের সহজ। খরচও কম।

সন্ধ্যেবেলা রাধানাথবাবু নবদ্বীপ বিশ্বাসকে নিয়ে এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করাতে।

নবদ্বীপ বিশ্বাস থাকেন নিমতিতার পশ্চিমে ক্রোশখানেক দূরে ধুনুরীপাড়া কলোনিতে। কলোনিতে আছে পৌনে চারশো মাছ-ধরা পরিবার। তারা এসেছে পাবনা জেলার সদরের

বেড়া থানার নানান অঞ্চল থেকে। যমুনা আর হোড়াসাগর বা বড়াল নদীর ধারেকাছে আগে এদের বাস ছিল। কলোনিতে বেশির ভাগ লোককেই ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল শুধু হাতে। চার-পাঁচটার বেশি নৌকো বর্ডার পেরিয়ে আসতে পারেনি। যারা ট্রেনে করে এসেছে, তারা সঙ্গে জাল আনতে পারেনি।

দেশে ছিল নবদ্বীপ বিশ্বাসের চার-চারটে নৌকো। দুটো ছিল সাতাশ-আটাশ হাত লম্বা, একটা বিশ হাত আর একটা হাত-চোদ্দ। আসবার সময় নবদ্বীপ বিশ্বাস শুধু বিশহাতি নৌকোটাই যা আনতে পেরেছিলেন। আর সেই নৌকোয় করে কিছু কোণা জাল। গ্রামের বাড়িতে তাঁর আরও ছিল বিস্তর জাল : বাছাড়ি, ঘনবেড়, খেওলা, ভেসাল, মই জাল, বিরিণ্ডি, বাঁশগেড়ে, ছাঁদি, শাংলো—আরও অনেক। আর ছিল সেই জগৎবেড় জাল, যা ফেলতে লাগে একশো জন লোক; পাশ থেকে তিনখানা নৌকা লাগে তিরিশ-বত্রিশ হাত, তদ্‌বির করতে ডিঙি লাগে চার-পাঁচখানা আর মাছ সরবরাহ করতে আরও চার-পাঁচখানা ডিঙি। সবই ফেলে আসতে হয়েছিল।

এপারে এসে ব্যবসা আর ঘর করবার লোনের টাকায় নবদ্বীপ একটা টুনিবেড় জাল করলেন। টুনিবেড় জালে লোক লাগে বত্রিশজন। তারপর হল টানাবেড় জাল; টানাবেড়ে লোক লাগে বত্রিশজন। তিন বছর ঐ জালেই চলল। তারপর নবদ্বীপ শুরু করলেন ডিম ধরা সাবাড়।

নবদ্বীপের হাতে যেই দশ হাজার টাকা জমল, অমনি তিনি জগৎবেড় জাল তৈরি করতে লেগে গেলেন। নিজের টাকা ছাড়াও আলকাতরা ইত্যাদি বাবদ ঔরঙ্গাবাদের মুদিখানার এক দোকানদারের কাছে হাজার দুই টাকা দেনা আর দুজন মহাজনের কাছে হাজার পনেরো টাকা চড়া সুদে ধার হল। জগৎবেড় জাল তৈরি করতে পনেরো হাজার টাকা লাগল বটে, কিন্তু সেই এক বছরেই মাছ উঠল এক-লক্ষ বাইশ হাজার টাকার। যেখানে যা ধারদেনা ছিল সব শোধ হয়ে গেল। লোকজনদের ছ-মাসের দেনাপাওনা মিটিয়ে হাতে নগদ লাভ থাকল পাঁচ-ছ হাজার টাকা।

তার পরের বছর? পরের বছর নদীতে মাছই হল না।

অথচ জালের কাছি প্রত্যেক বছরই নতুন করে কিনতে হয়। কাছি বলতে সত্তর বাম লম্বা (দু-হাত ছড়ালে যতটা হয়, ততটাতে এক বাম) সাত ইঞ্চি মোটা পনেরোটা কাছি। একেকটা কাছির ওজন ছ হন্দর। বাষট্টি টাকা করে কাছির হন্দর। তাছাড়া তিরিশ-বত্রিশ টাকা মণের পাট লাগবে তিরিশ-চল্লিশ মণ; আর বারো-তেরো টাকা মণ দরের আলকাতরা একশো মণ। তাহলেই বুঝে দেখুন জগৎবেড় জাল পোষার কী খরচ! পরের বছর মাছ না পেয়ে নবদ্বীপ বিশ্বাসকে শেষ অবধি হাজারে সাড়ে বত্রিশ টাকা সুদে নতুন করে আবার সাড়ে এগারো হাজার টাকা ধার করতে হল।

পুঁজির অভাবে গত ক-বছর নদীতে জগৎবেড় জাল ফেলাই হয়নি। কিছু জমানো সোনা ছিল। বিশ-পঁচিশ ভরি চলে গেছে। তাছাড়া ইদানীং নদী ভাঙছেও খুব। কলোনির দশ আনা অংশই এখন নদীর পেটে।

নবদ্বীপ বিশ্বাসের অধীনে কাজ করে কলোনির শতখানেক জেলে। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত :

তারা যা মাছ ধরবে, তা থেকে দাদন ইত্যাদির টাকা কেটে নিয়ে যা থাকবে সমান ভাগ হবে। যারা বেশি খাটুনি করে, তারা একটা করে 'মান্য' পায়। মালিক পায় খুব বেশি হলে পাঁচশো টাকা, ম্যানেজার দুশো-আড়াইশো, মুহুরি দেড়শো, মাঝি পঞ্চাশ। মোটা মোটা কাছি জলে যারা নামায় ওঠায় তাদের বলে 'শিশালদার'। তিন নৌকোয় শিশালদার থাকে ছ-জন। তারা প্রত্যেকে পায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা।

হঠাৎ নদীর দিক থেকে একটা সোরগোল ওঠায় ঘরের মধ্যে সকলেই আমরা কথা বলতে বলতে থেমে গেলাম। একটা আর্ত চিৎকার। এক ছুটে আমরা সবাই পুবের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে যতদূর দেখা যায় নিকষ কালো অন্ধকার। আকাশে—একটাও তারা নেই। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগলাম ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা পরিষ্কার একটা আওয়াজ : 'বাঁ-চাও, বাঁচা-ও, বাঁ-চা-ও'!

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর চারিদিক জুড়ে একটা বুকচাপা স্তব্ধতা আমাদের সবাইকে যেন গ্রাস করে ফেলল।

নদীর অন্ধকার জলে কয়েকটা আলোর ফোঁটা ছুটে গিয়ে একজায়গায় হয়ে আবার আলাদা হয়ে হয়ে পিছিয়ে এল। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

পরে ভানুই খবর নিয়ে এল। নৌকো উল্টে গিয়ে সাত-আটজন ডুবন্ত লোক 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে স্রোতে ভেসে চলেছিল। কয়েকটা নৌকো এগিয়েওছিল সাহায্যের জন্যে। স্রোতের টানে তারা ভেসে যাচ্ছিল পাকিস্তানের দিকে। এগিয়ে যেতে পারলে হয়ত তাদের বাঁচানোও যেত। কিন্তু পাকিস্তানী পুলিশের খপ্পরে পড়বার ভয়ে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছায় তাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। 'বাঁচাও, বাঁচাও' আওয়াজটা কানের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে রইল।

নিমতিতায় এখন সবচেয়ে ফলাও হয়ে উঠেছে বিড়ির ব্যবসা। প্রায় বছরতিরিশ আগেও গ্রামে হুঁকোতামাকেরই বেশি চল ছিল। শুধুমাত্র স্থানীয় প্রয়োজনে খুচরোভাবে কিছুটা বিড়ি বাঁধা হত। এখানে বিড়ির প্রথম কারখানা খোলে এম. বি. এম. কোং, বিশ্ববিজয় বিড়ি ফ্যাক্টরি। তখন থেকেই বিড়ি বাইরে রপ্তানি হতে থাকে। এখন তো ধুবড়ি, গণ্ডিয়া, ভাগলপুর, উত্তর বাংলা, কলকাতা থেকে বড় বড় লোক এসে এখানে কারখানা খুলেছে। এদিককার লোকের যার যেটুকু জমি ছিল নদীই সব ঘুচিয়ে দিয়েছে। কাজেই মজুরের কোনো অভাব হয়নি। অন্যান্য জায়গার চেয়ে মজুরিও এখানে কম। ক্ষেতমজুরদের দেড় টাকা রোজ। কাজেই বিড়ি কারখানা এখানে খুলবে না তো খুলবে কোথায়। কলকাতার রাজাবাজার থেকে নাসিরুদ্দিন, খলিল মিঞারা এসে এখানে কারখানা খুলেছে। কেননা কলকাতায় বিড়ি বাঁধতে হাজারে মজুরি দিতে হয় দু টাকা সাড়ে দশ আনা। এখানে দেড় টাকা!

মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানির কারখানাই এখানে সবচেয়ে বড়। খাস কোম্পানির অধীনেই কাজ করে দশ-বারো হাজার মজুর। তাছাড়া আছে মুন্সীদের অধীনে কাজ করা মজুর। সব মিলিয়ে মোট সংখ্যা পঁয়ত্রিশ-তিরিশ হাজার হবে। মৃণালিনীর দৈনিক বিড়ি হয় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ

লাখ। তার পরেই হয় মলয় বিড়ি ওয়ার্কস-এর। দৈনিক বারো-তেরো লাখ। এছাড়া আছে আসাম, নিউ আসাম, দিলীপ, বিশ্ববিজয়, এস. কে., খলিলুদ্দিন। সব ঘর মিলিয়ে এখান থেকে দৈনিক এক কোটি সওয়া কোটি বিড়ি বাইরে চালান যায়। পাঁচ টাকা করে হাজার হলে রোজ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বিড়ি। তার জন্যে মজুরি দিতে হয় রোজ প্রায় হাজার পনেরো টাকা।

কোম্পানির মালিকরা নিজেদের কারখানায় সব বিড়ি তৈরি করে না। তাদের সাব-এজেন্টদের বলে মুন্সী। মালিকরা মুন্সীদের দেয় সুতো, তামাক আর বিড়ির পাতা।

সাধারণ হাজার বিড়িতে লাগে পাঁচ ছটাক তামাক। বড় বিড়িতে ছ ছটাক। বড় পাতার বড় বড় বাণ্ডিলে থাকে দু-সের আড়াই সের পাতা। তাতে তিন হাজার বিড়ি হয়। দেড়-দু ছটাক ওজন হয় ছোট পাতার ছোট ছোট বাণ্ডিল। তাতে বিড়ি হয় একশো বিশ। একেকটা বড় পাতায় পাঁচ ছটা আর ছোট পাতায় গোটা দুই।

কোনো কোনো কোম্পানির মুন্সী হতে গেলে দুশো-আড়াইশো টাকা কোম্পানির কাছে জমা রাখতে হয়। সেইসঙ্গে এমনও চুক্তি থাকে যে, দৈনিক পঞ্চাশ হাজার বিড়ি বানিয়ে দিতে হবে। মুন্সীরা মজুর খাটায় দুভাবে। আটচালায় লোক বসিয়ে কারখানা খুলে, কিংবা মজুরদের বাড়িতে বাড়িতে বিড়ির মশলা যুগিয়ে। কারখানায় যারা খাটে তারা পায় দেড় টাকা আর বাড়িতে বসে কাজ করলে পায় এক টাকা ছ আনা।

আগে মুন্সীদের ছিল পঞ্চাশ টাকা মাইনে। মজুরদের ছিল তিরিশ টাকা। তখন মুন্সীরা করত কী, কোম্পানির কাছ থেকে দাদন-পাওয়া তামাক আর পাতা মজুরদের কম করে দিয়ে বাড়তি তামাক আর পাতা চোরাবাজারে বেচে দিয়ে দেদার পয়সা করত। তাছাড়া সে-সময়ে ঔরঙ্গাবাদে ছিল চোরাচালানের বড় রকমের ব্যবসা।

আর একটা ব্যাপারে মালিকদের সঙ্গে ষড় ছিল বলেই মুন্সীদের ওসব হাতটান মালিকরা দেখেও দেখত না। ব্যাপারটার নাম ছাঁটাই। মুন্সীদের যোগানো তামাক আর পাতা থেকে মজুররা যেসব বিড়ি তৈরি করে দিত, তার নানারকম খুঁত বার করে মুন্সীরা বেধড়ক বিড়ি ছাঁটাই করে দিত। এইসব বিড়ি বাবদ মজুররা কোনো পয়সা পেত না। সেই ছাঁটাই-করা বিড়ি মুন্সীদের কাছ থেকে নিয়ে বিড়ি কোম্পানিগুলো বাজারে বেচত। এই বিড়ির জন্যে কোনরকম মজুরি দিতে হত না বলে মালিকদের মোটা লাভ হত। দিনে যে মজুর দু-হাজার বিড়ি বাঁধত, দিনের শেষে মুন্সীরা তার পাঁচশো বিড়িই হয়ত বাতিল করে দিত। এ ব্যাপারে রেকর্ড করেছিল বেলাল মিঞার মুন্সী। হাজারের মধ্যে একেবারে সাতশো।

মুন্সীরা যাতে বেশি বেশি করে খুঁত ধরে বিড়ি ছাঁটাই করে, তার জন্যে মালিকদের দিক থেকে নানা রকমের লোভনীয় ব্যবস্থা থাকত। মুন্সীরা পেত রকমারি বখশিস—কেউ গ্রামোফোন, কেউ রেডিও, কেউ হাতঘড়ি।

কিন্তু বড় বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কেঁচে গেল। মজুররা কোর্টকাছারি করায় সরকারের পক্ষেও আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। ত্রিদলীয় সম্মেলনে বসে রফা হল এই যে, মুন্সীরা এখন থেকে মাস-মাইনের বদলে কমিশনে কাজ করবে। আর ছাঁটাইয়ের ব্যাপারটাও আগের মত ওরকম ঢালাওভাবে হতে পারবে না। ছাঁটাই চলবে

হাজারে দু'মুঠো—পঁচিশটায় এক মুঠোর হিসেবে দু-মুঠোয় পঞ্চাশটা। এখন সেইভাবেই চলছে।

চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন সাল অবধি বিড়ি কারখানায় আরও একটা মধ্যযুগীয় প্রথা ছিল। তার নাম ঈশ্বরবৃত্তি। এ প্রথাটা এসেছিল সটান সেকালের জমিদারদের কাছ থেকে। মজুরি থেকে সপ্তাহে চার আনা করে পয়সা কেটে রেখে দেওয়া হত ঠাকুর-দেবতার নামে। সে টাকার কোনো হিসেব থাকত না। গোটাটাই যেত মালিকের পকেটে। শেষ পর্যন্ত সরকারী হস্তক্ষেপে এই বাজে আদায় বন্ধ হয়।

যে জুলুমগুলো নিমতিতায় বন্ধ হয়েছে তার অনেকগুলো নাকি এখনও ধুলিয়ানে চলছে। আসলে মজুরের ঘরে সিঁদকাঠি দেওয়াটা বন্ধ হয়নি। বন্ধ হবারও নয়। যেটা ঠেকানো গেছে সেটা দিনে-ডাকাতি।

বিকেলের দিকে গ্রামের ভেতরটা খানিকক্ষণ ঘুরলাম। গ্রামে এমন বাড়ি খুবই কম যেখানে বিড়ি বাঁধা হয় না। পাড়ার মধ্যে অনেক ঘুরেও কানে কোনো গ্রাম্য সুর ভেসে এল না। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে কেউ কেউ গাইছে হিন্দী সিনেমার গানের কলি।

পৌষ মাসে নাকি এসব দিকে এখনও কী একটা গান হয়। শাগবোল, না সাঁঝবোল। ছেলেরা দল বেঁধে বেরোয় সন্ধেবেলায়। শাগবোল গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-পয়সা চাঁদা তুলে বেড়ায়। তারপর সংক্রান্তি নাগাদ সেই চাঁদায় চড়ুইভাতি করে।

আর এক আছে আলকাপ। সামাজিক প্রহসন ধরনের এক রকমের যাত্রা। স্থানীয় ভাষায় লেখা। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত লোকেরাই এসব জিনিস লেখে। বেশি দেখা যায় মেলায় আর নিচু সমাজে।

এ গ্রামে গত বিশ বছর ধরে উচ্চশিক্ষার দিকে সাধারণ মানুষের একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। নাপিত, রাজবংশী, মাহিষ্য পরিবারে গ্র্যাজুয়েট আছে। মাঝারি চাষীর মেয়ে আছে স্কুল ফাইনাল পাশ। নাপিতদের এক ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করে সেট্‌লমেন্ট অফিসে কাজ করছে। পড়াশুনো করেছে সে বিড়ি বেঁধে।

স্কুলে-পড়া অনেক ছেলেমেয়েকেই বাড়িতে বসে বিড়ি বাঁধতে হয়। শুধু পড়ার খরচ যোগাবার জন্যে নয়, সংসারের সাশ্রয়ের জন্যেও।

বাড়ির মেয়েদের কথা তো ওঠেই না। বিড়িমজুরদের তিন ভাগের এক ভাগই মেয়ে। শুধু বাড়ির মা-বউরা নয়, মেয়েরাও ছোট থেকে বিড়ি বাঁধে।

এ গ্রামের মেয়েরা চাষী পরিবার হয়ে থাকার সময় আগে কখনও যা পায়নি, আজ বিড়ি বাঁধার কাজ করে তা পাচ্ছে।

বাড়িতে এই প্রথম তারা পাচ্ছে মর্যাদা। বিড়ি বেঁধে তারা পায় পুরুষের সমান মজুরি। বিড়ি বাঁধার কাজ জানে বলে বিয়ের বাজারে এ-গাঁয়ের মেয়েদের খুব আদর। এদিকে বাপ-মারাও রোজগেরে মেয়েদের হাতছাড়া করতে চায় না। এমনও নাকি হয়েছে যে, বিয়ের পর মেয়ে বাপের বাড়ি এলে তাকে নানা অছিলায় আটকে রাখা হয়েছে—শ্বশুরের ঘরে পাঠানো হয়নি। অবশ্য পুরোটাই যে মেয়ের অমতে তা নয়। তার কারণ, বিড়িবাঁধা মেয়েরা একেবারে অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চাষী ঘরের বউ হয়ে নিজেদের পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে

পারে না। এখানে যাহোক হাতে দুটো কাঁচা পয়সা থাকে। শখ-শৌখিনতা করবার ইচ্ছে হলে ভিখিরির মত কারো কাছে হাত পাততে হয় না। শ্বশুরবাড়িতে সে স্বাধীনতাটুকু কে দেবে?

মোট কথা, নিমতিতার গ্রামে গ্রামে বিড়িবাঁধা পরিবারগুলোতে মজার মজার ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। পুরনো সংস্কারের বাঁধনগুলো এখনও বজ্র আঁটুনি না ফস্কা গেরো— জোর করে কিছু বলা শক্ত হচ্ছে।

এ গাঁয়ের বিয়ে-হওয়া মেয়েরা সেই ছড়াটা জানে কিনা জিগ্যেস করতে ভুলে গেলাম। সেই যে সেই ছড়াটা—

ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝম
এপারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে—
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।
এ মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে।
হাড় হল ভাজা মাস হল দড়ি
আয় রে নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

এদিকের অঞ্চলগুলোতে জমিদাররা এখন সেই হিতোপদেশের নখদন্তহীন বাঘ। বেনামীতে আর কত জমিই বা খাস করে রাখা যায়। বনেদী হিংস্রতার মধ্যে একটা পালিশ ছিল। নতুন বড়লোকদের সেই পালিশটা নেই। পালিশটা আনতে তাদের সময় লাগবে। ঈশ্বরবৃত্তি উঠে যাওয়ার ব্যাপারটাই ধরুন না কেন। অমন দাঁতখিঁচুনো গাঁক-গাঁক ভাব চলবে না। ফোঁটাতিলকে স্বভাব আস্তে আস্তে মিছরির ছুরি হবে।

নতুন যারা বড়লোক হয়েছে, তারা সকলেই বিড়ির পয়সায় বড়লোক। চাষ-আবাদ করে নয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি নামডাক দু-জনের। একজনের বাড়ি ছাবঘাটি গ্রামে, অন্য আরেকজনের বাড়ি ধুলিয়ানে। দু-জনেই পয়সা করেছে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে। এদের প্রত্যেকেই নাকি এখন কোটিপতি। ব্যবসাতে একেকজনের বিশ-তিরিশ লাখ টাকা খাটছে।

যিনি ছাবঘাটির, তাঁর বয়স ষাট। তাঁর দাদা নাকি হাটবাজারে দা-কাটা তামাক বিক্রি করতেন। দাদা ছিলেন নিরক্ষর, ভাইয়ের কিন্তু সামান্য বাংলা অক্ষরজ্ঞান আছে। মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালেও ছেলেদের ইনি ইস্কুল-কলেজে পড়িয়েছেন। বড় ছেলে বিয়ে করেছে নিজে দেখে।

কলকাতায় অফিস এলাকায় তাঁর বাড়ি আছে। ভাড়া খাটে। এখানকার বাড়িতে ইলেট্রিক আছে, রেডিও আছে। বইপত্র কিনে এমনকি ঘরে সাজিয়ে রাখারও অভ্যেস যে নেই সেকথা সবাই জানে। ফুলের বাগানটাগান? সে-সব নাকি নেই। ফিল্মে একবার টাকা লাগিয়েছিলেন। তারপর আর বেলতলামুখো হননি। বিড়ি ছাড়া আর কোনো ব্যবসাও বিশেষ নেই। গ্রামের শিক্ষিত লোকদের টানার কখনও কোনো ব্যবস্থা করেননি। অভ্যেসটভ্যেস নাকি সব রকমেরই আছে। দানধ্যান বলতে নিজের গ্রামে একটা ইস্কুল আর মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র।

ধুলিয়ানের যিনি টাকার কুমির, তিনি আগে ছিলেন রাজমিস্ত্রি। নিজের বিড়ির

প্রচারকৌশলের দিক দিয়ে কিন্তু তিনি সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন। তাঁর নিজের প্রোজেক্টর আছে। নিজের বিড়ির বিজ্ঞাপনের ছবি তুলে লাইনে লাইনে তিনি দেখিয়ে বেড়ান।

মালিকদের টাকার পাহাড় তুলতে গিয়ে মজুরদের ফুসফুসগুলো ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছে যক্ষ্মায়। হাড়ভাঙা খাটুনি, দিবারাত্রি বসে বসে কাজ, তামাকের ধুলো, পুষ্টিকর খাবারের অভাব—সব মিলিয়েই বোধহয় এমন হচ্ছে। শিগগিরই একটা চেস্ট ক্লিনিক খোলা হবে। জায়গা নেওয়া হয়েছে স্টেশনের পেছনে। টাকা উঠেছে হাজার চোদ্দ-পনেরো।

তার ইতিহাস আছে।

একবার মজুরদের তরফ থেকে এই বলে মামলা দায়ের করা হয়েছিল যে, সরকারী ব্যবস্থামতো ন্যূনতম মজুরি তাদের দেওয়া হচ্ছে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটা আপস হল। মিটমাট হল এই শর্তে যে মালিকরা নিজেরা টাকা তুলে মজুরদের জন্যে একটা চেস্ট ক্লিনিক খুলে দেবে। সেই টাকাতেই ক্লিনিক হচ্ছে।

এক হাতে ফুসফুসে ঘা করা, অন্য হাতে সেই ঘায়ে মলম দেওয়া। শুনে খুব হাসি পেল। তামাসাটা মন্দ নয়।

সন্ধ্যের পর পুবের বারান্দায় গোল হয়ে বসে ঘরোয়া খেলা হচ্ছিল। সত্যজিৎ এত খেলাও জানে। বুদ্ধির খেলা বলে প্রত্যেকটাতেই আমি হেরে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ বংশী আকাশের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য-হওয়া গলায় বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন—কী ওটা?'

রেলিঙে ভিড় করে আমরা সবাই বংশীর আঙুলের নিশানা লক্ষ্য করে তাকালাম। জ্বলজ্বলে একটা তারা। কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই। যেন হন্ হন্ করে হেঁটে আসছে। কে যেন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল : 'স্পুৎনিক! স্পুৎনিক!'

আর কোনো কথা নয়। আমরা সব হুড়মুড় করে ছুটলাম ছাদে! গোটা আকাশটা পাড়ি দিয়ে চোখের আড়াল হওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আশ্চর্য! কলকাতায় কতবার দেখবার চেষ্টা করেছি। ঘড়ি ধরে দাঁড়িয়েছি রাস্তায়। কখনও দেখতে পাইনি। সেই স্পুৎনিক শেষে দেখলাম নিমতিতার আকাশে। একেই বলে কপাল।

নিমতিতাকে মনে থাকবে। নিমতিতা। তেতো কে বলল? মিষ্টি।

৩২ বর্ষ ৯ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৬৯

[সুবচনী নামে লিখিত]

ভুবননগর এড়িয়ে

পিঠে বোঁচকা। কাঁধে ঝোলা। ঘাড় আপনি নুয়ে এসেছে।

বিনয়ভবন পেরিয়ে হিহি-করা মাঠ। তারপর একটানা ওলান জমি। বাউলবৈরাগীদের তালি-মারা আলখাল্লার মত টুকরো জোড়া দেওয়া দেওয়া ধানখেত। আলের ওপর দিয়ে তেড়াবাঁকা এলোমেলো পায়ে-চলার রাস্তা। ঘাড় টেড়ি করে হাঁটতে গেলেই হোঁচট খেয়ে পা মচকাবার সমূহ ভয়।

সামনে অনেক দূরে বাঁশবন। ভুবনডাঙা গ্রাম। তার মাথার ওপর পেরিস্কোপের মত উঁচিয়ে আছে চালকলের চিমনি। আকাশে আড় হয়ে মটকা মেরে রয়েছে জলকলের ট্যাঙ্ক।

আমার আগে আগে তরতরিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল বোধহয় ভুবনডাঙারই কোনো মেঝেন। মাথায় গামছা পাকিয়ে বিঁড়ের মতন করে বসানো। তার ওপর দুধ কিংবা তেলভর্তি একটা অ্যালুমিনিয়ামের ডাবরি। পিঠে পিছমোড়া করে বাঁধা দুধের বাচ্চা। দুহাত ছেড়ে দিয়ে স্বচ্ছন্দে সে মাথার ভার সামলে হাঁটছিল।

ট্যুরিস্ট লজটা কোথায়, আমার এই প্রশ্নের উত্তরে সে স্রেফ জানে না বলল। হয় সে সত্যিই জানে না, নয় আমার ভাষা বোঝেনি কিংবা এক কথায়-সে আমাকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেয়েছিল। তিনটের কোনোটাই আমার কাছে খুব সুখের ব্যাপার বলে মনে হয়নি। তাছাড়া এও হতে পারে যে, এক লপ্তে তিনটেই সত্যি। জানে না, বোঝে না এবং চায় না।

খেতের পর খেত পেরিয়ে ভুবনডাঙার উঁচু পাড়ের ওপর উঠে পেছনে তাকালাম। মনে হল, এখান থেকে শান্তিনিকেতন ঢের দূর। ভুবনডাঙার ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে এক অন্য ভুবন, যেখানে বিশ্বের ঠাঁই।

আগে সবটাই ছিল আস্ত ভুবননগর। ভুবনডাঙা নামটা হয়েছে পরে।

রবিঠাকুর ছেলেবেলায় বোলপুর ইস্টিশানে নেমে আশ্রমে যেতে পাল্কিতে। গাছপালা ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে নিশ্চয় অনেক ঘুররাস্তায় যেতে হত। এখন তো নাকের সোজা রাস্তা। গাড়ি দূরের কথা, সাইকেল-রিক্শাও এখন হুস্ করে চলে যায়। শান্তিনিকেতনের লোক এটা সেটা কিনতে বোলপুরের বাজারে টুক করে চলে আসে।

আমি এবার মাঠ ভেঙে হাঁটা রাস্তায়। একালে ভদ্রলোকেরা এভাবে আলটপ্কা হয়ে কম আসে।

যেখানে এসে উঠলাম সেটা একটা অজ পাড়াগাঁ। কবর দেখে ঠাহর হয় মুসলমান পাড়া। উঠোনো গড় হয়ে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রয়েছে গরুর গাড়ি। একপাশে গাদা করা খড় আর জাবনার নাদা। নাকে সর্দি নিয়ে একপাল ছেলেমেয়ে আদুড় গায়ে আমার দিকে এমনভাবে চেয়ে রয়েছে যেন আমি অন্য কোনো দেশের মানুষ।

দেশ তো তবু পদের। আমাদের কাউকে কাউকে ওরা এমনকি অন্য কোনো গ্রহের লোক বলেও ভুল করে। বছরে একটা দিন ওরা দেখে আকাশ থেকে পড়ে ডানাঅলা রথ। তার আগে থেকেই মাঠে মাঠে বসে যায় বন্দুকঅলা সেপাইদের ছাউনি। বউঝিরা বাইরে বেরোয় না। খুব ডাকাবুকোরাও তখন শান্তিনিকেতনের কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়। রথের রথীকে চর্মচক্ষে দেখে এখানকার খুব কম লোক। বাকিরা দেখতে পায় কাগজের ছাপা ছবিতে। গ্রামের ভেতর দিয়ে হেঁটে এসে আন্দাজে শেষ অবধি পৌঁছে গেলাম বোলপুর শহরে।

ব্যস, ফুরিয়ে গেল মাটির বাড়ি আর খড়ের চাল। বড় বড় পাকা দালানের আড়ালে পড়ে গেল রোদে-দেওয়া ছেঁড়া কাঁথা আর মাটির দেয়ালে হেলান দেওয়া মই-লাঙল। আর আজকের উপেক্ষিত ভুবনডাঙায় পোড়ামাটির সেই তোরণ, যেখানে একবার পড়েছিল স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের পদধূলি।

শান্তিনিকেতনের এপারে ভুবনডাঙা। তার গায়ে গা দিয়ে এখানেও এক অন্য জগৎ।

এক ঠিকেদারের তিন তিনটে চোখ-ধাঁধানো বিশাল বাড়ি। গেটের গায়ে মাধবীলতা। এক সময়ে তিনি নাকি দেখতেন শ্রেণীহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন। ঠিকেয় ভুল হওয়ার সংখ্যা, ইদানীং দেখা যাচ্ছে, খুব কম নয়।

বোলপুরে এমনিতেই এখন জমি কেনা, বাড়ি করার হিড়িক পড়ে গেছে। হয়ত আর বছর কয়েকের মধ্যেই ভুবনডাঙায় গরিব-দুঃখীর পাট উঠে যাবে। তাদের ভিটেমাটি চাটি করে সেখানে হবে পয়সাওয়ালাদের নয়া বসত।

এ শতাব্দীর গোড়াতেও বোলপুর ছিল নিতান্ত গণ্ডগ্রাম। লোকসংখ্যা ছিল তিন হাজারের কিছু বেশি। বাড়তে বাড়তে বছর ষোল আগে সেই সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল প্রায় আট গুণ। এখন সেটা আরও বেড়ে ষোলগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর মধ্যে কিছু অস্থায়ী। ব্যবসা চাকরি বা বেড়ানোর সূত্রে বা দীর্ঘ মেয়াদে এসে তারা থাকে। একাংশ এসেছে দেশভাগের পর, বাদবাকি প্রায় সবাই এসেছে এই জেলারই নানা অঞ্চলের গ্রামগঞ্জ থেকে।

গ্রামে যাদের জমি জায়গা নেই বা কাজের অভাব, গ্রাম ছেড়ে তারা শহরে চলে আসছে রুজিরোজগারের ধান্ধায়। গ্রামের যারা পয়সাওয়ালা তারাও শহরে জমিজায়গা কিনছে, ঘরবাড়ি তুলছে। ছেলেপুলেদের কলেজ-ইস্কুলে পড়ানো, সপরিবারে এসে শহরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা, গাঁয়ের টাকা শহরে এনে খাটানো—এসব কারণ তো আছেই। সেইসঙ্গে আছে শহরস্থ হয়ে গাঁয়ের লোকের চোখে জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষা। মনে হচ্ছে, ভুবনডাঙাকে কোণঠাসা করতে শেষ পর্যন্ত এখানকার আদিবাসীদের স্রেফ তারা উঠিয়ে তবে ছাড়বে।

স্বাধীনতার পর গ্রাম ছেড়ে শহরমুখো হয়েছে একটার পর একটা জনস্রোত। এক তো জমিদারি উচ্ছেদের পর। তারও পরে ভাগচাষীরা যখন আইনগত কিছু সুযোগ-সুবিধে পেল ঠিক সেই সময়। যারা চলে এল তারা নিজে হাতে জমি চাষ করতে রাজি নয়। এরা সবাই বলতে গেলে গ্রামের ভদ্রলোক। গ্রামে ছিল নিজের জমি ভাগে দিয়ে বসে খাওয়ার অভ্যেস। শহরে এসে এরা পড়ল মহা ফাঁপরে। পুঁজি বলতে ব্যাঙের আধুলি। তাও সব সময় খুইয়ে

ফেলায় ভয়। গতরে খাটার মুরোদ নেই, তার ওপর আছে চক্ষুলজ্জা। এদেরই মধ্যে হা-হুতাশ আর চোখ টাটানোর ভাব খুব বেশি। কবে কী ঘি খেয়েছিল সেই গন্ধ এখনও হাতে এদের লেগে আছে। আর যতটা নয় তার চেয়েও বেশি বঞ্চিত বলে এরা নিজেদের মনে করে।

বোলপুরের যারা বড়লোক তাদের বেশির ভাগেরই পয়সা হয়েছে ধানচালের কারবারে। বাইশটা ধানকলের মধ্যে এখন চলছে মোটে তেরো-চোদ্দটা। বেশির ভাগ কল অচল হয়ে আছে শরিকানার ঝগড়ায়। চালু কলের অর্ধেক কিনে বা ভাড়া নিয়ে মাড়োয়ারী চালাচ্ছে। এইসব কল থেকে বছরে আয় হয় শুধু প্রকাশ্যেই চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা। লুকো-ছাপার হিসেব যে কত তা কেউ জানে না।

এই টাকায় কেউ ভূ-সম্পত্তি করছে, কেউ বা আড়তদারি বা সুদখোরি কারবারে টাকা লাগাচ্ছে। খুব কম টাকাই যাচ্ছে উৎপাদনের খাতে। এক সময়ে টাকাওয়ালারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল বাস-লরির ব্যবসায়। তাতে অনেক নতুন নতুন বাসরুট খুলেছিল। গত তিন বছর ধরে তাতে ভাঁটার টান। কেননা তেলের খরচ তো বটেই, সেই সঙ্গে মোটরপার্টস আর টায়ারের দাম বেজায় বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে এও ঠিক যে, বাসের যাত্রীও বেড়েছে বহুগুণ। একতলা একটা বাস থেকে হয় পুরোপুরি দোতালা বাসের আয়। কেননা বাসের চালের ওপর তিলধারণের জায়গা থাকে না।

এক সময়ে বোলপুর ছিল ধানচালের বড় গঞ্জ। এখান থেকে কাঁচা চামড়ার আর তামাক খাওয়ার হুঁকো নানা জায়গায় চালান যেত। এখানে তাঁতের কাপড়েরও ভাল একটা বাজার ছিল।

বোলপুরের আসল নাম হল বলিপুর। লোকে বলে, সেকালে কোনো এক রাজা নাকি এখান থেকে দীর্ঘ রাস্তা ছাগল বলি দিতে দিতে গিয়েছিল। তাইতে গ্রামের নাম হয়ে যায় বলিপুর। কলিকাতা যেমন কলকাতা, বলিপুরও তেমনি মুখে মুখে বোলপুর হয়ে গেছে।

বোলপুরে লক্ষ্মীর বাস। কিন্তু হলে হবে কী, শহরটার কোনো লক্ষ্মীশ্রী নেই। পৌরসভা আছে, কিন্তু তার আয় বেশি নয়। ফলে বেশির ভাগই কাঁচা রাস্তা। পাকা ড্রেন হচ্ছে, কিন্তু তা দিয়ে সব জায়গায় ঠিকমতন জল নিকাশ হয় না। উপযুক্ত কলকব্জার অভাবে জলকল থেকেও না থাকার দাখিল।

এমনিতেই তো এ রাজ্যে বারোমাসে তেরো পার্বণ। তাছাড়া ঘাড়ের ওপর শান্তিনিকেতন। জেলায় পীঠস্থানও খুব কম নয়। আর আছে বড় বড় মেলা। তার ফলে, বোলপুরে বারো মাস তিরিশ দিন দর্শনার্থীর ভিড় থাকে। তারা থাক না থাক, এখানকার রাস্তাঘাট জলবিদ্যুৎ খাবারদাবার জলহাওয়া জনস্বাস্থ্য বাসস্থান—সব কিছুর ওপরই এই ক্রমবর্ধমান ভিড়ের চাপ সমানে এসে পড়ছে। তাতে পৌরসভার খরচ আছে, কিন্তু আয় নেই।

বোলপুরের যে বাজার, সেটাও পৌরসভার নয়। ব্যক্তিগত মালিকের। বাজারের ব্যাপারে যত দায় সব পৌরসভার। আর লাভের গুড়টুকু শুধু পিঁপড়েতে খায়।

শহরে ঘুরতে ঘুরতে ট্যুরিস্ট লজের কাছেই দেখি স্কুলবাগান পাড়ায় এক পোলট্রি ফার্ম।

পোলট্রি কথাটা বাংলায় বেশ চালু হয়ে গেছে। অনেকে বলেন, যে ভাষা যত ধার করতে পারে সেই ভাষার তত মুরোদ। কিন্তু তাই বলে আদেখলেপনাও কি ভাল? আসলে সব সময় যে ঠেকায় পড়ে আমরা ধার করি তা নয়। এক তো সাহেবি শব্দের ব্যাপারে আমাদের কুছকাঙালি ভাব তো আছেই, তার ওপর আছে গা-মাথা একেবারেই ঘামাতে না চাওয়া।

তাছাড়া একটু নলচে আড়াল দিলেও তো হয়! যেমন, পোলট্রি-র ব্যুৎপত্তিগত মানে ছানাপোনা। আমরা যেমন বলি 'পোলা' বা 'পুলে'। একটু কষ্ট করলে বাংলা-ঘেঁষা একটা শব্দ কি দাঁড় করানো যেত না? কিংবা 'ডেয়ারি'র ধ্বনি সাদৃশ্যে 'দোয়ারি' গোছের কোনো শব্দ?

গেটের ভিতর ঢুকে বাঁদিকে আপিস আর মুর্গিঘর, ডানদিকে বসতবাড়ি।

ফার্মের যিনি মালিক, তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। নাম তাঁর অজিত বসুরায়। পৈতৃক বাড়ি ছিল বরিশালে। এ অঞ্চলে অনেক দিন আছেন। দেখেই বোঝা যায়, বেশ উদ্যোগী পুরুষ। দিনের বেলায় ফার্মের তদারকি করে তাঁর ছেলে দেবাশিস। সে নাইটে বি-কম পড়ে। এ কাজ সে খুব খুশি হয়েই করে। হাতেকলমে কাজ করে নিজে নিজেই সে অনেক কিছু শিখেছে।

অজিতবাবুর ফার্মে ডিম হয় দৈনিক এক হাজার। নানা বয়সের ব্রয়লার মুর্গি আছে চার হাজার। দুর্গাপুর আসানসোল ধানবাদ থেকে পাইকাররা এসে কিনে নিয়ে যায়। চাহিদা প্রচুর। এ রাজ্যে বেশির ভাগ ডিম আসে পাঞ্জাব আর হরিয়ানা থেকে। ওরা শস্তায় মুর্গির খাবার পায়। তাই ওরা কম দামে ডিম দিতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে মুর্গির খাইখরচ এত বেশি যে, ওদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হয় না। গত বছর বাদামখোলের দাম ছিল এক কুইন্টাল আশি টাকা। এ বছর তার ডবল দাম। কুঁড়োর দাম পঁচাত্তর থেকে বেড়ে হয়েছে দুশো টাকা। আর ফিশমিল দেড়শোর জায়গায় হয়েছে দুশো টাকা।

এ সত্ত্বেও অজিতবাবু বললেন, পোলট্রি হল বেশ লাভের ব্যবসা। মুর্গি পিছু মাসে এক টাকার ওপর লাভ। তাছাড়া আছে মুর্গির সার। জমিতে দিলে ভাল ফলন হয়। এই তো সেদিন নলহাটি থেকে এসে তুঁত চাষের জন্যে এক ট্রাক সার কিনে নিয়ে গেছে।

পোলট্রির কথা তাঁর মাথায় প্রথম ঢোকায় পীস কোরের কিছু মেয়ে। সে আজ বছর বারো আগের কথা। প্রথমবার পোলট্রি করে একবার একটা বড় রকমের চোট খান। এক বন্ধুর কথা শুনে মহুয়ার খোল খেতে দেওয়ার পর চার-পাঁচশো মুর্গি এক রাত্রেই সাফ হয়ে যায়। পরে জানা গেল, মহুয়ার খোলে আছে এক তীব্র বিষ। ও দিয়ে আসলে পোকামাপড় মারে।

আগে থেকে পোলট্রির বিষয়ে ওঁর কোনো ট্রেনিং নেওয়া ছিল না। ফলে, গোড়ায় গোড়ায় এই রকম অনেক আক্কেলসেলামি দিতে হয়েছে। এখন অবশ্য ঘাঁটাঘাঁটি করে পুরো ব্যাপারটাই বাপছেলের হাতে এসে গেছে।

ইচ্ছে ছিল এ অঞ্চলের আরও একটু খবর নেওয়ার। সব তো আর ঘুরে ঘুরে একার চোখে দেখা যায় না।

কিন্তু বোলপুর ব্লকের আপিস কেন যে শ্রীনিকেতনে, দীর্ঘ রাস্তা সাইকেল-রিক্‌শায় যেতে যেতে আমার মাথায় এটা কিছুতেই ঢুকছিল না। একজন বললেন, আসলে কী জানেন— প্রথম যিনি বিডিও হয়ে আসেন, তিনি ওখানে সুবিধেমতন একটা বাসা পেয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকেই ব্যাপারটা চলে আসছে। লোকের কী সুবিধে সেটা হিসেবের মধ্যে আজও আসেনি। ফলে, আমারও গাঁটগচ্চা কম হল না।

যখন পৌঁছলাম তখনই প্রায় লাঞ্চের সময়। বিডিও মশাইকে প্রশ্ন করে অসময়ে উত্যক্ত করতে আমারই খুব খারাপ লাগছিল। তাই জানার ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে সারতে হল।

ব্লক এলাকায় সবই প্রায় ছোট ছোট শিল্প। ধানকল, হাস্কিং মেশিন, আটাচাকি, আইসক্রিম আর বেকারি। তেলকল আর সাবান কল। করাত কল, কোকব্রিক, খোলভাঙা গুঁড়ো করার কল। হিউম পাইপ তৈরি আর লেদের কাজ। ছাপাখানা আর প্লাস্টিক কারখানা। কিছু কামারশাল, কিছু হাতের কাজ আর পটারি।

আর আছে এগারোটা ইঁটখোলা। ছমাস কাজ হয়। মালিকরা স্থানীয়। হাজার দুই লোক কাজ করে। সবাই আসে বাংলার বাইরে থেকে। একটা বড় দল আসে। তাদের বাড়ি দুমকায়। এরা পোক্ত লোক; কতটা মাটিতে কী হারে বালি মেশাতে হয় এরা জানে। বাইরে থেকে এরা সপরিবারে এসে শেডের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকে। ছটা মাস মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। ফুরনের কাজ। মজুরি পায় হাজার করা দশ থেকে বারো টাকা। মিশিয়ে সাইজ করা, সাজিয়ে ভাটায় দেওয়া। তার জন্যে হাজারে আঠারো টাকা। ফায়ারিং তাদেরই করতে হয়। স্থানীয় লোক নেওয়া হয় না দুটো কারণে। এক তো কাজ জানার ব্যাপার আছে। তাছাড়া স্থানীয় লোক হলেই তাদের পালাপার্বণ থাকবে, ঘরের টান থাকবে। ছ-মাস মাটি কামড়ে পড়ে থাকবে বলেই বাইরে থেকে লোক আনা।

ব্লকের হাল ফেরানোর জন্যে সি-এ-ডি-এ এক প্রকল্প করেছে। তার চৌত্রিশ দফা কর্মসূচী। এতে টাকা খরচ হবে আট কোটি আটষট্টি লক্ষ। ওঁরা মনে করেন, এই টাকা খাটানোর ফলে এ অঞ্চলের লোক বাড়তি আয় করবে বছরে সাত কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা।

অনেক আঁটঘাট বেঁধে তৈরি হয়েছে এই প্রকল্প। ময়ূরাক্ষীর জল তুলে চাষের খেতে পৌঁছে দেওয়া হবে। পত্তন করা হবে ছোট ছোট শিল্প। অনেকে হাতের কাজ করে বাড়ি বসে রোজগার করতে পারবে। পোষা হবে গরু ছাগল শুয়োর আর হাঁসমুর্গি। মজা পুকুরগুলোর সংস্কার করে সমবায় গড়ে তাতে হবে মাছ চাষ। পুরনো রাস্তা মেরামত, নতুন রাস্তা তৈরি। স্বাস্থ্যরক্ষা আর সমাজশিক্ষা। হাটবাজারের উন্নতি। ধর্মগোলার পত্তন। সব মিলিয়ে এক বহুমুখী পরিকল্পনা। এর ফলে, ব্লকের বাড়তি আটত্রিশ হাজার কৃষি পরিবার বছরে তিনশো দিন কাজ পাবে।

জায়গায় জায়গায় অগভীর নলকূপ, কুয়ো আর ক্যানেল আওতাভুক্ত জমিতে নালা খোঁড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। অনেক পুকুরে একই সঙ্গে মাছ চাষ আর জলসেচের কাজ

হচ্ছে। একটি ঘরের একশো পনেরোটি বাড়ি হয়েছে ভূমিহীন কৃষি মজুরদের জন্যে। বেকার যুবকেরা যাতে কাজ পায় সেইদিকে বিশেষ দেওয়া হচ্ছে। একশো ছেলের চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলোতে। যুবকদের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে ছটি ক্ষুদ্রশিল্প সমবায় সমিতি। মৎস্যজীবী যুবকেরা পাঁচটি সমিতি গড়েছে মাছ চাষের জন্যে। উপজাতীয় যুবকেরা গড়েছে সাতটি ধর্মগোলা। বোলপুরে তৈরি হচ্ছে একটি হিমঘর। পোকামারা ওষুধ আর সার কেনার জন্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক সমবায় সমিতিগুলোকে ঋণ দিচ্ছে। চাষীর ছেলেদের চাষের কাজে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্যে প্রশিক্ষণ শিবির হচ্ছে। এই রকম আরও কত কী।

এসব ফিরিস্তি পড়তে বা শুনতে যত ক্লান্তিকরই লাগুক, গ্রামে গিয়ে নিজের চোখে দেখলে সংখ্যাগুলো তখন আর সংখ্যা থাকে না—জীবনের রঙে-রসে মেতে ওঠে।

শ্রীনিকেতনের একদল কর্মীর সঙ্গে কাছের একটা গ্রামে গিয়ে সেই কথাই আমার মনে হয়েছিল।

যে রাস্তা দিয়ে জীপ যাচ্ছিল সেই রাস্তাটা দেখিয়ে ঐ গ্রামেরই একটি ছেলে লাফিয়ে উঠে বলেছিল—এই দেখুন, এটা আমরা করেছি। প্রকাণ্ড পুকুর দেখিয়ে বলেছিল—ওখানে সমবায় থেকে আমরা মাছ চাষ করছি। গ্রামের ভেতর নারকোল গাছ দেখিয়ে বলল—আমরা লাগিয়েছি। এসব অঞ্চলে আগে কখনও নারকোল গাছ হত না।

রাস্তা, পুকুর, নারকোল গাছ—হঠাৎ যেন হাতের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে আমার চোখের সামনে সব নেচে উঠেছিল।

চত্বরে বসেছিল বৈঠক। তখন সন্ধে হয়-হয়। কেউ কেউ নেশা করে ঝিমোচ্ছিল। কিন্তু বাকি সকলেই উৎসাহে যেন টগবগ করে ফুটছিল। এই হোক তাই হোক, এটা করব সেটা করব, আমি এটা দেব ও সেটা দেবে—শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, ঠিক জায়গায় ঘা দিতে পারলে এদেশকে কত সহজে ঢেলে সাজানো যায়।

ফিরে আসার পথে গিয়েছিলাম শহরের এক ইস্কুলে। কথা বলে খানিকটা আঁচ করতে পারলাম শহরের ভদ্রলোকেরা কী চোখে শান্তিনিকেতনকে দেখেন।

এক তো লেখাপড়ার ব্যাপার। ডে স্কলার নেওয়ার বিধান থাকলে বোলপুরের ছেলেমেয়েরা বাড়িতে থেকে শান্তিনিকেতনে পড়তে পারে।

দ্বিতীয় ব্যাপার শান্তিনিকেতনে চাকরি।

এককথায়, প্রতিবেশী বলে বিশেষ সুবিধে পাওয়ার প্রত্যাশা।

যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এর পেছনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের প্রতি অনুরাগ, তাহলে দেখা দরকার, বোলপুরের শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর শান্তিনিকেতনের কতটা ছাপ পড়েছে।

আমার ধারণা, খুব বেশি পড়েনি। তার কিছু কিছু কারণ সহজেই আঁচ করা যায়। যে ব্যবস্থায় পরীক্ষায় পাস করাটাই জীবনে কৃতকার্য হওয়ার একমাত্র উপায়, সেখানে তাকে

বাদ দিয়ে কজন ছাঁ-পোষা গৃহস্থ ছেলেমেয়েদের আম্রকুঞ্জে পড়ানোর ঝুঁকি নেওয়ার কথা ভাবতে পারে?

মেয়েদের নিয়ে আরও মুশকিল। তাদের পক্ষে শান্তিনিকেতনের খোলামেলা বাঁধন-ছেঁড়া নাচানে আবহাওয়া মোটেই নিরাপদ নয়। ভাল ঘর-বর দেখতে হবে। কুষ্ঠি মেলাতে হবে। শান্তিনিকেতনের ছাপ থাকাটা কি বোলপুরের মেয়ের বাবার পক্ষে অস্বস্তিকর হবে না?

আসলে বোলপুর কখনই শান্তিনিকেতনে নিজেকে মিশিয়ে দেবে না। কেনই বা দেবে? বোলপুর আর শান্তিনিকেতনের মধ্যে পার্থক্যের ধরনটাও তাই বলে পিছিয়ে থাকা আর এগিয়ে যাওয়ার হবে না।

বোলপুর নিজের মত করে এগোবে। শান্তিনিকেতনের পেটের খোরাক যদি বোলপুর যোগায়, শান্তিনিকেতন বোলপুরকে যোগাক মনের খোরাক। তাহলেই তো আর কোনো ঠোকাঠুকি নেই।

স্টেশনে যেতে যেতে মনে হচ্ছিল, একদিন স্টেশন থেকে শান্তিনিকেতনে যেতে বোলপুরের রাস্তাটুকু চোখ-কান বুঁজে পার হয়ে যেতাম। শান্তিনিকেতন থাকত লক্ষ্য, আর বোলপুরটা উপলক্ষ্য মাত্র।

বলতে গেলে, এই প্রথম চোখ মেলে বোলপুরকে দেখলাম। তাও খুব ওপর-ওপর।

বোলপুরকে চিনতে গেলে আরও বারকয়েক আমাকে আসতে হবে।

শান্তিনিকেতনকে তার পুরনো নামে এখনও যদি ডাকা যায়, তাহলে বলব ভুবননগর এড়িয়ে ভুবনডাঙ্গা। এবারে সফরটা আমার ভালই হল।

শারদীয় পরিচয় ১৩৮৪

মিছিলে মিছিলে

পেছনে পড়ে রইল অফুরন্ত খেলার মাঠ, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় রোদে জলে মাথায় ছাতি ধরে দাঁড়ানো বড় বড় রেনট্রি গাছ, বর্ষায় পুঁটিমাছের ছিপ ফেলবার অসংখ্য নয়ানজুলি, ডাকবাংলোর আঙিনায় দেবগণের মর্ত্যে আগমনের ভঙ্গিতে সাহেব মেম, দেবদারুর পাতায় সাজানো তোরণ, ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়িতে ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে বিলি করা অদ্য-শেষ-রজনী লেখা লাল নীল কাগজ, রাত্তিরে সার্কাসের বাঘের গর্জন, ট্রেজারির সামনে দিয়ে অন্ধকারে যেতে যেতে বন্দুকধারী সেপাইয়ের গা-ছমছম-করা হু-কাম-দার হাঁক, প্রতিমা ভাসানোর দিন নৌকোয় হারমোনিয়াম বাজিয়ে কাছে থেকে দূরে চলে যাওয়া গান, রমজানের মাসে দূরের রাস্তা দিয়ে গা দুলিয়ে দুলিয়ে উটের দলের দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া, সকালে শিউলি আর বিকেলে বকুল ফুল কুড়োতে ছোটা, পৌষ সংক্রান্তিতে বাড়ি বাড়ি ঘুরে পিঠে খাওয়া, সিন্নির লোভে সত্যনারায়ণের পাঁচালি শুনতে যাওয়া, এ-পাড়া ও-পাড়ায় আটকলাইতে কুলো ভেঙে বেড়ানো, মোরগের ডাকে চোখ মেলে ভোরের আজান শোনা, তারের বেড়ায় রোদ পড়ে শিশির ঝলমল করা, সন্ধ্যেবেলায় পুকুর থেকে হাঁসগুলোকে ঘরে তোলবার জন্যে চই-চই ডাক, কুয়োতলা আলো করে সন্ধ্যামণি ফুল ফোটা, জ্যোচ্ছনা রাত্তিরে রণ্‌পায়ে হেঁটে বেড়ানো, কুকুরশোঁকার জঙ্গলে জোনাকির ঝিকিমিকি, রাত দুপুরে হঠাৎ কোথাও আগুন লাগার চিৎকার, টমটমের চাকায় আর ঘোড়ার নাল-বাঁধানো খুরে নদীর ব্রিজের ওপর গুম গুম শব্দ—

মফস্বলের খোলামেলা একটা ছোট্ট আত্মীসূয় শহর। দশ-এগারো বছরের একটা ছেলেকে সেখান থেকে তুলে এনে এই প্রকাণ্ড শহরের একটা এঁদো গলির মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হল। সুইচ টিপে ফুস্‌মন্তরে ঘরের আলো জ্বালিয়ে নিভিয়ে, কল খুলে জল এনে, ট্রামের চাকায় শহর দেখিয়ে, হাতে গরম জিলিপির ঠোঙা গুঁজে দিয়ে, পার্কের বেঞ্চিতে বসিয়ে শালপাতার গায়ে কুলপি বরফ ঢেলে, রাস্তায় কাটা ঘুড়ির পেছনে ছুটিয়ে, ফেরিওয়ালাদের রকমারি ডাকহাঁক শুনিয়ে, একটা একটা করে গ্যাসের আলোয় সন্ধ্যে জ্বেলে, দোরে দোরে বাঁকা লাঠি আর কালো আলখাল্লায় তসবি-গলায়-দেওয়া মুশকিল-আশান ঘুরিয়ে, খোলা ম্যানহোলে দড়ি-বাঁধা মানুষ অদৃশ্য করে, হাইড্রেটের মুখ থেকে জলের ফোয়ারা তুলে—এই শহরটা তাকে ভোলাতে লাগল।

ভাব হতে হতেও হয় না। আকাট দেয়ালগুলো সামনে দাঁড়িয়ে বাদ সাধে। দেয়ালে দেয়ালে চামচিকের মতো কেবলি ঠোকর খেতে থাকে তার চোখদুটো। ঠোকর খেতে খেতে, ঠোকর খেতে খেতে একদিন এক অবাক কাণ্ড! দেয়ালের গায়ে কারা যেন সেঁটে দিয়ে গেছে একটা হাতে-লেখা কাগজ। কাগজের এক কোণে যেন কথা কইছে একটা মন্ত্র : বন্দেমাতরম।

একটু এগিয়ে গিয়ে দেখল ফুটপাট ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়িয়েছে একটা নতুন রকমের ভিড়। এক বাড়ির নয়, এক পাড়ার নয়—এক জায়গা থেকে আসেনি। কিন্তু একই জায়গায়

যাবে বলে তারা বেরিয়েছে। নিশানাটা মনে করে রাখার জন্যেই লাঠির গায় গিঁঠ দিয়ে তিন রঙের নিশানটা সামনে ধরে আছে।

ছেলেটার যে ভালোবাসা প্রথম দেয়াল ধরে দাঁড়াতে শিখেছিল, দিনে দিনে তা মিছিলের সঙ্গে বড় হয়ে পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে শিখল। সেই সঙ্গে আরেকটা নিশান, আরেকটা রং, আরেকটা নিশানা ছোট থেকে বড় হতে লাগল।

মিছিলের পায়ে পায়ে শান-বাঁধানো রাস্তায় একটা নতুন সুর বেজে উঠল। মুঠো-করা হাতের ওঠাপড়ায় এক নতুন শপথ। বন্দনা নয়, বিপ্লব। যারা সকলের পেছনে পড়ে ছিল, দৃপ্ত পায়ে তারা এসে দাঁড়াল সকলের সামনে। কলকাতায় দেখা দিল নতুন দিন—পয়লা মে। হাওয়ায় দুলতে দুলতে গেল লাল রং, তার নিচে তেলকালিমাখা মানুষ।

সেই নতুন মিছিলে নিজেকে মিলিয়ে দিয়ে এই শহরটাকে আজও সে উল্টেপাল্টে নেড়েচেড়ে দেখছে। আশ্চর্য ভয়ঙ্কর সুন্দর এই শহর। চোখে তার এক সুন্দর স্বপ্ন। ভীষণ বলিষ্ঠ দুটো হাত অন্যায় আর অবিচারের শিকড় ধরে টানছে। আর অসংখ্য রক্তাক্ত স্মৃতি বুকে নিয়ে ছিন্নভিন্ন আকাশ ব্যাকুল হয়ে ঝুঁকে পড়ে তাকে দেখছে।

পরিচয় : ১৩৭০

এখানে

সেই নাগরিক ধূসরজীবন
পিছনে ফেলে,
সব থেকে দ্রুত ট্রেনে করে আজ
এখানে আসা।
—আসানসোলে।

এখানে আকাশ পাহাড়ের গায়
পড়েছে ভেঙে,
পাহাড়ের পায় সারি সারি সব
চিমনি চুড়ো।
ধানের জমিরা পাশাপাশি শুয়ে
দিগ্বিদিকে—
খাড়া ক'রে কান কাস্তের শাণ
শুনছে নাকি
কামারশালে?

ঊর্মিল ভুঁই হাঁটে বনহীন
তেপান্তরে;
সরু সরু ঘাস, শিরে বুঝি তার
শিশির ঝলে!
দুই দিকে দূর বালুদের দেশ,
মধ্যে নদী
শ্বাস টেনে টেনে পায়ে পায়ে রাখে
চিকণ রেখা।

নির্জন মাঠ, হঠাৎ কোথাও
তারের বেড়া;
সর্পিল পথে চলে রেলপথ
ধনুক আঁকা
দেশান্তরে।

দিনের পাহারা সন্ধ্যায় সেরে
সূর্য দেখি
অতিকায় তার ডানা মেলে কালো
পাহাড় থেকে
ক্লান্ত চোখে।

তাড়িখানা খোলা; রাস্তায় খালি
লোকের মেলা।
স্ত্রী, পুরুষ মেলে মুখোমুখি শুধু
মুখর ভাঁড়ে।
কারো অসহ্য নেশা কাড়ে শেষ
কপর্দকও।
বহুদিনকার ভুলে-যাওয়া গ্রাম,
পুরনো ভিটে
স্মরণে নামে।

দূরে শিশুগাছ; ধানক্ষেত তার
কিনার ঘেঁষে।
কিছু নয়, তারা তবু কী স্বপ্ন
রচনা করে!
নগরের সেই নীড় ছেড়ে এসে
এখানে ভাবি,
সিনেমা ছায়ায় রাজধানীতেই
ছিলাম ভালো।

যাদের রক্তে উঁড়ছে আকাশে
মিলের ধোঁয়া,
মুষ্টিমেয়ের খেয়ালেই এই
ভরা ভুবনে
তাদের ভোলা॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত *পরিচয়* পত্রিকার অষ্টম বর্ষের ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৫ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। *পরিচয়*-এ সম্ভবত এটিই তাঁর প্রথম রচনা।

রাস্তার লোক

চোখ পড়তেই
হঠাৎ আঁতকে উঠেছিল লোকটা।

তারপর ভাল ক'রে তাকিয়ে বুঝল,
না,
সে যা ভয় করেছিল তা নয়—

রাস্তার খোঁদলটার মধ্যে জমে রয়েছে
ট্রাম-লাইনের মরচে ধোঁয়া জল।

লোকটা আঁতকে উঠেছিল
কেননা সে জানত :
এখানে,
হ্যাঁ, এখানেই—

প্রাণপণে চাইল সে ভুলতে।

তার মনে হল
মাথায় লাঠির বাড়ি খেয়ে পড়ে-যাওয়া
গাঁয়ের হাড়-জিরজিরে বুড়োর মত
রাস্তাটা
একদৃষ্টে তার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে—
এখন বলুক সে কী করবে!
লোকটা চমকে উঠে
চোখ
সরিয়ে নিল।

এবার সে মুখ উঁচু ক'রে হাঁটবে
যেন কিছুতেই
তার পায়ের নিচে
রাস্তাটা না দেখা যায়

দূরে
পুরনো গীর্জার কাঁধের ওপরে দেখ
কী সুন্দর টলমলে নীল
পুজোর আকাশ।

দিনের নিভন্ত আলোয়
ঝুঁকে প'ড়ে
চোখ কুঁচকে দেখছে—

এখন ঘড়িতে ক'টা বাজল।

অমনি লোকটার বুকের মধ্যে
ছাঁৎ ক'রে উঠল।
এখন,
হ্যাঁ এখনই তো—

প্রাণপণে চাইল সে ভুলতে।

সামনে পা ফেলতে গিয়ে
লোকটা হঠাৎ
শিউরে পিছিয়ে এল—
ঈস্, আরেকটু হলেই সে মাড়িয়ে দিয়েছিল
মায়ের কোল-ছেঁড়া
একটা দুধের বাচ্চাকে।

তারপর ভাল ক'রে তাকিয়ে বুঝল
আসলে তার মনেরই ভুল;
আজ অন্তত—
এ-রাস্তার কোথাও
কোনো লাশ
পড়ে নেই।

কিন্তু ঠিক সেই সময়

লোকটা শুনতে পেল—

পেছন থেকে
একটা নিষ্ঠুর দজ্জাল স্মৃতি
তার নাম ধ'রে
চিৎকার ক'রে ডাকছে।

হাত দিয়ে কান দুটো বন্ধ ক'রে
লোকটা তাড়াতাড়ি
পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকে পড়ল।

তারপর যেতে যেতে
বন্ধ দু'কানে সে শুনতে পেল
রাবণের চিতা
দাউ দাউ করে জ্বলছে।

২৯ বর্ষ, ২য়-৩য় সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৬

ধীন তা

১
চৌবাচ্চাটা আরেকটু বড় হলেই
থাকবে না আর বাচ্চা
সে তখন হবে প্রকাণ্ড তালপুকুর—
বাহবা
বহুত আচ্ছা!
লোকে এক্ষুনি চাঁদ পেতে চায় বলেই
থাকা যাচ্ছে না সাচ্চা
উপায় কোনই নেই তাই হতে হয় কুকুর—
বাহবা
বহুত আচ্ছা!

২
চৌবাচ্চাটা বড় হতে হতে
জানি হবে তালপুকুর
আপাতত বেশি চাইনাকো মোটে
লোভ তবু এইটুকুর—
নুনের সঙ্গে ভাত যেন জোটে
দুটো বেলা খোকাখুকুর॥

৩
স্ত্রীকে আপাতত দিতে চাই বচ্ছরকার
শাড়ি একখানা। যে-সময়ে দেওয়া দরকার
জানিই তো দেবে ফুঁড়ে আমাদের ছাপ্‌পর—
অভাবের হাতে দুগালেতে দুটি থাপ্‌পড়
খেয়ে পার হই বৈতরণীটা। তারপর
মাটির মুটুকে রাজা করে দিও সরকার॥

২৫ বর্ষ আশ্বিন-কার্তিক ১৩৬২
৩য়-৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৩৭৩

সন্ধ্যামণি

সময়ের গলায়
এখনও আড় হয়ে আছে ঘড়ির কাঁটা।
ও বেড়াল, তোমার পায়ে পড়ি
খুলে দাও না।
এত সব শুনেটুনেও—
তেমনি গোঁজ হয়ে বসে থাকল বেড়ালটা।

হাতের কব্জিতে কালো কার বেঁধে
আমার চেয়েও ঢ্যাঙা
এক চোয়াড়ে অন্ধকার কাঁধ উঁচু করে দাঁড়িয়ে।
সামনে কী আছে
কিছু ঠাহর করতে পারছি না।

আমার স্বপ্নগুলো
আছে—
কিন্তু আড়ালে।
করাতের দাঁতে দাঁতে ঘিষঘিষ শব্দ—
খুব মিহি করে কাটছে।
তারপর চেয়ার টেবিল খাট পালঙ্ক
কত কী।

জোয়ানমদ্দ অন্ধকার
তার কাঁধটা সরালেই দেখতে পাবো
সবুজ মাঠ, মাঠে সোনার ধান
এক জায়গায় বসে
আমরা হাপুস-হুপুস করে খাচ্ছি।

শিকড়ে টান লাগছে
লাগুক—
শিকড়গুলো শক্ত।
শুকনো পাতাগুলো ঝরে পড়ে
পড়ুক—
অন্ধকার শব্দ করে যাবে।

ততক্ষণ আমিই বা বসে থাকি কেন?
উঠোনে সন্ধ্যামণি ফুল ফুটিয়ে তোলবার
এই তো সময়।

পরিচয় ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৩ পৃ. ২২৩

পাথরের ফুল

ফুলগুলো সরিয়ে নাও
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়,
ফুল
জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

এখন আর
আমি সেই দশাসই জোয়ান নেই।
রোদ না, জল না, হাওয়া না—
এ শরীরে আর
কিছুই সয় না।
মনে রেখো,
এখন আমি মা-র আদুরে ছেলে
একটুতেই গলে যাবো।

যাবো বলে
সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছি—
উঠতে উঠতে সন্ধে হল।
রাস্তায়
আর কেন আমায় দাঁড় করাও?

অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর
গাড়ি এখন টিকিয়ে টিকিয়ে চলেছে।
মোড়ে
ফুলের দোকানে ভিড়।
লোকটা আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল?

ঠিক যা ভেবেছিলাম
হুবহু মিলে গেল।
সেই ধূপ, সেই ধুনো, সেই মালা, সেই মিছিল—
রাত পোহালে
সভা-টভাও হবে।
(একমাত্র ফুলের গলা-জড়ানো কাগজে-লেখা
নামগুলো বাদে)
সমস্তই হুবহু মিলে গেল।

মনগুলো এখন নরম—
এবং
এই হচ্ছে সময়।
হাত একটু বাড়াতে পারলেই
ঘাট-খরচাটা উঠে আসবে।

এককোণে ছেঁড়া জামা পরে
শুকনো চোখে
দাঁতে দাঁত দিয়ে
ছেলেটা আমার
পুঁটুলি পাকিয়ে বসে।

বোকা ছেলে আমার,
ছি ছি, এই তুই বীরপুরুষ?
শীতের তো সবে শুরু
এখনই কি কাঁপলে আমাদের চলে?

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়,
ফুল
জমতে জমতে পাথর।

পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

ফুলকে দিয়ে
মানুষ বড় বেশি মিথ্যে বলায় বলেই
ফুলের ওপর কোনদিনই আমার টান নেই।
তার চেয়ে আমার পছন্দ—
আগুনের ফুল্‌কি
যা দিয়ে কোনদিন কারো মুখোশ হয় না

ঠিক এমনটাই যে হবে,
আমি জানতাম।
ভালবাসার ফেনাগুলো একদিন উথলে উঠবে
—এ আমি জানতাম।
যে-বুকের
যে-আধারেই ভরে রাখি না কেন
—ভালবাসাগুলো আমার;
আমারই থাকবে।

রাতের পর রাত আমি জেগে থেকে দেখেছি
কতক্ষণে কি ভাবে সকাল হয়,
আমার দিনমানটা গেছে
অন্ধকারের রহস্যভেদ করতে;
আমি একদিন, একমুহূর্তের জন্যেও থামি নি।
জীবন থেকে রস নিঙড়ে নিয়ে
বুকের ঘটে ঘটে আমি ঢেলে রেখেছিলাম।
আজ তা উথলে উঠল।

না।
আমি আর শুধু কথায় তুষ্ট নই।
যেখান থেকে সমস্ত কথা উঠে আসে
যেখানে যায়,
কথার সেই উৎসে
নামের সেই পরিণামে—

জল মাটি হাওয়ায়
আমি নিজেকে মিশিয়ে দিতে চাই।

কাঁধ বদল করো।
এবার
স্তূপাকার কাঠ আমাকে নিক।
তারপর আগুনের একটি রমণীয় ফুল্‌কি
আমাকে ফুলের সমস্ত ব্যথা ভুলিয়ে দিক॥

১৩৬৪ ভাদ্র-আশ্বিন শারদীয় সংখ্যা

জননী জন্মভূমি

আমি ভীষণ ভালবাসতাম আমার মা-কে
—কখনও মুখ ফুটে বলিনি।
টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে
কখনও কখনও কিনে আনতাম কমলালেবু
—শুয়ে শুয়ে মা-র চোখ জলে ভ'রে উঠত।
আমার ভালবাসার কথা
মা-কে কখনও আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

হে দেশ, হে আমার জননি—
কেমন করে তোমাকে আমি বলি!

যে মাটিতে ভর দিয়ে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি
আমার দুহাতের
দশ আঙুলে তার স্মৃতি
—আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই হে জননি, তুমি।
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

হে জননি,
আমরা ভয় পাইনি।
যারা তোমার মাটিতে নিষ্ঠুর থাবা বাড়িয়েছে
আমরা তাদের ঘাড় ধরে
সীমান্ত পার ক'রে দেব।
আমরা জীবনকে নিজের মত ক'রে সাজাচ্ছিলাম
আমরা সাজাতে থাকব।

হে জননি,
আমরা ভয় পাইনি।
যজ্ঞে বিঘ্ন ঘটেছে বলে
আমরা বিরক্ত।

মুখ বন্ধ ক'রে,
অক্লান্ত হাতে, হে জননি,
আমরা ভালবাসার কথা ব'লে যাব।

বর্ষ ৩২, সংখ্যা ৬, পৌষ ১৩৬৪

জলছবি

ক্যালেন্ডারে হাত দিস্ নে,
যা ভাগ্, বোকাহাবা!

চেয়ার খালি। জান্‌লা খোলা।
নিরক্ষর হাওয়া
বারে বারে একই বইয়ের
ওলটাচ্ছে পাতা।

ঘড়ির কাঁটায় হাত দিস্‌নে,
সময় গোনাগাঁথা।

বারান্দায় ফুলের টব,
মেঝেয় ছাড়া চটি
ব'সে ব'সে শুড় নাড়াচ্ছে
মাটির প্রজাপতি।

টেবিলঝাড়া পাখির পালক
ঘরের মধ্যে ওড়ে
খাটের তলায় ছেঁড়া চিঠিটা
বেড়ায় নড়ে' চড়ে'।

পা আকাশে, হাত নামানো—
রেলিঙে সার বেঁধে
শুকোয় কাপড়। রঙীন ঘুড়ি
তারে রয়েছে বেধে।

আলো নেভানো। চোখ বন্ধ।
দেখতে পাচ্ছি সবই।
কাঠের বাক্সে পোকায় কাটছে
পুরনো গ্রুপছবি।

একটিবার দৌড়ে এসো
ও নদী ও স্মৃতি—
ঘরের এই দেয়াল ধ'রে
দাঁড়াও না, লক্ষ্মীটি!

দরজায় কে পর্দা ঠেলছে?
বাইরে যাই। ফিরি।
পায়ের শব্দে নেমে যাচ্ছে
অন্ধকার সিঁড়ি।

শারদীয় পরিচয় ১৩৬৯

লাল গোলাপের জন্য

আমারও প্রিয় রং লাল;
আমারও প্রিয় ফুল
গোলাপ।

আমি লড়ছি
লাল গোলাপের জন্যে।

চেয়ে দেখ,
আসমুদ্রহিমাচল
শোকস্তব্ধ আমাদের ভালবাসা
নতমুখে
উদ্ভিন্ন মাটির দিকে তাকিয়ে।

শৃঙ্খলের ক্ষতগুলো
ভাল ক'রে আজও শুকোয় নি;
প্রাণের সব তার
এক সুরে এখনও বাঁধা হয় নি;
সর্বনাশের কিনার থেকে
পৃথিবী
বরাবরের মত এখনও সরে আসে নি।

চষা মাটির মত এবড়ো খেবড়ো সময়;
চলতে কষ্ট হলেও
জানি, তার গর্ভে ছড়ানো আছে বীজ।
আশাহত অবুঝ অশান্ত
আমাদের আজকের অভিমানগুলো
চোখের জল ফেলে
নবান্নের উৎসব করবে।
চোখে নয়,
এখন আমাদের বুকের মধ্যে লাল গোলাপ-
বুক দিয়ে আমাদের রক্ষা করতে হবে।

আমার প্রিয় রং লাল;
আমার প্রিয় ফুল
গোলাপ।

লাল গোলাপের জন্য
সাহসে বুক বেঁধে
এখন আমাদের লড়াই।

বর্ষ ৩৩ ॥ সংখ্যা ১২ ১৩৭১

ভাল লাগছে না

আমার ভাল লাগছে না।
ভাল লাগছে না।
ভাল লাগছে না।

এ জন্যে নয় যে,
দু দুটো যুদ্ধের পরেও
স্বাধীনতার যুদ্ধে আজও
মানুষ মাছির মতো মরছে।

আমার ভাল লাগছে না।
ভাল লাগছে না।
ভাল লাগছে না

এ জন্যে নয় যে,
সভ্যতার মুখোশ খসিয়ে ফেলে
শয়তান বর্বরের দল
হিংস্রতায় জানোয়ারদেরও হার মানাচ্ছে।

আমার ভাল লাগছে না।
ভাল লাগছে না।
ভাল লাগছে না

এই জন্যে যে,
রাক্ষসদের হাড় একদিকে, মাস একদিকে করতে পারে
রক্তবীজের বংশধর যে মানুষ
থমকে দাঁড়িয়ে তারা দেখছে
রামলক্ষ্মণের চুলোচুলি।

আমার ভাল লাগছে না।
ভাল লাগছে না।
ভাল লাগছে না

যখন দেখছি
আমরা আমেরিকার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে
ভিয়েতনামকে ভাই বলছি।

বর্ষ ৩৬ সংখ্যা ১, ভিয়েতনাম সংখ্যা ১৩৭৩

জল আসুক

১
সারাদিন গুম হয়ে থাকবার পর
আকাশের মুখের ভাব
বদলে গেল—
এবার
যেন একটা কঠিন সংকল্পে
মন বেঁধে নিয়েছে।

সভায় অতর্কিতে ছুঁড়ে-দেওয়া কোনো বেআইনী দলের
উত্তেজক ইস্তাহারের মত
শূন্যে ভর দিয়ে দিয়ে নামছে
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না
জানলার গরাদের ওপারে
কিসের
ফিস্-ফাস্ ফিস-ফাস শব্দ।

থেকে থেকে
ঠাণ্ডা, এলোমেলো হাওয়া।

যেন কিছুর অপেক্ষায়
পর্দাটা
সেই কখন থেকে
কেবলি ঘর-বার ঘর-বার করছে।

২
হে জেলের দেবতা, তুমি কোথায়?

লোকে অবলীলাক্রমে হেঁটে পার হচ্ছে নদী—
আমাদের পুকুরগুলোতে পাঁক;
কুয়োর এই ঘোলা জল
হে দেবতা,
আর যে আমরা মুখে দিতে পারছি না।

তোমার পায়ে পড়ি, এই মোড়লগুলোকে নাও
ওরা একে মুড়িয়ে খাচ্ছে
তার ওপর গুঁতিয়ে গুঁতিয়ে আমাদের রাখছে না—

বরং পাঠিয়ে দাও কিছু বেবুন
আমরা ওদের নুনজল খাইয়ে তৃষ্ণার্ত করলে
ওরা ঠিক জল বার করবে
মাটি থেকে ওরা ঠিক খুঁজে বার করবে কন্দ।

হে জলের দেবতা, তুমি কোথায়?

চীরবাসে বীর

কবিতাকে পারি আমিও পরাতে পোশাক
ধোপদুরস্ত ছন্দে চোস্ত মিলে
পেতে পারে যাতে দস্তুরমতো হুঁকো সে
যেকোনো সময় মজলিশে মহফিলে।

আমার ভাবনা বেড়ায় না গায়ে ফুঁ দিয়ে
কাটায় না দিন ফুর্তিতে মজা লুটে
সেজে ফিটফাট টেরি-কাটা ফুলবাবুটি
ফুলে ফুলে মধু খায় না সে খুঁটে খুঁটে।

অসি নিশ্চল; গর্জে ওঠে না কামান
পুরু হয়ে তাতে স্বপ্নের জং ধরে
থামে নি যুদ্ধ, বদ্‌লেছে শুধু অস্ত্র
মানুষের হয়ে মানুষের মন লড়ে।

পল্টনে নাম লিখিয়েছ যারা, তাকাও!
পতাকা আমার উড়ছে ঊর্ধ্বশ্বাসে
কবিতা আমার পদাতিক...কাঁধ মিলিয়ে
পা ফেলে জোয়ান তালে তালে চারিপাশে।

উলিড়ুলি বেশ, তবু কী অসমসাহসে
কঠিন আঘাত প্রাণপণে যায় হেনে
পরিপাটি সাজ নয় কো বীরের ভূষণ
বীরত্ব দিয়ে লোকে যোদ্ধাকে চেনে।

আমার কবিতা আমি মিশে গেলে মাটিতে
রবে কি রবে না তাতে গেছে ভারি বয়ে
আমার কবিতা লড়ে সম্মুখ সমরে
দিতে হলে দেবে প্রাণ, পিছোবে না ভয়ে।

যা থাক কপালে, পবিত্র এই পুঁথিতে
চিরশান্তিতে ঘুমোবে আমার কথা
জেনো, এখানেই মিলবে বীরের সমাধি
যাদের মাথার মণি ছিল স্বাধীনতা।

[হাঙ্গেরীয় কবি পেতফি-র কবিতার ইংরেজি অনুবাদ থেকে বাংলা]

সম্পাদকীয়

পূর্বপাকিস্তানে 'পরিচয়' নিষিদ্ধ

পূর্বপাকিস্তানে 'পরিচয়'-এর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়েছে। পূর্বপাকিস্তান সরকারের আদেশক্রমে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৯ সংখ্যা ও তৎপরবর্তী কোনো সংখ্যা 'পরিচয়' পূর্বপাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছতে পারবে না।

কেন এই আদেশ, আমরা জানি না। প্রকাশ 'পরিচয়'-এ নাকি 'আপত্তিকর সংবাদাদি' প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু কথাটা কি মূলত ঠিক?

'পরিচয়'-এর পাঠকেরা জানেন, কী ধরনের লেখা 'পরিচয়' সাধারণত প্রকাশ করে এসেছে। বাঙলা ভাষায় যে সাহিত্য আমাদের আছে, তাকে অগ্রসর করাই ছিল 'পরিচয়'-এর প্রধান কাজ। প্রগতিশীল সংস্কৃতির উজ্জীবনই 'পরিচয়'-এর প্রধান লক্ষ্য।

এই লক্ষ্যসাধনে অন্যান্য অবশ্য প্রয়োজনীয় কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে 'পরিচয়' যে বিশেষ একটি ভূমিকা পালন করেছে তা আবার মনে করিয়ে দেই। সে-ভূমিকাটি হল শান্তির জন্য সংগ্রামের ভূমিকা; বিশ্বশান্তি তথা পাক-ভারত মৈত্রী ও সাম্প্রদায়িক শান্তির জন্য দ্বিধাহীন সংগ্রামের ভূমিকা।

মাঝে মাঝে বন্যা এসেছে, অশুভ প্রচারে আকাশবাতাস নিনাদিত হয়ে উঠেছে, পথরোধ করেছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এবং উন্মত্ততার প্রেতমূর্তি। সেইসব মুহূর্তে, এদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে 'পরিচয়'-এর ঘোষণাও কোনো ভয়কে মান্য করেনি, কোনো অন্ধসংস্কারের কাছে যুক্তিকে বিকিয়ে দেয়নি। মানুষের মহত্ত্বের আদর্শ, সাম্প্রদায়িক শান্তির পবিত্র আদর্শের জন্য অকপটে দাঁড়িয়েছে 'পরিচয়'।

সেই সুদূর ১৩৫২-৫৩ সাল থেকে 'পরিচয়' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধারমণ মিত্র প্রভৃতি বিশিষ্ট লেখকদের তথ্যসম্মত লেখা প্রকাশ করে সংগ্রাম করেছে বাঙলার ইতিহাসের সাম্প্রদায়িক বিকৃতিসাধনের বিরুদ্ধে। ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদের কূটচালে যখন শুরু হল কলকাতা এবং অন্যত্র এক বীভৎস সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, তখন 'পরিচয়'-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য 'ইতরতার অভিযান' থেকে বাঙলার সংস্কৃতির সমস্ত ঐতিহ্যের দোহাই পেড়ে ডাক দেওয়া হয়েছিল প্রতিরোধের, আস্থা ঘোষিত হয়েছিল সেদিনকার বাস্তব অসাম্প্রদায়িক মূল শক্তি শ্রমিক-কৃষকের ওপর। দাঙ্গাকে ধিক্কার দিয়ে 'শাদা ঘোড়া', 'আদাব'-এর মতো গল্পও প্রথম প্রকাশ পায় 'পরিচয়'-এ।

একমাত্র 'পরিচয়'-ই সম্ভবত এমন একটি সাহিত্য-পত্রিকা, যেখানে সেইদিন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম মৈত্রীর বাণী, সাম্প্রদায়িক শান্তি ও পাক-ভারত বন্ধুতার বাণী নির্ভয়ে উচ্চারিত হয়ে এসেছে, যেখানে বাঙলা ভাষার সংস্কৃতিতে পুষ্ট করার জন্য হিন্দু-মুসলিম, পাকিস্তান ও ভারতের লেখকেরা সমান মর্যাদায় অংশ নিয়ে এসেছেন।

এই 'পরিচয়'-কে 'আপত্তিকর' বলতে হলে আসলে আপত্তিকর ঘোষণা করতে হয়

সাম্প্রদায়িক শান্তির আদর্শকেই, বিশ্বশান্তি ও পাক-ভারত মৈত্রীর বাণীকে, প্রগতিশীল সংস্কৃতির ভবিষ্যতকেই।

আমরা জানি, কোনো দেশের মানুষই এই মহত্তম আদর্শগুলিকে আপত্তিকর বলে ভাবতে পারেন না। যে আদেশ তা ভাবাতে চায় আপত্তিকর হল সেই আদেশটাই।

ইতিমধ্যেই পূর্বপাকিস্তানের অনেক পাঠক ও লেখকের কাছ থেকে আমরা চিঠি পেয়েছি। নিষেধাজ্ঞার সংবাদে তাঁরা ব্যথিত ও বিচলিত হয়েছেন। বাঙলা ভাষার জন্য যাঁদের ভালোবাসা এবং রক্তদান ইতিহাসে লেখা থাকবে, এ চিঠি তাঁদের। এ চিঠিগুলি আমাদের কাছে অমূল্য সম্পদ, এ চিঠিগুলি আমাদের কাছে ভবিষ্যতের নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

বিশেষ করে সেইজন্য তাঁদের কাছে আমাদের আবেদন—আপনারা যাঁরা বাঙলা ভাষাকে ভালোবাসেন, অবাধ সাংস্কৃতিক বিনিময়ের নীতিকে যাঁরা শ্রদ্ধা করেন, তাঁরা এগিয়ে আসুন এই আপত্তিকর আদেশের প্রতিবাদ করুন। 'পরিচয়'-এর ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার নিশ্চিত করুন।

পূর্ব পাকিস্তানে 'পরিচয়'-এর এ সংখ্যা হয়তো পৌঁছবে না, কিন্তু জানি যে শান্তির এ আবেদনকে আটক রাখার মতো বেড়া কোথাও নেই।

পাক-ভারত সাংস্কৃতিক বিনিময় ও মৈত্রী

'পরিচয়'-এর ওপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রসঙ্গেই আমরা আবার দাবি করছি পাক-ভারতের মধ্যে অবাধ ও স্বচ্ছন্দ সাংস্কৃতিক লেনদেন।

কিন্তু আশঙ্কার কথা এই যে এই অত্যন্ত ন্যায্য ও স্পষ্ট নীতিটিকেও বানচাল করার মতো দুর্বুদ্ধি শুধু পাকিস্তানে নয় এখানেও আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। পাকিস্তান থেকে একটি ক্রিকেট টিম ভারতে এসেছেন এবং প্রশংসনীয় ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু ধিক্কারের কথা যে, ভারতের মাটিতে এমন অন্ধতা এখনো রয়েছে, যা হিন্দু মহাসভার খেরের মতো হঠাৎ এই অতিথি ক্রীড়াবিদ্‌দের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহের কথা বলতে লজ্জা পায় না।

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কিছু চলচ্চিত্র এখনো ভারতের মানুষের জন্য আসে। এতে ভারতের হিন্দী-উর্দু ভাষী দর্শকদের খুশি হবারই কথা। দাবি করতে হলে দাবি করা উচিত উভয়ত আদানপ্রদানের ব্যবস্থা। কিন্তু আশঙ্কার কথা এই যে, তার বদলে দাবি উঠছে আদানপ্রদান একেবারেই বন্ধ করার।

অন্ধ-ভেদবুদ্ধির এই সর্বনাশা দাবিগুলি সম্প্রতি সবচেয়ে সংহত ও সবচেয়ে উলঙ্গ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কলকাতার এক সাম্প্রতিক সম্মেলনে। সেখান থেকে ধ্বনি উঠেছে সর্বপ্রকার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ নিশ্চিহ্ন করে অর্থনৈতিক অবরোধ এবং প্রয়োজন হলে আরো ভয়ঙ্কর কিছু করা হোক।

কিন্তু তাতে লাভ কার? ভারতবর্ষের? সাধারণ ভারতবাসীর? পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের? আদৌ নয়।

পাকিস্তানে 'পরিচয়'-এর শূন্যস্থানের সুযোগ নিতে এগিয়ে আসবে মুনাফাশিকারী, মিথ্যা-ব্যবসায়ী কাগজ, হিন্দুস্তানে পাকিস্তানে এক স্থানে অন্য স্থানের ফিল্মের অনুপস্থিতি ভরে যাবে হলিউডি নোংরামির অধিকতর আমদানিতে। পাক-ভারত বাণিজ্যের মোটা মোটা তথ্যগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরালেই দেখা যাবে, গত কয়েকবছর ধরে যে পরিমাণে পাক-ভারত বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছে, ঠিক সেই পরিমাণেই উভয় দেশের বাজারেই আরো বেশি করে ঘাঁটি গেড়েছে মার্কিন ও ইংরেজ। কাশ্মীর নিয়ে যে পরিমাণ উত্তেজনা বেড়েছে, সেই পরিমাণেই রাজনৈতিক-সামরিক কর্তৃত্বের সুযোগ পেয়েছে মার্কিন কূটনীতিকেরা। আর অন্যদিকে পাকিস্তানের পাটচাষী দর পায়নি, শিল্পের অভাবে ছাঁটাই হয়েছে হিন্দুস্তানের কেরানি-মজুর। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে এই পারস্পরিক উত্তেজনার আর যা ফল হতে পারে, তা হল শুধু উভয় খণ্ডেই আর একদফা নৃশংসতা; বদ্ধসীমান্তের দুই পাশে শুধু সংখ্যালঘুদের জীবন ও সম্পত্তি নিয়ে আর একটি উন্মাদ নরক-নৃত্য।

কিন্তু ভরসার কথা যে, রেষারেষিতে ভারতের মানুষের এতটুকু স্বার্থ নেই, যে রেষারেষি বন্ধ করার জন্য ভারত সরকার এতটুকু সত্যকার প্রচেষ্টা করেননি এবং করছেন না, তাকে বন্ধ করে প্রকৃত শান্তি ও পাক-ভারত মৈত্রীর এক উজ্জ্বল পাল্টা পথ উপস্থিত করার মতো শুভবুদ্ধির অভাব বাঙলায় হয়নি। পশ্চিম বাঙলার শান্তি সংসদ সম্প্রতি পাসপোর্ট প্রত্যাহার, অবাধ বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক লেনদেন এবং শান্তিপূর্ণ পারস্পরিক আলোচনার মারফত পাক-ভারত মৈত্রী প্রতিষ্ঠার জন্য এক উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এসেছেন বাঙলার বিশিষ্ট জননেতা, শিল্পী-সাহিত্যিক ও বহু গুরুত্বপূর্ণ গণসংগঠন। সম্প্রতি মৈত্রী সপ্তাহ পালন উপলক্ষে সারা পশ্চিম বাঙলা ব্যাপী এক বিপুল আলোড়ন জেগেছে। পয়লা নবেম্বরের কেন্দ্রীয় সমাবেশ থেকে হাজার হাজার হিন্দু-মুসলমান-শিখ মানুষ এই শুভবুদ্ধিকে তুলে ধরেছেন সগর্বে। বারংবার মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতার মূল্য দিয়ে ইতরতার যে অভিযান বাঙলা ঘৃণা করতে শিখেছে, তার পুনরাবির্ভাব আর নয়। অঙ্গীকার যদি করতে হয়, তবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নামে নয়, বাঙলার মানুষ, বাঙলার লেখকশিল্পীরা অঙ্গীকার করবেন চণ্ডিদাস, রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের নামে, অভিযান যদি করতে হয়, তবে সে অভিযান হোক যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সর্বনাশের বিরুদ্ধে।

দ্বাবিংশ বর্ষ, ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা কার্তিক, ১৩৫৯

বাংলা ছন্দের নূতন সম্ভাবনা

প্রবোধচন্দ্র সেন

...ছন্দের বিশ্লেষণে আমাদের বাক্-রীতির প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখা চাই কেননা, বাক্-রীতিকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করে ছন্দ-রচনা অসম্ভব। বস্তুত শিল্পিত বাক্-রীতির নামই ছন্দ। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে আমাদের বাক্-রীতির বহু বিচিত্র রূপ ধরা পড়ে। এস্থলে দুটি মাত্র রূপের কথা সংক্ষেপে বলবো। প্রথমত, আমাদের বাক্যের স্বাভাবিক প্রস্বরব্যবস্থাকে ছন্দেও মোটামুটি অব্যাহত রাখতে হয়; ছন্দের খাতিরে তাকে একটু-আধটু পরিবর্তন করা গেলেও তাতে গুরুতর পরিবর্তন ঘটানো যায় না, ঘটালে কানে খট্‌কা লাগে অর্থাৎ ছন্দ-পতন ঘটে। বস্তুত ছন্দ-পতন বা কানে খট্‌কা লাগার মানেই হলো স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির লঙ্ঘন। দ্বিতীয়ত, যুগ্ম-ধ্বনির ব্যবহার-কৌশলই হলো ছন্দোবৈচিত্র্যের প্রাণ। আর, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ-ভঙ্গিতেই যুগ্মধ্বনির দু-রকম প্রয়োগ দেখা যায় ঃ (১) যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট বা সংকুচিত প্রয়োগ, এবং (২) তার বিশ্লিষ্ট বা সম্প্রসারিত প্রয়োগ। যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনিকে সর্বদাই সম্প্রসারিত করে দুই মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়, তাকেই বলি মাত্রাবৃত্ত। আর, যে-ছন্দে যুগ্মধ্বনির ওই উভয়প্রকার প্রয়োগেরই ব্যবহার দেখা যায়, তাকেই বলি যৌগিক; প্রচলিত পরিভাষায় এই ছন্দই 'অক্ষরবৃত্ত' নামে পরিচিত। মজার কথা এই যে, প্রায় কুড়ি বছর আগে আমিই ওই নামটি বাংলা সাহিত্যে চালিয়েছিলাম। এতদিনে এটা অনেকের মনে এমনভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে যে, বহু চেষ্টা করেও আমি এখন আর তাকে নাড়তে পারছি না। অক্ষরবৃত্ত নামটা ওই ছন্দের প্রচলিত অক্ষর-গোণা হিসেবের দিক থেকে সাধারণের মনে খুব লেগেছে। কিন্তু ঐ নামটা অবৈজ্ঞানিক। যৌগিক (composite) নামটা বৈজ্ঞানিক ঃ ধ্বনি-বিশ্লেষণ-জ্ঞাপক। তাই তার অর্থ গ্রহণ সাধারণের পক্ষে একটু কঠিন। যাহোক, যৌগিক ছন্দে যুগ্মধ্বনি কোথায় বিশ্লিষ্ট হবে এবং কোথায় সংশ্লিষ্ট হবে সে এক জটিল প্রশ্ন। এ-সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধে বহু আলোচনা করেছি। আর আলোচনা করতে প্রবৃত্তি হয় না। তবু সংক্ষেপে মাত্র চারটি নিয়মের কথা বলছি ঃ (১) শব্দান্তবর্তী যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক হয়ে থাকে—এ-নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, কিন্তু খুব বিরল; (২) সংস্কৃত শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনি সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক হয়ে যাচ্ছে—এ-নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় বটে, কিন্তু খুব বিরল; (৩) সমাসের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শব্দের অন্তস্থিত যুগ্মধ্বনি বিকল্পে সংশ্লিষ্ট হয়। শব্দ-মধ্যবর্তী যে-সব যুগ্মধ্বনি (যে কারণেই হোক) সাধারণত যুক্তাক্ষরের সাহায্যে লেখা হয় না সেগুলি প্রায়শ বিশ্লিষ্ট ও দ্বিমাত্রিক বলে গণ্য হয়ে থাকে, কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনমতো সংশ্লিষ্ট ও একমাত্রিক করতেও বাধা নেই। আসলে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণরীতিকে বজায় রেখে সব যুগ্মধ্বনিকেই সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট করা যায়। কবি গুণাকর ভারতচন্দ্র ছন্দের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু যৌগিক ছন্দকে অক্ষর-সংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠার রীতি তিনিই প্রবর্তন করেন।

এই আক্ষরিক রীতি শতাধিক বৎসরকাল বাংলা সাহিত্যে অনুসৃত হয়ে আসছে। কিন্তু ধ্বনি-প্রতিষ্ঠ ছন্দকে লিপি প্রতিষ্ঠ করার এ প্রয়াস বিজ্ঞান-সম্মত নয়। তাই তার ব্যর্থতা অনিবার্য। সূক্ষ্ম ধ্বনিরসিক রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথমে এ ছন্দের অক্ষর-সংখ্যার শৃঙ্খলকে কতকাংশে শিথিল করেন। কিন্তু এ-পথে তিনিও বেশি অগ্রসর হয়েছেন বলে মনে করিনে। বেশি অগ্রসর হবার বিপদও আছে। যাহোক, যৌগিক ছন্দকে অক্ষরের ডোরে বাঁধার প্রয়াসে আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতিকে অনেক স্থলেই কিছু পরিমাণে পরিবর্তিত করতে হয়। কিন্তু তবু খটকা লাগে না দুই কারণে। এক, ওই কৃত্রিম উচ্চারণই দীর্ঘদিনের অভ্যাসে আমাদের কাছে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে; দুই, আমাদের উচ্চারণের মধ্যেই কতক পরিমাণে সংকোচন-সম্প্রসারণের স্বাধীনতা রয়েছে। ওই স্বাধীনতা যদি না থাকত, তাহলে দীর্ঘ দিনের অভ্যাসেও অস্বাভাবিক জিনিস স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারতো না। তাছাড়া, সব ছন্দেই কিছু না কিছু পরিমাণে কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়; তার উপর ভিত্তি করেই শিল্প রচনা করতে হয়। সে হিসাবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দেও অনেকখানি কৃত্রিমতা রয়েছে। যাহোক, আমাদের স্বাভাবিক উচ্চারণকে অবলম্বন করে যদি যৌগিক ছন্দের অক্ষর-সংখ্যার কৃত্রিম বন্ধনকে শিথিল করা যায়, তবে কিছুমাত্র অন্যায় তো হবেই না, বরং ছন্দকে কৃত্রিমতার বন্ধন থেকে মুক্ত করার গৌরব অর্জন করাই হবে। সুভাষ এ-পথে অগ্রসর হয়েছেন, সে-জন্যে তাঁকে অভিনন্দন জানাই। কিন্তু সুভাষের পূর্ববর্তীরাই এ কার্যে পথ-প্রদর্শন করেছেন।

সে কথা বলার পূর্বে বুদ্ধদেবের* একটি উক্তির আলোচনা করা প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, ''আমি আবিষ্কার করি যে পয়ারে 'কলকাতা' অনায়াসেই তিন মাত্রার জায়গা পায়''। দৃষ্টান্ত দিয়েছেন—

আসিলো কলকাতার। আরো এক কাল।

কিন্তু এখানে 'কলকাতা'য় তিনি কি করে তিনমাত্রা ''আবিষ্কার'' করলেন তা বুঝতে পারলাম না। আমি তো দেখতে পাচ্ছি ও-শব্দ স্পষ্টতই চারমাত্রার জায়গা জুড়ে রয়েছে। বরং সুভাষই কৃতিত্বের সঙ্গে ও-কার্যে সফল হয়েছেন। যথা—

---

*বুদ্ধদেব বসু

এই প্রসঙ্গে প্রবন্ধের পূর্বাংশে প্রবোধচন্দ্র সেন লিখেছিলেন : ছন্দ যথার্থভাবে আলোচনা করতে হলে চোখের অন্ধ অভ্যাসের পরিবর্তে একটি সদা-জাগ্রত কানের অভ্যাস গড়ে তোলা চাই। তাহলেই বোঝা যাবে ছন্দের আলোচনায় অক্ষর বলে কোনো জিনিস নেই, আছে কতকগুলি ধ্বনি; যুক্তাক্ষর, অযুক্তাক্ষরের পরিবর্তে পাওয়া যাবে যুগ্ম ও অযুগ্ম ধ্বনি; 'শ্রুতিগম্য যুক্তাক্ষর' বলে কোনো পদার্থ হতে পারে না—ওটা, কানকে চোখটারা মাত্র।...বস্তুত কানের কাজ চোখে সারার দরুনই ছান্দসিকের কথা অন্যেরা বুঝতে পারে না।...

একটি ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত দিলেই আমার কথা স্পষ্ট হবে আশা করি। যেমন, 'ছন্দ' শব্দটি। 'অক্ষর' বৃত্ত পয়ার ছন্দে ও শব্দটিতে দুই অক্ষর ধরা হয় এবং সে দুটি অক্ষর হচ্ছে 'ছ' আর 'ন্দ'। কিন্তু এ-বিভাগ হচ্ছে নিছক চাক্ষুষ ও লিপিগত। কান দিয়ে শুনলে ও-কথাটিতে ছ এবং ন্দ পাওয়া যাবে না, পাওয়া যাবে ছন্ এবং দ। অর্থাৎ 'ছন্দ' কথাটির চাক্ষুষ রূপ হচ্ছে ছ-ন্দ, কিন্তু তার শ্রৌত রূপ হচ্ছে ছন্-দ। চাক্ষুষ পরিভাষায় ও-কথাটির প্রথমাংশে আছে একটি 'অযুক্ত' (ছ) এবং দ্বিতীয়াংশে একটি 'যুক্ত অক্ষর' (ন্দ); এটা নেহাৎই লিপিরূপের কথা। কিন্তু শ্রৌত রূপের পরিভাষায় ও কথাটির প্রথমেই আছে একটি যুগ্মধ্বনি (ছন্) এবং দ্বিতীয়াংশে একটি অযুগ্মধ্বনি (দ)।

(১) ইতিমধ্যে কলকাতায়; একুত্রিশে চৈত্রেই চম্পট...

(২) বিদ্যার্থী দুলাল শেখে নৈশ বিদ্যা কল্‌কাতায়।

উভত্রই 'কলকাতা' শব্দ তিনমাত্রার বেশি জায়গা জোড়েনি। তারপর বুদ্ধদেব বলেছেন,—

"আসিলো কলকাতার আরো এক সকাল

এ-ও পয়ারে চলে যায়"। আমার কিন্তু মনে হয় এটা চালানো উচিত নয়, কারণ তাতে বাংলা বাক্‌-রীতির উপর জুলুম হবে। কারণ 'এক সকালকে' 'এক্সকাল' রূপে গণ্য করলে বাংলা প্রাস্বরিক রীতি ব্যাহত হয়। কারণ 'সকাল' কথার প্রথম ধ্বনিটির উপর একটি প্রস্বর আছে, কিন্তু উক্ত রূপে 'এক' কথার সঙ্গে জুড়ে দিলে ওই প্রস্বরটি মারা পড়ে এবং উচ্চারণে কৃত্রিমতা ও বিকার ঘটে। এরকম বিকার ছন্দে স্বীকার্য নয়। "এক শো কাল" হলে ওরকম সংশ্লেষণ স্বীকার্য হ'তো।

যৌগিক ছন্দে সুভাষের যুগ্মধ্বনির ব্যবহার-কৌশলকে বুদ্ধদেব দুই শ্রেণীতে ফেলেছেন ঃ (১) 'প্রথাবিরুদ্ধ' অর্থাৎ অনভ্যস্ত স্থলে যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষ, এবং (২) অনুরূপ অনভ্যস্ত ক্ষেত্রে ওই ধ্বনির বিশ্লেষ। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের বিচারটাই আগে করা যাক। বুদ্ধদেব তাঁর এই 'অকুণ্ঠিত আচরণে'র দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেছেন :

(১) বিকালে মসৃণ সূর্য মূর্ছা যাবে লেকে প্রত্যহ।

(২) মন্দভাগ্য বার্সিলোনা রেস্তোরাঁতে মন্দ লাগবে না।

"এখানে 'প্রত্যহ' আর 'লাগবে না' চারমাত্রায় ছড়িয়ে আছে।" এই মাত্রা প্রসারণের নৈপুণ্য ও অভিনবত্বের খুব তারিফ করেছেন বুদ্ধদেব। এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে, 'প্রত্যহ' কথাটিকে টেনে দীর্ঘ করে 'প্রৎ-তহ'-রূপে চার মাত্রার স্থান দিলে ও-শব্দটির স্বাভাবিক উচ্চারণ-রীতির উপর জুলুম করা হয়। আমার বিশ্বাস এস্থলে প্রত্যেক বাঙালী পাঠকেরই খটকা লাগবে। কাজেই অভিনব হলেও এটিকে সুষ্ঠু বলে স্বীকার করে নেওয়া যায় না। এ-ক্ষেত্রে যৌগিক ছন্দের দ্বিতীয় নিয়মটি প্রযোজ্য। পক্ষান্তরে 'লাগবে না' কথায় চারমাত্রা ধরতে বাধা নেই; (পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়ম দ্রষ্টব্য), কিন্তু এক্ষেত্রে অভিনবত্বও কিছু নেই রবীন্দ্রনাথের 'পরিশেষ' গ্রন্থে এরকম প্রয়োগের বহু দৃষ্টান্ত আছে, একটি উদ্ধৃত করছি—

সব কথা তার
কোনো কালে জানবে না কেউ
নিজেও জানে না কোনো লোক। (অগোচর)

এখানে 'জানবে না'-র মাত্রামূল্য চার। সুভাষের যৌগিক ছন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে যুগ্মধ্বনির অনভ্যস্ত বিশ্লেষণের দিকে তাঁর ঝোঁক নয়, তাঁর ঝোঁক হচ্ছে অনভ্যস্ত সংশ্লেষণের দিকে। এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। কারণ, এ-ছন্দে আ সংস্কৃত শব্দের অযুক্ত যুগ্ম-বিধানকে অক্ষর গোণার অভ্যাসের ফলে বিশ্লিষ্ট বলে গণনা করার দিকেই আমাদের সাধারণ প্রবণতা; কাজেই ওই বিশ্লেষণে কোনো কৃতিত্ব নেই এবং তাতে ছন্দও দুর্বল হয়। তা ছাড়া, ও-রকম বিশ্লেষণ অনেক স্থলেই আমাদের বাক্‌-রীতি-বিরোধী। কিন্তু বাক্‌-রীতি বজায় রেখে যুগ্ম-ধ্বনির বিশ্লেষণে কৃতিত্ব আছে। সুভাষের রচনায় ওরকম বাক্‌রীতি-সঙ্গত অথচ অনভ্যস্ত একটি বিশ্লেষণেরও দৃষ্টান্ত আছে।—

(১) প্রজাপতি পায় নাকো | এরোপ্লেনের শব্দ | বাতাসের কানে।

—পলাতক

(২) বোমাত্মক এরোপ্লেন | গান গায় | দক্ষিণসমীরে।

—পদাতিক (৪)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে 'এরোপ্লেন' কথাটিতে চারমাত্রা, কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তে পাঁচমাত্রা। এরকম বিশ্লেষণ অনভ্যস্ত হলেও একেবারে অভিনব নয়। রবীন্দ্রনাথের 'পূরবী' থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) যুগান্তরের ব্যথা | প্রত্যহের | ব্যথার মাঝারে...

(অতীত কাল)

(২) যুগান্তর সাগরের | দ্বীপান্তর | হতে বহি আনে। (ঐ)

'যুগান্তর' কথাটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে সংশ্লিষ্ট এবং এটা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী; কিন্তু প্রথম দৃষ্টান্তে বিশ্লিষ্ট, অথচ বাক্‌রীতি-বিরোধী নয়। কেন নয়, সে কথা এখানে উত্থাপন করতে চাইনে। কিন্তু উক্ত প্রকার বিশ্লেষণ-পদ্ধতির অনুসরণ করে আমি যদি লিখি—

নীলোৎপলাঞ্জলি | দিয়া আমি | পূজিনু দেবীরে

তাহলে আমার যৌগিক ছন্দে কি দোষ ঘটবে? ছন্দ-স্রষ্টা কবিদের আমি এ কথা জিজ্ঞাসা করছি।

এবার সুভাষের অনভ্যস্ত সংশ্লেষণের বিষয় আলোচনা করা যাক। তাঁর এরকম সংশ্লেষণকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। আমরা ওই শ্রেণী-বিভাগ অনুসারেই এ-বিষয়ের আলোচনা করবো। প্রথমত, টুকরো, পাগড়ি, হাজরা, টাট্‌কা, খাজনা প্রভৃতি শব্দকে দুই মাত্রা এবং ডায়মন্ড, হারবার, কমরেড, কসরৎ, দরকার, কলকাতা, মাসতুত, ঝুমঝুমি প্রভৃতিকে সুভাষ তিনমাত্রা বলে গণ্য করেছেন, আর, অধিকাংশস্থলেই তার প্রয়োগ বেশ সুষ্ঠু হয়েছে।

(১) হাজরা পার্কে সভা কাল;। নিরপেক্ষ থেকে আর। চিত্তে নেই সুখ।

(২) অথচ বকেয়া খাজনা। প্রজারা দেয়নি গত। দুই তিন সনে।

(৩) কী দরকার এসে?

(৪) সংগ্রাম নিশ্চিত, তবু—মাসতুতো ভায়েরা...

(৫) এস্‌প্ল্যানেডে আশ্চর্য জনতা।

কিন্তু এতে অভিনবত্ব নেই। যৌগিক ছন্দের চতুর্থ নিয়ম অনুসারেই এগুলি সুষ্ঠু বলে স্বীকার্য। তবে সুভাষের কৃতিত্ব এই যে সাধারণত কবিরা এসব স্থলে অক্ষর গোণার নিরাপদ পথে বিশ্লেষণের দিকেই ঝুঁকে থাকেন; কিন্তু সুভাষের প্রখর কান তাঁকে উচ্চারণ-রীতির পথেই চালনা করেছে, ছন্দ-শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দেয়নি। তাই তাঁর চোখ তাঁকে আক্ষরিক হিসাবে নিরাপদ পথের দিকে চালনা করার সুযোগ পায়নি। যাহোক, তথাপি এই বিশিষ্টতা বাংলা কাব্যে অভিনব নয়, একথা স্বীকার্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁর "ছন্দ" পুস্তকে (পৃঃ ১২৮—১৫৮) এ-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ঐ বই থেকে (পৃঃ ১৪০) একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

টোট্‌কা এই মুষ্টিযোগ। লট্‌কানের ছাল,

এখানে টোট্‌কা ও লট্‌কান কথার ধ্বনি-সংশ্লেষণ লক্ষিতব্য। দ্বিতীয়ত, প্রত্যয়-যোগেও অনেক সময়ে শব্দমধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনির উৎপত্তি হয়। ও-সব স্থলেও যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষণ হওয়া উচিত কিনা, তাও তর্কের বিষয় হতে পারে। অর্থাৎ 'এক' শব্দে দুই মাত্রা, কিন্তু 'একটি' শব্দের দুইমাত্রা গণনা করা যায় কি? পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়ম অনুসারে বলতে হবে, যায়। দৃষ্টান্ত—

(১) একটি কথা শুনিবারে। তিনটি রাত্রি মাটি। (ছন্দ, পৃঃ ১৩০)

(২) একেকটি করে মোর। দিনরাত্রিগুলি
সুন্দর সুগন্ধ তনু। একেকটি সম্পূর্ণ পুষ্পসম।

—বন্দীর বন্দনা, 'কালস্রোত'

(৩) আমরা কয়েকটি প্রাণী,। দু'চোখে ঘুমের হরতাল

—পদাতিক, পৃঃ ১৯

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তের 'একেকটি' (মূলে আছে এক-একটি, বোঝার সুবিধার জন্যে আমি সংক্ষিপ্ত করছি) বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। এখানে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রণালীর দৃষ্টান্ত পাশাপাশিই রয়েছে।

তৃতীয়ত, অতঃপর প্রশ্ন আসে যৌগিক ছন্দে হসন্ত-মধ্য চলতি ক্রিয়াপদের যুগ্মধ্বনিগুলিকে সংশ্লিষ্ট করা চলে কি-না। বহুদিন যাবৎ এ প্রশ্ন আমার মনকে দোলা দিয়েছে। কয়েক বছর আগে আমি প্রকাশ্যে রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করি ও সব ক্ষেত্রেও সংশ্লেষণ করা যায় কিনা এবং এ কথাও বলি যে, ও-রকম প্রয়োগ চালালে বাংলা ছন্দে নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে এবং বাংলা কবিতার ভাষাও জোরালো হবে। এস্থলে ও-বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টান্ত রচনা করে জবাব দেন যে, তাও করা চলে এবং তাতে ছন্দের কোনো ক্ষতি হয় না। যথা—

(১) 'সিটকে' মুখ খাবি, জ্বর। আট্‌কে যাবে কাল।

(২) টাটকা মাছ 'জুটল' না তো,। সুটকি দেখো চেখে।

(৩) ঘূর্ণী বেগে 'উড়ল' ধূলো। রক্ত সন্ধ্যাকাশে।

(৪) 'টুটল' কেন উর্বশীর। মঞ্জীরের ডোর।

ছন্দ, পৃঃ ১১৩, ১৫৩

এখানে সিট্‌কে, আট্‌কে, জুট্‌ল, উড়্‌ল, টুট্‌ল, এইকটি হসন্ত মধ্য চলতি ক্রিয়াপদের যুগ্মধ্বনির সংশ্লেষণ ঘটেছে। অথচ রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এখানে "ছন্দের নীতি নষ্ট করা হয়নি"। এই আলোচনার পূর্বে তিনি যৌগিক ছন্দে কখনও হসন্ত-মধ্য চল্‌তি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করেন নি। অতঃপর সাক্ষাতেও তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়। তার কিছুদিন পরেই তিনি যৌগিক ছন্দে হসন্ত-মধ্য চলতি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে আরম্ভ করেন। ওই কবিতাগুলি 'পরিশেষ' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, ও-সব কবিতায় তিনি উক্ত-প্রকার ক্রিয়াপদের মধ্যবর্তী যুগ্ম-ধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট না করে অক্ষর হিসাবের রীতি অনুসারে বিশ্লিষ্টই করেছেন।—

সে না হ'লে বিরাটের নিখিল মন্দিরে
'উঠ্‌ত' না শঙ্খধ্বনি,
'মিলত' না যাত্রী কোনো জন,
আলোকের সাম-মন্ত্র ভাষাহীন হ'য়ে
'রইত' নীরব। (প্রাণ)

উঠ্‌ত, মিলত, রইত—তিন স্থলেই যুগ্মধ্বনি বিশ্লিষ্ট। সুতরাং ও রকম ক্রিয়া-মধ্যস্থ যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত সাহিত্যে দেখা দেয়নি, 'ছন্দ' গ্রন্থের কয়েকটি মাত্র উদাহরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে আছে বলে আমার বিশ্বাস। কিন্তু ছন্দ-পথের সাহসী 'পদাতিক' সাহিত্যে ও ও-রকম প্রয়োগ আমদানি করে সুধীজনের বিস্ময়ভাজন হয়েছেন। যথা—

(১) বসন্ত সত্যিই 'আসবে'? কী দরকার এসে? (বার্ষিক)

(২) আমাদের হাতে 'আস্‌বে' রাজ্যভার! চমৎকার কিবা (অতঃপর)

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-রকম সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের দুটিমাত্র দৃষ্টান্তই আছে তাঁর পুস্তকখানিতে। পক্ষান্তরে ও-রকম ধ্বনির বিশ্লিষ্ট প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আছে তিনটি। একটি পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে। বাকি দুটি এখানে দিলাম।

(১) ফাল্গুন অথবা চৈত্রে। বাতাসেরা। দিক্ 'বদলাবে', —নির্বাচনিক

(২) এবার বিধ্বস্ত চীন। মন্দ 'লাগবে না'।

হসন্ত-মধ্য চল্‌তি ক্রিয়াপদের যুগ্মধ্বনির সংশ্লিষ্ট প্রয়োগের আরও পরীক্ষা হওয়া উচিত। এ-স্থলেও যৌগিক ছন্দের পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়ম স্মরণীয়।

এই প্রসঙ্গেই সুভাষের রচনা থেকে আরও তিনটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

(১) মাংসের দুর্ভিক্ষ 'নইলে'। ঋষি মনে। হতো হাব ভাবে। —নির্বাচনিক

(২) এতৎসত্ত্বেও 'হয়তো'। গুরুভাগ্যে ঘুরে যাবে। অদৃষ্টের চাকা, —অতঃপর

(৩) বিপদ একাকী 'নয়কো'। ঐ

নইলে, হয়তো, নয়কো, এই কথা তিনটি—পূর্বোক্ত 'আসবে' শব্দের মতো হসন্ত মধ্য ক্রিয়াপদ না হলেও ক্রিয়াত্মক পদ বটে এবং 'আস্‌বে'-র মতো এদেরও যুগ্মধ্বনি বেশ সুষ্ঠুভাবেই সংশ্লিষ্ট হয়েছে। ঠিক এ-জাতীয় অন্য দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে না। তবে 'নইলে' শব্দের অনুরূপ প্রয়োগ প্রাচীন বাংলায় পাওয়া যায়। প্রাচীনকালে 'হইতে', 'হইল' প্রভৃতি শব্দকে অবলীলাক্রমে দুই মাত্রা বলে গণ্য করা হতো। কিন্তু আধুনিক কালে 'অক্ষর' সংখ্যার প্রভাববৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ও-সব সংশ্লিষ্ট শব্দ শিথিল হয়ে তিন মাত্রায় ছড়িয়ে পড়েছে। আধুনিক সাহিত্য থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

সেই মত নষ্ট হৈল বহু টিকি, বৈদিকী, তান্ত্রিকী,
টিকিমেধ যজ্ঞে তার, নষ্ট হৈল সর্পময় কুঁসি...
সাব্যস্ত হইল চুল, শশব্যস্ত টিকি অন্তর্ধান।

—সত্যেন্দ্রনাথ, অভ্র-আবীর, টিকিমেধ যজ্ঞ।

এখানে 'হইল' শব্দের সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট দু-রকম প্রয়োগই দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট প্রয়োগে অক্ষর সংখ্যার সমতা রক্ষার চেষ্টায় 'হৈল'-রূপে লেখা হয়েছে। এটা অক্ষর সংখ্যার আধিপত্য এবং মানসিক দুর্বলতার ফল। সর্বত্র এ-রকম ভাবে সংখ্যার সমতাও রক্ষা করা যায় না। যথা—

(১) 'শিউলি', 'কুন্দ', জুঁই কিংবা স্নিগ্ধ শান্ত শারদ জ্যোৎসনা
বৌ যেন ঐ রূপে সবারেই করিছে ভর্ৎসনা।

—লেখক

(২) 'সাঁওতালী' যুবতী যত চলে সারি সারি
নিকষ পাষাণে যেন গঠিত পুতলি।

—রাধারাণী দেবী

(৩) যায় আসে 'সাঁওতাল' মেয়ে
শিমুল গাছের তলে কাঁকর বিছানো পথ বেয়ে।

—রবীন্দ্রনাথ

'সাঁও' ধ্বনি তৃতীয় দৃষ্টান্তে বিশ্লিষ্ট; কিন্তু অন্যত্র সংশ্লিষ্ট; 'শিউ' ধ্বনিত সংশ্লিষ্ট। ও-সব স্থলে অক্ষর সংখ্যার সমতা নেই, কিন্তু ছন্দের রীতি ঠিক আছে।

চতুর্থতঃ সমাসবদ্ধ শব্দের প্রথমাংশের যুগ্মধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট করার যে কৌশল সুভাষ দেখিয়েছেন তা অভিনব না হলেও, তাতে বাহাদুরি আছে। সাহিত্যে এখানে-সেখানে এরকম প্রয়োগের দৃষ্টান্ত থাকলেও সুভাষের মতো এমন ব্যাপকভাবে কেউ তা প্রয়োগ করেন নি। সুভাষ অবলীলাক্রমে গোলদীঘি, একচেটিয়া, মন-দেয়া, হাত-পা, অনেক-দিন, খিদিরপুর, ভারতবর্ষ প্রভৃতি শব্দের মধ্যবর্তী যুগ্মধ্বনিকে সংশ্লিষ্ট করেছেন।—

(১) তবুও আড্ডায় চলে। 'মন-দেয়া-নেয়া'র হেঁয়ালি। (পৃঃ ২০)

(২) 'ভারতবর্ষে' বিপ্লবের। দেরী নেই আর।

এ-রকম চল্‌লে অন্তত ছন্দের ক্ষেত্রে যে বিপ্লব ঘটতে দেরী হবে না, সেটা নিশ্চিত। কারণ, এ-রকম দৃষ্টান্ত বাংলা সাধু-সাহিত্যে এখনও দেখা যায়নি। যে দুয়েকটি দেখা গিয়েছে তাও ব্যঙ্গ রচনায়। যথা—

(১) কোনো দিকে বিন্দুমাত্র না করি দৃকপাত
'জাম-বাটি' উজাড় কৈল গাবু গাবু রবে।

—সত্যেন্দ্রনাথ, হসন্তিকা, অম্বল-সম্বরা কাব্য।

(২) এর পরে ঝগড়া হবে, শেষে 'দাঁত কপাটি'।

—রবীন্দ্রনাথ, ছন্দ, পৃঃ ১৩০

সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যে ভারতচন্দ্র বাংলা যৌগিক ছন্দকে অক্ষর সংখ্যার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছিলেন এবং যাঁর আক্ষরিক মতবাদের প্রভাব থেকে বাংলার কবি-সমাজ আজও মুক্ত হ'তে পারেননি, তাঁরই রচনায় পাই—

এইরূপে 'নারদ মুনি' বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া॥

দেখা যাচ্ছে আন্তরিক মতবাদের উদ্‌ভাবয়িতার অন্তরও সম্পূর্ণরূপে ওই মতবাদের বশীভূত হয়নি; বাংলা ভাষার বাক্‌ভঙ্গি ও উচ্চারণ-রীতি তাঁর মতবাদের প্রতিকূলতাকে অস্বীকার করেই আত্মপ্রকাশ করেছিল তাঁর কানে। একেই বলে অদৃষ্টের পরিহাস। ভারতচন্দ্রের 'নারদমুনি' এবং সুভাষের 'ভারতবর্ষ' একই ধ্বনি-গোষ্ঠীভুক্ত, তা বলা বাহুল্য।

প্রথমে 'ঝগড়া' তারপরে 'দাঁত-কপাটি'র দৃষ্টান্ত তুলেই মনে মনে আশঙ্কা জেগেছিল তারপরে 'নারদমুনি'র প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেই রীতিমতো ভয় হচ্ছে, ওই মুনিটি আবার হিমালয় ছেড়ে বাংলা ছন্দ আলোচনার ক্ষেত্রে আবির্ভূত না হন ন'-বছর আগে (উত্তরা-১৩৩৯, ভাদ্র) এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছিলাম। তার একস্থানে বলেছিলাম—প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতি শব্দের 'প্রাণ' 'মান্'-কেও সংক্ষিপ্ত করার অভ্যাস অতি অনায়াসেই হতে পারে। মৃৎপিণ্ড, মার্তণ্ড প্রভৃতি শব্দে যদি তিন unit ধরা যায় তা-হলে এদের analogyতে প্রাণদণ্ড, মানদণ্ড প্রভৃতি শব্দেও তিন unit ধরা শক্ত হবে, অর্থাৎ কানকে ওভাবে অভ্যস্ত করা কঠিন হবে না।—

'প্রখর মার্তণ্ড-তাপে বিদগ্ধ ধরণী'—এই লাইনটার ধ্বনি যাদের কানে অভ্যস্ত, তাদের কাছে—'কঠোর প্রাণদণ্ড-বিধি করিল প্রচার এই লাইনটাও খারাপ শোনাবে না।" তখন কেউ আমার বিরুদ্ধে দণ্ড উদ্যত করেননি। এখন আশঙ্কা হচ্ছে, এ-রকম বিপ্লবী ছান্দসিকের বিরুদ্ধে হয়তো অচিরেই প্রাণদণ্ড-বিধি প্রচারিত হতে পারে। তবে ভরসার বিষয় এই যে, কমরেড সুভাষ এবং 'নারদমুনি' নিশ্চয় আমার পক্ষ সমর্থন করতে কুণ্ঠিত হবেন না।

(১) তব ভাল উদ্‌ভাসিয়া এ ভাবনা 'তড়িৎপ্রভা'বৎ
এসেছিলো নামি.....

রবীন্দ্রনাথ, পূরবী, শিবাজী উৎসব।

(২) বিশ্বকবি-ছত্রপতি, ছন্দরথী নিত্য-বন্দনায়
বিতরে যে বিশ্বে বোধি, বিশ্ব-বোধিসত্ত্ব 'জগৎপ্রিয়',
নিত্য তারুণ্যের টীকা ভালে যার, চিত্ত 'চমৎকার',
নমস্কার, তারে নমস্কার।

সত্যেন্দ্রনাথ, বেলাশেষের গান, নমস্কার।

যদি 'জগৎপ্রিয়' বিশ্বকবির 'তড়িৎ-প্রভা' সত্যই 'চমৎকার' বলে গণ্য হয়, তাহলে সুভাষের 'ভারতবর্ষ' এবং কবি গুণাকর ভারতের 'নারদমুনি' ও চমৎকার বলে স্বীকৃত হবে না কেন? (পূর্বোক্ত তৃতীয় নিয়ম স্মরণীয়) "মেরীর তনয় যদি দোষের না হয়, ঘোষের তনয় তবে দোষের ত নয়।"

কিন্তু নারদমুনির প্ররোচনায় অবশেষে আমাকে কম্‌রেড সুভাষের পেছনেই লাগতে হলো। পদাতিকের ২০ পৃষ্ঠায় একটি কবিতা আছে। যথা—

অগ্নিবর্ণ সংগ্রামের পথে প্রতীক্ষায়
এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর
গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাবো
সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
ততদিন আত্মরক্ষার প্রাচীর হোক্
প্রত্যেক শরীরের ভগ্নাংশ;
জীবনকে পেয়েছি আমরা, বিদ্যুৎ জীবনকে।
উজ্জ্বল রৌদ্রের দিন কাটুক যৌথ কর্ষণায়
আর ক্ষুরধার প্রত্যঙ্গ তরঙ্গ তুলুক কারখানায়।

ইত্যাদি

এটা কি? এটা কি ছন্দোবদ্ধ কবিতা, না স্বচ্ছন্দ-বিহারী গদ্য রচনা? এতে ছন্দের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমাকে হাল ছাড়তে হয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময় লেগেছে, এ-বিষয়ে বুদ্ধদেব নীরব কেন?

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং হিরণকুমার সান্যাল সম্পাদিত পরিচয় পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে (১১ দশ বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) প্রবোধচন্দ্র সেন *পদাতিক* প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছিলেন। আলোচনাটির ঈষৎ সংক্ষেপিত রূপ *পরিচয়* পত্রিকার ১৩৬৩ সালের জয়ন্তী সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়। জয়ন্তী সংখ্যা ১৩৬৩ থেকেই লেখাটি এখানে সঙ্কলিত হল।—সঃ

'চিরকূট'

সিদ্ধেশ্বর সেন

সুভাষ মুখোপাধ্যায় থেকে পাঠগ্রহণ একেবারে না করেছেন, সমসাময়িক এবং কনিষ্ঠ কবিদের মধ্যে এমন কেউ আছেন বলে আমি জানি না। রবীন্দ্রনাথের লিরিকমার্গ থেকে বাঙলা কবিতার স্বর্গচ্যুতি ঘটেছে বহুদিন। (এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে সে ছাড়পত্র পাওয়া তার মস্ত গর্ব।) ইতিমধ্যে বাঙলা কবিতার উপর দিয়ে মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, মড়ক, দেশব্যাপী ও আন্তর্জাতিক ঘনঘটার কালবৈশাখীর প্রলয়ান্তক হয়ে দেখা দিয়েছে। তাতে বাঙলা কবিতার নতুন ভূসংস্থান ও আবহাওয়া গড়ে ওঠা বিচিত্র নয় এবং স্বভাবগতিকে বাঙলা কবিতার মানসপ্রকরণ ফলে এখন ঢের বেশি জটিল, অন্তর্ক্ষুব্ধ এবং প্রশ্নবিদ্ধ। বাঙলা কবিতার আধুনিক মেজাজ স্বপ্রতিষ্ঠ ঐ কারণে। তৃতীয় দশকের শেষাশেষি এবং প্রাক-চতুর্থ দশকে এর রূপ ছিল অনেকটা এই রকম—পুরনো জগতে অবিশ্বাস এবং তা থেকে হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও আত্মসমর্পণ। নির্জনতার উপাসক কবি জীবনানন্দেরও সে সময় না লিখে উপায় ছিল না ঃ "কোন আমলকি নাই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে", বস্তুত ডেকাডেন্সের সব কটি শর্তই তখন যেন পূর্ণ হয়েছিল। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সময়োচিত "উঠপাখী"র প্রতীক কি বিষ্ণুদের স্বভাবজ দুরূহ উল্লেখ ও পৌরাণিক প্রতীক সমবায়ে "হায় কালের ধারায় নিয়মে হারায় পার্থ-সারথীর পরাক্রম" স্মর্তব্য। বিরূপ পরিমণ্ডলে অভিশাপ ও প্রচলিত মূল্যবোধে বিতৃষ্ণা এবং বিদ্রূপ তৎকালীন কবিতার একটি লক্ষণ। সুভাষবাবুও শ্লেষচর্চা করেছেন। তীব্র ও প্রখর দীপ্তিকেই বিদ্রূপের শরজালে লক্ষ্যভেদে এগিয়েছেন, কিন্তু নঙর্থে কখনো নয়, সেই মোহভঙ্গ ও ব্যাপক হতাশার কালে তিনি, হয়ত তিনিই প্রকৃত অর্থে, আর এক অঙ্কুরিত সত্যে, নতুন মূল্যমানে নিঃসংশয়ী ছিলেন, হয়ত বা সে ধূসর বর্ণ-অন্ধতার যুগে আর এক রক্তিম দেশ ঃ

> "যেখানে সমস্তদিন সবুজ সমুদ্রের পরে
> লাল সূর্যাস্ত
> আর বলিষ্ঠ মানুষ স্পন্দমান স্বপ্ন" (সমর সেন)

মাঝে মাঝে অপরূপ একটা সান্ত্বনার মত কোন কোন তরুণতর কবিকে ইশারা করে গিয়েছিল, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই বোধ হয় সেখানে প্রত্যয়ে তন্ময়তম ঃ

> "অগ্নিবর্ণ সংগ্রমের পথে প্রতীক্ষায়
> এক দ্বিতীয় বসন্ত। আর
> গলিতনখ পৃথিবীতে আমরা রেখে যাব
> সংক্রামক স্বাস্থ্যের উল্লাস।
> ততদিন আত্মরক্ষার প্রাচীর হোক
> প্রত্যেকটি শরীরের ভগ্নাংশ।" (পদাতিক)

এবং ''উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে নাকি, আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে?'' বলে যুগান্তর এনেছিলেন। ''পদাতিকে'র কবিতাগুলি তাই একদিকে বিকারগ্রস্ত অতীত মূল্যবোধকে বিদ্রূপে ধিক্কৃত করছে, অপরপক্ষে উদ্‌ভাসিত নতুন জীবনের অঙ্গীকরণে আশ্চর্য আবেগবাহী সার্থকতা লাভ করেছে।

আধুনিকতার চোরাবালি থেকে প্রগতিশীলতার দিগ্‌দর্শনে বাঙলা কবিতার এ সম্মুখগতি একান্ত কালানুক্রম ও সংগত। এই নতুন কবিতার সংজ্ঞায় বলে—আত্মচিত্রণে নয়, প্রশ্নের সততায়, চেতনার রূপান্তরের অপরিহার্য দাবিতে তার দাম। প্রচলিত অর্থে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে নয়, সমষ্টিস্বরূপের মধ্যে ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশ—সমাজ বিবেকের সঙ্গে সমীকরণে তার পূর্ণাঙ্গতা, ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মুক্তি-কামনার লক্ষ্য ছিল সমগ্রে। যে-জন্য তিনি কোনদিন চলিতভাষায় যাকে বলা চলে শুদ্ধ ''ব্যক্তিগত'' হয়ে ওঠেননি, তাঁর ব্যক্তিত্ব সর্বত্রই ''সমাজগত'' এবং কাব্যনিষ্ঠার যে আবেগে তিনি কর্মৈষণার ব্রত নিলেন, সেই আবেগে তিনি চাইলেন সেই বেড়া ভেঙে ফেলতে, কবিকে যা তার প্রাপ্য থেকে দূরে রাখে। শ্রমকর্মী মানুষের অন্তরঙ্গতায়, সহজ সম্বন্ধপাতে ফেলার আগ্রহে এবং দুরূহ চেষ্টায় তাঁর কাব্যের দ্বন্দ্ব প্রগতি, সাম্যবাদে বিকাশ।

'চিরকূটে'র কবিতায় আমি তাই সেই কবিকে খুঁজি, 'পদাতিকে'র পথ পরিক্রমায় যিনি 'অগ্নিকোণে'র দিগন্তে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন এবং তা পেয়েছি। 'পদাতিকে'র কবির বিশ্ববোধ 'চিরকূটে'র ইতস্তত কবিতার ধারা বেয়ে 'অগ্নিকোণে'র ব্যাপ্তিতে মুক্তি নিয়েছে। 'অগ্নিকোণ' কবির উপলব্ধিতে এক স্বভাবসংগত নতুন অধ্যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ কি আকস্মিক কদাচ নয়, সম্প্রতি কেউ কেউ যা বোঝাতে চেয়েছেন। 'অগ্নিকোণে'র সার্থকতাকে 'চিরকূট', এমন কি কবির সার্থকতম সৃষ্টি 'পদাতিকে'র প্রতিপক্ষে ব্যবহার করার এ মানসিকতা আমার কাছে একটু বাচাল মনে হয়। 'অগ্নিকোণ' সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিত্বের প্রত্যাশিত এবং সৃষ্টিশীল বিবর্তন।

চতুর্থ দশকের প্রথমদিকে কবি তাঁর সর্বপ্রথম 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন, এতদিন পর্যন্ত তাই তাঁর অদ্বিতীয় (দুই অর্থেই) হয়েই ছিল। কিন্তু প্রায় আবার এই দশকের শেষদিকে ১৯৪৮এ তিনি প্রকাশ করেন, এবার আর কবিতাগ্রন্থ নয়, কবিতা-পুস্তিকা 'অগ্নিকোণ'। এটা উল্লেখযোগ্য এইজন্যই যে আমার ত মনে হয় নামমাত্র মূল্যে এই কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশের ধরনের মধ্যেই তাঁর উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত, অধিকসংখ্যক জনগণের মধ্যে তা ছড়িয়ে দেওয়া। এদিক থেকে 'অগ্নিকোণে'র বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গে যেন আশ্চর্য মিল। এর স্বল্পকাল পরেই কবি কারারুদ্ধ হন। তাঁর অনুপস্থিতিতে 'পদাতিক' এবং 'অগ্নিকোণে'র মধ্যবর্তীকালে লিখিত কবিতা এবং 'অগ্নিকোণ' কবির অজস্র অনুরাগী ও উৎসুক পাঠকদের সৌভাগ্যক্রমে সংকলিত হয় 'চিরকূট'-এ। চিরকূটের কবিতাগুলিতে সময়ের ব্যবধান তাই অনেক, এতে ১৯৪০র কবিতা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি সাম্প্রতিকতম ১৯৪৮রও রয়েছে। সে হিসেবে প্রত্যেকটি কবিতার নিচে যথাসম্ভব তারিখ চিহ্নিত করে প্রকাশক পাঠকদের যথেষ্ট উপকার করেছেন।

চিরকূটের প্রথমাংশের কয়েকটি কবিতা সময়ের দিক থেকে 'পদাতিকে'র সমকালীন। ফলে কি আঙ্গিকে, কি বক্তব্যে সেগুলিতে পদাতিকের মেজাজ সুস্পষ্ট। যেমন, ''কাব্য-জিজ্ঞাসা''য় সেই যুগের কবিদের স্ববিরোধিতা যেন দর্পণে প্রতিভাস ঃ

নিজেই নিজের ছায়ার পাশে
চমকালে মিছে, নিজেকে চিনে
নামাও বল্‌গা পিপাসু ঘাসে,

কেননা,

রুক্ষ মাটিতে, মেঘলা দিনে,
শুধুই ধুম্র ইচ্ছাধীনে
কতকাল মেঘ আকাশে ভাসে?

অবস্থাটা এতই উপভোগ্য যে তাতে মিলগুলো পর্যন্ত মনে হয় যেন witty. অবশ্য সান্ত্বনাচ্ছলে সঙ্গে সঙ্গে কবি জনিয়ে দিচ্ছেন ঃ

হে দিগভ্রান্ত, আমি ত বুঝি
তোমার জটিল হারানো পথে
বাতি যে ধরব সেটুকু পুঁজি
আলেয়ার নেই।

সুতরাং, এস বরং ''ঠিকানা বদলে প্রণয় খুঁজি'', কবিতাটি বড়। এর শেষ দিকে যখন এসে পড়ি, তখন ঃ

ভাঙল চিবুক-ঠেকানো হাতের নিদ্রা—
বাগানে শুকনো কংকালসার বৃক্ষ,
খিড়কির পথে পালাবে কি কলাবিৎরা

ব্যাঙ্গোক্তি ক্রমেই এমন ঘন হয়ে আসে যে এবং আরও পরে যখন ঃ

বাতাস পিঠে চাবুক হানে আকাশ আনে বজ্র
শান্তি কবে ফুঁকেছে শিঙে—বেজায় ঢিমে কানত।

তখন কবিতার এই চাপাহাসিতে চমৎকৃত হতে হয়। মনে পড়ে 'ডবল-ডেকারে ফাল্গুনী কবিদের' দুরবস্থা, আর 'চোখ বুজে কোন কোকিলের দিকে কান' ফেরানোর লঘুগুরু 'প্রস্তাব'। (প্রসঙ্গত, না বলে পারছি না যে এই অত্যাশ্চর্য কবিতাটির এক কদর্থ আলোচনা সম্প্রতি আমাকে পড়তে হয়েছে। কবিতাটির প্রসঙ্গ এবং পটবিচার না করে, কবিতাটির সমস্ত বক্তব্য জুড়ে তীব্র Satire-এর প্রচ্ছন্ন toneকে সামান্যমাত্র বোঝাবার চেষ্টা না করে, ব্যক্তি-চেতনা এবং যৌথ-আবেগ নিয়ে এই দারুণ কাব্যরসিকটি যে থিয়োরী ফেঁদেছেন, তাতে মনে হয় যে সময়ের দিকে (১৯৪০) নজর দিলে তিনি হয়ত আর একটু মাত্রাজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারতেন এবং 'শ্যামবাজার থেকে এসপ্লানেডে'র শড়কের অতীব স্থূল এবং নিকৃষ্ট বাহাদুরি দেখাতে, অন্তত সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রসঙ্গে রুচিতে বাধত)।

কিন্তু বিদ্রূপ যে আবার কত ভয়ংকর হতে পারে, এক টুকরো বজ্রগর্ভ মেঘের মত,

শ্লেষাত্মক মাত্র চার লাইনের মধ্যে কী দুঃসহ জ্বালা, ক্ষোভ এবং ক্রোধের ভ্রূকুটি লুকিয়ে রাখতে পারে 'চিরকূট' না পড়লে তা ধারণা করাও দুঃসাধ্য ঃ

পেট জ্বলছে, খেত জ্বলছে
কে খাজনা শুধবে?
হুজুর, এবার না বাঁচালে
আগুন জ্বলে উঠবে। (চিরকূট)

সন্দেহ নেই এ কবিতা স্বল্পতম কথায় কবির অসামান্য শক্তির পরিচয়। অবশ্য সুভাষবাবু বরাবরই একটু মিতভাষী, না হলে 'পদাতিকে', 'অতঃপরে'র মত সংক্ষিপ্ত কবিতায় ("বণিকের মৌলিক প্রতিভা দেশী শিল্পে মুক্তি পাবে") তিনি ইতিহাসের পালা-বদলের প্রায় উপন্যাসের মত অতখানি ব্যাপ্ত বিষয়-বস্তুকে কবিতার ঠাস বুনোনে ধরান কি করে?

'চিরকূট' 'পদাতিকে'র মত স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, কিংবা শেষভাগে যুক্ত 'অগ্নিকোণে'র ঘনসংহতি ছাড়া, অল্পবিস্তর দুর্বল। এর কারণ এই যে তার বিভিন্ন কবিতাগুলির মধ্যে সময়ের বিস্তৃতি অনেকখানি। তাই 'চিরকূটে'র মধ্যে যা পাওয়া সম্ভব তা কবির বিকাশের কয়েকটি স্তর।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'পদাতিকে'র উপসংহার করেন এই বলে ঃ

তাই এই কৃষ্ণপক্ষে উপবাসী প্রার্থনা জানাই।
আমাকে সৈনিক কর তোমাদের কুরুক্ষেত্র ভাই।।

এর মধ্যে তিনি বোধ হয় কোন দ্ব্যর্থের অবকাশ রাখেননি এবং এই 'কুরুক্ষেত্রে'র উল্লেখ তাঁর কবিতায় ঘুরেফিরেই এসেছে। ১৯৪৩-এর জুনে স্টালিনগ্রাডের প্রতিরোধে লিখেছেন ঃ

এমন কুরুক্ষেত্র ইতিহাস দেখেনি কখনও
বসন্ত-গলিতপত্র;
বাতাস বারুদ-গন্ধ, অন্ধকার বিদ্যুত-খচিত।

(স্টালিনগ্রাড)

আবার ঘূর্ণাবর্তে স্বদেশের বুকে দাঁড়িয়ে লেখেন ঃ

বিড়ম্বিত জীবনে আবার
কুরুক্ষেত্র করাঘাত করে।
পালাবার নেই কোন খিড়কির দুয়ার। (ঘোষণা)

স্পষ্টতই বুঝতে পারা যায় এ 'কুরুক্ষেত্র' কবির কাছে দ্বন্দ্বময় জীবনের প্রতীক এবং সেখানে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের কথাই বলেছেন। লেনিন হয়ত একেই সাহিত্যে Partisan Spirit আনার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা বলেন। সাহিত্যের পক্ষপাতিত্বের প্রশ্নে যথেষ্ট জোর দিয়েই লেনিন দেখিয়ে দেন ঃ "নির্বিত্ত শ্রেণীর যে সামগ্রিক স্বার্থ তারই **অংশবিশেষ** হোক সাহিত্য।" কেননা "সমাজে বাস করা, আবার তা থেকে মুক্ত থাকা অসম্ভব।" এর পরেই আছে বুর্জোয়া শিল্পীর 'স্বাধীনতা' সম্পর্কে লেনিনের সেই বিখ্যাত উক্তি। অন্যত্র, ক্লারা জেট্‌কিনের সঙ্গে আলোচনায়, বুর্জোয়া ডেকাডেন্ট গোষ্ঠীগুলির ভূয়ো-নবত্বমূলক বিভিন্ন সাহিত্যিক 'ইজম'কে

কমিউনিস্ট শিল্পের চরম বলে চালাবার কায়দা সম্পর্কে সতর্ক করে বলেছিলেন ঃ "যা কিছু নতুন তাকেই দেবতা বলে পুজো করতে হবে এমন কি কথা আছে? ...'জিনিষটা নতুন'—শুধু এইজন্যেই কি? বাজে, একেবারে বাজে। এর অনেকটাই ভণ্ডামি...।" অবশ্য লেনিনের প্রথম উক্তিকে বিকৃত করে যে কতদূর অনাচার করা যেতে পারে তার নিদর্শন ত বাঙলা দেশেই গত দু বছরের কবিতায় ভুরিভুরি মিলবে। "সাহিত্য ও শিল্পের সমস্যা"য় মাও সে-তুঙ এরই নামকরণ করেন 'পোস্টার ও স্লোগান স্টাইল' বলে। এবং সে সম্পর্কে তীব্র নিন্দা করে লেখেন যে, আমরা কেবলমাত্র সেই সমস্ত শিল্প-কাজকেই নিন্দা করি না, যার বিষয়বস্তু ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের, পরন্তু সেই সবেরও যা আঙ্গিককে সম্পূর্ণ জলাঞ্জলি দিয়ে বিষয়বস্তুর উপর জোর দেয়।" তারপর সার্থক শিল্পসৃষ্টির ব্যাখ্যা করে লেখেন ঃ "শিল্প ও রাজনীতির ঐক্যই আমরা দাবি করি। আমরা দাবি করি বিষয় ও আঙ্গিকের পূর্ণসংগতি, 'The perfect blending of revolutionary political content with the highest possible level of artistic'. 'অগ্নিকোণে'র কটি কবিতা এই নিরিখে শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। আবার এই সঙ্গে বলতে চাই যে বাঙলা কবিতার সাম্প্রতিক অবস্থায় কোন না কোন দিক থেকে লেনিনের দ্বিতীয় উক্তিটিও (জেট্‌কিন-প্রসঙ্গে) খুব বেশি মনে রাখার সময় সম্প্রতি আসেনি কি? অতি-রাজনীতিক অসাহিত্য যেমন, দেখা গেছে, মার্কসবাদী শিল্পদৃষ্টিতে বিকার, তেমনি অতিসাহিত্যিক (শিল্পেই শিল্প অর্থে) কুসাহিত্য, ওই দৃষ্টিতে, সমান বিকার এবং ক্ষতিকর বিকার নয় কি? বিশেষ যদি তা আবার লেনিন কথিত ডেকাডেন্ট ধারার হেরফেরে নবকলেবর নিয়ে আসে, মনে হয়?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার একদা বিশেষ রসগ্রাহী বুদ্ধদেববাবু তাঁর বাঙলা সাহিত্যের ইংরেজি সমালোচনাগ্রন্থে Poet-pamhleteer এই ইঙ্গিতার্থে লিখেছেন, "Subhas wears his roles well, in fact they now seem to have grown into his skin। বুদ্ধদেববাবু অবশ্যই সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনবোধের প্রতীতি থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত বিন্দুতে অবস্থান করেন। কিন্তু আমাদের মধ্যেও হয়ত বা কারও কারও কাছে দেখি 'জনযুদ্ধের গান', 'ময়দানে চল', 'জবাব চাই', 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার' প্রভৃতি কবিতা শস্তা 'ছন্দোবদ্ধ' সাংবাদিকতা' বলে মনে হয়। সত্যিই এ কবিতাগুলিকে সুভাষবাবুর কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে গ্রহণ করার কোন বাধ্যবাধকতা ওঠে না। সুভাষবাবুও নিশ্চয়ই তা মনে করে এগুলি রচনায় হাত দেননি। কিন্তু তা বলেই কি ওই কবিতাগুলিকে অস্বীকার করা যাবে? না 'ছন্দোবদ্ধ সাংবাদিকতা' বলে খানিকটা অবজ্ঞা দেখানো সম্ভব? আমি ত মনে করি, নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর বেপরোয়া গুলিবর্ষণের বর্বরতার অন্ধকারতম মুহূর্তে যদি কোন বিবেকবান কবি 'রক্তের ধার রক্তে শুধবো' বলে প্রতিবাদে জ্বালাময়ী হয়ে উঠতে পারেন ঃ

"শিকলে বেঁধেছ, হাত দিলে শেষে মুখের গ্রাসে
শয়তান, চাও ভাঙতে কলিজা গুলিতে গ্যাসে?
পার পাবে নাকো দেওয়ালে ঘোষণা ঃ শেষ লড়াই
বারুদে লাগালে আগুন যখন ঃ পুড়ে হও ছাই।" (জবাব চাই)

কি 'দীক্ষিতের গানে' গলা মেলান ঃ

"বিপদ-তাড়ানো আওয়াজে আজকে হাঁকো হৈ হৈ
ফাঁসিতে দিয়েছি জীবন মরতে পিছপাও নই
গৃহকলহকে দূরে ঠেলে এস একজোট হই।"

তখন এই সমস্ত লাইনের তপ্ত তাজা আবেগ এবং দৃপ্ত পৌরুষ কোন্ রসতত্ত্বের মাপকাঠিতে নাকচ করা চলবে? যখন বেশ কানে পৌঁছয় এমন চড়াস্বরেই কবি ঘোষণা করেন ঃ

"লাখো লাখো হাত এক হলে বল পরোয়া কাকে
আমাদের দাবি কে রোখে, কে রোখে লাল ঝাণ্ডাকে?"

কিংবা ক্ষুব্ধ ভর্ৎসনা করে ওঠেন, "ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লাল ঝাণ্ডা ওঠাই", তখন কোন্ সৌন্দর্যবোধে তাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব? আমার মনে হয় ও কবিতগুলিকে তাদের যথার্থ মূল্যে গ্রহণ করায় কোন বাধা থাকাই সংগত নয়।

মাত্র তুলির দু'একটি টানের মত কয়েকটি সংযত লাইনে আশ্চর্য জীবন্ত চিত্রকল্প ফোটাবার অদ্ভুত দক্ষতা সুভাষবাবু 'চিরকুটে'র কবিতায় দেখিয়েছেন, যেমন, দুর্ভিক্ষের বাঙলার ঃ

সঙ্গীচ্যুত পড়ে থাকে
জীবন স্পন্দনশূন্য নিশ্চল শরীর।
চোখে তীব্র অভিযোগ,
ভিক্ষাপাত্রে দুটি হাত স্থির;
ঠোঁটে তার বিস্ফারিত ক্ষুধিত আত্মার
কঠিন দস্তুর অভিশাপ। (স্বাগত)

এ এক মর্মস্পর্শী স্থিরচিত্র যেন, যেন আমাদের সমস্ত অস্তিত্বকে আজও ধিক্কৃত করছে। যখন, 'দিশাহীন জীবনের গোলক ধাঁধায়, গ্রাম ছুটে চলেছে শহরে' তখন 'বর্ষশেষে' আঁকেন ঃ

ভিটা শূন্য পড়ে
আকাশের কণ্ঠরোধ করে পদধ্বনি
ক্রূর অট্টহাসি খেলে
সওদাগরী ডিঙায় ডিঙায়।
রাখাল এখন দূর শহরের কুলি।...
তরঙ্গে তরঙ্গে বেগ
বজ্র দাঁতে কাটে মেঘ
অরণ্য বাড়ায় বাহু শিলাবৃষ্টি ঝড়ে
কঠিন মাটিতে ক্রুদ্ধ পদশব্দ
বেত্রাহত অন্ধকার শিহরায় ভয়ে—(বর্ষশেষ)

আমার মনে হয়, ঐ সময়ে কবির এটি একটি শক্তিশালী রচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সর্বগ্রাসী হিংস্রতায় প্রাগৈতিহাসিক নৃশংসতা মাথা তোলে ঃ

আকাশে সমুদ্রে স্থলপথে
থর থর শোভাযাত্রা উলঙ্গ মৃত্যুরে
অরণ্য-পর্বত শোনে রণচণ্ডী সাঁজোয়ার নহবতে আজ
আদিম গুহার সুর। (প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার)

সে প্রচণ্ডতার ভারে শ্বাসরোধ হয়ে আসে ঃ

আর্তনাদ করে নিচে অগণিত প্রজাপুঞ্জ
লুণ্ঠিত খামার বন্ধ বাক্যালাপ
ভুলুণ্ঠিত গাছের গোলাপ।
(প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার)

মহাচীনে প্রতিরোধ জেগে ওঠে 'অতর্কিতে গেরিলার উচ্চকণ্ঠে 'গানে' ঃ

'ফসলের সূচীমুখে দৃপ্ত বাধা, প্রতিবন্ধ চিমনির হাঁ-মুখ।
অরণ্যের ডালে ডালে বর্ধিত চাবুক।' (চীন)

আবার মৃত্যু মন্বন্তরের পর নবজীবনের আভাষও তেমনি জীবন্ত ঃ

পথে পথে পদশব্দ ওঠে
আকাশে নক্ষত্র ফোটে;
নদী করে সম্ভাষণ, পাখী করে গান
মাঠের সম্রাট দেখে মুগ্ধনেত্রে
ধান আর ধান।। (স্বাগত)

এবং সে গৌরবের দিনে কবি কিন্তু মাঠের অধীশ্বরকে স্বাগত জানাতে ভোলেন না। বাঙলা দেশের কৃষককে 'মাঠের সম্রাট' বলে এমন দরদী কণ্ঠে আর কোন আধুনিক বাঙালী কবি এর আগে সম্মান দেখাতে পেরেছেন?

কিন্তু ৫০-এর বাঙলার যে জ্বালা, তিল তিল করে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে, ভূখ-মিছিলের মধ্য দিয়ে পথে পথে স্তূপাকার মৃতদেহের পাহাড় ঠেলে যে কালান্তর এল, সমাজজীবনে এবং জীবনবোধে যে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা সেদিন দেখা দিল, এইসব কবিতায় তার সমগ্রতা ধরা পড়ে না। অনেক ক্ষমতাবান কবিকেই সেদিনের আকস্মিকতার সামনে দাঁড়াতে দেখেছি—নির্বাক স্বীকৃতিতে। সে যন্ত্রণা ভাষা দিতে পারল শুধু সেদিনের তরুণতম কবির আর্তি ঃ

হে মহামানব একবার এস ফিরে
শুধু একবার চোখ মেল এই গ্রাম নগরের ভিড়ে।
(বোধন)

১৩৫০-এর যে ব্যাহত জীবনযাত্রা চুপি চুপি কান্না বুকে নিয়ে আমাদের অসাড় জীবন-মন-চেতনার উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল, মড়ক ও ধ্বংসের আগুনের মধ্য দিয়ে ঝলসিয়ে মূল্যবোধের আমূল পরিবর্তন আনছিল, কবিদের উপলব্ধিতে তা থাকলেও তার সার্থক প্রকাশ ঘটল সেই একজনে। বিশেষ বিশেষ সময়ে সকলের হয়ে কথা কয়ে ওঠে যে,

সে কাব্য শ্রেষ্ঠ। অগ্রজের সমস্ত বেদনা এবং আবেগ নিয়ে 'চিরকুটে' সুকান্তের উদ্দেশে লেখা একটি কবিতায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাই লেখেন ঃ

যৌবনের পদপ্রান্তে যে কৈশোরের ছিন্নশির উপহার দেয়
বসন্তকে পুড়িয়ে মারে দাউ দাউ দাবাগ্নির শিখায়...
একটি কিশোরের আশ্চর্য কণ্ঠের কাকলি স্তব্ধ করে দিয়ে
মাটির বুকে টেনে আনে এক ঝলক রক্ত
তারপর সমস্ত শরীর জুড়ে শাদা কাপড় বিছিয়ে
মৃত্যুর গুণকীর্তন করে—
সুকান্ত, তোমার সেই আততায়ীকে
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিয়ে
তোমাকে বাঁচাব।

আর উৎসর্গীকৃত এই কবিতাটির নাম দেন ''উজ্জীবন''। (বিষ্ণুবাবুও 'কনিষ্ঠ-কীর্তিমান' সুকান্তের সম্পর্কে বলতে গিয়ে 'বিস্ময়কর' ছাড়া কথা খুঁজে পাননি।) সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন একাত্ম হবার অনুভূতিকেই বোধ হয় মাও বলেছেন ঃ transformation of sentiments, a changing over from one social clasgs to another''. সুকান্তের এই সব কবিতায় যৌথ আবেগের যে অদম্য প্রকাশ তা কোন্ মানুষকে না কর্মে ও জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করবে?

এই প্রসঙ্গে মুডের কথা আসে। নিশ্চয়ই এক এক যুগে এক এক মুড প্রধান হয়ে দেখা দেয়। যেমন প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়ে ফেললে সূর্যের আলো স্বচ্ছ সাতটি রঙের সমারোহে ভেঙে যায়, তেমনি সেই যুগের বিশেষ 'মুড' জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যকেই সে আঁধারে ধরে রেখে আবার বর্ণে-গন্ধে ছড়িয়ে দেয়। যেমন ডেকাডেন্সের 'মুড' স্বভাবতই আজকের মূল্যবোধে প্রতিক্রিয়াশীল। আজকের দিনের 'মুড'কে তেমনি শুধুমাত্র মিছিলের মুড বলে স্বকল্পিত মার্কা দিয়ে আবার তা নিয়ে পরিহাস করার অভ্যাসটাও মনে করি বেশ কিছু অসুস্থ। যদি মিছিল বলতে হয় সংঘবদ্ধ জীবনের সংগ্রামের প্রতীক, ত তার মধ্যে নিশ্চয়ই ভালবাসা, আবেগ, ঘৃণা এবং প্রতিরোধে মেশা জীবনের সামগ্রিক প্রকাশ থাকবে। যদি মিছিল কথাটির সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে মুক্তি কামনার, সংগ্রামের 'মুড' বলা যায় তাহলে, তাহলে জীবনের সমস্ত মূল্যের নব-রূপায়ণ কি তার মধ্য দিয়ে সম্ভব নয়? সম্ভব নয় কি মহৎ সৃষ্টি? এই মুডই কি বাঙালী কবিকে ১৯৪৮ সালের আবর্তে দাঁড়িয়ে 'মিছিলের মুখ'-এর মত শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখতে প্রেরণা দেয় না? ফ্রান্সের পতন এবং ফরাসী প্রতিরোধের মুড কি ফরাসী কাব্যের উজ্জীবন নয় আরাগঁকে কি তাঁর সর্বোত্তম সৃষ্টিতে জাগায় না? জিদ্‌কেও যা গভীরভাবে নাড়া দিলে, মনে পড়ে তিনি লিখেছিলেন ঃ ''in our own field there is, on the one side, reflective poetry (I am using the word in this two senses of contemplative and reflected as in a mihrror) and, on the other side, direct poetry...for all the splendours of cerebral

poetry in France, it is from the other tendency, from direct poetry, that I am now expecting our renaissance, from the mood that inspired Aragon to write the poems in Heart-break..." এলসার বিরহ এবং মিলনে পুনরুজ্জীবন সারা দেশের বুকে উপকথার অমরত্বে বেঁচে যায় ঃ "Paris, Paris of herself liberated" বলতে গিয়ে যে আবেগে আরাগঁর গলা ভারী হয়ে আসে, তা কি সারা ফ্রান্সের মানুষেরই নয়?

কবিতার একটা বড় সমস্যাই হল Communication-এর। প্রত্যেক বিশেষ যুগের বিশিষ্ট 'মুড'টি এই জটিলতাকে অনেকখানি সাবলীল করে দেয়। কেননা তার মধ্য দিয়ে কবি আর তাঁর শ্রোতারা এমন এক আবেগ-উন্নত স্তরে এসে পড়েন, যেখানে তাঁরা অনেক বেশি কাছাকাছি, অন্তরঙ্গ আর ঘরোয়া। মহৎ কবিতা বোধ হয় এই অবস্থায় সিদ্ধ হয়। কবির পারদর্শিতা তখন সেই 'মুড'কে তুলে ধরায়, তাঁর জীবনের অনুভবের রঙে সাজিয়ে তোলায়, ছড়িয়ে দেওয়ায়।

'অগ্নিকোণে' এসে, আমার ত মনে হয়েছে, সুভাষবাবু তেমনি একটি প্রকাশকে ধরতে চেয়েছেন। তাই মাত্র কয়েকটি কবিতা লিখতে না লিখতেই এসে গেছে অসাধারণ সাফল্য। 'অগ্নিকোণে'র আইডিয়া 'চিরকূটে'র ইতস্তত কবিতার মাঝে মাঝে যেন উঁকি দিয়ে গেছে। 'চিরকূটে'র দুটি কবিতার আমি বিশেষ করে উল্লেখ করব। তার মধ্যে একটি ত অনবদ্য, মনে হয় এরই কবি পরবর্তীকালে 'মিছিলের মুখ'-এর রচয়িতা হতে পারেন। এটি হল '৪৪ সালে লেখায় মাত্র চারটি stanza 'সীমান্তের চিঠি' ঃ

তোমাকে ভুলিনি আমি
তুমি যেন ভুলোনা আমায়।
তোমার সহস্র চোখ
চেয়ে আছে তারায়।
পর্বত দাঁড়ায় পাশে
অগ্নিবর্ণ বনের সবুজ
—এখানে প্রস্তুতি আমি
প্রতিশ্রুত আমার পৌরুষ। (সীমান্তের চিঠি)

পড়তে পড়তে সিমোনভের কবিতা মনে পড়ে। এক আশ্চর্য Lyricism ছড়িয়ে রয়েছে এই পৌরুষদৃপ্ত বলিষ্ঠ কবিতাটিতে। Revolutionary romanticism-এর এই অস্পষ্ট সৌরভ পরবর্তী 'মিছিলের মুখে' যেন অদ্ভুত সঙ্গতি লাভ করেছে। সুভাষবাবুর কাব্যের দু'টি গুণ হচ্ছে বোধ হয় এই যে, পৌরুষের প্রদীপ্ত ভঙ্গিমা, সহজ সুস্থ ঋজুতা, আর জলন্ত দেশপ্রেম ঃ

এদেশ আমার গর্ব,
এ মাটি আমার কাছে সোনা।
আমি করি তারি জন্ম বৃত্তান্ত ঘোষণা।। (ঘোষণা)

স্বদেশভূমির ভূপ্রকৃতিতে প্রাণবন্ত সত্তার আরোপে ঃ

এখানে আমার পাশে—
হিমাচল,
কন্যা কুমারিকা।
অলঙ্ঘ্য প্রাচীর ঐক্য
প্রতিজ্ঞা পরিখা। (ঘোষণা)

দেশপ্রেম সর্বকালেই মহৎ কাব্যের উৎস, কবির উপলব্ধ চেতনাকে তা আবেগের স্থির ভূমির উপর দাঁড় করিয়ে দেয়। এই বোধই তাঁকে পরে 'অগ্নিকোণে'র উত্তাল পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশকে দেখায়, মহান করে দেখায়। 'চিরকূটে'র আর একটি কবিতায় এমন একটি ইমেজের খোঁজ পাই যার তুলনা মেলে না, এই যুগের ভাঙন আর বিক্ষোভের অত ভাল রূপকল্প দু'লাইনে দেখিনি ঃ

মাঠে-মাঠে ধরেছে ফাটল
আপন দর্পণে মুখ দেখে রসাতল। (বর্ষশেষ)

'একটি কবিতার জন্য' পড়তে গিয়ে যে, 'রক্তের লাল দর্পণে মুখ দেখে ভস্মলোচন'-এর দেখা পাই, তাকে কি আমরা আগেই তাহলে উঁকি দিয়ে যেতে দেখিনি?

'অগ্নিকোণে'র কবিতাগুলি লেখা হয়েছে এমন এক সময়ে যখন আমাদের এই প্রাচীন মহাদেশ এশিয়ার, ইতিহাস তার মোড় নিচ্ছে। যুদ্ধোত্তর গণ-অভ্যুত্থানের অসংযত ঢেউ ভেঙে পড়ছে প্রশান্ত সমুদ্রের উপকূলে উপকূলে। এই কবিতাগুলির spirit যেন তার উৎসর্গপত্রে উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে ঃ "সিঙ্গাপুরে যে তিনজন শহীদ বৃটিশের ফাঁসিকাঠে আন্তর্জাতিক গাইতে গাইতে প্রাণ দিয়েছেন," অগ্নিকোণের জগৎ তাই বিক্ষুব্ধ, প্রতিহিংসাপরায়ণ, নির্মম আবার প্রশান্তির, ভালবাসার, সৌন্দর্যের ও গানেরও।

'অগ্নিকোণে'র এই সংগ্রাম-ক্ষুব্ধ, আলোড়িত জগতের ছবি ফোটাতে গিয়ে কবি যে আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন তিনমাত্রামূলক বিলম্বিত ছন্দে ঃ

'অগ্নিকোণের তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে তোলপাড় কালাপানি'

তা তাঁর ভঙ্গিতে দিয়েছে এক গতির সুর। সেই সংগ্রামের উদ্দামতা, ভয়াবহতা এবং ক্রুদ্ধ সৌন্দর্যের প্রতিকল্প ফোটাতে তিনি এমন সব ইমেজ সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি মনে হয় ধরা-ছোঁয়া যায় পর্যন্ত, এমনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঃ

বনে জঙ্গলে ঝটপট করে প্রতিহিংসার পাখা,
কাঁধের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে
ধনুকের মত বাঁকা পিঠগুলো
টান করে ঘুরে দাঁড়ায়,...
রক্তের পাঁকে শত্রুকে পুঁতে
অন্ধকারের বুকে হাঁটু দিয়ে দুহাতে উপড়ে আনে...
মৃত্যুর ঝড় ঠেলে

অন্ধকারে গলা টিপে ধরে
রক্তের নদী উজিয়ে এগোয়
সূর্যকে ছিঁড়ে আনে,
কোটি কণ্ঠের হুঙ্কারে লাগে
বজ্রেরও কানে তালা। (অগ্নিকোণ)

তারপর নবজীবনের প্রতীক ঃ 'পোড়া মাঠে মাঠে বসন্ত ওঠে জেগে'। কেবলমাত্র 'অগ্নিকোণ' কবিতাটি থেকে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। অন্য কবিতাগুলি থেকে তুলবার লোভ স্থানাভাবে সংবরণ করতে হয়। তবুও আরেকটি দিকের কথা তুলছি, 'মিছিলের মুখ' কবিতায়, যেখানে পাই ঃ

ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল ভিড়
আর মাটির দিকে নামানো হাতের অরণ্যে
পায়ে পায়ে হারিয়ে গেলো
মিছিলের সেই মুখ।

সেখানে হাজার হাজার মানুষের 'হাতের অরণ্যে'র যে অদ্ভুত ইমেজ তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা ছাড়াও আর একটি প্রতীক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমার মনে হয়, কেননা, 'মিছিলের মুখে' এক জায়গায় রয়েছে, 'কিন্তু হাত তাদের নামানো মাটির দিকে' ঃ তা দেখে একথাই মনে আসে যে কবি 'আকাশের দিকে নিক্ষিপ্ত মুষ্টিবদ্ধ একটি শানিত হাতে' এবং 'মাটির দিকে নামানো হাত'-এর মধ্যে কোন ইতিতার্থ নিশ্চয়ই আনছেন, এবং তা বোধ হয় এই যে তুলে ধরা মুষ্টিবদ্ধ হাত ঊর্ধ্বমুখ বিদ্রোহের এবং অপর নামানো হাতটি গতানুগতিক নতমুখী জীবনের প্রতীক। জীবনের দুটি সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী contrastএর এ ধরনের ব্যবহার আঙ্গিকের দিক থেকে অত্যন্ত কুশলী এবং আশ্চর্য সার্থক সন্দেহ নেই। সত্যিকার কবিতা মাত্রই যাকে বলা চলে thinking in images এবং ইমেজের সার্থকতা হল আবার তার পুনঃসৃষ্টিতে—জীবনের বাস্তবতা থেকে তা বেছে নেওয়ায় এবং তার জীবন্ত প্রয়োগে। এ কথা খুব বেশি মনে রাখা এই জন্যই প্রয়োজনীয় যে অনেকে এ পথে না গিয়ে যত্রতত্র থেকে ইমেজ সংগ্রহ করে কাব্য-শরীরের এখানে সেখানে জুড়ে দেওয়াতেই পরম তৃপ্তি লাভ করেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা প্রমাণ করে যে সদ্যলব্ধ জীবনের আবেগতপ্ত ইমেজ সৃষ্টিতে কবিতার কতখানি ঐশ্বর্য।

"অগ্নিকোণ" বইয়ে 'একটি কবিতার জন্য' ও 'মিছিলের মুখ' সর্বোৎকৃষ্ট। 'একটি কবিতার জন্য' কবিতায় যে সংহত আবেগ, কঠিন গম্ভীর বিন্যাস এবং মহান্ পরিণতি ঃ

আকাশে বাতাসে মুখরিত গানে
গর্জনে তার,
নখদর্পণে আঁকা
নতুন পৃথিবী, অজস্র সুখ, সীমাহীন ভালবাসা
(একটি কবিতার জন্য)

তা আমাদের যেন সমস্ত আকাঙ্ক্ষার স্বপ্নের মুক্তি, অবাধ প্রসার। তাৎপর্যে এবং প্রেরণায় সার্থক নামা। কিন্তু 'মিছিলের মুখ' আমার কাছে আরও মহনীয়। এর প্রতীক আরও হৃদয়স্পর্শী। এর প্রার্থনা ঃ

ডাক দিই
যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়
আর সমস্ত পৃথিবীর শৃংখলমুক্ত ভালবাসা
দুটি হৃদয়ের সেতুপথে
পারাবার করতে পারে।

আমার চেতনায় নতুন মূল্যবোধকে জীবন্ত করে তোলে। এখানে প্রেমের নতুন সংজ্ঞা অপূর্ব শিল্পরূপ পায়। ব্যক্তিপ্রেমের অনুভূতি কালের পরিবর্তনে নতুন করে উচ্চারিত হয়। এই প্রেমের উপলব্ধি এখন আর হৃদয়তন্ত্রী ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার নয় তখন তা 'নিষ্কাষিত তরবারির মত জেগে উঠে আমাকে জাগায়।' এখন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্রে আলোক-স্তম্ভর মত তা জ্বলে ওঠে। মহত্তর জীবনের অঙ্গীকারে এই প্রেম পূর্ণতা পায়। প্রেয়সীর চোখের দিকে তাকিয়ে কোন এক মুহূর্তে দূর বিদেশের মহৎ কবি যদি বলে উঠতে পারেন ঃ

So deep your eyes that as I lean to drink
Their pools the light of all the suns reflect.

তবে আমাদের দেশের কোন সংগ্রামী কবিও বা তাঁর মুক্তি কামনার সঙ্গে এ অনুভূতির সমীকরণে কেন না লিখবেন ঃ

আমাকে উজ্জীবিত করে সমুদ্রের একটি স্বপ্ন
মিছিলের একটি মুখ।

'মিছিলের মুখ' এই দিক থেকে আমার মনে হয় আমাদের সংগ্রামশীল জীবনে প্রেমের নতুন মূল্য জ্ঞানের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। বাঙলা প্রগতিশীল কাব্যে যদি প্রেমের কবিতা নতুন করে লিখতে হয় ত নিশ্চয়ই এই মূল্যজ্ঞানে। জীবনের সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে অনুভূতিতে তাই কিছুটা অন্যমনা ঃ

আজ দুবেলা পথে ঘুরি
ভিড় দেখলে দাঁড়াই
যদি কোথাও খুঁজে পাই মিছিলের সেই মুখ।

কথায় কেমন একটা বিষণ্ণ গম্ভীর আমেজ লাগে। 'মিছিলের মুখ'-এর এই সুরটি সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখার এক নতুন স্বাদ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা পাঠ এবং আলোচনা করতে গিয়ে, তাঁর বিকাশ এবং ক্রমপরিণতির সূত্র ধরে চলতে গিয়ে মোটামুটি কবির ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় উঠে আসছে তাকে আমি বলব কবি-স্বভাব। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি-স্বভাব হল জনতার জীবনের কাছাকাছি গিয়ে তার জীবন সত্যকে তুলে ধরার চেষ্টায়, হতাশা থেকে বিশ্বাসে টেনে তোলায়। কথাটা বোধহয় এইভাবে পরিষ্কার করতে পারি, সুভাষবাবু যখন অগ্নিকোণ প্রকাশ করেন, তখন পারিপার্শ্বের অবস্থাটা ছিল এই; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গণমুক্তি

আন্দোলন সমস্ত বাঁধ ভেঙে দুর্বার হয়ে উঠেছে, স্বদেশেও গণ-আন্দোলনে জোয়ার বইছে, কিন্তু ঠিক ঠিক ভাবে দেখতে গেলে আমাদের দেশে সে এক দারুণ বিপর্যয় ও ছত্রভঙ্গ অবস্থা, দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে, জনগণের জীবনে সেদিন যে দুর্দৈবের বান ডেকেছিল আর একজন শক্তিশালী কবির ভাষায় যখন ঃ

পথে পথে ভিড়
মনের আগল খুলে দেখি ঃ উদ্বাস্তু সংসার ছত্রভঙ্গ নীড়,
এলোমেলো ভয়ঙ্কর বাঁধভাঙা উদ্দামজল উদ্ধত অস্থির
মানুষ, মানুষ ঃ (মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়)

তখন সুভাষবাবু কি দুর্ভাগ্যের এই দিকটা দেখেননি? তাহলে ঐ একই সময়ে প্রকাশিত 'অগ্নিকোণে' তার সামান্য প্রকাশও নেই কেন? সেখানে অমন নিঃসন্দিগ্ধ আশাবাদ, জীবন সংগ্রামে জয়ের অমন সুদৃঢ় আস্থা আসে কি করে? দেশের এই নিকট বাস্তবকে না দেখে তিনি আন্তর্জাতিক জীবনকে অত বড় করে দেখিয়েছেন কি জন্য? এখানেই কবি স্বভাবের কথা আসে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবি-স্বভাব বাস্তবতার 'পজিটিভ' দিকটাকেই দেখায়। 'পদাতিকে'র যুগ থেকেই সুভাষবাবু জীবনবোধের এই পরিচয় রেখেছেন। তিনি শুনিয়েছেন আশা ও বিশ্বাসের সুর, নিপুণ হাতে তিনি 'অগ্নিকোণে'র পটভূমিকা আমাদের দৃষ্টির সামনে ধরে দিয়েছেন, আমাদের দৃষ্টিকে উঁচু করে তুলে ধরেছেন সেই অভ্যুদয়ের দিকে। মুক্তি সংগ্রামের ডাক দিয়ে জানিয়েছেন :

যে দেবে প্রাণ, জীবন দেবে
বরমাল্য তাকে, (ঝড় আসছে)

'পদাতিকে'র প্রথম কবিতাতেই মনে পড়ে শুনেছিলাম :

তিল তিল মরণেও জীবন অসংখ্য
জীবনকে চায় ভালবাসতে, (মে-দিনের গান)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা তাই বীর্য ও পরাক্রমে আমাদের জাগায়।

উপসংহারে জানাতে চাই যে, যে জীবনবোধে তাঁর কবিতা, রাজনৈতিক চেতনার সঙ্গে কবিসত্তার বিরোধ ঘুচিয়েছে, কবিতাকে মহত্তর সার্থকতা দান করেছে, নতুন মূল্যজ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অভিজ্ঞতালব্ধ সেই উপলব্ধি আজ নিশ্চয়ই অনেক বেশী ব্যাপক, অনেক বেশী গভীরে। সম্প্রতি বন্দীজীবন থেকে তিনি সত্যকে নিশ্চয়ই আরও এক দিক থেকে দেখেছেন, অনেক সংগ্রামী-সাথীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেকে ভালবেসেছেন। আমরা তাঁর সেই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা শুনতে চাইব, আবেগে এবং অনুরাগে, আনন্দে ও বেদনায়, প্রেমে ও মহিমায় গাঁথা সেই সব নতুন অনুভূতির কবিতা তাঁর থেকে আশা করে রইব।

চিরকূট॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সারস্বত লাইব্রেরী॥ ২০৬ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬॥ দাম দেড় টাকা॥

পরিচয়, মাঘ, ১৩৫৭

'নাজিম হিকমতের কবিতা'

মৃগাঙ্ক রায়

মহৎ কবির লক্ষণ কী। কাব্যজিজ্ঞাসার অন্তর্গত বহু জিজ্ঞাসার এটিও একটি জিজ্ঞাসা। কোনো কবির একখানি কাব্যগ্রন্থ সম্পূর্ণ পড়ার পর স্বভাবতই এ-জিজ্ঞাসা মনে জাগতে পারে।

মহৎ কবির লক্ষণ হয়তো একটি মাত্র নয়, বহু। কিন্তু তাদের মধ্যে একটিকে আমার প্রধান বলে মনে হয়। কোনো কবি যদি তাঁর দেশের নিঃসংশয় পরিচয় হয়ে উঠতে পারেন, তিনি নিশ্চয়ই মহৎ কবি। যেমন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বজয়ী প্রতিভা যে আমাদের মুগ্ধ করেছে তার একটি কারণ, তিনি এ-দেশেরই পরিচয় বহন করছেন এবং সে-পরিচয়ের মধ্যেই সমগ্র-দেশের চেতনা বিধৃত। আমরা তারই মধ্যে নিজেদের দেখবার দৃষ্টি লাভ করলাম। সমগ্র দেশকে, তার ট্র্যাডিশনকে, বেদনা ও আনন্দকে, তার সচেতন ও অচেতন রূপলোককে কবি যদি তাঁর অনুভবের হিরন্ময় পাত্রে ধারণ করতে না পারেন, সেই পরিপূর্ণ দৃষ্টির যদি অভাব ঘটে, ভালো কবির অন্যান্য লক্ষণ উপস্থিত থাকলেও, তিনি মহৎ কবি এ-কথা বলা চলবে না। আমাদের দেশে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে, কবি তাঁর কাব্যে নিজেকেই প্রকাশ করবেন। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, কবির এই ব্যক্তিপুরুষটি কে—যাকে তিনি প্রকাশ করতে চাইলেন। যদি এমন হয় যে, এই ব্যক্তিপুরুষ তাঁর স্বদেশচেতনারই মন্থনসঞ্জাত রূপ, তা হলে সে আত্মপ্রকাশ বৃহত্তর মানুষেরই প্রকাশ এবং কবি নিশ্চয়ই মহৎ কবি। কিন্তু এই ব্যক্তিপুরুষটি যদি শুধুমাত্র অমুকচন্দ্র অমুকের প্রতিমূর্তি হন, তা হলে তাঁকে কবি বলেই স্বীকার করব কিনা সে-প্রশ্নও উঠতে পারে।

নাজিম হিকমতের কবিতা পড়ে আমার এই কথাগুলিই সর্বপ্রথম মনে হয়েছে। মনে হয়েছে, নাজিক হিকমত সেই শ্রেণীর কবি যাঁকে আমরা নিঃসংশয়ে মহৎ বলতে পারি। নাজিম হিকমত তুর্কিস্থানের কবি। বিদেশীর কাছে (যেমন আমাদের কাছে) তুর্কিস্থান বিশেষ করে পরিচিত হতে পারে নাজিম হিকমতের দেশ বলে। কবি এই যে তাঁর দেশের পরিচয় হয়ে উঠতে পারলেন, এ কেবল তিনি মহৎ কবি বলেই। তেমনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েছেন এমন কোনো বিদেশীর কাছে ভারতবর্ষের পরিচয় হতে পারে, ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথের দেশ।

নাজিম হিকমতের কবিতার বৃহত্তম অংশ তুর্কিস্থান বিস্তৃত হয়ে আছে। অবশ্য সেখানেই শেষ নয়, কবি সমবেদনার সহযোগিতার হাত আমেরিকায়, ইওরোপে এবং এশিয়ার বিভিন্ন এশিয়ার বিভিন্ন দেশের জনসাধারণের দিকে প্রসারিত করেছেন। কিন্তু তুর্কিস্থান কখনো হারিয়ে যায়নি। সে-দেশের বজ্রাহত জনসাধারণ কেবলই কবির চেতনাকে আঘাত করেছে, সে-দেশের কৃষকবিদ্রোহের নেতা বদরুদ্দিন, জাতীয় সংগ্রামের নেতা কামাল আতাতুর্ক তাঁর স্মৃতিকে উজ্জ্বল করেছে। এমন কি কবির প্রেমও তাঁর স্বদেশানুভূতির সঙ্গে সম্পৃক্ত

হয়ে একধারবাহী স্রোত সৃষ্টি করেছে। প্রিয়াকে বলছেন,

You are my country
The foot-steps running towards you are mine.
(You are my country)

তুমি আমার দেশ।
যে পদচিহ্ন তোমাকে খুঁজছে
সে তো আমারই। (অনুবাদ)

অবিস্মরণীয় এই লাইন দু'টির মধ্যে হিকমতের কবিতার মূল কথাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জীবনজয়ের যে কঠিন পথে তিনি অগ্রসর হয়েছেন তার সমস্ত প্রচেষ্টাই স্বদেশানুগামী। তাঁর প্রতিটি কবিতাই তার প্রমাণ। বলছেন,

Bloody wrists, clenched teeth
bare feet,
Land like a precious silk carpet
This hell, this paradise is ours.
(Plea)

এই স্বল্পবাক কবিতাটির মধ্যে দেশের দুরবস্থার জন্য গভীর বেদনাবোধ (যে-বোধ প্রায় উন্নাসিকতার স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে) এবং গর্ব—এই দুয়ের সংমিশ্রণ এবং সমন্বয় কবির আজীবন সংগ্রামের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করেছে। এমন কি জেলে বসেও কবি নিজের বন্দীজীবনের দীর্ঘ দুঃখদৈন্যের চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন নি। বাইরের জগতে মানুষ যেখানে প্রতিদিন প্রতি পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে চলেছে কবি নিজের অন্ধকার ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে তৃষার্তের মতো সেদিকে তাকিয়ে আছেন। শুনছেন, খুনী ওসমানের বিয়ে হল। ভাবছেন, তিনি কারারুদ্ধ হবার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল, হিরোশিমা চূর্ণ হয়ে গেল বোমার আঘাতে, সে-যুদ্ধ শেষ হল। কিন্তু আবার বেজে উঠছে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের হুংকার। কিন্তু কবির দৃষ্টি এই খণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যেই শেষ হয়ে যায় নি। বলছেন,

The babies who had just been conceived
the year I was jailed
are ten year old children now.
(Since I was jailed)

এই ক'টি নেহাত সাদা কথার মধ্যে একটি গভীর এবং বহুদূরপ্রসারী কবি-দৃষ্টির পরিচয় রয়েছে। নিজে বন্দী থেকেও চলমান বিশ্বের সঙ্গে কবি চলেছেন। অনুভব করছেন, চতুর্দিকের ধ্বংস ও ক্লিন্নতার মধ্যে, ভয়াবহ যুদ্ধের বারবার আসা-যাওয়ার মধ্যে পৃথিবীতে নতুন প্রাণ দেখা দিচ্ছে, মানুষ এগিয়ে চলেছে।

প্রতিদেশেই কবিরা কবিতার কর্তব্য সম্পাদন করেন ব্যক্তিগত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে। কিন্তু সেই ব্যক্তির সীমা ছাড়িয়ে সমগ্র দেশই কাব্যসৃষ্টির প্রেরণা হয়ে উঠেছে—এমন কবি সব দেশেই দুর্লভ। দু'একটি দেশাত্মবোধক কবিতা লিখেই সে নিরিখে পৌঁছনো যায়

না, দেখতে হবে, সে-কবির সমগ্র চেতনাই স্বদেশচেতনা কিনা। নাজিম হিকমত সেই দুর্লভ কবিগোষ্ঠীর একজন, সেই স্বদেশচেতনার কবি।

নাজিম হিকমতের কবিতা যে-কারণে সবচেয়ে বেশি চমক লাগায় সে হচ্ছে তাঁর ভাষা এবং বাক্‌ভঙ্গি। এতকাল একটি বিশিষ্ট ভাষা দিয়ে, ছন্দ দিয়ে, ধ্বনি-তরঙ্গ দিয়ে কবিতার যে অন্তঃপুর তৈরি করা হয়েছিল কবিতার এবং জীবনেরই প্রয়োজনে দেশে দেশে তার প্রাচীর ভেঙে পড়েছে। কিন্তু তবু তার মধ্যে কাব্যের আমেজ ছিল, শব্দ বাছাইয়ের সংস্কার একেবারে শিথিল হয়ে যায় নি, অন্তর্মিলের ধ্বনিসৌকর্যও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা গেছে। কিন্তু গদ্যকবিতা এবং নিছক গদ্যের মধ্যবর্তী এই সামান্য ব্যবধানটুকুও নাজিম হিকমত রক্ষা করেন নি। তিনি বললেন ঃ কবিতার, গদ্যের আর কথা বলবার ভাষার ভিন্নতা নতুন কবি স্বীকার করেন না। ('দি নিউ পোয়েট ডাজ নট রেকগনাইজ সেপারেট ল্যাঙ্গুয়েজ ফর পোয়েট্রি, প্রোজ অ্যাণ্ড টকিং।) তাঁর এই আদর্শকে এমন সততার সঙ্গে তিনি অনুসরণ করেছেন যে ভাবলে অবাক লাগে। একটি মাত্র উদাহরণেই আমার বক্তব্য স্পষ্ট হবে। 'দি এপিক অফ্ দি সেকেণ্ড ওঅর্ল্ড ওঅর' কবিতায় কবি হ্যান্স মুলার নামক একটি সৈনিকের বর্ণনা করছেন ঃ

Hans Muller from Munich
used to love three things :
1—Golden foamed barley water :
2—Anna, Plump and white like Prussian Potatoes
3—Red cabbage.

এই রকম নম্বর দিয়ে এক দুই-তিন করে বলার ধরন গদ্যকবিতারও রীতি নয়, প্রবন্ধেরই রীতি। হিকমত তাকেও অনায়াসে তাঁর বাক্‌ভঙ্গির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে, এই গদ্যভঙ্গির মধ্যে কবিতার সম্ভাবনা কোথায়। সম্ভাবনা নিশ্চয়ই আছে। হিকমত তা প্রমাণ করেছেন। এতকাল কবিতার আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে অলংকার, ধ্বনি বা ছন্দবন্ধনের যে বহিরঙ্গ উপায় অবলম্বন করা হত, নাজিম হিকমত তাকে প্রায় বর্জন করলেন, কিন্তু কবিতার আত্মাকে জাগিয়ে তুললেন কবিতারই গভীর প্রদেশ থেকে, জীবনের বাস্তবচিত্রসমাবেশের নৈপুণ্যে এবং তীব্র আবেগে। ফলে শব্দসজ্জা বা ছন্দবন্ধের প্রয়োজন তাঁর হয়নি। উপমা তিনি খুব ক্বচিৎ ব্যবহার করেছেন; যাও করেছেন তারও ভাষায় কোন জৌলুস নেই, কেবল আন্তরিক আবেগ এবং স্বচ্ছ চিত্রবোধ ছাড়া। আবার এই চিত্রকল্পও তিনি প্রায় ব্যবহার করেননি বললেই চলে।

হিকমতের এই নিছক গদ্যভঙ্গির কবিতা যে কাব্যের সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছে তার আরও একটি কারণ বোধহয় কবিতার পার্সনাল টোন। এই পার্সনাল টোন সকল কবিতাতেই অল্পবিস্তর স্পষ্ট, প্রচ্ছন্ন নয়। কিন্তু এই পার্সন বা অহং নিরালম্ব অহং নয়, সে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার দেশের জীবনযাত্রার সঙ্গে সংযুক্ত এবং অত্যাচারিত, উৎপীড়িত মানুষেরই প্রতীক। কিন্তু কোনো কোনো কবিতায় (যেমন 'ফেয়ারওয়েল') তাঁর ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র কণ্ঠটিও শোনা গেছে। তবু যে সে-কবিতা আমাদের ভালো লাগে তার

কারণ সেই স্বতন্ত্র মানুষটি ব্যক্তিগত খেয়ালে এবং শূন্যাশ্রয়ী কল্পনায় মত্ত হয়ে ওঠে নি। তার পশ্চাৎপটে এক আগ্নেয় সংগ্রামের ইতিহাস রয়েছে। জেল থেকে স্ত্রীর উদ্দেশে যে-কটি কবিতা লিখেছেন তার প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যেই কবির ব্যক্তিরূপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে, কিন্তু কোনো কবিতাই কারুমূল্য থেকে বঞ্চিত নয় শূন্যাশ্রয়ীও নয়। কয়েকটি কবিতা তো আশ্চর্যরকম ভালো। ভালো যে হতে পেরেছে তার আরও একটি কারণ, কবির কঠিন মাত্রাজ্ঞান, যে-মাত্রা-জ্ঞান না থাকলে কবি ক্রমশ 'পার্সনাল' থেকে 'প্রাইভেট' ভাবনাকল্পনার খপ্পরে পড়ে প্রতিভার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে চলে যেতে পারতেন।

'নাজিম হিকমতের কবিতা' বাইশটি অনুবাদ-কবিতার সংকলন। এর মধ্যে কিছু কবিতা ওপরে আলোচিত ইংরেজি অনুবাদ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। কিছু ফরাসী অনুবাদ থেকে গৃহীত। সুভাষবাবুর মতো শক্তিমান কবি অনুবাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এটা আশার কথা। আমাদের দেশে শক্তিহীন লেখকেরাই সাধারণত অনুবাদের বাজার গরম করেন। কারণ হয়তো মূল রচনার ক্ষেত্রে তাঁদের কলম চলে না বলেই। এক্ষেত্রে শক্তিমানের দেখা খুব কম মেলে। তাই অনুবাদ-সাহিত্যের একটি সম্পূর্ণ ধারা গড়ে ওঠার পরও বাংলা অনুবাদের এই দুর্দশা।

উদ্ধৃতি দিয়েই আলোচনার সূত্রপাত করা যাক।
জেল থেকে হিকমত চিঠি লিখছেন তাঁর স্ত্রীকে।

বলছেন,

Kneeling I am looking at the earth
I am looking at the branches with their bright
blue blossoms
You are like the spring earth my beloved
I am looking at you.
নতজানু হয়ে আমি চেয়ে আছি মাটির দিকে
উজ্জ্বল নীল ফুলের মঞ্জরিত শাখার দিকে আমি তাকিয়ে
তুমি যেন মৃন্ময়ী বসন্ত, আমার প্রিয়তমা
আমি তোমার দিকে তাকিয়ে।

এই অনুবাদ নিঃসন্দেহেই স্বচ্ছ। মূল কবিতার প্রাচ্যদেশীয় আবহাওয়া অনুবাদকে হয়তো সহজ করেছে এবং সেই কারণেই হয়তো আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, মনের গঠনের সঙ্গে এবং ভাবনাধারণার সঙ্গে হিকমতের কবিতার একটি অন্তরঙ্গ যোগাযোগ অনুভব করা যায়। বিশেষ করে উদ্ধৃত লাইন কটি পড়ে হঠাৎ মনে হতে পারে যে, এ আমাদেরই দেশের কবিতা।

এই বাইশটি কবিতার মধ্যে সব কটি কবিতাই সম্পূর্ণ সার্থক অনুবাদ এ-কথা হয়তো বলা চলে না। কিন্তু এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে অধিকাংশ কবিতার অনুবাদই সার্থক। যেমন 'ছাপ', 'না-ধরানো সিগারেট', 'কলকাতার বাঁড়ুজ্যে', 'বিদায়', 'জেলখানার চিঠি'

ইত্যাদি। বিশেষ করে 'ছাপ' কবিতাটির অনুবাদ আশ্চর্যরকম ভালো। উদ্ধৃতি দিলাম না। কিন্তু পাঠককে এই কবিতাটি পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি। 'আহম্মদ ড্রাইভার' কবিতাটি অবশ্য 'ছাপ'-এর বিপরীত দৃষ্টান্ত। এর একটি কারণ ইংরেজী অনুবাদটির অস্বচ্ছতাও হতে পারে। ইংরেজী অনুবাদের দুর্বলতাকে সুভাষ বাবু কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, কারণ সেই ইংরেজী অনুবাদই তাঁর অবলম্বন ছিল। এ ছাড়া সমস্ত কবিতাতেই প্রাণবন্ত অনুভবের পরিচয় আছে। মনে হয়, সুভাষবাবু প্রত্যেকটি কবিতারই প্রেরণার উৎসে পৌঁছতে পেরেছেন। তাই অনুবাদে কোনো কঠিন প্রচেষ্টার ছাপ নেই, যেন অত্যন্ত সহজ ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে।

সুভাষবাবুর এ-অনুবাদে আর একটি জিনিস লক্ষ্য করবার আছে। সে হচ্ছে তাঁর বাঙালিয়ানা। সম্পূর্ণ বিদেশী কবিতার অনুবাদ করতে বসে অনুবাদককে সর্বপ্রথম যে-সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় সে হচ্ছে, ইমেজ এবং কথার রূপ নিয়ে। ইমেজ এবং কথার বিদেশী রূপ যদি অনুবাদেও অপরিবর্তিত থাকে তা হলে এদেশের ভিন্ন পরিবেশ এবং মানসিকতায় বর্ধিত পাঠকদের পক্ষে তা গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে না; অপরপক্ষে, বিদেশী ইমেজ এবং কথাকে সম্পূর্ণ দেশী চালে অনুবাদ করলেও মূল কবিতার রস ক্ষুণ্ণ হতে পারে। সুভাষবাবু এ দুয়ের সমন্বয় করতে পেরেছেন, কিন্তু ঝোঁকটা রেখেছেন বাঙালিয়ানার দিকে। তাই উপমায় 'উজানী নৌকা'ও মিলছে, এমন কি 'পাটিসাপটা'র মতো বাঙালী ব্যাপারও দুর্লভ নয়। তাই বলতে হয়, সুভাষবাবুর এই অনুবাদ-প্রচেষ্টা ইংরেজী এবং ফরাসীফেরতা হয়ে এলেও সার্থক হয়েছে। নাজিক হিকমতকে বাঙালী পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য তিনি নিশ্চয়ই ধন্যবাদার্হ।

Selected Poems—Nazim Hikmet, A Parichaya—Unity Publication. 63, Dharmatala Street, Calcutta—13. Rupee one and annas eight only.

নাজিম হিকমতের কবিতা।। **অনুবাদক : সুভাষ মুখোপাধ্যায়**।। ঈগ্‌ল্‌ পাবলিশিং কোং লিঃ।। কলকাতা-২০।। দেড় টাকা।।

পরিবর্জনে নয়, পরিগ্রহণে

অরুণ সেন

চল্লিশের কবিরা বাংলা সাহিত্যে কিছুই দেন নি, এই দশক অন্ধকার : এরকম কথা আমার কাছে ঘোরতর অতিশয়োক্তি লাগে, যদিও তাঁদের সম্পর্কে সাম্প্রতিক এই উপেক্ষার দায়িত্বকে তাঁরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারেন না। চল্লিশের কবিরা প্রায় সকলেই লিখছেন এবং অত্যন্ত সজীবভাবেই লিখছেন, এখনও যে-কোনো পত্রিকা তাঁদের কবিতা প্রকাশ করে গর্বিত হয়, এটাই কী তাঁদের সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নয়? অবশ্য চল্লিশের কবিদের সম্পর্কে একটা জিনিস আমার খুব আশ্চর্য লাগে। তাঁরা প্রত্যেকেই এত ছাড়া-ছাড়া—অন্তত তিরিশের বা পরবর্তী পঞ্চাশের কবিতার তুলনায়। অথচ বিষ্ণু দে বা অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বোঝাবার দরকার হয় না। সাহিত্যের ইতিহাসকে যাঁরা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার লীলা মনে করেন, তাঁরা সেভাবেও ব্যাপারটাকে দেখতে পারেন। যে কারণে বোধহয় চল্লিশের রাজনীতির ব্যাপারে উৎসাহ পঞ্চাশের দশকে কেমন থিতিয়ে গেল। অবশ্য পটভূমির ব্যাপারটাই এখানে সবচেয়ে বেশি।

আরেকজন আবার বলেছেন, তিরিশের কবিদের হাতে যে আধুনিকতা কষ্টার্জিত সাধনার বা উপার্জনের ব্যাপার ছিল, চল্লিশের কবিরা তা স্বাভাবিকভাবেই পেয়ে গিয়েছিলেন বলেই তাঁদের মধ্যে আর দলবদ্ধতার উত্তেজনা ছিল না। তাই তাঁরা ছাড়া-ছাড়া। কিন্তু সেটাও একমাত্র কারণ বলে আমার মনে হয় না।

চল্লিশের কবিদের মধ্যে আমাকে সবচেয়ে টানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এবং মণীন্দ্র রায়ের কবিতা। মণীন্দ্র রায়ের 'কালের নিস্বন' গত বছরে বেরিয়েছে এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কাল মধুমাস' এ-বছর জ্যৈষ্ঠে। দুজনকেই এখন সময়কে নিয়ে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। মণীন্দ্র রায়ের কবিতার ওপর তিরিশের কোনো কোনো কবির, বিশেষত বিষ্ণু দে-র প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। কিন্তু এই আত্মসচেতন কবি ক্রমশই এক অনিবার্য কণ্ঠস্বর লাভ করতে চলেছেন, যেখানে তাঁর স্বাতন্ত্র্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হয় না। সরল সমাধান বা সমীকরণকে তিনি প্রশয় দেন না, বরং জটিলতার অনেক ঘোলা জল সাঁতরে তিনি পৌঁছতে পারেন খুব দৃঢ়নিবদ্ধ আত্মবিশ্বাসের সরলতায় :

'অথচ স্বতন্ত্র আমি, লোভে কাঁপি, ঈর্ষায় স্বকীয়
পরাজয়ে ছিন্নভিন্ন; একে চাই ওকে করি ঘৃণা;
আকণ্ঠ জঞ্জালে ডুবে ক্রমে নিজে নিজেরও অপ্রিয়—
এ পোড়া পাহাড় আর বুকে যেন বইতে পারি না।'...

শেষ পর্যন্ত প্রার্থনা করেছেন :

'স্বপ্ন করো, মগ্ন করো, করো প্রাণ আভার বসতি,

কেন্দ্রে টানো, কামনায়, কামাগ্নির ধাতুর ঘর্ষণে।
অশ্রু ঘাম রিরংসার দাহে তুমি এসো স্নিগ্ধ জ্যোতি,
এবার ভ্রূমধ্যে এসো মমতার তৃতীয় নয়নে।।"

(এবার ভ্রূমধ্যে এসো)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জনপ্রিয়তা যে সাময়িক ব্যাপার নয়, তা আশাকরি ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই জনপ্রিয়তাকে খুব শ্রদ্ধার চোখেই দেখা উচিত, কেননা এই কবি মাঝখানের দীর্ঘ বিরতি সত্ত্বেও নিজের কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকের পরিবর্তনে, পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বরাবরই তৎপর। অবশ্য জনপ্রিয়তার যে দিকটা সরল আবেগানুসৃত, সেটুকু সন্দেহের চোখে যদি কেউ দেখে, তাকেও দোষ দেওয়া যায় না। তবে, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিজত্ব বা স্বাতন্ত্র্য এতই প্রবল যে, তাঁর কাব্যের কোনো বৈশিষ্ট্য চিনিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন হয় না সাধারণ পাঠককেও। এই কবির প্রধান বৈশিষ্ট্য চিত্রকল্পরচনা—প্রায় ইমাজিস্ট গ্রুপের আদর্শেই। তাঁর কবিতায় আসে অজস্র চিত্রকল্প, ঝরঝরে ভাষায় লেখা। কবিতা থেমে নেই, শব্দের পর শব্দ এসে যাচ্ছে, তরতর করে এগোচ্ছে কবিতা। তিনি নিজেই এ-বিষয়ে 'কাল মধুমাস'-এর একটি কবিতায় বলেছেন :

'আমি চাই কথাগুলোকে
পায়ের ওপর দাঁড় করাতে।
আমি চাই যেন চোখ ফোটে
প্রত্যেকটি ছায়ার।
স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে।' (আমার কাজ)

সেজন্যই মুখের ভাষাকে অবলম্বন করেছেন তিনি—ট্রেনের হকারের, পাড়ার আড্ডাবাজের, কেরানীবাবুর ভাষা—কথা বলার চালকে এনেছেন কবিতায়।

তাঁর চিত্রকল্পবাদী কবিতাগুলোকে যদি কেউ সম্পূর্ণ নতুন বলে দাবি করেন, তবে আমি আপত্তি করব। কারণ 'পদাতিক'-এর ঐ ব্যঙ্গ-কবিতার আড়ালেই লুকিয়ে ছিল বহু ছোট ছোট চিত্রকল্পের প্রায় নিজস্ব রাজ্য। 'কাল মধুমাস'-এও আছে এরকম চিত্রকল্পের মেলা। 'খোলা দরজার ফ্রেমে' এরকম একটি কবিতা।

'মাথার ওপর লম্বা একটা লাঠি উঁচিয়ে
কোলে-পো কাঁখে-পো হয়ে
একটা ট্রাম
তার পেছন পেছন
তেড়ে গেল
তারের গায়ে অনেকক্ষণ ধরে ঝুলে থাকল
একটা একটানা
ছি

ছি
শব্দ'...

মার্কিন typographical বা মুদ্রণচতুর কবিতার আদল আছে কবিতাটির চেহারায়। এই চিত্রকল্পরচনায় তাঁর প্রধান অস্ত্র সমাসোক্তি—অর্থাৎ অচেতন বস্তুর মধ্যে চেতনা আরোপ করায়। কিন্তু এটাই প্রায় মুদ্রাদোষে পরিণত হচ্ছে কবির। যেটার চকিত ব্যবহার আনন্দের ছিল, এখন তার দুর্ঘটনাতুল্য ব্যবহার রসাভাস ঘটায়। পথটা টন্ টন্ করে উঠল : এরকম উক্তির পৌনঃপুনিক ব্যবহারে আর ধার থাকে না।

বুদ্ধদেব বসু একদা বলেছিলেন, সুভাষ নাকি সমর সেনের রোমাণ্টিক সৌন্দর্যের জন্য হাহাকারকে বিষাদেরও অযোগ্য বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেই হাহাকার নেই, কিন্তু বিবাদ যেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতাকেও এখন আক্রমণ করেছে। বিষাদ, স্মৃতি ইত্যাদি তো তাঁর কবিতায় সত্যিই একসময়ে অভাবিত ছিল এবং পুরোপুরি সুখেরও ছিল না সেটা।

আমার ভালো লাগে সেই কবিতাও, যেখানে তিনি সচেতনভাবে একটি সুরকে অনুরণিত করে করে একটি অসাধারণ এফেক্ট তৈরি করেন :

'আমার স্মৃতিতে দুলে দুলে
দুলে দুলে

সারাক্ষণ
দুলে দুলে
নিশান
দুলে দুলে
নিশান
দুলে দুলে
সারাক্ষণ আমার স্মৃতিতে
নাচছে।'

কিংবা 'দরোজা খোলা/ফিরে এসেছি—/ফিরে এসেছি দেখ' জাতীয় কিছু কবিতা। 'কাল মধুমাস' কবিতায় দেখছি, কখনো লোক-দেখানো মিল, কখনো খুব চোরা-মিল, যেন মিলই নয়, অদ্ভুত মেজাজ তৈরি করছে। কিন্তু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায়, মনে হয়, সম্প্রতি বিষয়বস্তুর অভাবের সমস্যা দেখা দিচ্ছে—তাই নিজেকে অনুকরণ করার ঝোঁকও এসে পড়ছে, যা অন্তত তাঁর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত ছিল। [সংক্ষেপিত]

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের-কবিতা

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

তিরিশের দশকের লক্ষ্যহীন বিদ্রোহ, তাঁদের অপার দেহবিলাস সর্বপ্রথম ক্লান্ত করে ঐ দশকেরই দু'জন মুখ্য কবিকে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে, সমর সেন ও বিষ্ণু দে। 'জগতের শূন্য অন্ধকার শরীরের রূপরেখা' সম্বল করে বাঁচবার যে ক্লান্তিকর প্রয়াস তারই উদ্দেশ্যে বর্ষিত হলো তাঁদের শাণিত ব্যঙ্গ। প্রচলিত অবস্থা বিচলিত করেছিল তাঁদের। বুকের ভেতরে ক্ষয়রোগের জীবাণু নিয়ে জৈবিক হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত হওয়া তাঁদের কাছে সঙ্গত মনে হয় নি—তাই সেই অমানুষিকতার বিরুদ্ধে প্রথম 'নোট অব ডিসেন্ট' লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁরা। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে এসেছেন মুখ্যত প্রতিবাদের নিশান তুলে ধরেই যদিও তাঁর প্রতিবাদ তাঁর পূর্বসূরীদের তুলনায় গুণে ও ধর্মে আলাদা।

কিন্তু মজার কথা হলো এটাই যে, সুভাষের প্রথম আবির্ভাবকে স্বাগত জানালেন তিরিশের দশকের এমন এক প্রতিনিধিস্থানীয় কবি যিনি 'বন্দীর বন্দনায়' রতিবিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছিলেন কিংবা 'ছোট দুটি মুঠি ভরা স্তনের' স্বপ্ন যাঁকে উদ্দীপিত করত। ঘটনাটি অনেকের কাছেই কবি-সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর উদারতা হিসেবে প্রতিভাত হলেও, আমার কাছে এটা কিন্তু যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ মনে হয়েছে। এবং আমার ধারণা সুভাষের কবিপ্রতিভার বিশিষ্টতার চাবিকাঠিটিও এরই উত্তরের মধ্যে নিহিত।

তিরিশের কবিদের যাত্রা সুরু হয়েছিল দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে। একটি রক্তের সমুদ্র সাঁতরে রুক্ষ তীরভূমিতে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর দেখেছেন আরেকটি অনিবার্য ধ্বংসের হাতছানি। অথচ দুনিয়া জুড়ে যে সব যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে গিয়েছে তার অভিঘাতে ব্যাপ্তি ঘটেছে তাঁদের চৈতন্যের। ঘটেছে রুশ বিপ্লব, ১৯২৯-এর বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক বিপর্যয়, স্পেনের গৃহযুদ্ধ, মিউনিক, ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান। সবই তাঁরা দেখেছিলেন এবং বুঝতে পেরেছিলেন কিন্তু মৃত্যুর সমুদ্র ঘেরা দ্বীপ থেকে পরিত্রাণের বীজমন্ত্র তাঁদের জানা ছিল না বলেই একেবারে মুখ ঘুরিয়ে বামাচারী ভৈরবের মত স্পর্ধিত ঘোষণা করেছিলেন ঃ

সৃষ্টি মূলে আছে কাম, সেই কাম দুর্জয় দুর্বার।
যুপবদ্ধ পশু আমি? ভরিতেছি মৃত্যুর খর্পর
তপ্ত শোণিতের ধারে?—না না সে যে মধুর উৎসার!

[মোহিতলাল মজুমদার]

স্বভাবতই এই তাৎক্ষণিক আনন্দ-মাদকের পরিণামের মতোই ক্লান্ত করেছিল তাদের; 'গঙ্গা তীরে নিরানন্দ নারীদল' দেখা কিংবা 'দুপুরে কাঁচা ডিম খেয়ে ঘুম' এবং বৃদ্ধ বয়সে 'আরেকটি কিশোরী উপভোগের' বিকৃত বাসনাকে শান্তি ব্যঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিলেও কোন সদর্থক প্রত্যয়ভূমি তাঁদের চোখ পড়ে নি। তাই সুভাষ যখন এসেই ঘোষণা করলেন ঃ

প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা [মে দিনের কবিতা]

অথবা

আমাদের থাক মিলিত অগ্রগতি
একাকী চলতে চাই না এরোপ্লেনে ;
আপাতত চোখ থাক পৃথিবীর প্রতি
শেষে নেওয়া যাবে শেষকার পথ জেনে। [সকলের গান]

তখন এই নিশ্চিত বিশ্বাস; সকলকে সঙ্গে নিয়ে একটি লক্ষ্যের দিকে পা বাড়ানোর দুর্জয় সাহস স্বভাবতই সকলকে মুগ্ধ করেছিল। অসুস্থ, রুগ্ন, শ্বাসরুদ্ধ পটভূমিতে নির্মল বসন্ত বাতাসের মতো তাঁর আবির্ভাব তাই সকলকেই খুশি করে তুলেছিল ও এমন কি জীবন-দর্শনের আসমান-জমিন ফারাক সত্ত্বেও বুদ্ধদেব বসুকেও।

২

আজ থেকে তিরিশ বছরেরও কিছু বেশি দিন আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা রচনা সুরু করেছেন। তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'পদাতিক'-এর প্রকাশ কালই ১৯৪০। এই দীর্ঘ সময় সুভাষের রচনারীতি, তাঁর দৃষ্টিকোণ এবং অনুভব যেমন পালটেছে তেমনি আমাদের কাব্যরুচির বদলও কম হয় নি। এক সময়ে যে কবিতা সব সময় মুখে গুন্ গুন্ করত, আজ তা নেহাতই কথার কথা বলে মনে হয়। এই পরিবর্তিত রুচি নিয়ে পদাতিকের কবিতাগুলি আজ যখন পড়ি, তখন অনেকটাই যেন বনফুলের সেই বিখ্যাত পাঠকের মতো অবস্থা হয়। আজ যেন আমাদের সমগ্র মনোযোগ কবিতার বহিরঙ্গ চটকেই আটকে থাকে। দেখি কেমন অনিবার্য মিল দু'টি চরণকে মিলিয়ে দিচ্ছে, সতেজ প্রাণবান শব্দ বৃষ্টি ঝলমল করছে কবিতার শরীরে কিন্তু সব মিলিয়ে যা পাই তাতে মন ভরে না। এগুলি পড়ে অনেকটাই যেন পদ্যপড়ার আনন্দ পাওয়া যায়। বোধহয় এই কারণেই কবিতা-প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে একজন কবি বাতিকের কবিতাগুলিকে 'নেহাত উপরিতলের বস্তু' বলেছিলেন।

সমালোচকের এই দুঃসাহসী মন্তব্য তখন যে বিশেষ আলোড়ন তুলেছিল তার স্বাক্ষর তৎকালীন 'সীমান্ত' পত্রিকায় বিধৃত হয়ে আছে। এবং সমালোচককে এর জন্য জবাবদিহি করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটা কি? প্রশ্নটা কি এই নয় যে, কবিতার কাছে আমাদের প্রত্যাশা কি, আর পদাতিক-এর কবিতাগুলি সে-প্রত্যাশা কতটা পূরণ করে?

কোথায় যেন দেখেছিলাম, কবিতা হচ্ছে মানুষের সংগ্রামশীল অস্তিত্বের আবেগময় প্রকাশ। মানুষের এ-সংগ্রাম আত্মিক বা সামাজিক-রাজনৈতিকও হতে পারে। কিন্তু তার প্রকাশ এমন হবে যা আমার অর্থাৎ পাঠকের আবেগকে আলোড়িত করবে, প্রাচ্য আলংকারিকদের নির্দেশানুযায়ী সহৃদয় হৃদয়সংবাদী হবে। সঙ্গত কারণেই এই আবেগময় প্রকাশের বাহন হচ্ছে শব্দ। আমাদের প্রতিদিনের পরিচিত শব্দগুলি কবি ব্যক্তিত্বের স্পর্শে

এমন একটি অতিরিক্ত মাত্রা লাভ করে, যা তার নিজস্ব অর্থকে ছাড়িয়ে অন্য আরেকটি ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। শব্দের এই জাদুকরী ক্ষমতার কথা জর্জ টমসন সাহেব আলোচনা করেছেন তাঁর 'মার্কসবাদ ও কাব্য' গ্রন্থে। পদাতিকের অধিকাংশ কবিতা শব্দের চাকচিক্যে আমাদের মন কেড়ে নেয়, কিন্তু অন্যকোনো ব্যঞ্জনা ও উপলব্ধির সীমানায় কি এরা পৌঁছে দেয় পাঠককে?

"তবে, যুদ্ধ আজ।/রাজন্যের অনুকম্পা নেই/প্রজাপুঞ্জের স্বপ্ন ভঙ্গ।/বণিক প্রভু চোখ রাঙায়/কারখানায় বন্ধ কাজ।

(ইতিহাস, আমাদের দিক নেয়।)/উদাসীন ঈশ্বর কেঁপে উঠবে নাকি/আমাদের পদাতিক পদক্ষেপে?" [পদাতিক]

অথবা,

"তবে কি নাছোড়বান্দা ফাল্গুন, কমরেড?/বসন্ত বিজ্ঞপ্তি আঁটে ঘূর্ণিফল গাছে;/পর্দায় সর্দার হাওয়া কসরৎ দেখায়।/আকাশে অসংখ্য টর্চ, মেঘেরা ফেরার/গোল দীঘির গর্তে চাঁদ ধরা পড়ে গেছে।/বসন্ত সত্যিই আসবে? কি দরকার এসে/বছর বছর দেখা দিয়েছে সে ক্যাম্বেলের ভীড়ে।" [আলাপ] স্বভাবতই প্রশ্ন আসে উপরি উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে যা বলা হয়েছে তা কি কবির বিশ্বাসের রসে জারিত, না এগুলি তাঁর পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত, যা তিনি মনোহারী শব্দে ছন্দে বেঁধে পাঠকদের সামনে উপস্থিত করেছেন? আমার মনে হয়েছে পদাতিকের যুগে সুভাষ বুদ্ধির দিক থেকে বিশ্বাসের জগতে এসে উপস্থিত হলেও, তখনও পর্যন্ত তিনি তাকে হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করতে পারেননি। তাই এ-সময়ের কবিতায় তাঁর ভূমিকা মুখ্যত শিক্ষকের, যিনি অবোধ পাঠক সাধারণকে কর্তব্য-অকর্তব্য তাঁর ভূমিকা মুখ্যত শিক্ষকের, যিনি অবোধ পাঠক সাধারণকে কর্তব্য-অকর্তব্য বিষয়ে কখনো নির্দেশ দিচ্ছেন, কখনো বা তাদের ব্যর্থতায় বিদ্রূপ করছেন। টমসন বলেছেন কবির কর্তব্য হচ্ছে, "to stimulate in his fellow men the desire for that which is realisable but as yet unrealised." পাঠকের মনে এই "ডিজায়ার" জাগানো সম্ভব হয় তখনি, যখন কবির স্থান তার হৃদয়ের কাছাকাছি।

৩

কিন্তু পদাতিক কাব্যগ্রন্থের আপাত ব্যর্থতা সত্ত্বেও অন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সদর্থক দিক যে রয়েছে তা আলোচনার সুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। সারদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থের নানা অপূর্ণতা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে 'ভোরের পাখি' অভিধায় অভিহিত করেছিলেন। তার কারণ ঐ কাব্যগ্রন্থটি একটি নতুন ধারার উৎসমুখ খুলে দিয়েছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকাও বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রায় অনুরূপ। তিরিশের কবিদের আত্মহননের রুদ্ধশ্বাস পটভূমিতে তিনি এক বিশ্বাসের বৈজয়ন্তী উড়িয়ে এসেছিলেন যার অনিবার্য প্রভাব চল্লিশের পরবর্তী কবিদের মধ্যে অবশ্যই লক্ষণীয়। বলা চলে সুভাষের আবির্ভাবই পরবর্তী কবিকুলকে প্রগতিশীল ও দক্ষিণপন্থী—এই দুই

প্রতিদ্বন্দ্বী শিবিরে খাড়াখাড়িভাবে বিভক্ত করেছিল। এ-বিভাগের ফল বাঙলা কবিতার পক্ষে ভাল কি মন্দ হয়েছিল সে বিতর্কে না গিয়েও একথা অনায়াসে বলা চলে যে এর পর থেকে বাঙলা কবিতা এই দুটি ধারাতেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং পরবর্তী প্রায় সব কবির উপরেই কিছু না কিছু প্রভাব বিস্তার করেছে।

'পদাতিক' কাব্যগ্রন্থের যা মূল দুর্বলতা তার আক্রমণ থেকে কবি নিজেও রেহাই পাননি এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তাঁকে প্রবলতর সামাজিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে আত্মিক সংগ্রামেও লিপ্ত হতে হয়েছে। যে প্রত্যয়ের নিশান উড়িয়ে বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব, তার ভিত যে সুদৃঢ় নয় তা প্রমাণ করে পরবর্তী ইতিহাস। পদাতিকের পরবর্তী গ্রন্থ 'অগ্নিকোণ'। দুই গ্রন্থের প্রকাশকালের ব্যবধান প্রায় দশ বছর। এই দশ বছর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অগ্নিশুদ্ধির কাল। পদাতিকে যাদের উপদেশ দিয়েছেন, ব্যঙ্গ করেছেন এই দীর্ঘ সময়ে তাদেরই কাছে তিনি আসতে চেষ্টা করেছেন, নিজের মনকে তাদের মনের দর্পণে প্রক্ষেপ করে নতুন করে নিজেকে চিনতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে স্বাধীনতা পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর অবিস্মরণীয় রিপোর্টাজগুলি স্মরণীয়।

'অগ্নিকোণ' আকারে ছোট কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রূপান্তরের দলিল হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কবির ভাষণের গাঢ়তা এখানে সহজেই চোখে পড়ে—ছন্দ আর শব্দের কারিগরী এবং সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গর শায়ক পরিত্যাগ করে নিরাভরণ আন্তরিকতায় কবি উচ্চারণ করেছেন ঃ

"একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে/আগুনের নীল শিখার মতন আকাশ/রাগে রী রী করে, সমুদ্রে ডানা ঝাড়ে/দুরন্ত ঝড়, মেঘের ধুম্র জটা/খুলে খুলে পড়ে,....."

[একটি কবিতার জন্য]

কিংবা,

"অন্ধকারে হাতে হাতে তাই গুঁজে দিই আমি/নিষিদ্ধ এক ইস্তাহার/জরাজীর্ণ ইমারতের ভিৎ ধ্বসিয়ে দিতে/ডাক দিই/যাতে উদ্বেলিত মিছিলে একটি মুখ দেহ পায়/আর সমস্ত পৃথিবীর শৃঙ্খল-মুক্ত ভালবাসা/দুটি হৃদয়ের সেতুপথে/পারাপার করতে পারে।"

[মিছিলের মুখ]

সচেতন পাঠক সহজেই লক্ষ্য করবেন, 'অগ্নিকোণে'ই সুভাষ 'দুটি হৃদয়ের সেতুপথে পৃথিবীর শৃঙ্খল-মুক্ত ভালবাসা' পারাপার করাবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন। কবি হৃদয়ের রূপান্তর যে ঘটে গিয়েছে তা স্পষ্ট। তিনি আর জনতার থেকে পৃথক হয়ে ফতোয়া দিচ্ছেন না, আত্মকেন্দ্রিকতার খোলস ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছেন এমন একজন কবি যিনি আমাদেরই মতো প্রতিদিনকার জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত। রুশ-বিপ্লব কবি মায়াকভস্কির জীবনে যে-রূপান্তর ঘটিয়েছিল, সুভাষের এ-রূপান্তরও প্রায় তারই সমগোত্রীয়। কেননা, পরে আমরা দেখব লক্ষ্যাভিমুখে চলতে চলতে এই দুই কবির বাসনাই এসে মিলিত হয়েছে একই বিন্দুতে।

৪

'অগ্নিকোণে'র পরবর্তী গ্রন্থ 'চিরকুট'। প্রকাশকালের ব্যবধান প্রায় দু'বছর। প্রকাশের সময় 'অগ্নিকোণে'র সব কবিতাই 'চিরকুট' গ্রন্থে গৃহীত হয়েছিল। 'চিরকুটে'ই প্রথম স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক নতুন দিকে পা বাড়াচ্ছেন, একটা নতুন রূপান্তরের দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন।

ব্যাপারটা একটু খুলে বলা দরকার। পূর্বেই উল্লেখ করেছি 'পদাতিক' থেকে 'অগ্নিকোণে'র ব্যবধান প্রায় দশ বছর এবং এই দশ বছর সুভাষের কবি জীবনের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়। এ-সময় তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরেছেন, শ্রমিক মহল্লায় গিয়েছেন, তাদের আন্দোলনের সঙ্গে, তাদের জীবন যাত্রায় সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়েছেন। এই পরিচয় একদিকে যেমন বদলে দিয়েছে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অন্যদিকে তেমনি রূপান্তর ঘটিয়েছে তাঁর ভাষারীতি ও প্রকাশভঙ্গির। 'চিরকুটে'ই প্রথম দেখতে পাই আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ঘরোয়া শব্দগুলি, গ্রাম্য ইডিয়ম ইত্যাদি আসতে সুরু করেছে কাব্যের আসরে। বলা হয়ে থাকে বিষয় ও বিষয়ীর অন্তরঙ্গতার নিরিখ নাকি শব্দ। তা যদি হয় তবে একথাও মানতে হবে যে সুভাষ এই গ্রন্থেই প্রথম দেশের মানুষ ও তার জলমাটির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হওয়ার দিকে অগ্রাহ্য হয়েছেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্বতঃই মনে পড়ে যে এমনতর ঘটনা মায়াকভ্স্কির জীবনেও ঘটেছিল। এই প্রধান রুশ কবিও প্রথম জীবনে ছিলেন অতিমাত্রায় আত্মকেন্দ্রিক। রুশ বিপ্লবের প্রচণ্ড অভিঘাত তাঁকেও একাত্ম করে দিয়েছিল জনগণের সঙ্গে। তারপর থেকে মায়াকভ্স্কির কবিতার প্রকাশভঙ্গি, তাঁর শব্দ ব্যবহার সবই আমূল পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। জনগণের মুখের ভাষাকে তিনি দিয়েছিলেন কাব্যের মর্যাদা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধভাবে এমনটিই ঘটেছে বলে আমার ধারণা। চল্লিশের দশকের অস্থির সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ব্যাপক পরিভ্রমণ সেখানকার মানুষের বিচিত্র জীবনযাত্রা তাঁকে এক নতুন জগতের সন্ধান দিয়েছে। নতুন উপলব্ধিতে তিনি উদ্দীপিত হয়ে উঠেছেন। আর সঙ্গত কারণেই তাদের মুখের কথা, তাদের সংস্কার সবাই অঙ্গীভূত হয়েছে কবিতায় :

"মাঠে ঘাঠে কপাল ফাটে/দৃষ্টি চলে যতদূর,/খাল শুকনো, বিল শুকনো/ চোখের জলে সমুদ্দুর।" [চিরকুট]

এ-ব্যাপারে কবি নিজেও সচেতন। তাই সাহিত্যিক সাধনার অভীষ্ট হিসেবে তিনি এই চিরকুটে এসেই বললেন ঃ

"আমরা দেব বোবাকে ধ্বনি/খোঁড়াকে দ্রুত ছন্দ/লক্ষ বুকে রয়েছে খনি কুঁড়ি ঢাকা গন্ধ।/আমরা নই প্রলয় ঝড়ে অন্ধ।" [কাব্য জিজ্ঞাসা]

চিরকুট কাব্যগ্রন্থে সর্বত্র সার্থক না হলেও পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে তাঁর লক্ষ্য যে লক্ষ বুকের খনি থেকে সম্পদ আহরণ করা, তা এখানেই যথেষ্ট স্পষ্ট।

৫

'চিরকুটে'র পরেই সুভাষ অনুবাদ করেন তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের কবিতা। মনোধর্মে হিকমত ও সুভাষের নৈকট্য সুবিদিত। হিকমতের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর বলার বিশেষ ঢঙটি। মনে হয় কবি যেন তাঁর পাঠকের একান্ত কাছাকাছি বসে অন্তরঙ্গ ভাবে আলাপ করছেন। এই বিশেষ ঢঙটি সুভাষকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল বলে মনে হয়। এর আরেকটি দিকও তাঁর চোখে অবশ্যই ধরা পড়ে থাকবে। যে-মানুষগুলিকে তিনি দেখেছেন, যাদের দুঃখের দিনে তিনি তাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, শুনেছেন তাদের আনন্দ-বেদনার কথা, তাদের কবিতার বিষয় করতে গেলে, তাদেরই কাছে গিয়ে বসতে হবে। এ দিক থেকে মায়াকভ্স্কির দৃষ্টান্তই আবার মনে পড়ে। মায়াকভ্স্কিকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে শব্দগুলি তিনি কবিতায় ব্যবহার করেন কেন। একটুও না ভেবে উত্তর দিয়েছিলেন কবি, কেননা এগুলি সাধারণ মানুষ ব্যবহার করে থাকেন। সুভাষকে প্রশ্ন করলেও সম্ভবত এই একই উত্তর পাওয়া যাবে। হিকমতের নিচু গলার আলাপচারী গদ্য আর তার সঙ্গে আমাদের ঘরোয়া শব্দগুলি কি অপূর্ব কাব্যভাষা হয়ে উঠতে পারে 'চিরকুটে'র পরবর্তী গ্রন্থগুলি তার প্রমাণ।

"জেলা আপিস রিক্ত হস্ত/কলকাতা থেকে খালি হাতে ফিরে/দাওয়ার উপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে/রেশনের ভাঁজ করা থলি।/এ মাসের শেষাশেষি;/ও মাসের শেষ কিস্তিও মেলে নি।" [একটি লড়াকু সংসার]

এমনি চলতি, মৌখিক শব্দকে ব্যবহারের একটা সুবিধে এই যে, এই শব্দগুলি যেকোনো আবেগের বাহন অতি সহজেই হতে পারে। 'চিরকুট'-পরবর্তী গ্রন্থাবলীতে আরো একটি ব্যাপার সহজেই চোখে পড়বে যে, সুভাষ উত্তরোত্তর গদ্যভঙ্গির দিকেই ঝুঁকে পড়েছেন। যে ছান্দসিক সিদ্ধির জন্য একদা তিনি বিখ্যাত ছিলেন, সেই ফুলের মালা হেলায় পরিত্যাগ করে তিনি যেন এসে দাঁড়াতে চান সেই জীবনের মাঝখানে যেখানে আমাদের প্রথাগত কবিতা প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর এরপর যদি কোথাও ছন্দ ব্যবহারও করে থাকেন তবে তার চালও লৌকিক ঃ

'ভাই আমাকে বকুক ঝকুক/দিক গে যতই খোঁটা/যমের দুয়োরে কাঁটা দিচ্ছি/ভাই-এর কপালে ফোঁটা।" [ফোঁটা]

অথবা

"নেমে গেল এক্ষুণি/ট্রেন খালি করে ভোরের শেফালি/নেমে গেল এক্ষুনি।"

[কাছে দূরে]

ফুল ফুটুক, যতদূরেই যাই থেকে কাল মধুমাস কিংবা তারপরের কবিতাবলীতেও সুভাষ ক্রমশই দৈনন্দিন আলাপচারিতার কাছাকাছি চলে আসছেন। ঊনবিংশ শতকের শেষপাদে কবিতার বন্ধন-মুক্তির যে ঐতিহাসিক চেষ্টার সুরু, রবীন্দ্রনাথ থেকে সমর সেন প্রভৃতির হাতে যার প্রতিষ্ঠা, আজ সুভাষের হাতে তারই এক নতুন বিকাশ কিনা কে বলতে পারে? সুভাষ নিজে অবশ্য বলেছেন ঃ

"আমি চাই কথাগুলোকে/পায়ের ওপর দাঁড় করাতে/আমি চাই যেন চোখ ফোটে/প্রত্যেকটি ছায়ার।/স্থির ছবিকে আমি চাই হাঁটাতে। আমাকে কেউ কবি বলুক/আমি চাই না। কাঁধে কাঁধ লাগয়ে/জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত/যেন আমি হেঁটে যাই। আমি যেন আমার কলমটা/ট্রাক্টরের পাশে/নামিয়ে রেখে বলতে পারি/এই আমার ছুটি/ভাই, আমাকে একটু আগুন দাও।" [আমার কাজ]

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পচিন্তা স্পষ্ট করার পক্ষে অপরিহার্য। আর এও আরেক আশ্চর্য যে, ভিন্ন পরিস্থিতিতে সেই রুশ কবি মায়াকভ্স্কিও এইভাবেই কামনা করেছিলেন, যেন সোভিয়েতের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর কবিতা মিলে যায়। দুজনের এ মিল কি নিতান্তই আকস্মিক?

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা।। ভারবি। দাম ছয় টাকা।

বর্ষ ৪০, ১ম সংখ্যা,
শ্রাবণ ১৩৭৮

কবিতার দশ বছর

অরুণ সেন

অরুণ মিত্র বা মণীন্দ্র রায়ের পাশে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বরং অনেক ক্লান্ত, বিষণ্ণ। তাঁর আবেগও অনেক গোপন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় পথ-চলতি বাগভঙ্গির ব্যবহার, সমাসোক্তির প্রয়োগ এখনও আগের মতোই বজায় আছে। 'একটুও না দাঁড়িয়ে/তার ওপর দিয়ে/লাফাতে লাফাতে চলে গেল/সময়' জাতীয় অভ্যাস এখনও পাওয়া যায়। কিন্তু সন্দেহ নেই, সত্তরের দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা ভেতরে-ভেতরে যেন কোথায় একটু বদলে গেছে।

আর সেই বদলটা যে সময়েরই চাপে তা বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না—সেই 'অদ্ভুত সময়', যখন পুরনো ভিতগুলো বালির মতো ভাঙছে, আর 'আমরা ভাইবন্ধুরা... ভেঙে টুকরো হচ্ছি'। ১৯৭২-এ প্রকাশিত 'ছেলে গেছে বনে'-তে এই অদ্ভুত ভাঙনের সময়েরই কথা। ঐ গ্রন্থেই 'ফেরাই' অংশটিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক হঠকারিতার বেদনার্ত পরিণতির কথাই লেখেন—'ছুরিবিদ্ধ গুলিবিদ্ধ/অপাপবিদ্ধের দল', 'বলির বাজনা', চারপাশে 'ছেলেধরা'র দল, আর 'বাইশকোপের খেলা'। বিদ্রূপ নয় মোটেই, সহানুভূতিতে ভেজা লাইনগুলো। কিন্তু আবেগও প্রকাশ করেন নি—কারণ আগেই জানি আবেগ গোপন করতেই ভালোবাসেন কবি। এই অভিজ্ঞতায় লেখা সর্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় 'পাখির চোখ'। কবিতাটি পরের বই 'এই ভাই'-তে (১৯৭৪) আছে। অর্জুন কুরুক্ষেত্রের মাঠে দেখছেন ঃ

সামনে গড়াগড়ি যাচ্ছে
ভাইবন্ধুদের মাথা;
পেছনে
আততায়ী আমার ভাই।

হে সারথী,
রথ এখানে থামাও।
আর আমার এই বিষাদকে
একটু ধরো। (পাখির চোখ)

যে ব্যক্তিগত বিষাদ বা অভিমানকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কখনও গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি, সময়ের চক্রান্তে দেখা যাচ্ছে এখন তা তাঁকে পেড়ে ফেলেছে। বিস্ময়করভাবে আত্মজৈবনিক মান-অভিমানের কথাও আসছে কবিতায়। কিন্তু এখানেই তাঁর মুন্সিয়ানা বলব না, বলব ব্যক্তিত্বের অখণ্ডতা যে সেই ব্যক্তিগত প্রকাশই শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠতে

পারছে সময়েরই স্বরলিপি। 'এই ভাই' গ্রন্থে প্রকাশ হয়ে পড়ে সময়ের এই নিঃস্বতার কথা, একটি যুগের ব্যর্থতার কথা, ব্যক্তিগত প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই।

আপনি মশাই, গেছেন বদলে
বদলে গেছেন, ছি ছি।
আগে গলায় বাজ ডাকাতেন
এখন করেন চিঁ চিঁ। (ভাবতে পারছি না)

একি নিজেকে ব্যঙ্গ? না কি সময়কে? না কি নিজের কৃত-কে? কবিতাটি শেষ হয় কিন্তু অভিমানের ব্যক্তিময়তাতেই, যা তাঁর কাছে এতকাল ছিল অভাবিত।

হেই গো দাদা, ছাড়ুন ঠ্যাং—
চলে যাচ্ছি ড্যাডাং ড্যাং।

নিজের বা নিজেদের কৃত-কে এবং তার বর্তমান উত্তরাধিকারকে ব্যঙ্গ করার কথা উঠছে, কারণ তিনিই তো আজ লেখেন ঃ

আমার হাতে তো কুষ্ঠ হয় নি
যে,
সারাক্ষণ হাত মুঠো করে থাকব! (দুয়ো)

ফলে, ব্যর্থতার বোধ, নৈরাশ্যের বোধ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় যার ছোঁয়া প্রায় ছিলই না—তা এই 'এই ভাই' বা 'একটু পা চালিয়ে, ভাই' (১৯৭৯) দুটি গ্রন্থকেই গ্রাস করে রেখেছে।

কেউ যায় না

শুধু জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে
সব কিছুই
জায়গা বদ্‌লে বদ্‌লে
সকলেই

থাকে। (কে যায়)

বনে দাবানল;
খোলা হাওয়া কোথাও
নেই, কোথাও
নেই। (এই ভাই)

এই ভেবে যায়,
দিন যায়
দিন। (এমনি ক'রে)

রোজই ঘুম ভাঙলে ভাববার চেষ্টা করি
আমি কোথায়। (কোথায়)

এই ছিন্ন ঘুরে-ফিরে-আসা শব্দের ফাঁকে ফাঁকে কবির দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে সময়ের অভিজ্ঞতায় মেলানোর স্বভাব সময়ের চাপেই বোধ হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও মাঝে-মাঝে হারিয়ে ফেলেন। এরকম অভিমান তো আগে কখনো দেখা যেত না—এখন তাঁর কবিতা তাই 'আজ আছি কাল নেই'। কিংবা 'হাজরা পার্কে সভা কাল' এই বলে যিনি ঘোষণা করেছিলেন, 'নিরপেক্ষ থেকে আর চিত্তে নেই সুখ',তিনি এবার লিখলেন,

কেন ডাকো
মন নেই, যাব না সভায়। (যাব না সভায়)

মনে হয়, আশাবাদে যেমন, তেমনি এই নৈরাশ্যেও সুভাষ মুখোপাধ্যায় খুব বেশি জটিলতার দিকে যেতে চান না। সব সময়ই একটা ক্যাজুয়াল ভঙ্গিতে তিনি সব কিছুকে উড়িয়ে দিতে চান, জটিলতাকেও। মানুষের নিত্যব্যবহৃত বাগধারা কিংবা ছড়া-রূপকথা-কথকতার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞাকে তিনি যেমন সহজ-করে-বলায় কাজে লাগান, তেমনি এখানেই থাকে হয়তো অতি-সরলীকরণেও বিপদ। তবে বিপদই মাত্র, এই বিপদকে পার করে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেখেন 'একটু পা চালিয়ে, ভাই'—ব্যক্তিগত ও সামাজিক ব্যর্থতাবোধ-বিষাদ, সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস, আত্মসমালোচনা কিংবা আত্মবিশ্বাস সব কিছু দিয়ে মোড়া এই অসামান্য কবিতাটি।

সময়ের এই দায়কে মেনে নিয়ে বিশ্বাসকে আঁকড়ে রাখা, কোনো যান্ত্রিকতায় নয়, উচ্চারণের সজীব নতুনত্বে—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সাফল্য যে কতখানি তা বোঝা যায়, চল্লিশের দশকের অপরাপর কবি, যাঁদের সঙ্গে তাঁর নান্দনিক সাযুজ্য দীর্ঘকাল, তাঁদের পরিণতি দেখলে। (সংক্ষেপিত)

সমালোচনা সংখ্যা ১৯৮০

এখনকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'ছেলে গেছে বনে'-র মোট ৪৩টি কবিতা (কোনো কোনোটিতে আবার ১-এর ভেতর ২, ৩ এমনকি ৪-ও আছে) নিয়ে কী মনে হতে আমি হঠাৎ সেগুলির বিষয় ভাগ করতে বসে যাই। এবং, কী আশ্চর্য, ক্রমানুসারে ৫ অর্থাৎ 'সফরী' এবং ৭ অর্থাৎ 'মধ্যে যুদ্ধ' এই দুটি কবিতা ছাড়া অন্যান্যগুলির উৎস যেন ধরে ফেলতেও অসুবিধে হয় না। এ ভারী তাজ্জব ব্যাপার! যে কালে, কী নিয়ে কবিতা লিখেছেন প্রশ্ন শুনলে কবিরা চোখ পাকান, সে সময়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা দেগে বলে দেওয়া হচ্ছে, এটি এর ওপর লেখা, এ আমার ধাষ্টামো নয় তো?

অথচ, পাঠকরা, 'ছেলে গেছে বনে' নিয়ে বসুন, মিলিয়ে দেখুন আমার হিসেবের সঙ্গে, ভারী ইনটারেস্টিং। কারণ, বিষয়ের এলাকাটা খুব বড় ও বিচিত্র। পুলিশের ওপর কবিতা আছে দুটি—'সামনেওয়ালা ভাগো' ও 'শব্দে আর নিঃশব্দে' (প্রথমটি অবশ্য পদ্য, দ্বিতীয়টি কবিতা); সি পি আই এম এল-এর জানপণ ছেলেদের ওপর তিনটে—'ছেলে গেছে বনে', 'সবাই সমান', 'বলির বাজনা'; তার সঙ্গে খতম অভিযান মিলিয়ে যদি ধরেন তো চারটি ('খেলা হবে' কবিতাটি যোগ করলে ৫)। পদ্য-কবিতা-ছড়া মিলিয়ে এ কালের কোনো উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে নেই যা তফাৎ করে দেখাব? আছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ('লাগসই'), আছে ভিয়েতনাম, বাংলাদেশ ও রুশদেশের ওপর লেখা ('ভিয়েতনামে কোনো একটি গান', 'নিয়ে যাব শহর দেখাতে', 'কড়াপাক', 'দেখেশুনে')। ট্রেন বরাবরই খুব প্রিয় বিষয় সুভাষের, এখানেও আছে মোক্ষম একটি—'কে বা কারা'। সাম্প্রতিক সমস্যা নিয়ে একটি ('সময়ের জালে'), সংগ্রামী জোটের ফাটল নিয়ে একটি ('অদ্ভুত সময়'), মনে হয় সি পি এম-কে লক্ষ্য করে দুখানা ('হাত বাড়িয়ে রেখেছি' ও 'মধ্যিখানে চর'), 'একুশে ফেব্রুয়ারি' একটি, কমিউনিস্ট পার্টির ভাঙন নিয়ে—'বন্ধুরা কোথায়', 'অদ্ভুত সময়', 'হাত বাড়িয়ে রেখেছি, মাওবাদী চিনা রেজিমের ওপর 'ম্যাও'; এ ছাড়া, বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে বলে আন-ক্লাসিফায়েড—তেমন দু-একটি।

বইটি আদ্যন্ত পড়ে ফেলে মনে হল, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিশ্চিতভাবে বয়স বেড়েছে। সময়ের বৈগুণ্যে তিনি এখন আগের চেয়ে অনেকটা বেশি সতর্ক, এবং বেশ কিছুটা অনিশ্চিতও বটে। এই অনিশ্চিতি প্রথম ফুটে ওঠে 'এই ভাই' কাব্যগ্রন্থে, যা এখানে বেশ ডাগর। বিশ্বাসের অন্ধ জোর, যা অনুকূল আবহাওয়ায় অ-বাস্তব ভাবে ফুলে ফেঁপে ওঠে, তার চুপসে যাওয়ার দৃশ্যটিও কম মর্মান্তিক নয়। যত দেরিই হোক, তবু এমনটি না হয়ে যায় না। গলা কেড়ে নিয়ে সেখানে মাইক বসানোর প্রতিবাদ সুভাষ করেছেন কিছুকাল আগেই, মূঢ় ভক্তির প্রাথমিক আলোড়ন কেটে যাওয়ার পর নির্বিচারে মেনে নেওয়ার ঘোর শত্রু

তো সত্যি সত্যি একজন কবিই হতে পারেন। 'ছেলে গেছে বনে'-তে এই একই কারণে তিনি অনুবাদ করেছেন ভারদভস্কির একটি কবিতা, যেখানে বলা হয়েছে, "যা জানবার আমি নিজে নিজে জানব।/আমার যা কিছু ভুল/আমি নিজেই বার করব।/সমস্তই আমি জানব মনপ্রাণ দিয়ে—/পরের যোগানো বাঁধা গৎ দিয়ে নয়।"

লেনিন যখন মূর্তি হয়ে যাচ্ছিলেন তখন সেই মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে পাথর ছুঁড়তে চেয়েছিলেন লেনিনবাদী মায়াকভস্কি। রক্ষণশীল অথচ প্রগতিপন্থী (কী বিচিত্র এই দুটো শব্দকে এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করা!) রাজনীতি-ব্যবসায়ীরা মায়াকভস্কিকে বাতিল করতে চেয়েছিলেন দুরারোগ্য রোমান্টিক আখ্যা দিয়ে। হাওয়ার্ড ফাস্ট যখন সাম্যবাদে বিশ্বাস হারান, আমার মনে পড়ে, তখনও অনেকে তাঁর সেইসব লেখার মধ্যে বোহেমীয় চরিত্রের বীজ খুঁজছিলেন, যে সব লেখা তাঁরা একদিন মাথায় তুলে ধেই ধেই করে নেচেছেন। সুভাষ একজন কমিউনিস্ট; এবং সাচ্চা কমিউনিস্টদের মতন যখন তিনি আর 'বিশেষজ্ঞ'দের চেতাবনিতে বিশ্বস্ত রইলেন না, ডাল-পালা সরিয়ে দেখতে চাইলেন নিষ্ঠুর, ডিম্যান্ডিং সত্যকে—তখন থেকেই তার ওপর কম হামলা হয়নি। যেভাবে নানা মহল এমনকি অন্দরমহল থেকেও তাঁর চরিত্রহননের অক্লান্ত প্রয়াস হয়েছে, তাতে কমজোরি হলে সুভাষ এতদিনে হয় কমিউনিস্ট থাকতেন না, না হয় কবিতা লেখায় ইস্তফা দিতেন। কিন্তু সুভাষ যে আজও কমিউনিস্ট এবং কবি—বিংশতি পার্টি কংগ্রেসের দুর্মর রোগ-সন্ধানী আলোয় তাঁর হৃদয়-মন যে আজও উদ্ভাসিত—এ এক অসামান্য ঘটনা। সবটাই নিয়েভস্কি প্রসপেক্টের মতো সোজা সড়ক নয়, সবই পুষ্পলাঞ্ছিত নয়, মাঝে মাঝে আসে অন্ধকার "ঘর-জোড়া স্তব্ধতা", শোনা যায় 'ইতিহাসের এক ভীষণ চিল চিৎকার" এবং এই ভয়ংকরতা সম্পর্কে গড্ডলিকা থেকে সরে দাঁড়িয়ে কে আগে মুখ খুলবেন, একজন সৎ কমিউনিস্ট শিল্পী ছাড়া? সুভাষই সব সিদ্ধান্তবাগীশের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করার সৎ-সাহসে এই ঝুঁকি প্রথম নিয়েছেন। এবং এই ঝুঁকি তিনি এত দূর পর্যন্ত নিয়েছেন, যেখানে এমন প্রশ্ন করতেও তিনি পেছ-পা হননি, "গড়বার দল নয়/একটা ভাঙবার চক্র/নামাবলী গায়ে দিয়ে ভক্তদের ভোলাচ্ছে/মধ্যিখানে চর/তার আড়ালে ব'সে রয়েছে/কোন্ সে সওদাগর?" যা আমরা ভাবি, অথচ বলি না, জানি অথচ প্রকাশ্যে স্বীকার করি না—চোখকে মন ঠাউরানোর সেই অভ্যাসগত কুশিক্ষাকে নস্যাৎ করে দিয়ে মর্মান্তিক সত্যকে আন্তরিক বেদনায় উচ্চারণ করেন সুভাষ, "যখন/এক সঙ্গে হাত মুঠো করে দাঁড়াতে পারলেই/আমরা সব কিছু পাই—/তখন বিভেদের এক টুকরো মাংস মুখে ধরিয়ে দিয়ে/চোরের দল/আমাদের সর্বস্ব নিয়ে চলে যাচ্ছে—" অথবা, "পথ এখন এক অন্ধ গলিতে এসে ঠেকে গেছে/শহীদের স্মৃতি রাখতে শহীদ হওয়া/খুনের বদলে খুন/এই বৃত্তটাকে কিছুতেই ছাড়ানো যাচ্ছে না।"

বিপ্লবের বন্ধু কে, শ্রমিকশ্রেণীর শরিক কে হবে—এ নিয়ে মতাদর্শগত সংঘাত বেঁধেছিল লেনিন ও ট্রটস্কির মধ্যে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে মাওবাদী লাইনের অন্যতম প্রধান ফারাকও এই জায়গাতেই। সুভাষ লেনিনবাদী যুক্তফ্রন্ট তত্ত্বের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে অত্যন্ত সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন বিপজ্জনক ট্রটস্কাইট বিপ্লবিয়ানার চেহারাকে এবং

লেনিনের নির্দেশকেই দিয়েছেন কাব্যময়তা, "যারা শত্রুকে একঘরে না ক'রে/বন্ধুকে শত্রু করছে/যারা সংগ্রামের সাথীদের/আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়ে/মৃত্যুর গুণগান গাইছে—/সেই শয়তান চক্রটাকে এবার/যেখানে পাও খুঁজে বার করো/ফাঁক ভরাট করো/ভাঙাকে জোড়া দাও/তাহলেই সোনার কৌটোয় কালো প্রাণ ভোমরাগুলো/বুক ফেটে দাপিয়ে দাপিয়ে মরে যাবে।"

বিভেদপন্থীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সুভাষ নির্দ্বিধ, স্থিরচক্ষু। তিনি তাদের সম্বোধন করেছেন 'ছেলেধরার দল' নামে, যারা ছেলেদের নাকের কাছে 'অতি-বিপ্লবী' "ফুল শুঁকিয়ে/ফুসলে নিয়ে চলে গেছে/তাদের বলি দেবে ব'লে।" প্রতিক্রিয়া ও চরম বিপ্লবীয়ানার "বলির বাজনা ও রক্তমাখা খাঁড়াগুলো"-কে দূর হটানোর প্রতিজ্ঞা বার বার তাঁর অনমনীয় কবিতাগুলিতে বেজে উঠেছে। নরখাদক-রাজনীতির খাদ্য হিসেবে যে সব রোমান্টিক বিপ্লবী তরুণরা এই দেশের বুক ফাঁকা রেখে চলে গেছে, এক বিরাট সম্ভাবনা যেখানে শবসাধনার অন্ধকারে চোরাগোপ্তা ও রক্তের স্রোতে ডুবে গেছে, সুভাষ তাদের শোচনীয় পরিণতির জন্য দায়ী করেছেন, শাস্তি তলব করেছেন সেই মৃত্যুর সওদাগরদের, "পাখি-পড়ার মত ক'রে" যারা বুঝিয়েছিল "হয় মারো নয় মরো।" এককালে যাঁরা কাঁধে কাঁধ দিয়ে মাঠে ময়দানে লড়াই করেছেন, পার্টির ভাঙনের পর তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক গিয়ে দাঁড়ায় অহি-নকুলের। শুধু রাজনীতিগতভাবে বৈরিতা নয়, মানবিক সম্পর্কের মধ্যেও এর ফলে যে চিড় ধরে, তা সুভাষকে খুব গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছে বারবার। তিনি না লিখে পারেননি, "আমার সেই বন্ধুরা কোথায়/আমি জানি না/পাছে কোনো অকল্যাণ হয়/তাই কাউকে জিগ্যেস করি না/দেখে ফেললে না চেনার ভান করি" অথবা, "কে তার আস্তিনের তলায় কার জন্যে/কোন হিংস্রতা লুকিয়ে রেখেছে/আমরা জানি না।/কাঁধে হাত রাখতেও এখন আমাদের ভয়।" তবু সমূলে বিশ্বাস হারানোর পাত্র তিনি নন। এককালীন সহযাত্রীর "ঘৃণার দিকে" তিনি ফিরিয়ে রাখেন তাঁর "ভালোবাসার মুখ" হাত বাড়িয়ে রাখেন, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়েও সে যাতে তাঁর হাত ধরতে পারে। জানি না, তাঁর এই আশা আদৌ পূর্ণ হবে কি না। কারণ, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক রাজনীতির গতি-প্রকৃতি অনুযায়ী, এ সহজে পূর্ণ হওয়ার নয়।

এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে সি পি আই এম এল-এর তরুণ কর্মী, যাদের বিকৃত রাজনীতিক পরিভাষায় বলা হয় 'নক্সাল', তাদের সম্পর্কে সুভাষ কী মনোভাব অবলম্বন করছেন, তা নিয়ে কবি নিজেই নিশ্চিত নন। তাঁর অতি-খ্যাত 'ছেলে গেছে বনে' কবিতায় কোথাও সুভাষ বলেছেন, "পেরিয়ে চল্লিশ/যে আগুন প্রায় নিবন্ত, ওরা তার তুলছে আঁচ খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে", কোথাও বা, "অথচ তারই হাতে দেখছি মুক্তপাখা/যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত আমারই পতাকা।" স্পষ্টতই বোঝা যায় যে উগ্রপন্থী তরুণদের সাহস, আত্মত্যাগ ও সততা কবিকে প্রগাঢ়ভাবে আকৃষ্ট করেছে। অথচ 'ফেরাই' ও 'বলির বাজনা' কবিতায় কবি এই তরুণদের ট্রাজিক পরিণতির জন্যই কেবল মর্মাহত, তাদের রক্তরঞ্জিত হাতে যে তাঁরই পতাকা যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হয়েছে, এমন কথা বলার মুখ আর তাঁর থাকে না। তারই ফলে অতি অল্পসময়ের মধ্যে লেখা 'ছেলে গেছে বনে' ও 'ফেরাই'—এই দুটো কবিতার বক্তব্য

আগাপাস্তলা পালটে যায়, এবং এই পরিবর্তন প্রথম কবিতাটির একেবারে বিপরীত মেরুতে চলে যায় 'বলির বাজনা'-য়। এবং এই অকল্পনেয় দ্রুত পরিবর্তনের তাগিদেই বোধহয় শেষ-মেশ সুভাষ লিখে ফেলেন 'ম্যাও' নামে এমন একটি কবিতা যা কয়েকবার চোখ কচ্‌লে পড়েও সুভাষের কবিতা বলে মনে হয় না। একজন কমিউনিস্ট হিসেবে সুভাষ মাওবাদী চিনের বিপজ্জনক ঝোঁক বা বিকৃতির বিরুদ্ধে অবশ্যই আপসহীন ও তাত্ত্বিক সংগ্রাম চালাতে পারেন, কিন্তু তাকে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার বাইরে ছুঁড়ে দিতে পারেন না। আমি আশা করি, সুভাষ একদিন এই কবিতাটি নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তিত হবেন।

যে-কোনো জিনিসকে দেখা এবং তা বর্ণনা করার ব্যাপারে সুভাষের ধরন-ধারণটাই এমন, যা তাঁকে অন্যান্য কবির থেকে অনায়াসেই পৃথক ও বিশিষ্ট করে তোলে। ধরা যাক, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে লেখা 'নিয়ে যাব শহর দেখাতে' কবিতাটি। এখানে 'জয় মুজিব, জয় বাংলা' বলে প্রথাগত গদ্‌গদ তন্ময়তা নেই, নেই তলোয়ার হাতে করে যুদ্ধে ছুটে যাওয়ার ভীম পণ। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পাশাপাশি পশ্চিমবাংলার অরাজক, বিশৃঙ্খল পরিবেশকে কুশলী সুভাষ অননুকরণীয় ভঙ্গিতে স্থাপন করেছেন কেবল ট্রেনিং ক্যাম্প থেকে একটি মুক্তিযোদ্ধাকে মাত্র চার-প্রহর সময়ের মধ্যে কলকাতা দেখানোর পরিকল্পনার মাধ্যমে। একটি অগ্নিশুদ্ধ পবিত্র তরুণকে তিনি নিয়ে আসছেন স্বভূমি দেখাতে। কবি ব্যগ্রভাবে চাইছেন যাতে এই তরুণ সংগ্রামী তাঁর দেশ দেখে জিভে কোনো তিক্ত স্বাদ নিয়ে না ফেরে। তাই তিনি "দেয়ালে পা ফাঁক ক'রে চোখ-মারা তারকা-রাক্ষুসি," "সুবেশে পকেটমার নারীমাংসলোভী বইপুঁথি," "ভ্রাতৃরক্তে হাত-রাঙানো খুনী" ইত্যাদিকে কঠোর ভর্ৎসনার সুরে বলছেন, "স'রে যাও, স'রে যাও এসো না সাক্ষাতে।" সুভাষের এই অসামান্য বলার ভঙ্গিটি আরও মর্মস্পর্শী হয়ে বাজে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ওপর রচিত 'লাগসই' কবিতাটিতে। যখন সমস্বর সংকীর্তনে এ দেশের ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরচন্দ্রকে ঈশ্বর প্রতিপন্ন ক'রে তাঁর মানবত্বকে হেয় করতে তৎপর, ঠিক তখন সুভাষ লিখলেন, "এবং কিছু না কিছু প্রত্যেকেই পেত/যে যেমন জানাত প্রার্থনা/তাও/পেলে পরে ভুলে যাবে মানুষ সে পাত্র না/প্রতিদানে ঢিল/ছুঁড়েছে সে সজোরে পাঁজরে/মুখটা ব্যথায় নীল/অতএব লেগেছিল ঠিক/যেহেতু ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন না ঈশ্বর বাস্তবিক!"

এই বইটিতে সুভাষ ফর্মের নতুন নতুন নিরীক্ষা বেশ সপাটে চালিয়েছেন। কোনো কোনো কবিতায় পুরোনো ছড়া ও হেঁয়ালির ধাঁচকে নিপুণভাবে ব্যবহার করা হয়েছে (দ্র. 'পুব হাওয়ার গান', 'ধরাবাঁধা' 'রসুই', 'সামনেওয়ালা ভাগো') কোথাও রীতি গ্রহণ করা হয়েছে বাউল গান থেকে ('নিশির ডাক নাটকের গান'), কোথাও এসেছে মাদারীর খেলার সুর ('খেলা হবে'), কোনো খানে কেবল গোটা চোদ্দ স্লোগান একটু তফাত রেখে পর পর সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে (' দেয়ালে লেখবার জন্যে')। আমার একটু মৃদু আপত্তির কথাও এ প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখছি। অনুপ্রাস সৃষ্টি ও অপ্রত্যাশিত অন্ত্যমিল দেওয়ার ঝোঁক 'ছেলে গেছে বনে'-তে বাড়াবাড়ি রকমের দেখা যাচ্ছে। অনেক সময়ই এগুলো বড্ড বেশি ডেলিবারেট বলে মনে হয় এবং এর ফলে, অন্তত আমার মতে, কবিতার ক্ষতিই হয়। বহু কবি-যশোপ্রার্থী

সুভাষের আঙ্গিকের নকল করতে প্রাণান্তকরভাবে তৎপর। এই নকলনবিশদের দলে তাঁর সমসাময়িক কবিও কেউ আছেন। সুভাষকে আত্মসাৎ করার ক্ষমতা এঁদের নেই, এঁরা কেবল বাইরের কিছু ঠমকই অনুকরণ করতে পারেন। অথচ, সুভাষের পক্ষে যা খেলা, তা-ই অন্যদের পক্ষে মৃত্যু হয়ে দাঁড়াতে পারে। আশা করি, সুভাষ আমার কথাটা একটু খতিয়ে ভাববেন।

বইটি পাঠ শেষ করে আবার বিশ্বাস হল, কবি হিসেবে সুভাষের কোনো মার নেই। সব সময় তিনি সময়ের নাড়ি ধরে আছেন। এখনও, প্রতিনিয়ত তিনি নিজেকে অতিক্রম করছেন। আঙ্গিক নিয়ে তাঁর চিন্তা আজও নতুন নতুন ফসলের সম্ভাবনায় আক্রান্ত। এবং ইতিপূর্বে, অন্যত্র যা বলেছিলাম এখানেও তা-ই আবার আবৃত্তি করছি : তাঁর কবিতার বিবর্তনের ইতিহাস আসলে বাংলা কবিতার বিবর্তনেরই ইতিহাস।

ছেলে গেছে বনে॥ সুভাষ মুখোপাধ্যায়। আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি.॥ তিন টাকা

পরিচয় ৪২ বর্ষ ১-২ সংখ্যা জুলাই-আগস্ট ১৯৭২ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

‘যখন যেখানে’

কুশল লাহিড়ী

সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি। তার গদ্য রচনায় কবিতার আমেজ বার-বার উঁকি দিয়েছে। বিশেষ করে উপমার বহুল প্রয়োগ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যভঙ্গির একটি বৈশিষ্ট্য হলেও সে-বৈশিষ্ট্য তাঁর কবি-সত্তার আধিপত্যই লক্ষ্য করা যায়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার যাঁরা পাঠক, তাঁরা ‘যখন যেখানে’ পড়ে এমন বহু পংক্তির সাক্ষাৎ পাবেন, যা তাঁর কবিতায় পূর্বেই পেয়েছেন। কোনো কোনো সময় আলোচ্য গ্রন্থের বহু উপমা ও বাচন-ভঙ্গী তাঁর কাব্যেও স্বচ্ছন্দে ঠাঁই পেয়েছে। ‘‘হোস্-পাইপের গলা ফাটিয়ে মাটি গোলা জল’’, ‘‘ঠিকে ঝি বাড়িতে ডাকাত পড়ার মতো জোরে জোরে যখন কড়া নাড়ে’’, ‘‘আহ্লাদে সোনালি রেল’’, ‘‘বড় বড় বাড়ির বগলের নিচ দিয়ে গলে-আসা এক পাল কচি রোদ’’, ‘‘ডানপিটে রোদগুলো’’ ইত্যাদি বহু উপমা উদ্ধার করে বলা যায় নিছক গদ্য-শিল্পী নিশ্চয়ই এমন বাচনভঙ্গির আশ্রয় নিতেন না, এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার সঙ্গে যাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, তাঁদের আঙুল দিয়ে দেখাতে হবে না, যে ‘যখন যেখানে’ পুস্তকের বলার ভঙ্গির সঙ্গে তাঁর শেষ-দিককার কবিতার (‘‘ফুল ফুটুক না ফুটুক’’ পর্যায় থেকে) আশ্চর্য মিল আছে। কবিতায় তিনি যেমন গল্প বলার ধরণ গ্রহণ করেছেন, বর্তমান গদ্য-গ্রন্থে তার বিশেষ ব্যত্যয় ঘটে নি। বলা যায় তাঁর গদ্যে কাব্য ও গদ্যের হর-পার্বতীর মিলন হয়েছে, কবিতায় গদ্য ও কাব্যের। পথিক পথ অতিবাহন করে, সেই পথ-পরিক্রমায় হয়তো সে কিছু লক্ষ্য করে, কিছু এড়িয়ে যায়। তাই পথিক-চোখ নিয়ে কখনই কোনো ভালো রচনা সৃষ্টি করা যায় না, কারণ ভালো রচনার মূল কথাই হলো অন্তরঙ্গ-দৃষ্টি, আত্মীয়তা অথচ সেই দৃষ্টি বা মনোভাব কখনই আবিল বা মোহগ্রস্ত নয়। ‘যখন যেখানে’ প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে এই পথিক-চোখ নিয়ে লেখা কয়েকটি রিপোর্টাজের সমষ্টি। অথচ এগিয়ে গেলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আশ্চর্য অনুভূতি, আত্মীয়তা এবং অতি তুচ্ছ নগণ্য জিনিসও মানুষের প্রতি অসীম দরদ ছত্রে ছত্রে ব্যাপ্ত হয়ে রচনাগুলিকে রসোত্তীর্ণ অনন্য করে তুলেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে গল্পের আমেজ প্রবেশ করিয়ে কৌতূহল জাগ্রত রেখেছেন। বিশেষ করে প্রায় প্রতি রচনার শেষের দিকে গল্পের সাস্‌পেন্সও অতি সূক্ষ্ম ভাবে জিইয়ে রেখে লিপি কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। সহজ করে বলা সহজ নয়। কিন্তু যিনি সহজ করে বলতে পারেন, তিনি যে কিস্তিমাতও করেন, ‘যখন যেখানে’ পড়লে বোঝা যায়। ‘‘বাবর আলির চোখের মতো’’, ‘‘লিখতে বারণ’’, ‘‘একটি অমানুষিক কাহিনী’’, ‘‘আমাদের গাড়ি’’ প্রভৃতি রচনায় হঠাৎ হঠাৎ বিষণ্ণতার প্রলেপ লাগিয়ে লেখক ট্রাজেডির একটি নিভৃত সুর যোজনা করেছেন, ফলে লেখাগুলি তাদের চটুল ভঙ্গি, লঘু আবরণ ছিন্ন করে গভীর হয়ে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দৃশ্য-ইন্দ্রিয় অতি প্রখর।

কবিতায় যেমন তিনি চিত্রের পর চিত্র রচনা করে সমস্ত বিষয়কে সম্মুখে ভাসিয়ে তোলেন, 'যখন যেখানে' গ্রন্থেও তেমন বহুচিত্র যোজনা করে তেমনই সফল হয়েছেন। প্রথম রচনা "এইটুকু"র পৃষ্ঠা তিনেকের মধ্যে উপমা ও সরল বাচনভঙ্গির সাহায্যে পর পর কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত করে নেবুতলার গলির স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন, এই চিত্রই গল্পের শেষ অংশে নিবারণবাবুর কাহিনীকে পূর্ণতাদান করেছে এবং নেবুতলার গলির চিত্রটির সঙ্গে নিবারণবাবুর জীবন কাহিনী তাই একান্ত হয়ে উঠেছে। তবু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আশ্চর্য গদ্যে বাস্তবের রুক্ষ, রূঢ় রূপটি অনাবিষ্কৃত থেকে যায়। অতি তুচ্ছ নগণ্য ঘটনা, দুঃখ-দারিদ্র, নিষ্ঠুরতা সকল রকম চিত্রই আমরা পাই, কিন্তু সেই দুঃখ দারিদ্র্য, শঠতা, হীনতার উত্তাপ আমাদের জ্বালিয়ে দেয় না। এজন্য হয়তো লেখককে দোষী করা যায় না, কারণ তাঁর রচনার মধ্যে রূপকথার আমেজটি অতি অচেতনেও লেগে যায়, তাই যখন তিনি তাঁর স্বভাব-বিরুদ্ধ নিষ্ঠুরতা, নির্মমতা আঁকতে যান, তখন তা ভাবালুতায় পরিণত হয়, "একটি প্রতিবাদ পত্র" তার অন্যতম নিদর্শন। এমন রচনায় তাঁর গল্প-বলার সহজ ভঙ্গিটি অবশেষে ভাবালুতার আশ্রয় নেয়। তবু সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য-শিল্পী হিসেবে সফল এবং অনেক গদ্য-শিল্পীর ঈর্ষার পাত্র, এ-কথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর সহজ, সরল, কাব্যময় উপমা প্রয়োগের ভঙ্গি, কথকতার অন্তরঙ্গতা ইত্যাদি সম্মিলিত হয়ে গদ্য-রচনাকে একটি বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আমার মনে হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য-রচনায় তাঁর বক্তব্য উপস্থাপনার সহজ, সরল অথচ রসোত্তীর্ণ ভঙ্গি অনেক গদ্য-শিল্পীর শিক্ষার বিষয়। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা আরও গদ্য-রচনা আশা করি।

যখন যেখানে।। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বর্তিক। মূল্য দু টাকা পচাত্তর নয়া পয়সা।।

কার্তিক লাহিড়ী এই নামে এটি আলোচনা করেন
পরিচয় জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ পৃ ১৪৬১-৬২

জীবন অবাধ জীবন অগাধ

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

চমকে গিয়েছিলাম প্রথম বিজ্ঞাপনে। দ্বিতীয়বারেও ঘোর কাটে নি। 'হাংরাস'* মানে কি?

মানুষের মনের ভেতর মন কাজ করে। দেওয়া-নেওয়া চলে মনে মনে, কাজে অকাজে। তারই ফাঁকে ফাঁকে শব্দের জন্ম হয়। ভাষা গড়ে ওঠে। মানুষের বুকে বুকে ঘুরতে ঘুরতে ভাবনাগুলো ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে। ছড়াতে গিয়ে পুরনো শব্দ ভেঙে যায়। নতুন কথার জন্ম হয়। হাঙ্গারস্ট্রাইক কতো অনায়াসে হাংরাস হয়ে ওঠে, বিশ সালের আন্দোলনে মাহাতোদের নেতা সরডিহা-র সেই পাকাচুল চাষীর মুখে। আর একথা কে না জানে, মানুষের বুকে মুখে ভাঙা গড়া এবং জন্ম যাদের সেইসব সামান্য শব্দ মুকুটে মণির মতো কবিতার অসামান্য অঙ্গ হয়ে ওঠে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে, কি আশ্চর্য বিস্ময়ে।

মনের ভেতরে ভয় ছিল। কারণ কবিরা অনেকেই ততোদিনে হাঁটতে হাঁটতে হাজির উপন্যাসের মেলায়। আসর বসার পর দেখা গেল কেউ এনেছেন জনপ্রিয় কোনো লেখকের কোনও কোনও গল্পের পুনরাবৃত্তি, কেউ স্মৃতিকথার মিষ্টি মোলায়েম স্পর্শ। একমাত্র ব্যতিক্রম সম্ভবত শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তিনি যখন সমস্ত রাত কলকাতায় কলকাতায় দয়িতাকে হারিয়ে খুঁজে হারিয়ে খুঁজে ক্লান্তিতে ঘরে ফিরে—তবে কি সে সারাক্ষণ ঘরের ভেতরেই, তাকে রেখে আমিই কি তবে পথে পথে তাকে এতোক্ষণ...এইসব বলেন, তখন বুকের ভেতর মোচড় খাওয়া ব্যথা আনন্দ সংশয় এইসব অনুভূতি একাকার মহৎ হয়ে ওঠে। যদিও শক্তি যথারীতি চমক-ধমকের লোভ এড়াতে পারেন না অলিতে গলিতে।

ভয় পার করে এতো চেনা অথচ এতোই অচেনা প্রতিবেশীদের খুব কাছে নিয়ে তাদের দুঃখসুখ হাসিবেদনার ঠিক মাঝখানে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিতে মোটেই সময় লাগে না সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের। এবং সমস্ত ব্যাপারটা তিনি ঘটান কি অসম্ভব অনায়াসে, স্নিগ্ধতায়। এবং তা-ও এমন এক ভুবনভোলানো দেশভাঙা দেশগড়া মন্ত্রের মোহ ও মোহমুক্তির প্রেক্ষাপটে—যেখানে অনেক রক্তের দাগ, অনেক রক্তের স্বাদ। এমন লিপ্ত এবং নির্লিপ্ত গলায়, এমন চিকন আপত্তির ইঙ্গিতে এবং একটুও তিক্ততা না এনেও কেমন করে লেখা যায় সেসব কথা ঃ একমাত্র সুভাষই বোধহয় পারেন।

একজন আম্মা ছিলেন। সত্যিকারের বেঁচে থাকা মানুষের বিবেকের মতো তিনি। নিজের মধ্যবিত্ত সন্তানদের কাজে ও কথায় অনাত্মীয়তা দেখে তিনি যখন জ্বলে ওঠেন, পুড়ে যান, দুঃখে প্রায় ফেটে পড়ে যখন বলেন, "এতোক্ষণ ভেবেছিলাম তোরা স্বদেশি করিস, অন্ততঃ তোরা এসে আমার পাশে দাঁড়াবি," তখন তিনি এমনই জীবিত যে চোখের সামনে তাঁকে দেখতেই হবে। এবং তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বুকের ভেতর অনেক পাপের গ্লানি ভার হয়ে উঠবেই।

অরবিন্দ সেই আম্মার দৌহিত্র। আসলে তিনি মায়েরই মতো। অরবিন্দ কমিউনিস্ট। পার্টির কাগজে কাজ করত। তারই মাঝখানে অরবিন্দ ইন্টারভিউ নিচ্ছে বাদশার। আন্দুল

রোডের ধারে মণ্ডলপাড়ার মুসলমান বসতির ছেলে বাদশা, ছোটখাট শ্রমিকনেতা। অরবিন্দের কথা এবং বাদশার কথার মধ্যে দিয়ে কাহিনী স্তর থেকে স্তরে চলে যায়। সব কটি স্তর পার না হয়ে 'হাংরাস' কিছুতেই বন্ধ করা যায় না।

বাদশার কথা তার ঘর ছাড়িয়ে গ্রাম, তা ছড়িয়ে সমাজ—গ্রাম শহরের গরীব মানুষের সমাজ—তা ছড়িয়ে কারখানা এবং তারপর শ্রমিকশ্রেণী ও তার লড়াইয়ে পৌঁছে যায় কথার ছলেই। যেন আপনা থেকেই। তার মধ্যে দিয়ে একটা মানুষের গড়ে ওঠা, অনেক মানুষের বেড়ে ওঠা এবং না-ওঠা, সমগ্র সমাজের যাত্রা ছবি হয়ে ভাসতে থাকে চোখের ওপর। সে ছবিতে হাসিও থাকে, কান্নাও। জিতে যাওয়া থাকে, পরাজয়ও। সবই থাকে। যেমন থাকে জীবনে।

অরবিন্দর কথার মতো বাদশার কথা তেমন গতিতে ছোটে না যদিও, সে আমাদের একটানে নিয়ে যায় দুবেলা চোখে পড়া এবং প্রায় একবারও না দেখা পশ্চিম বাঙলার মুসলমান সমাজের বুকের মাঝখানে। সে-সমাজের মাঝের মহল এবং নীচের মহলের একেবারে অন্দরে, অন্তরে। পড়তে পড়তে বিস্ময় সীমানা ছাড়িয়ে যায়, সুভাষ এতো জানলেন কি করে! তাঁদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লোকাচার, প্রাত্যহিক জীবনের নানা ডিটেইল এমন করে আয়ত্ত করা এবং তার চেয়ে বড়ো কথা অচর্চিত এইসব ব্যাপার ও শব্দগুলিতে এমন অনায়াস গতি দেওয়া, প্রায় অবিশ্বাস্য। 'হাংরাস'-এ পীর, মুরীদ, মুরিদান, দোয়াতাবিজ, ওরস দাওৎ, শরীয়তের খেলাপ কিংবা বোরোবত্রিশের কথা পড়তে পড়তে ওপার বাঙলার সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্-র বিখ্যাত উপন্যাস 'লাল সালু'র কথা মনে পড়ে যায় বারবার। যদিও তার বিষয় ভিন্ন, বলার কথাও অন্য। ধর্ম, মসজিদ, পীর, মুরিদান এবং মহব্বতই তার প্রধান, প্রায় একমাত্র, উপজীব্য।...এমন কথা কারো কারো মনে হতেও পারে—কোথাও কোথাও এসব একটু কম হলেও 'হাংরাস'-এর রসহানি ঘটত না। তবু সন্দেহ থেকেই যায় এই বিস্তারটুকু বাদ দিয়ে মণ্ডল-পাড়ার ছবিটি চরিত্রগুলি এবং তাদের নিতান্ত নিজস্ব পরিবেশটুকু গড়ে তোলা যেত কি, যায় কি!

বাদশা অনেক খোলামেলা প্রাণের সাদামাটা স্বভাবের মানুষ। গ্রামের সর্বহারা পরিবারের ছেলে, মজুরদের মাঝখানে পৌঁছে অবশেষে একটা লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছে। এখন সে বেগে ধেয়ে যেতে চায় সামনে। তার সংশয় কম। দ্বন্দ্বে ভোগে না সে। ভাবে যত, করে তার চেয়ে বেশি। তার স্বভাবে ঝড়ের একটা ইশারা আছে।

অরবিন্দ অন্য মানুষ। তার ইনট্রোভার্ট স্বভাবে সংশয়ের শেষ নেই। জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। নিয়তই দ্বন্দ্বের কোলাহল। কোলাহল বলা ভুল হল। 'হাংরাস'-এ কোথাও কোলাহল নেই। এমন-কি যখন পথে মিছিল হয়, জেলের ভেতরে গুলি চলে—তখনও নেই। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরম যত্নে কণ্ঠস্বর নিম্নগ্রামে রেখেছেন শেষ অবধি। অনেক নাটকীয় ঘটনা ঘটে। কিন্তু কোথাও তারা নাটক হয়ে যেতে পারে না। বরং কখনও-বা কবিতা হয়ে যায়, সুভাষেরই কবিতার মতো। সহজ স্বরটা যাতে কেঁপে কেঁপে না ওঠে, বিদ্রোহে বা মৃত্যুতেও, সে বিষয়ে অসম্ভব সচেতন তিনি। এবং সার্থকও। অনেক কঠিন কথা গভীর কথা তিনি এমন সহজে সরলভাবে বলেন যে মনে হয় তারা যেন আপনা থেকেই হয়ে উঠল, কারো গড়ে তোলার অপেক্ষা না রেখেই।

সহবন্দী বরুণবাবুর সঙ্গে সাহিত্যের ব্যাপারে অরবিন্দর মেলে না। তিনি মার্কসবাদকে মাথায় করে রাখলেও সাহিত্যের ত্রিসীমানায় তাকে ঢুকতে দিতে রাজী নন। আবার তাঁর বিরুদ্ধবাদীদের

সঙ্গেও সহমত নয় সে। তাঁরা বলেন, সাহিত্য তো প্রচারের মাধ্যম মাত্র। এই বিতর্কে, বেশ বোঝা যায়, অরবিন্দর ভেতরে ভেতরে কোথাও একটা কিছু ছিঁড়ে যাচ্ছে। লেখক সে বিষয়ে নীরব তিনি শুধু একটি বাক্যে তাকে প্রকাশ করেন ঃ "অ্যাও নয় অও নয়, তা হলে কি?"

অনশনব্রতী খায় না। খাবেও না কিছুতেই। অথচ ফোর্স ফিডিং-এর পর "পেটের মধ্যে গরম দুধ যাওয়ার সেই পরম আরামের অনুভূতি'র কথা অরবিন্দ ভুলতে পারে না কিছুতেই। এমনটি ঘটার কথা নয়। ঘটা উচিত নয়। তবু যে ঘটে। এবং এইসব ব্যাপার সে বোঝে বলেই বলে ঃ "আমি মধ্যবিত্ত। আমাকে নিয়েও ভয়।" এই কথা মনে হতেই সন্ন্যাসী কমিউনিস্টের মতো আত্মশুদ্ধির আগুনের ঝাঁপ দেয় না সে। পার্টিতে হয় 'কৌপিন আঁটা' নয় 'কাছা খোলা' যে দুটি দল আছে তার কোনোটিতেই সে নেই। বরং বন্ধু জুটিয়ে আড্ডা বসিয়ে দেয়। সেখানে চলে নিষিদ্ধ আলোচনা—খাওয়াদাওয়ার গল্প। "যারা মনে করে খাওয়ার কথা মনে করাটাই পাপ তারা মন থেকে সেই পাপ বার করে দিয়ে বোঝা অনেকটা হালকা করতে পারছে।" আড্ডাধারীরা অনেক গবেষণা করে আড্ডার নাম দেয় 'কারখানা'। 'খামার' নামটা বাতিল, কারণ ওতে মার আছে।

অথচ পার্টির লাইন অনুসারে রবি ঠাকুরকে ধরাশায়ী করার জন্যে অনেকদিন ধরে চোখা চোখা বাণ শানিয়ে রাখে অরবিন্দ। তারপর ভাষণ দিতে উঠে সব যায় উলটে। উগ্রপন্থী বন্ধুরা বিদ্রূপ করে ঃ "আপনি, কমরেড, তা হলে শোষক জমিদারের পক্ষে?" অরবিন্দ কি কষ্ট পায়? হয়তো পায়। রাগ করে? অরবিন্দ প্রায় কখনোই রাগ করে না। যদিও মনে মনে, অভিমান পুষতে পুষতে, নিঃসঙ্গ নির্জনে দাদু এবং আরো অনেকের সঙ্গে কলহ করতে করতে নিজের কাছে ঘোষণা করে, সারা বিশ্বের ওপর রেগে গেছে সে, রেগে আছে। এবং পরক্ষণেই মনে পড়তেই যোগ করে, "একমাত্র কমরেড স্টালিন ছাড়া।" আসলে সে রাগ করে না কখনোই।

"পুরনো কথা আজ লিখতে গিয়ে অনেক গম্ভীর জিনিসকে আমি হালকা করে ফেলছি।" একেবারে আউটসাইডার অথবা অতিরিক্ত লিপ্ত কেউ অরবিন্দর এই উক্তিকে হালকভাবে না-ও নিতে পারেন। কিন্তু একটা কথা মানতেই হবে, 'হাংরাস'-এর এ মলাট থেকে ও মলাট কোথাও ক্রোধ নেই। বিদ্বেষ তো নেই-ই। অথচ রাগ হতেই পারত। হওয়ার অনেক কারণই ছিল।

মানুষজন, মোড়লটোড়লদের কাছে কতো মান পান বলে গালগল্প করে বেড়ানো বাদশার বাপজান যখন ছেলের সামনে হেনস্তা হন, যখন ছেলেও বোঝে বাপও বোঝে, শুধু ব্যথার গ্লানিটুকু আড়াল করার জন্যেই যেন বোঝার ব্যাপারটুকু ঢেকে রাখে দুজনেই—তখন তলস্তয়, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের চেনা চরিত্রগুলি ভেসে ওঠে চোখের সামনে। চোখ জ্বালা করে। তবু রাগ হয় না।

বিপ্লব হল না। বোঝাই যাচ্ছে হাওয়ার কথাও ছিল না। অনেক প্রাণ তবু গেল এ বোঝার দায় বয়ে। তখনও যাচ্ছে। জেলের মধ্যে, বন্ধ ঘরে, পথে এবং সিঁড়িতে গরম শীষের গুলি বুকে নিয়ে মরছে "মিষ্টি মায়াবী মুখের" কনক এবং কনকের মতো আরো অনেকে। ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, কোথাও একটা ফাঁকি ছিল। কোথায়? কোথাও একটা ভুল ছিল। কার ভুল? কার হুকুমে বন্ধ ঘরে এমন নির্মম গুলি ছোটে? কার মূঢ় নির্দেশে কনকরা বুক পেতে দেয় সেই গুলির সামনে?

রাগ হতেই পারত। তবু রাগ নেই কোথাও। বরং সংযত সহানুভূতিতে, 'হালকা' কথার ছলে, অনেক তিক্ততাকে মানুষের প্রাণের স্পর্শ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

ইতিহাসের কোনো পর্যায়কে বিচার করার চেষ্টাও করেন নি তিনি। কিছু ঘটনা, খুবই বড় ঘটনা, ঘটে যাওয়ার আগে পরে এবং মাঝখানে একটি মানুষ, দুটি মানুষ, কিছু মানুষের মনে আর মননে যা ঘটে যায় তাই নিয়েই তাঁর ভাবনা। ইতিহাসের কোনো গতি, বৃহৎ সব ব্যক্তিত্বের বিচ্যুতি অথবা পার্টির কোনো ত্রুটি 'হাংরাস'-এ বড় কথা নয়। দু-হাতের দশ আঙুলে জেলের লোহার জাল আঁকড়ে ধরে ফোর্স ফিডিং-এর আগে ডাক্তারের সঙ্গে, এবং নিজের সঙ্গেও, লড়াই করতে করতে অনশনব্রতী বিপ্লবীর চোখে পড়ে যায় "ন নম্বর ওয়ার্ডের মাথায় সেই চারাগাছটা প্রাণপণে কার্ণিশ আঁকড়ে রয়েছে।" সেই চারাগাছের মতো জীবনই সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আলোড়িত করে, তাঁর কলমকে নাড়ায় চালায়। 'হাংরাস'-এও তাই ঘটেছে।

এবং সেই জীবন থেকে উঠে আসা মানুষগুলোই 'হাংরাস'-এর সম্পদ। অল্প কথায় সাধারণ সেই মানুষগুলির অসাধারণ ছবি এঁকেছেন তিনি। 'হাংরাস' শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও, চোখ বুঝলেই চোখ পড়ে—জেলের মধ্যে, অল্প অন্ধকারের বিকেলে, ছেলের ফটো ধরে কথা বলছেন সুবিমলবাবু। মণ্ডলপাড়ার টুনিবুড়ি কেবলই মনে করিয়ে দেয় ইন্দির ঠাকরুণকে। মাঠে জঙ্গলে ঝোপঝাড়ে ঘুরতে ঘুরতে, টনিবুড়ির দশপাশে ছুটোছুটি করতে করতে, কোঁচড় ভরে কুল কুড়োতে কুড়োতে বাদশা আর তার দিদি সময়ের প্রাচীর পার হয়ে যেন অপু আর দুর্গা হয়ে যায়। আবদুল পকেটমার কিংবা ফালতু হরির বানানো গল্পও বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় (এই আবদুলই কি জেল থেকে বেরিয়ে কবিতার বই ছাপার জন্যে সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে টাকা দেবে বলেছিল?)। আর দেশবন্ধুর মিছরি ছোঁড়ার দৃশ্যটি! পা ছড়িয়ে দোতলার জানলায় বসে আছেন তিনি। মাঝে মাঝে মিছরির টুকরো ছুঁড়ে দিচ্ছেন মাঠে। কয়েদীরা হুটোপুটি কাড়াকাড়ি করে কুড়োচ্ছে। বৃদ্ধ কয়েদী শেখ বাঙালের গম্ভীর মন্তব্য ঃ "বাবু বায়োস্কোপ দেখতে বড়ো ভালবাসতেন।" ভাবা যায় না!

হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো মূল কাহিনীর ধারায় প্রেমের কথাও এসেছে। এ প্রেম যেন পূর্বরাগের পূর্বাভাসই। প্রতিমাদের কাহিনীতে নামের প্রতীকী ব্যাপারটা ছাড়া অন্য কিছু তেমন রক্তমাংস পায় নি। বরং সোনারেনকে নিয়ে হাড়কলে যা ঘটে যায় তাতে অনেক নাটকীয়তা আছে। এবং অসম্ভব সম্ভাবনা নিয়ে উমা শুধু অরবিন্দর পেটে, এবং বুকেও, খোঁচা মেরে দূরে চলে গেছে। অথচ যেতেও তো পারে নি। হাঙ্গেরি থেকে পাঠানো তার পাইপ অরবিন্দ যত্নেই রেখেছে তো!

এইসব ব্যাপারের গা ঘেঁষে সুখের সঙ্গে দুঃখের কি সহবাস! বাদশার বুড়ো বুবু কিরে কেটে টেনে টেনে বের করছে মা-র শেষ কড়িটিও ঃ "বল, ছেলের মাথায় হাত রেখে বল নেই—।" বয়সে বেঁকে যাওয়া শাশুড়ীর চীৎকারের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিদ্বেষে জ্বলে মরছে বউ। পয়সাটা ঠকাস করে মাটিতে ফেলে দিয়ে রাগে হাঁপাচ্ছে। উঠোন থেকে তা কুড়িয়ে নিয়ে খুশিতে নাচতে নাচতে যে চলে যাচ্ছে সে তো তার পেটের ছেলেই। কি যে প্রাণান্ত এ জ্বালা, কতো যে প্রাণে ভরা!

এই প্রাণ, এই জীবন, এই জ্বালা আর এই মানুষই 'হাংরাস'-এর আসল কথা। যে বিপ্লব হয় নি তা নিয়ে কোনো পরিতাপ নেই। কমরেড প্রসাদের চলে যাওয়া এবং কমরেড তোড়করের মঞ্চে আসার মধ্যে দিয়ে পার্টি যেখানে পৌঁছেছে তা নিয়ে কিছু কথা হয়তো বলার আছে।

ইশারায় ইঙ্গিতে কিছু ব্যঙ্গও হয়তো করার আছে (কমরেড চৌধুরী, যাঁকে সবাই শুধু চৌধুরী বলে, জিতেনবাবু ও হরেনবাবুকে তো জেতেনবাবু ও হারেনবাবু-ই বলেন)। কিন্তু কোনও রাগ নেই, বিদ্বেষ নেই। এবং সম্ভবত কোনও বিষাদও নেই। বরং যে বিপ্লব হয় নি, হওয়ার নয় তখনও, তার সৈনিকদলের ভেতর থেকে একটা মানুষ, নির্ভেজাল আস্তো একটা মানুষের জন্ম কিংবা হয়তো পুনর্জন্মের আভাস যেন পাওয়া যায়। এবং তা-ও অত্যন্ত বিনীত ভঙ্গিতে। চিকন ইঙ্গিতে। হাঙ্গারস্ট্রাইক ভাঙার পর আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যে অরবিন্দ যেন "পার্টিকে একটা চিঠি' লেখে। আর আরম্ভটা হল—

"প্রিয় কমরেড, আজ আমার জন্মদিন।...

"চিঠিতে আমি চাইছি পার্টির সদস্যপদ। আমি জানচ্ছি যে, অগ্নিপরীক্ষায় আমি উত্তীর্ণ হয়েছি। আট বছর ধ'রে সদস্য থাকলেও আমি চাইছি সেটা খারিজ ক'রে দিয়ে আমাকে নতুন ক'রে সদস্যপদ দেওয়া হোক।"

এ যেন জীবনের প্রান্ত পেরিয়ে উধাও তত্ত্বের হাত ছাড়িয়ে জীবনের নিয়মেই আবার ফিরে আসা প্রাণের প্রাঙ্গণে। যে প্রাঙ্গণে হয়তো একদিন এমন ভাবনার ফুল ফুটবে, যেতে যেতে এমন এক পথের সঙ্গে দেখা হবে, যেখানে তত্ত্বের বাক্য এবং প্রাণের গান এক এবং একাকার। সেই কারণেই হয়তো অনশনব্রতী অরবিন্দ মোটা মোটা বই পড়ে আর পণ্ডিতদের সাক্ষ্য মেনে জীবনের বাস্তবতা এবং দ্বান্দ্বিকতা বোঝার চেয়ে অন্ত্যজদের পাড়া থেকে ধূলো পায়ে হেঁটে আসা এক তরুণের কাছে জীবনের গান শুনতে বেশি আগ্রহী, যে-জীবনে হাসি-কান্না-প্রেম-দ্বেষ-সুখ-দুঃখ-জয়-পরাজয়-আশা-বিষাদ এবং সমস্ত কিছুই আছে এবং সত্যের মতোই উজ্জ্বল-ম্লান-উজ্জ্বল হয়েই আছে। এই জীবন এবং এই সত্যের ছোঁয়াছুঁয়ি থাকে না বলেই তো যে-বিপ্লব হয় না, হওয়ার নয়, সেই বিপ্লবের বন্ধ্যা মন্ত্র জপ করতে করতে অরবিন্দর ছোটমামা আম্মার কাছ থেকে সরে যেতে যেতে বিলেত চলে যায়। আর ফেরে না। আসলে আমরা তো চাই এমন এক বিপ্লব যা আম্মাকে যেমন গোর্কির মা করে তুলবে, ছোটমামাকেও করে তুলবে পাভেল। এবং প্রাণ দেওয়া নেওয়া খেলা নয়, বিপ্লব হয়ে উঠবে মানুষের প্রাণবন্যার অনন্ত উৎসবের উৎস, সৃষ্টির উদার আকাশ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস 'হাংরাস'—নামেই যার মাটির সোঁদা গন্ধ, কারখানা থেকে বেরিয়ে আসা মানুষের শরীরের ঘাম আর কালির স্পর্শ—আসলে হয়তো সেই বিপ্লবের পক্ষে প্রয়োজনীয় মানুষগুলোকে বোঝার, খোঁজার, এক আশ্চর্য আন্দোলনেরই পূর্বাভাস।

হাংরাস।। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বিশ্ববাণী প্রকাশনী। কলকাতা।। ১০ টাকা।

পৌষ-মাঘ ১৩৮০

সাক্ষাৎকার

চিঠিপত্র

রচনাপঞ্জী

একটি সাক্ষাৎকার : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

[গত ২০০২ সালের নভেম্বর মাসের এক সন্ধ্যায় কিছু প্রশ্ন নিয়ে হাজির হয়েছিলাম সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ডা. শরৎ ব্যানার্জী রোডের বাড়িতে। উপলক্ষ্য 'পরিচয়' বিষয়ক গবেষণার সূত্রে কিছু তথ্যসন্ধান। লক্ষ্য বর্ণময় মানুষটির সঙ্গে আলাপিত হওয়া। কবির দৃষ্টিশক্তি তখন ক্ষীণ শ্রবণশক্তি প্রায় সম্পূর্ণই লোপ পেয়েছে। বড় বড় হরফে লেখা স্বল্প কিছু সংক্ষিপ্ত প্রশ্নই শুধু তাঁকে করা সম্ভব হয়েছিল। ঈষৎ জড়ানো উচ্চারণে সেই একপাক্ষিক আলাপচারিতা আমাদের টেপরেকর্ডারে তোলা আছে। শারীরিকভাবে অশক্ত অবস্থায়ও তাঁর সহজ হাস্যময় উপস্থিতি আর হৃদয়ের আন্তরিক উত্তাপে কোনো ভাটা পড়েনি। সেই সন্ধ্যার বিবরণ এখানে লিপিবদ্ধ রইল। লিখিত প্রশ্নগুলির আগে [লি] চিহ্ন দেওয়া হল।]

শ্রীলা বসু

সুভাষ ঃ তুমি কি কয়েকটা প্রশ্ন দিয়ে গিয়েছিলে...না?

শ্রীলা ঃ [লি] নমস্কার। আমার নাম শ্রীলা বসু। কাটোয়া কলেজে পড়াই। আমার গবেষণার বিষয় : 'পরিচয়' পত্রিকায় রবীন্দ্র প্রসঙ্গ। অশ্রুবাবুদের (শিকদার) সঙ্গে আপনার কাছে এসেছিলাম দিন দুয়েক আগে।

সুভাষ ঃ (মাথা নেড়ে) তুমি চা খাও তো?

শ্রীলা ঃ এখন খাবো না।

সুভাষ ঃ খাবে খাবে। এই আলোটা নিবিয়ে দে আর একটু চা করে দে। সিগারেট খেলে অসুবিধে হবে না তো?

শ্রীলা ঃ (মাথা নেড়ে) না।

[লি] আপনি কীভাবে কবে থেকে 'পরিচয়'-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন?

সুভাষ ঃ পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত হওয়া নয়, প্রথম লেখা দিয়ে শুরু। আমি তখন স্কটিশ চার্চে পড়ি। 'পরিচয়' তখন ত্রৈমাসিক ছিল এবং পরিচয়ে লেখা বার হওয়া তখন খুব একটা জাতে ওঠা বোঝাত। আমি তখন থার্ড ইয়ারে পড়ি—স্কটিশ চার্চ। আমি একটা কবিতা পাঠাই 'এখানে' বলে কবিতাটা। ওরা আমাকে লিখে জানায় যে আপনার কবিতাটি ছাপা হবে ফলে আমার খুব আনন্দ হয়। বোধহয় একদিন ইস্কুল থেকে—এই—কলেজ থেকে ফেরবার পথে—তখন পরিচয়ের আপিসটা ছিল আগে যেটা সিগনেটের বইয়ের দোকান ছিল সেইখানে। সেখানে তখন...নাম ভুলে যাচ্ছি সব...যিনি থাকতেন দোকানে...সেখানে গিয়ে পরিচয় একটা নিলাম—তাঁর সঙ্গে আলাপ হল। এই হচ্ছে প্রথম পরিচয়ে আমার লেখা ছাপা। তারপরে—ওই একই সময়ে তখন আমার কবিতা নানা পত্রিকায় বেরোত। কবিতা পত্রিকায় বেরোতে লাগল। সেই সূত্রে সেইসময় বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে এঁদের সঙ্গে আলাপ হল। এবং বিষ্ণুবাবুর বাড়িতে যাতায়াত শুরু করলাম। এবং তাঁরই সঙ্গে প্রথম আমি, সমর সেন, বিষ্ণুবাবু আমরা

সব পরিচয়ের আড্ডায় শ্যামবাজারে সুধীন দত্তের বাড়িতে যেতাম। এইভাবে পরিচয়ের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হল। এই...। পরে একটা সময় তখন পরিচয় ত্রৈমাসিক মাসিক হয়েছে এবং আস্তে আস্তে প্রায় উঠে যাওয়ার অবস্থায় এল সেই সময় কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েকজন সুশোভন সরকার এবং কয়েকজন মিলে—হিরণ সান্যাল এরা সব মিলে পরিচয়টাকে কিনে নেওয়া হল—খুব অল্প টাকায়। এভাবে পরিচয়ের সঙ্গে—

শ্রীলা ঃ [লি] চল্লিশের দশকের মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে আপনারা শ্রদ্ধা করতেন কাদের?

সুভাষ ঃ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী বলতে যাদের আমরা শ্রদ্ধা করতাম—ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, হীরেন মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র—সব নাম মনে পড়ে না (হাসি)...পার্টির সঙ্গে যোগ ছিল—কম্যুনিস্ট পার্টির খুব পদস্থ ছিলেন এবং নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন হীরেন মুখার্জী।

শ্রীলা [লি] সুশোভন সরকার বা হিরণকুমার সান্যাল যাঁরা পার্টি মেম্বার নন তাঁরা মার্কসবাদী মহলে কতখানি সম্মান পেতেন?

সুভাষ ঃ ও সুশোভন সরকার (বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে—আগের প্রশ্ন) সুশোভন সরকার যদিও পার্টির সদস্য ছিলেন না কিন্তু পার্টির নেতারাও তাঁকে খুব সম্মান করতেন। তার কারণ প্রেসিডেন্সি কলেজে পরবর্তী যুগে যাঁরা মার্কসবাদে খুব অধিকারী হয়েছিলেন যেমন নিখিল চক্রবর্তী এবং আরও অনেকে, যাঁরা আমাদেরও সমসাময়িক ছিলেন, প্রদ্যোৎ গুহ...এঁরা এখনকার...রণজিৎ গুহ...এঁরা সবাই শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু হিরণ সান্যালকে ঠিক মার্কসবাদী বলা যায় না—সহানুভূতি ছিল—কিন্তু হিরণদাকে—হাবলদাকে আমরা অনেকটা রাবীন্দ্রিক বলেই মনে করতাম।

শ্রীলা ঃ [লি] 'পরিচয়'-এর সম্পাদক নির্বাচন হত কীভাবে?

সুভাষ ঃ আগে তো ত্রৈমাসিক যখন ছিল তখন তো সুধীন্দ্রনাথ দত্তই ছিলেন। তারপর যখন হস্তান্তর হয় খানিকটা তার ওপর কম্যুনিস্ট পার্টির যাঁরা ছিলেন তাঁরা খানিকটা নিয়ন্ত্রণে রাখতেন। রাখলেও পুরোনো পরিচয়ের যে আড্ডাটা সেটা কিন্তু থেকে গিয়েছিল। যদিও সুধীনবাবুর বাড়িতে নয়। নানা লোকের বাড়িতে হত। সুধীনবাবুর পরে বোধহয় গোপাল হালদার—

শ্রীলা ঃ হিরণ সান্যাল হয়েছিলেন।

সুভাষ ঃ হিরণ সান্যাল যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন। পরে খানিকটা পার্টিই ঠিক করে দিত কে সম্পাদক হবেন। অবশ্য তার সঙ্গে থাকত সুশোভনবাবুর পরামর্শ।

শ্রীলা ঃ [লি] আপনার ঠিক আগে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সুশীল জানা ও মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়। তাঁরা সরে গেলেন কেন?

সুভাষ ঃ আচ্ছা এর আগে কে ছিলেন?

শ্রীলা ঃ গোপাল হালদার।

সুভাষ ঃ গোপাল হালদার।

শ্রীলা ঃ (পরিচয়ের সম্পাদকের কালানুক্রমিক তালিকা লিখে সুভাষকে দেখানো)

সুভাষ ঃ ও নীরেন্দ্রনাথ। ওই আর একটা নাম তলায় add কোরো মার্কসবাদী...। এটা যেন নানা কারণে নীরেনদা গোপাল হালদার—নীরেনদা মস্কো চলে গেলেন—তারপর...তারপরে বোধহয়—চিন্মোহন সেহানবীশ হয়েছিলেন কি?

শ্রীলা ঃ না

সুভাষ ঃ হননি?

শ্রীলা ঃ গোলাম কুদ্দুস

সুভাষ ঃ অ্যাঁ?

শ্রীলা ঃ কুদ্দুস

সুভাষ ঃ অ্যাঁ?

শ্রীলা ঃ [লি] গোলাম কুদ্দুস আর সরোজ দত্ত।

সুভাষ ঃ এঁরা সম্পাদক হয়েছিলেন?

শ্রীলা ঃ এক বছরের জন্যে

সুভাষ ঃ আমার সব মনে নেই যেন...তখন পরিচয়ের অবস্থা খুব...বরাবরই খারাপ ছিল...না বিস্কুট [খাবো] না—আমি তখন জেলে ছিলাম...সেই সময় সুশীল জানা আর মঙ্গলাচরণ করত। পরিচয়টা—পরিচয়ের একেবারে অর্থানুকূল্য ছিল না। পার্টি বোধহয় কিছুটা সাহায্য করত। পরে যখন পার্টি উনিশশো আটচল্লিশ সালের পরে—তিপান্ন সাল—সময়—তখন পার্টির ভাঙা অবস্থা। কাজেই পার্টি কোনো সাহায্য করত না। তখন আমার ঘাড়ে। আমি তখন বেরিয়েছি জেল থেকে। আমার ঘাড়ে এসে পড়ল। ঘাড়ে আসা মানে কাগজের টাকা ধার করা, জোগাড় করা, বিজ্ঞাপন জোগাড় করা সমস্ত ভারই আমাকে বহন করতে হত। আর তাছাড়া নিজের পয়সায় বাসভাড়া দিয়ে যাওয়া আসা। কাজেই এই কাজের জন্যে লোক পাওয়া কঠিন হত। কাজেই জেল থেকে বেরোতেই তখন আমাকে এই কাজে জড়িয়ে নিল।...ননী ভৌমিক হয়েছিল না?

শ্রীলা ঃ পরে হয়েছিলেন। কে জড়াল সম্পাদনায়?

সুভাষ ঃ পার্টি থেকে।

শ্রীলা ঃ [লি] গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ এঁদের সম্পর্কে কিছু বলুন।

সুভাষ ঃ পার্টিতে গোপালদার যে কাজের ভার সেটা ছিল কৃষক সভার। নীরেনদা তো অধ্যাপনা করতেন এবং পার্টির ক্লাস নিতেন মার্কসবাদ পড়াতেন। নীরেনদা ছিলেন পুরোনো পরিচয়ের ঐতিহ্যের—এবং মস্কো যাওয়ার আগে পর্যন্ত ওঁর ঘাড়ে পরিচয়ের ভারটা ছিল সেই সঙ্গে গোপালদাও ছিলেন। কিন্তু গোপালদাকে পার্টির আরও নানা কাজে—সভা সমিতি—এই সমস্ততে ব্যস্ত থাকতে হত। ওঁকে সাহায্য করতেন চিন্মোহন সেহানবীশ। আর একজনের কথা আমি জানি না তুমি পেয়েছো কিনা...ও কখনও সহ সম্পাদক ছিল কি—মজুমদার—সেই ছিল পরিচয়ের আসল প্রাণ—আসল কাজ চালাত। আহা আমি প্রথম নামটা ভুলে যাচ্ছি—

শ্রীলা ঃ সম্পাদক হিসেবে মজুমদার কারোর নাম নেই।

সুভাষ ঃ নাম নেই না? তুমি জিজ্ঞেস কোরো কী মজুমদার, একজন আছেন নাম জানো অতীন মজুমদার—তাঁর দাদা—লেখায় হয়তো পাবে কিংবা প্রকাশক—রবীন মজুমদার

শ্রীলা ঃ হ্যাঁ, প্রকাশক

সুভাষ ঃ ওই ছিল প্রাণ পরিচয়ের, আসল কাজ চালাত। আর একজনের নাম—অচিন্ত্য দাশ—কিংবা কিছু হবে...সে ওই কাগজ আনা, প্রেসে তদারকি করা, সমস্ত কাজ শারীরিক যেটা সেই কাজটা করত—ওর নামটাও থাকা উচিত। দেখো তো পরিচয়ে কোথাও নাম পাবে অচিন্ত্যর। ও কখনও লেখেনি, লিখত না, লেখাপড়া কম জানত। কিন্তু ও সেই কাগজ জোগাড় করা, প্রেসে দেওয়া, আপিস ঠিক রাখা, সব কাজ করত।

শ্রীলা ঃ [লি] আর রবীন মজুমদারের কাজ বলতে—

সুভাষ ঃ রবীন মজুমদার সমস্ত কাজ—প্রুফ দেখা থেকে আরম্ভ করে, লেখা জোগাড় করা—সব কাজ সেই করত। ম্যানেজার বলতে যা বোঝায়।

শ্রীলা ঃ [লি] পি. সি. যোশীর পর রণদিভে লাইন বা ভবানী সেনের থিসিস নিয়ে একসময় প্রচুর বিতর্ক হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কী?

সুভাষ ঃ আমার তো সব মনেও পড়ে না—

শ্রীলা ঃ [লি] রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে মার্কসবাদী মহলের ধ্যানধারণা তখন কেমন ছিল? বুদ্ধিজীবীদের আর নেতাদের—

সুভাষ ঃ তুমি তো জানো যে ১৯৪৮-এর পরে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে পার্টির—তাঁর সম্পর্কে ধারণা ছিল যে রবীন্দ্রনাথ প্রতিক্রিয়াশীল—জমিদার—এই সমস্ত। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে মোটামুটি আমরা মেনে চলতাম। কিন্তু যখন সেই রণদিভে পিরিয়ডে ভবানী সেন একটা লিখলেন—রবীন্দ্রনাথকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে। অবশ্য পরে—

শ্রীলা ঃ মত বদলে নেন

সুভাষ ঃ ব্যাপার হচ্ছে কী বুদ্ধিজীবীরা আটচল্লিশ সালের আগে পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকে তো অগ্রাহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু একটা ভাব ছিল যে রবীন্দ্রনাথ ঠিক আমাদের তো নয়—এরকম একটা ভাব। অবশ্য আটচল্লিশ সালের পর আবার সেটা বদলে যায়।

শ্রীলা ঃ [লি] 'পরিচয়'-এর সম্পাদক জীবনে আপনি কোনো বিধিনিষেধ অনুভব করেছিলেন? পারিপার্শ্বিকের কোনো চাপ?

সুভাষ ঃ হ্যাঁ, এ তো বটেই। কেননা পরিচয়ের উপর পার্টির একটা দখল ছিল এবং পার্টি সদস্যদের বলা হত পরিচয় বিক্রি করতে এবং গ্রাহক হতে। এবং তখন খুব একটা সংকীর্ণতাবাদী ঝোঁক ছিল ওপরমহলে তো বটেই নিচের মহলেও। কেননা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার। ফলে আমাদের প্রায়ই বেগ পেতে হত—পার্টি সদস্যদের। তারা কোনোরকম অমার্কসবাদী লেখা বেরোলেই তারা এসে অভিযোগ করত তার প্রতিবাদ করত। এবং একটা ঝোঁক ছিল যাতে পার্টির লোকেদেরই লেখা ছাপা হয়, পার্টির বাইরের লোকদের লেখা ছাপা হলে তারা অসন্তুষ্ট হত। ফলে যখন সম্পাদক হলাম আমি নানা ধরনের চাপ আমার ওপর

আসতে লাগল। আমি তখন পরিচয়কে খানিকটা লিবারেল করার চেষ্টা করেছিলাম। তাতে পার্টির কিছু লোক খেপে গেল এবং তারা নালিশ করে পার্টির কর্তাদের কাছে এমন অবস্থা করল যে আমি ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম।

শ্রীলা ঃ [লি] 'পরিচয়' তখনও অর্থনৈতিক কারণে কম্যুনিস্ট পার্টির উপর নির্ভরশীল।

সুভাষ ঃ পার্টি তো কিনে নিয়েছিল পরিচয়টা। এবং গোড়ায় গোড়ায় অর্থ সাহায্যও করত। পরে আর সেটা থাকেনি কারণ পার্টির তখন ভাঙা অবস্থা।

ও একটা জিনিস বলে নিই। যখন পরিচয়ের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ...আমি তখন সম্পাদক ছিলাম—তখন উপায়ান্তর না দেখে আমি তখন পার্টিকে রাজি করিয়ে একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি করি। শেয়ারে টাকা তুলে...পঁচিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা করে নিই—লিস্ট দেখবে পরিচয়ে—আচ্ছা, তার মধ্যে সুশোভন সরকার ছিলেন। সুশোভনবাবু—আমার তো টাকা ছিল না—আমি কিনতে পারিনি—সুশোভনবাবু নিজের নামে হতে পারেননি কেননা উনি তখন সরকারি চাকরি করতেন। উনি আমার নামে শেয়ার কিনেছিলেন পঁচিশ টাকার—কিন্তু নামেই প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি জানো। আমরা কোনো নিয়মকানন মানিনি এখনও মানা হয় না। অডিট হয়নি মিটিং হয়নি শেয়ার হোল্ডারদের। এখনও তো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি কিন্তু সবটাই বেআইনি ভাবে চলে। (হাসি) প্রথমে তো নাম কো ওয়াস্তে...

একটা কথা বলতে পারি, আমি এটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি পার্টির লোকেদের যে পরিচয় পার্টির মুখপত্র নয় এর একটা আলাদা ঐতিহ্য আছে এটা সর্বসাধারণের কাগজ। কাজেই সাধারণ লোক যা চায় সেই মতো কাগজটাকে করা দরকার। এই নিয়ে খুব আমার সঙ্গে লড়াই হয়েছে। যাঁরা একটু গোঁড়া ধরনের ছিলেন তাঁরা এটা পছন্দ করতেন না...আমার মতটাকে। এবং আমি বলি যে পরিচয়ের উচিত নিজের পায়ে দাঁড়ানো। যাতে আরও বেশি গ্রাহক হয়, আরও বেশি লোকে কেনে। এটা—এই দৃষ্টিভঙ্গি পার্টির অনেকেরই পছন্দ ছিল না।

এখন পরিচয় অনেক খোলামেলা হয়েছে তাই না?

তোমার নামটা আর একবার বলো না।

২৪/১১/২০০২

চিঠিপত্র

কলকাতা
২৬/৫/১২

প্রিয়বরেষু,

সাদর অভিনন্দন।

আপনার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমি আনন্দিত।

ভাবছিলুম আমাকে যদি না দেওয়া হয় কাকে দেওয়া হবে। আপনাকে দেওয়া ঠিকই হয়েছে। আপনার মতো কর্মময় জীবন ও অনিশ্চিত জীবনযাত্রা আর কার? আপনি শুধু ঘরে বসে কবিতা লেখেন নি। মাঠে ঘাটে কয়েদখানায় ঘুরেছেন। জেলখানায় কি না কষ্ট করেছেন। তবে আপনার মতো কয়েকজন বেপরোয়াকে আমি ও আমার সহযোগীরা মুক্তি দিতে সুপারিশ করেছিলুম। সেটা ১৯৪৯-৫০ সালে।

গীতাকে ও আপনাকে প্রীতি নমস্কার। লীলা রায় বিশেষ অসুস্থ। নইলে তিনিও সঙ্গে আশিস পাঠাতেন। ইতি

আপনাদের
অন্নদাশঙ্কর রায়

পুনশ্চ,

আপনিই একমাত্র লেখক যিনি পুরস্কার পেয়ে লজ্জিত ও embarassed বোধ করেন। আপনার বাংলা ও ইংরাজী TV interview আমার খুব ভালো লেগেছে।

Si Gopal Haldar M. A. B. L. Dlitt.
WRITER AND JOURNALIST
C.I.T Bldgs. H/19
Calcutta-14 Phone-445601

'SHRIVASTU'
ROAD-6—RAJENDRANAGAR
Patna-16—800016

২৬/৫/৯২

পরম কল্যাণীয়েষু

সুভাষ! আজ কাগজে তোমার স্বীকৃতি প্রাপ্তি ও পুরস্কারের ঘোষণায় পরম আনন্দ লাভ করেছি। আমাদের সস্নেহ কল্যাণ কামনা জেন—পূর্ণতর শুভতর মহত্তর সৃষ্টিশীলতার মধ্য দিয়ে সতত নিজেকে অবারিত অবাধিত করো। বহুকালের পরিচয়। অতি অল্প বয়স থেকে তোমাকে পথ খোঁজার তপস্যা করতে হয়েছে যাঁরা দেখেছেন আমিও তাঁদের মধ্যে একজনা-এখনও আছি একথা ভাবতে ভাল লাগে। আমি এবৎসর নব্বই বর্ষ বয়স অতিক্রম করেছি—দেখা যদি আর নাও হয় আমার স্নেহ ভালোবাসা তোমার কাছাকাছি রইল। আশা করি সপরিবার সকলে ভাল আছ। জীবনসায়াহ্নে এসে যে মানি "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ, পরধর্ম্ম ভয়াবহঃ"—সে বাণী তোমার জীবনে উদ্বোধিত হ'ক সৃজনশীলতার মধ্য দিয়ে। জয় হ'ক মানুষের। অলমিতি বিস্তরেণ। ইতি

শুভার্থী
গোপাল হালদার

শ্রীমান্ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুহৃদ্বরেষু—

জীবনে আজ একটি পরম আনন্দের দিন। সুহৃদ্‌রূপে, সহযাত্রীরূপে, সাহিত্যের সহযোগী রূপে আপনাকে আমরা চিরদিন বুকভরা আলিঙ্গন ও প্রাণভরা অভিনন্দন জানিয়েছি—চিরদিনই আপনি আমাদের সকলের প্রিয়। আপনার প্রতিভার সম্মানে আমরাও আজ সম্মানিত। আপনি আমাদের সকলের গৌরব।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে আপনি যখন সাহিত্যক্ষেত্রে 'পদাতিক'-পরিচয়ে প্রবেশ করেছিলেন, তখনো আপনার আবির্ভাব কারুর অলক্ষিত ছিল না। 'প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য'—শুনে সাহিত্যরসিকের আশা ও সংশয় একই কালে জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। জীবন রসিকের উৎকর্ণ চেতনা খুঁজেছিল নতুন বাণী। আর মানুষের মুখ আপনার চোখের মধ্যে চাইছিল নতুন আশ্বাসের আলোক।

তারপর পঁচিশ বৎসরের মধ্য দিয়ে আপনি অনেক পথ পেরিয়ে এসেছেন—শপথ ছিল 'হতাশার কালো চক্রান্তকে ব্যর্থ করার; 'স্বপ্ন একটি পৃথিবী গড়ার'; 'অগ্নিকোণে'র তল্লাট জুড়ে দুরন্ত ঝড়ে রক্তের দামে রক্তের ধার শুধবার।' আশায় ভরা নিরাশায় ছাওয়া সেই পথে কদাচিৎ পেয়েছেন ফুলের স্পর্শ, প্রতিপদে পেয়েছেন কাঁটার আঘাত। সেই মূল্যেই আপনি কিনেছেন কাব্যলক্ষ্মীকে, আর জীবন রসিকেরা আপনার কণ্ঠে শুনেছেন জীবনলক্ষ্মীর গান

'মৃত্যুটা যত বড়ই হোক্ না
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।'

আপনার সহযাত্রীরা জেনেছে তাঁদের ধ্যাননন্ত্র 'ফুল ফুটুক'—

'হিরণ্যগর্ভ দিন
হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি নিয়ে আসছে।'

আপনার মুখ চেয়ে আমরাও পেয়েছি বিশ্বের অন্তরলক্ষ্মীর উদ্দেশ—

'আমি যত দূরেই যাই
আমার সঙ্গে যায়
ঢেউয়ের মালা গাঁথা
এক নদীর নাম
আমি যত দূরেই যাই
আমার চোখের পাতায় লেগে থাকে
নিকোনো উঠোনে
সারি সারি লক্ষ্মীর পা
আমি যতদূরেই যাই।'

বাংলার পল্লীলক্ষ্মীর মধ্যে বিশ্বলক্ষ্মীর এই আভাস আপনার চোখের পাতায় লেগে থাকে। আপনার চোখে চোখ রেখে, হাতে হাত মিলিয়ে, বুকে বুক দিয়ে আমরাও বিশ্বাস করি, বিশ্বের এই অন্তরলক্ষ্মীর দিকেই, আপনার মতোই, আমাদেরও এই লক্ষ্মীহারা লক্ষ জীবনের অভিযান।

পঁচিশ বৎসর পূর্বেকার সংশয় আজ বিদূরিত। আশা সার্থক, বাণী বিজয়ী। আপনি সাহিত্যে নতুন চেতনা সঞ্চার করেছেন। জীবনকে দিয়েছেন নতুন মহিমা, মানুষকে নতুন বিশ্বাস।

'আশ্চর্য সুন্দর' সেই সত্যে আপনার মুখ মিছিলের সকলকার মুখে জোগায় নতুন আশ্বাস। সুভাষ, আপনি আপনার সহযাত্রীদের সকলকার ভালোবাসা গ্রহণ করুন—আপনার নিরাপদ হাতে সেই ভালোবাসাগুলো পৌঁছে যাক চিরদিনের মানুষের বলিষ্ঠ হাতে!! ইতি—

গোপাল হালদার

পরিচয় সম্পাদকমণ্ডলী

পরিচয়, মাঘ, ১৩৭১

স্নেহাস্পদেষু,

সুভাষ, তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। আমার ভয় ছিল যে চিঠি তোমাকে দিয়েছিলাম তাতে বুঝি একটু আঘাত পেয়েছো বলে জবাবে দেরি হ'চ্ছে। আঘাত অবশ্য আমরা সবাই এভাবে পত্রালাপে কিম্বা সাম্‌নাসামনি কথাবার্তাতেও পরস্পরকে কতকটা দিয়ে ফেলি। জানি না, জগৎটা বড়ো জটিল। তবে তুমি যে অল্প কথায় এমন সুন্দর একটা চিঠি আমাকে দিলে—এটা আমি 'ভাগ্য'-এর একধরনের 'আশীর্বাদ' বলেই যেন নিলাম। আর তোমার মতো একজনকেও 'ছাত্র' বলে দাবি করার 'অহংকার' একটু রাখব বই কি!

চিঠি পেয়েই জবাব দিচ্ছি। নইলে খেই হারিয়ে ফেলব। একটানা লিখছি, ভাবছি আর কাগজে অক্ষর আঁকছি—অনেক কথা সর্বদা মনে এখন এত ভিড় করে যে গুছিয়ে কিছু বলতে পারি না।

তোমার মনের বেদনা অন্তত কতকটা বুঝতে পারি। নানাভাবে সেটা আমি যে 'বেদনা' বহুকাল ধরে বয়ে বেড়াচ্ছি, তার চেয়ে নিদারুণ। তোমার সরল সহজ সুন্দর কবি-মন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে জগৎজোড়া এক লড়াইয়ে, সারা দুনিয়ার মানুষকে বদ্‌লে নতুন 'সংসার' বানাবার লড়াইয়ে। কী অপরূপ 'reportage' বাংলার গ্রাম আর গ্রামবাসীদের নিয়ে তুমি লিখেছো! আর কত গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েছিলে পার্টির জীবনে। আমি তো তুলনায় থেকেছি অনেকটা 'রবাহুত'—পার্টির সরকারী নেতৃত্বের কাছে অনেকাংশে অবাঞ্ছিত, নিজেও কেমন একটা 'অস্বস্তি'র মধ্যে। এজন্য একটু 'detachmanet' সর্বদা রেখেছি—যা হয়তো একদিক থেকে আমায় আন্দোলনের মধ্যেই নিঃশ্বাস ফেলতে সহায় হয়েছিল। তোমরা কেউ কেউ আমার চেয়ে ঢের নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ছিলে বলেই অনেকগুলো 'কাণ্ড' জমে উঠে। সোভিয়েটসহ বহু দেশে, একটা বাস্তবে 'প্রতিবিপ্লব' গর্বাচেভ-নেতৃত্বে যে ঘট্‌ল, (এর পূর্বকথা এদেশেও) তার ধাক্কায় নিজেকে 'ছিট্‌কে' না নিয়ে পারলে না। বুঝিয়ে বলতে পারলাম না; আশা করি তুমি নিজগুণে আমার অন্তরের কথাটা আন্দাজ করে নিতে পারবে।

আমার কষ্ট এই যে "The God that Failed" স্থির করেছিলেন, তাদের প্রকৃত (এবং মানবিকতায় গ্রাহ্য) জবাবদিহি পাইনি। এটা বুঝি যে বোধহয় তোমার মতো যারা তাদের কাছে 'God' 'fail' করেনি। 'পাণ্ডা'রা করেছে। কিন্তু যতই কঠোর হোক, দুনিয়াটাকে বদ্‌লাবার লড়াই তো চালাতেই হবে—আর তা চলবেই, যদি না যন্ত্রের প্রাবল্য আর অর্থের অনন্ত দাপট মানুষের মনটাকেই ঠেলেঠুলে পিষে না ফেলতে পারে। থাক্ এসব কথা। তোমার চিঠি আমার মনকে একটু যেন সান্ত্বনা দিচ্ছে—তুমি এখনও আমাদের কাছে আগেকার সুভাষই হয়ে আছ। যথাসম্ভব ভালো থেকো। বধিরতায় আমিও ক্লিষ্ট, তবে কোনক্রমে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি।

ভালো থেকো। ভালোবাসা জেনো। অসংলগ্ন চিঠির জন্য মার্জনাও চাইছি!

শুভার্থী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

শ্রীমান্ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

স্নেহের সুভাষ,

আজ এক দৈনিকে তোমার অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে যাবার খবর পেয়ে দুশ্চিন্তায় পড়লাম। এভাবে তোমরা অসুস্থ হতে থাকলে চলবে কেন? আমার যে আর এই 'অজর অমর' হয়ে বেঁচে থাকতে ভালো লাগছে না। সেদিন একটা সভায় তুমি আসবে জেনেও যেতে পারিনি। সে যাক্, তুমি চট্ করে সেরে ওঠো—এবং লেখো, লেখো, লেখো। এখনও তোমার কলম থেকে দেশ আরও কিছু চাইছে। আর লিখতে পারো বা না পারো ভালো থেকো—নইলে আমার মতো লোক বাঁচি কেমন করে। টানা ক'লাইন লিখলাম। বেঁকে গেল—কত কাল আর চালাব?

ভালো থেকো, অনেক ভালোবাসা জেনো।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনাপঞ্জি

সংকলক : **প্রণব বিশ্বাস**

বই-এর বিষয়গত তালিকা

কবিতা

১.	পদাতিক	(ফেব্রুয়ারি ১৯৪০)
২.	অগ্নিকোণ	(অক্টোবর ১৯৪৮)
৩.	চিরকূট	(এপ্রিল ১৯৫০)
৪.	সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা	(১৯৫৭)
৫.	যত দূরেই যাই	(মে ১৯৬২)
৬.	কাল মধুমাস	(মে ১৯৬৬)
৭.	এই ভাই	(সেপ্টেম্বর ১৯৭১)
৮.	ছেলে গেছে বনে	(ফেব্রুয়ারি ১৯৭২)
৯.	একটু পা চালিয়ে ভাই	(মে ১৯৭৯)
১০.	জল সইতে	(মে ১৯৮১)
১১.	চইচই চইচই	(মার্চ ১৯৮৩)
১২.	বাঘ ডেকেছিল	(সেপ্টেম্বর ১৯৮৫)
১৩.	যা রে কাগজের নৌকা	(ফেব্রুয়ারি ১৯৮৯)
১৪.	ধর্মের কল	(জানুয়ারি ১৯৯১)
*১৫.	ফুল ফুটুক	
	(স্বতন্ত্র গ্রন্থ হিসেবে প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ১৩৯৯)	
*১৬.	একবার বিদায় দে মা	(অক্টোবর ১৯৯৫)
*১৭.	ছড়ানো ঘুঁটি	(বইমেলা ২০০১)

ছড়া

১.	মিউ-এর জন্য ছড়ানো ছিটানো	(জানুয়ারি ১৯৮০)
*২.	সাত সকালের ছড়া	(জানুয়ারি ২০০০)
*৩.	বকবকম	(জানুয়ারি ২০০১)
*৪.	হরে কর কমবা	(বইমেলা ২০০৩)

অনুবাদ কবিতা

১.	নাজিম হিকমতের কবিতা	(এপ্রিল ১৯৫২)
২.	দিন আসবে	(জুলাই ১৯৬১)
৩.	পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ	(এপ্রিল ১৯৭৩)
৪.	রোগা ঈগল	(ডিসেম্বর ১৯৭৪)
৫.	নাজিম হিকমতের আরো কবিতা	(বৈশাখ ১৩৮৬)
৬.	পাবলো নেরুদার আরো কবিতা	(এপ্রিল ১৯৮০)
৭.	হাফিজের কবিতা	(ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪)
*৮.	চর্যাপদ	(মে ১৯৮৬)
*৯.	অমরু শতক	(জানুয়ারি ১৯৮৮)
*১০.	গাথা সপ্তসতী	(ডিসেম্বর ১৯৮৯)

কবির নিজের কবিতার বই-এ ছড়িয়ে আছে দেশি বিদেশি কয়েকজন কবির কবিতার অনুবাদ। তার তালিকা :

	কবি/কাব্যগ্রন্থের নাম	কবিতার সংখ্যা	
১.	চর্যাপদ	৫টি পদ	ছেলে গেছে বনে
২.	শাহরিয়ার (উর্দু)	২	ছেলে গেছে বনে
৩.	ৎভারদভ্স্কি (রুশ)	১	ছেলে গেছে বনে
৪.	তু-ফু (চীনা)	২	ছেলে গেছে বনে
৫.	এরিখ ভাইনার্ট (জার্মান)	১	ছেলে গেছে বনে
৬.	তিনটি পুরোনো গ্রীক কবিতা	৩	ছেলে গেছে বনে
৭.	রাইনর মারিয়া রিলকে (ফরাসি)	১	ছেলে গেছে বনে
৮.	হেরমান হেসসে (জার্মান)	১	ছেলে গেছে বনে
৯.	ফেদেরিকো গার্থিয়া লরকা (স্প্যানিশ)	২	একটু পা চালিয়ে ভাই
১০.	সেসার ভালেহো (স্প্যানিশ)	২	একটু পা চালিয়ে ভাই
১১.	মহাকবি ভাল্লাথোল (তামিল)	১	একটু পা চালিয়ে ভাই
১২.	আলেকজান্দার সলঝেনিৎসিন (রুশ)	৪	একটু পা চালিয়ে ভাই
১৩.	সি. এফ. এন্ড্রুজ (ইংরেজ)	১	একটু পা চালিয়ে ভাই
১৪.	রবার্ত রোজদেস্তভেনস্কি (রুশ)	৩	জল সইতে
১৫.	নাজিম হিকমত (তুর্কি)	১	জল সইতে
১৬.	লাৎভিয়ার লোকমুখে	৮	চই চই চই চই
১৭.	মারিস চাকলাইস (লাৎভিয়া)	১	চই চই চই চই
১৮.	ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ (উর্দু)	১	বাঘ ডেকেছিল
১৯.	সদুক্তি কর্ণামৃত (সংস্কৃত)	১	বাঘ ডেকেছিল

২০.	রাজশেখর (”)	১	বাঘ ডেকেছিল
২১.	গোবর্ধনাচার্য (”)	১	বাঘ ডেকেছিল
২২.	আলেকজান্দার ব্লক (রুশ)	১	যারে কাগজের নৌকো
২৩.	পারভেজ শহীদী (উর্দু)	১৩	যারে কাগজের নৌকো
২৪.	জর্জ সেফেরিস (গ্রীক)	১	ধর্মের কল
২৫.	মিখাইল শাৎরভ (লালঘাসে নীল ঘোড়া নাটকের গান) (রুশ)	৬	ধর্মের কল
২৬.	ডি. এইচ. লরেন্স (ইংরেজি)	৩	একবার বিদায় দে মা
২৭.	কেওয়াপেটসে খোসিট সিলে (দক্ষিণ আফ্রিকা)	১	একবার বিদায় দে মা
২৮.	আহমেদ তিজানি সিফে (”)	২	একবার বিদায় দে মা
২৯.	ইয়েহুদা খামিচাই (ইজরায়েল)	৩	একবার বিদায় দে মা
৩০.	চীরবাসে বীর (হাঙ্গেরীয়)	১	

উপন্যাস

১.	হাংরাস	(বৈশাখ ১৩৮০)
২.	কে কোথায় যায়	(জুলাই ১৯৭৬)
৩.	অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ	(বৈশাখ ১৯৩০)
*৪.	কাঁচাপাকা	(আগস্ট ১৯৮৯)
৫.	কমরেড, কথা কও	(জানুয়ারি ১৯৯০)

অনূদিত উপন্যাস ও গল্প

১.	কত ক্ষুধা (মূল রচনা So many Hunger—ভবানী ভট্টাচার্য)	(১৯৫৩)
২.	রুশ গল্প সঞ্চয়ন	(মার্চ ১৯৬৩)
৩.	ইভান দেনিসোভিচর জীবনের একদিন (মূল রচনা One day in the life of Ivan Denisovitch)	(ডিসেম্বর ১৯৬৫)
*৪.	তমস (মূল রচনা ভীষ্ম সাহানী)	(মে ১৯৮৮)

রিপোর্টাজ, ভ্রমণ কাহিনী

১.	আমার বাংলা	(১৩৫৮)
২.	যখন যেখানে	(১৩৬৭)
৩.	ডাক বাংলার ডাইরি	(১৩৭২)

৪.	নারদের ডাইরি	(১৩৭৬)
৫.	যেতে যেতে দেখা	(১৩৭৬)
৬.	ক্ষমা নেই	(১৩৭৮)
৭.	ভিয়েতনামে কিছুদিন	(১৯৭৪)
৮.	আবার ডাকবাংলার ডাকে	(১৯৮১)
৯.	অগ্নিকোণ থেকে ফিরে	(১৯৮৪)
১০.	টো টো কোম্পানী	(১৯৮৪)
১১.	এখন এখানে	(১৯৮৬)
১২.	খোলা হাতে খোলা মনে	(১৯৮৭)
১৩.	কুড়িয়ে ছিটিয়ে	(১৯৯০)
১৪.	চরৈবেতি চরৈবেতি	(১৪০৬)

আত্মজৈবনিক রচনা, স্মৃতিকথা

১.	ঢোলগোবিন্দের আত্মদর্শন	(জুলাই ১৯৮৭)
*২.	টানা পোড়েনের মাঝখানে	(জানুয়ারি ১৯৯৪)
*৩.	ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই	(জানুয়ারি ১৯৯৪)
*৪.	চিঠির দর্পণে	(এপ্রিল ১৯৯৬)
৫.	হেমন্তর কী মন্তর	(১৯৯৭)

তত্ত্ব, প্রবন্ধ, ইতিহাস

১.	ভূতের বেগার	(১৯৫৪)
২.	বাঙালীর ইতিহাস (নীহাররঞ্জন রায় কৃত বাঙালীর ইতিহাস আদি পর্ব-এর সংক্ষেপিত রূপ)	(১৩৫৯)
৩.	অক্ষরে অক্ষরে	(সেপ্টেম্বর ১৯৫৪)
৪.	কথার কথা	(১৯৫৫)
৫.	কবিতার বোঝাপড়া	(জানুয়ারি ১৯৯৩)
*৬.	কথার গুণে তরি কথার দোষে মরি	(মে ১৯৯৮)
*৭.	বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আদি ও মধ্যযুগ সংক্ষেপিত)	(১৯৯৮)
*৮.	Tagore Without Bounds	১৯৯৯
৯.	কাজের বাংলা	(জানুয়ারি ২০০২)
*১০.	ফকিরের আলখাল্লা	(২০০২)

ছোটোদের লেখা

১. জগদীশচন্দ্র বসু (১৯৫৫)
*২. দেশবিদেশের রূপকথা
৩. ইয়াসিনের কলকাতা (১৯৭৮)
৪. রূপকথার ঝুড়ি (১৯৮৮)
৫. জানো আর দ্যাখো জানোয়ার (১৯৯১)
৬. এলাম আমি কোথা থেকে (১৩৯৮)

অনুবাদ গদ্য

১. রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ (জুন ১৯৫৪)
*২. ব্যাঘ্রকেতন (১৩৬৭)
মূল রচনা হিছ টয়-এর The Springing Tiger)
৩. চে গেভারার ডায়েরী (ডিসেম্বর ১৯৭৭)
৪. ডোরাকাটার অভিসারে (জানুয়ারি ১৯৬৯)
(মূল রচনা শের জং)
*৫. সেদিন বনে জঙ্গলে
৬. আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী (বইমেলা ১৯৮২)
*৭. ভারত স্বাধীন হল (১৯৮৯)
(মৌলানা আবুল কালাম আজাদ-এর India Wins Freedomএর বঙ্গানুবাদ)
*৮. চড়াই উৎরাই (২০০২)
(সেলিম আলির Fall of a Sparrow-এর বঙ্গানুবাদ)

সম্পাদিত গ্রন্থ

১. একসূত্রে (ডিসেম্বর ১৯৪২)
(গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত ফ্যাসিবিরোধী কবিতার সংকলন)
২. কেন লিখি (১৯৪৪)
(হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত বাংলাদেশের বিশিষ্ট কথাশিল্পীদের জবানবন্দী)
৩. পাতাবাহার (আশ্বিন ১৩৬২)
(ছোটোদের জন্য সংকলন)
৪. আগামী
(বার্ষিক সংখ্যা ছোটোদের সাহিত্য সংকলন)

৫. কেন লিখি (জানুয়ারি ২০০০)
(পঁচানব্বই জন বাঙালি লেখকের জবানবন্দী)
(প্রণব বিশ্বাসের সঙ্গে যুগ্মভাবে সম্পাদিত)

৬. শঙ্কা সংকট প্রত্যয় (২৩ নভেম্বর ২০০২)
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় শ্রদ্ধাস্পদেষু
(শঙ্খ ঘোষ, অমিয় দেব, সৌরীন ভট্টাচার্য, প্রণব বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পাদিত)

রচনা সংগ্রহ

১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা (১৯৫৭)
২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (এপ্রিল ১৯৭০)
৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ-১ম খণ্ড (নভেম্বর ১৯৭২)
৪. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ-২য় খণ্ড (আগস্ট ১৯৭৪)
৫. কবিতা সংগ্রহ ১ (এপ্রিল ১৯৯২)
৬. কবিতা সংগ্রহ ২ (এপ্রিল ১৯৯৩)
৭. কবিতা সংগ্রহ ৩ (১৯৯৪)
৮. কবিতা সংগ্রহ ৪ (ডিসেম্বর ১৯৯৪)
৯. কবিতা সংগ্রহ ৫ (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫)
১০. সুভাষ মুখেপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (ফেব্রুয়ারি ১৯৭৬)
(প্রথম দে'জ সংস্করণ)
১১. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতা (বইমেলা ১৯৯৩)
১২. গদ্য সংগ্রহ ১ (জানুয়ারি ১৯৯৫)
১৩. গদ্য সংগ্রহ ২ (বৈশাখ ১৪০৩)

বাংলাদেশে প্রকাশিত

১. পদাতিক (জুন ১৯৭০)
২. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য সংকলন (১৯৭৫)
৩. বাংলা আমার বাংলা দেশ (আগস্ট ১৯৮৮)
(নির্বাচিত গদ্য ও পদ্যের সংকলন)

সম্পাদিত পত্র-পত্রিকা

১. পরিচয়
২. সন্দেশ
৩. লোটাস
৪. সপ্তাহ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থের বিষয়গত তালিকা এখানে করা হয়েছে। সব বই যে হাতে নিয়ে তালিকা তৈরি করা গেছে এমন নয়। তাঁর অনেক বই এখনই দুষ্প্রাপ্য। সহৃদয় পাঠকদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরো বিস্তৃত তথ্য সম্বলিত তালিকা তৈরি করা সম্ভব হবে। বই-এর নামের পাশে প্রথম প্রকাশের সময় চিহ্নিত করা হয়েছে। * চিহ্নিত বইগুলির কোনো দ্বিতীয় মুদ্রণ বা সংস্করণ হয়নি।

জীবনানন্দ বিষয়ে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি হারিয়ে গেছে। সেটি খুঁজে পাওয়া খুবই জরুরি। এ ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা তাঁর রচনারও একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করতে হবে। কোনো একক ব্যক্তির পক্ষে হয়তো এ কাজ করা সম্ভব হবে না। পাঠক পাঠিকাদের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে হয়তো তাও করা সম্ভব হবে।

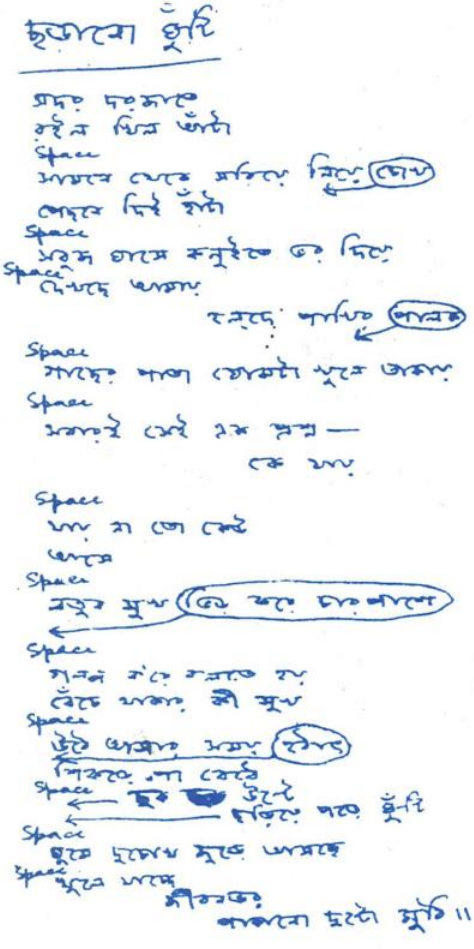

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর ঃ ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০০১৭

পরিচয় দাম ঃ একশ টাকা